চতুরঙ্গ
নির্বাচিত গল্প

চতুরঙ্গ

নির্বাচিত গল্প

সম্পাদনা:

বিষ্ণু বসু

আবদুর রউফ

নয়া উদ্যোগ ।। কলকাতা

CHATURANGA — NIRBACHITA GALPO
(SELECTED STORIES FROM CHATURANGA)

প্রচ্ছদ: সোমনাথ ঘোষ

মুদ্রণ:
নিউ সারদা প্রেস
৯সি শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

পার্থশঙ্কর বসু, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি,
কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে প্রকাশিত

মূল্য ১৫০.০০ টাকা

ISBN 81-85971-70-6

সম্পাদকের কথা

পত্রিকা প্রসঙ্গে

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকেব শেষ দিকটায় বাংলার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। বছর ছয়েক চলার পব ১৯২৭ সালে বন্ধ হয় 'বঙ্গবাসী'। 'প্রগতি' বন্ধ হয় প্রকাশের পর তিন বছরের মাথায় ১৯২৯ সালে। পরবর্তী দুমাসের মধ্যেই 'কল্লোল' থেমে যায় তাব সাত বছ্র আয়ুষ্কাল পূর্ণ না করেই। 'কালি-কলম' উঠে যায় ১৯৩০-এর জানুয়ারিতে । এর ফলে কিছুটা হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ই। কিন্তু সেই হতাশার ছায়া দীর্ঘতর হওয়াব আগেই অবশ্য আবির্ভাব ঘটে বাংলাসাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী পত্রিকা 'পরিচয়'-- এব। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পত্রিকাটির প্রকাশ সাল ১৯৩১। এর ঠিক পরেব বছরেই প্রকাশিত হয় সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূবর্বাশা'। প্রকাশ লগ্নেই পত্রিকাটিব অন্যতম কর্ণধাব অজয় ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন, 'কল্লোল', 'কালি-কলম', এবং 'প্রগতি' ব শূন্যস্থান পূরণ কবাব ভূমিকা নেবে 'পূবর্বাশা'। বলাই বাহুল্য প্রশ্নাতীত দক্ষতার সঙ্গে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। 'পূবর্বাশা' প্রকাশের পরবর্তী বছরেই ১৯৩৩ সালে ১৭ নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকাব তরফে প্রকাশ করা হয় সচিত্র সাপ্তাহিক 'দেশ'।

বাংলাসাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী উল্লিখিত পত্রিকাগুলি ছাড়া 'সাপ্তাহিক বসুমতী' 'বঙ্গবাসী','হিতবাদী' 'সঞ্জীবনী' ইত্যাদি দীর্ঘায়ু (তখন কোন কোনটিব বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে) সাময়িক পত্রগুলি তিবিশের দশকেও বহাল তবিয়তেই টিকেছিল। আবও যেসব পত্রিকা টিকেছিল কিংবা নতুন করে প্রকাশিত হয়েছিল সে সবেব মধ্যে মুসলিম সম্পাদিত কিছু কিছু পত্রিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যেমন 'নবনূব' (১৯০৩), 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' (১৯১৮), 'সওগাত' (১৯১৮), 'সাধনা' (১৯১৯), 'মোসলেম ভারত' (১৯২০), 'অভিযান' (১৯২৬), এবং 'সাহিত্যিক' (১৯২৬)। কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন প্রমুখদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র হিসাবে ঢাকা থেকে 'শিখা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। মওলানা আক্রাম খাঁ সম্পাদিত 'মাসিক মোহম্মদী' প্রকাশ পায় পরেব বছর ১৯২৭ সালে। তিরিশের দশকে এ ধরনের যেসব পত্রিকা প্রকাশ পায় তার মধ্যে 'জয়তী' (১৯৩০), 'ভারত'(১৯৩৪) এবং 'বলবুল'(১৯৩৪) পত্রিকাব নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। ইতিমধ্যে বিশের দশকে প্রকাশিত মুসলিম সম্পাদিত যেসব পত্রিকাব নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে 'সওগাত' এবং 'মাসিক মোহম্মদী' তিরিশের দশকে তো বটেই পববর্তী আরও বহুকাল বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বাংলার পত্র-পত্রিকা জগতেব এইরকম পটভূমিতে তিবিশের দশকের শেষ দিকটায় ১৯৩৮ সালে প্রকাশ পায় চতুরঙ্গ পত্রিকা। প্রথম দিকের দু/একটি সংখ্যায় যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে হুমায়ুন কবীর এবং বুদ্ধদেব বসুব নাম থাকলেও অচিরেই চতুবঙ্গ একক ভাবে হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত সাহিত্যপত্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয়

এটিকে মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার গোত্রভুক্ত করার কথা কখনই কারও মনে হয়নি। তাছাড়া চতুরঙ্গ-কে কয়েক বছর আগে প্রকাশিত 'পরিচয়', 'পূর্বর্বাশা' কিংবা 'দেশ' পত্রিকার অনুবৃত্তি বলাও কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাহিত্যরসিক মহলে চতুরঙ্গ সম্পর্কে এই মনোভাবই তার অনন্যতার নিদর্শন। এই অনন্যতাকে সংজ্ঞায়িত করা অবশ্য বেশ কঠিন।

একথা ঠিক হুমায়ুন কবীর সম্পাদক হওয়ার কারণে চতুরঙ্গ-এর প্রতি তৎকালে দেশের তাবৎ বিদ্বজ্জনের মনোযোগ যেভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল সেই সময় মুসলিম সমাজের অন্য কেউ সম্পাদক হলে হয়ত সেটা সম্ভব হত না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই হুমায়ুন কবীরের মেধা এবং পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। অধ্যাপনাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার পর তাঁর গভীর মননশীলতা, যুগোপযোগী প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা এবং আপসহীন জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণে দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে চতুরঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম ঘোষিত হলে মননশীলতার গহনে বিচরণশীল বাঙালিরা এই পত্রিকায় লেখা দিতে উৎসাহ বোধ করেন। যাঁরা গতানুগতিকতার বাইরে তাঁদের ধ্যান-ধারণাকে প্রসারিত করার তাগিদ অনুভব করতেন প্রথম প্রথম সম্পাদক হিসাবে হুমায়ুন কবীরের উপস্থিতির কারণেই চতুরঙ্গ পত্রিকার প্রতি তাঁরা আস্থাশীল হয়ে উঠেছিলেন। অনুরূপভাবে কবিতা এবং গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেসব দুঃসাহসী লেখক-কবি প্রচলিত গণ্ডি ভেঙে ফেলে সৃজনশীলতায় নতুন দিগন্ত উন্মোচনে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন তাঁরাও আস্থা স্থাপন করতে পেরেছিলেন হুমায়ুন কবীরের সম্পাদনার প্রতি।

এইভাবে সম্পাদকের নামের গুণে লেখক-কবিরা আকৃষ্ট হওয়ার পর চতুরঙ্গ পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে তাঁরা বুঝেছিলেন সম্পাদকের যত অবদানই থাক পত্রিকাটির প্রাণপুরুষ আসলে আতাউর রহমান। যদিও বরাবর চতুরঙ্গ-এর প্রকাশক হিসাবে উল্লিখিত হত আতাউর রহমানের নাম কিন্তু সেটা তাঁর আসল পরিচয় ছিল না। তিনি প্রকাশক যেমন ছিলেন, তেমনি একই সঙ্গে ছিলেন ডিফ্যাক্টো সম্পাদক। পেশাগত কারণে এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক জীবনে ব্যস্ততার কারণে সম্পাদনার কাজে মনোযোগ দেওয়ার মতো সময় হুমায়ুন কবীরের ছিল না। সময় থাকলেও সংগঠক হিসাবে তিনি কতটা সার্থকতা দেখাতে পারতেন সে সম্পর্কে সংশয় ছিলই। এব্যাপারে অনুজপ্রতিম আতাউর রহমানের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে হুমায়ুন কবীর বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়েছিলেন।

স্থিতধী এবং প্রাজ্ঞ বলতে যা বোঝায় আতাউর রহমান ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই তেমন ব্যক্তিত্ব। তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা এবং রসপিপাসা ছিল অনন্ত। ফলে বহুব্যাপ্ত এবং গভীর ছিল তাঁর পড়াশুনা। সমসাময়িক বিশ্বের যাবতীয় ধ্যান-ধারণা নিয়ে অনুশীলনে তাঁর ছিল অক্লান্ত উৎসাহ। কবিতা, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশ্বের যেখানেই কোনও নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যেত ইংরাজিতে হলে তো কথাই নেই, অন্য ভাষাতে হলেও ইংরাজিতে তার অনুবাদ সংগ্রহের জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। সংগৃহীত বইটি শুধু নিজে পড়ে তাঁর তৃপ্তি হত না, অন্য রসগ্রাহী বন্ধুদের পড়িয়ে তা নিয়ে আলোচনায় তিনি

পেতেন অনাবিল আনন্দ। এই কারণে আতাউর রহমানকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল উন্নত রুচি-সংস্কৃতি এবং গতিশীল ধ্যান-ধারণা চর্চার একটা পরিমণ্ডল। উন্নত রুচি-সংস্কৃতির ব্যাপারটা তাঁর নিখুঁত পোশাক আশাক, সুপুরুষ চেহারা, মার্জিত বিনম্র আচরণ, ইত্যাদির মাধ্যমে বিচ্ছুরিত হত। তাঁর অতিথিপরায়ণতা, এবং বন্ধু বাৎসল্যের কারণেও তাঁকে ঘিরে সংস্কৃতিবান মানুষদের পরিমণ্ডলটি ক্রমেই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর আকার নিয়েছিল। কিন্তু পরিমণ্ডল যত বড়ই হোক চতুরঙ্গকে সবরকম গোষ্ঠীমনস্কতার উর্ধ্বে ধরে রাখতে পারাটাও ছিল তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের আর একটা দিক।

আতাউর রহমানের অক্লান্ত প্রয়াসে খ্যাত-অখ্যাত লেখকদের মনে যে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন চতুরঙ্গ অর্জন করেছিল তাতে ভাল লেখা পাওয়ার জন্য খুব বেশি প্রয়াসের আর তেমন প্রয়োজন পড়েনি কখনও। এমনকি ১৯৮৪ সালে চতুরঙ্গ মাসিক হওয়ার পরেও সেই ধারা অব্যাহত থাকে। মননশীলতায় সমৃদ্ধ বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ, আগের মতোই নাটক, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা, সময়ের বিচারে অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের কবিতা গল্প, এবং উপন্যাস প্রকাশেব ধাবাটি অব্যাহত থাকে। তবে মাসিক পত্রিকায় আগেকার ত্রৈমাসিকের তুলনায় অনেক বেশি কবিতা এবং গল্প ছাপাব প্রযোজন দেখা দেওয়ায সর্বক্ষেত্রেই পূর্বের মান বজায় রাখা সম্ভব হযেছে এমন দাবি করা যায় না। কিন্তু উদীয়মান লেখকদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ কবিতা কিংবা গল্পগুলিই যে ছাপা হয়েছে -এতে কোনও সংশয় নেই।

মাসিক চতুরঙ্গ দশ বছর চলার পর আবার ত্রৈমাসিকে রূপান্তরিত হয় ১৯৯৪ সালে। মূল কারণ, পৃষ্ঠপোষণমূলক বিজ্ঞাপনের সংখ্যা কমে যাওয়া এবং পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় বৃদ্ধি। প্রতি মাসে ভাল লেখা পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে ওঠাও অন্যতম আব একটা কারণ। চতুরঙ্গ-এর কাছে মনস্ক পাঠকদের চাহিদা আজও যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে এর উন্নত মান বজায় বাখাব প্রশ্নে কোনও আপস চলে না। কখনও আপস করা হয়নি বলেই আজও যাঁরা একটু ভাল লিখতে পারেন লেখার আমন্ত্রণ পেলে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না। কেউ কেউ তাঁর শ্রমসাধ্য রচনাটি চতুরঙ্গ-এ প্রকাশ করা সম্ভব কিনা সেকথা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে খোঁজ কবেন। ফলে এখনও চতুরঙ্গ বাংলা ভাষার অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ রচনাসম্ভারের বাহন। তাই এই পত্রিকাব পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নির্বাচিত বচনা নিয়ে 'চতুরঙ্গ থেকে' নামে অশোক মিত্র সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থেব যে দুটি বিশালাকৃতি খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হযেছে এবং আরও একটি অনুরূপ আকারের খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায রয়েছে তাতেও সম্পাদক পত্রিকার আটাশ বর্ষের বেশি আর এগোতে পারেননি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট রচনার সম্ভার এতই বেশি যে খুব নির্মমভাবে ঝাড়াই বাছাই করা সত্ত্বেও যে লেখাগুলি অপরিহার্য বলে মনে হয় তাতেই মাত্র আটাশ বর্ষ পেরোতে না পেরোতেই তিন খণ্ড সংকলন গ্রন্থের আবার একটি মহাভারত হয়ে ওঠার উপক্রম। অথচ চতুরঙ্গ-এর বয়স এখন অতিক্রম করে গেছে যাট বর্ষের সীমানা।

এরকম পরিস্থিতিতে উল্লিখিত তিন খণ্ডে সংকলিত নির্বাচিত রচনাগুলি বাদ দিয়ে অনুরূপ নির্বাচিত রচনাসম্ভার নিয়ে আরও যে অনেকগুলি খণ্ডই প্রকাশ করা যায় -- এতে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। ভবিষ্যতে হয়ত তেমন আয়োজনেব প্রয়োজনও হবে।

আপাতত উল্লিখিত তিন খণ্ডে সংকলিত গল্পগুলি বাদ দিয়ে আরও বিপুল পরিমাণ উৎকৃষ্ট গল্পের যে ঐশ্বর্যভাণ্ডার ষাট বর্ষ অতিক্রান্ত চতুরঙ্গ-এর সংখ্যাগুলিতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে সেই ভাণ্ডার থেকে বলতে গেলে বাছাই করা ৩৭টি গল্পের একটি সংকলন পাঠকদের দরবারে হাজির করছি। প্রবীণ-নবীন সবরকম লেখকদের লেখা প্রকাশকালের ক্রমঅনুসারে এতে সাজিয়ে দেওয়া হল। এতে হয়ত বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিকতা, পালাবদল, নতুন দিনের চাহিদার সঙ্গে প্রবীণ লেখকদের মুকাবেলা, এ ধরনের প্রাচীনদের সঙ্গে অর্বাচীন লেখকদের প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে তুলনামূলক বিচারের একটা সুযোগ পাবেন আজকের দিনের পাঠকেরা।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, যেসব গল্পকার এই সংকলনে বাদ পড়ে গেলেন তাঁদের গুরুত্বও কিছুমাত্র কম নয়। অনেক প্রবীণ গল্পকার এবং তাঁদের কারও ভাল গল্প বাদ পড়ার কারণ উল্লিখিত তিনটি সংকলনে সেসবের স্থান হয়েছে। নবীন গল্পকারদের ক্ষেত্রে অনেকখানি লটাবির মতো পদ্ধতি অবলম্বন না করে উপায় ছিল না। নইলে সব ভাল গল্প একটি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে সংকলনটির যা কলেবর হত তাতে তার মূল্য ক্রেতাদের সাধ্য অতিক্রম করে যেত। এই সঙ্গে আরও যে কথাটি বলা দরকার, বাংলাদেশের গল্প সংখ্যায় এবং হয়ত উৎকর্ষেও মোটেই প্রতিনিধিস্থানীয় হয়নি। এর কারণ বাংলাদেশ নামক নবীন রাষ্ট্রটির উদ্ভবের পর সেখান থেকে গল্প সংগ্রহ বেশ কঠিন ছিল। ১৯৮৪ সালে চতুরঙ্গ মাসিক হওয়ার পর বাংলাদেশের সঙ্গে সাহিত্যের সেতুবন্ধন গড়ে তোলার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলে এই পর্যায়ে অল্পসংখ্যক হলেও সেখানকার কিছু গল্প মাসিক চতুরঙ্গ-এ প্রকাশ করা সম্ভব হয়। এই সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারত বাংলাদেশে যে গল্প একবার প্রকাশিত হয়ে গেছে এখানকার অন্যান্য কিছু পত্রিকার মতো চতুরঙ্গও যদি তা পুনর্মুদ্রণের নীতি গ্রহণ করত। কিন্তু বরাবর চতুরঙ্গ-এ তেমন গল্পই ছাপা হয়েছে যা সরাসরি এই পত্রিকার জন্যই প্রদত্ত। ফলে এই পত্রিকায় মুদ্রিত বাংলাদেশের গল্পের সংখ্যা কখনই পর্যাপ্ত হয়ে ওঠেনি। তাই এই সংকলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় বাছাই গল্প প্রত্যাশা করাটা বাস্তবসম্মত হবে না।

সব মিলিয়ে এই সংকলনটিও যে ৬০ বর্ষ অতিক্রান্ত চতুরঙ্গ-এ মুদ্রিত গল্পের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার থেকে নির্বাচিত গল্পের যথার্থ প্রতিনিধিত্বকারী হয়ে উঠতে পেরেছে। তবে এই রকম আরও একটি সংকলন প্রকাশ করতে পারলে নবীন-প্রবীণ মিলিয়ে বাংলা ভাষার অসামান্য ক্ষমতাধর গল্পকারদের প্রতি কিছুটা সুবিচার করা যায়। কিন্তু সাধ থাকলেও সাধ্যে না কুলোতে পারার জন্য যাঁদের গল্প চতুরঙ্গ-এর বিভিন্ন সংখ্যায় সমাদরে মুদ্রিত হলেও বর্তমান এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হল না তাঁদের কাছে আমরা মার্জনাপ্রার্থী।

পরিশেষে বলি, স্থানাভাবের কারণে অনেক অমূল্য গল্প বাদ পড়লেও অপেক্ষাকৃত বিশালাবৃতি এই সংকলন গ্রন্থটিতে প্রবীণ এবং নবীন গল্পকারদের যে সৃজনসম্ভার সাজিয়ে দেওয়া হল তাতে ইদানীংকালের পাঠকদের রসপিপাসা অনেকখানি মিটবে বলেই আশা করা যায়।

আবদুর রউফ

সম্পাদকের কথা

গল্প প্রসঙ্গে

এ কথা সবার জানা, সাহিত্যের প্রজাতি হিশেবে ছোটগল্পের আবির্ভাব আদিম জনজাতির জীবনযাপনের অনুসঙ্গী আকর্ষণে। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন মানুষদের সম্পদ কতটা সমৃদ্ধ ছিল সে বিষয়ে নানা সংশয় থাকলেও গল্পের ভাণ্ডার যে উপচে পড়ত তার প্রমাণ রয়েছে প্রচুর। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বিবিধ উপকথা, রূপকথা, লোককাহিনী থেকে শুরু করে অসংখ্য পুরাবৃত্তের কাহিনী দ্যুতিসম্পন্ন গল্পসমূহ আধুনিক পাঠককুলকে এখনো গভীরতর ভাবে ব্যাকুল করে তোলে। জাতক থেকে শুরু করে পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎ সাগর, শুক সপ্ততি প্রভৃতি ছুঁয়ে অজস্র পুরাণকথায় তার দৃপ্ত পদসঞ্চার আগ্রহী মানুষদের কাছে অজানা নেই। প্রতীচ্যের পৃথিবীতেও সমানুপাতিক গুরুত্ব নিয়ে অজস্র কথানক প্রাচীনকাল থেকে প্রবাহিত রয়ে গেছে। ব্যাবিলন, আসিরিয়া, মিশর থেকে গ্রিক রোমান সংস্কৃতিকে ফলবান করে ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা, ইয়োরোপের নানা প্রান্ত পর্যন্ত এমনকি চিন জাপানের সভ্যতাতেও তার প্রতিসাম্য অজানা নয়। চসার, বোকাচ্চিও তার প্রতিসাম্য বান্দেল্লো প্রভৃতি অজস্র লেখক আজও আমাদের কৃতজ্ঞ করে রাখেন।

কিন্তু এমন বর্ণময় ঐতিহ্য সত্ত্বেও এ কালের সাহিত্য পূজকের দল আধুনিক ছোট গল্পকে আমাদের চেতনায় প্রোথিত করতে চান একটি ভিন্নতর মাপকাঠি মারফত। শিল্পবিপ্লবের ফলে উদ্ভূত যে সকল সংকট ব্যক্তি ও সমষ্টিকে বিড়ম্বিত করেছে তারই অভিব্যক্তির আশ্রয় হিসেবে গল্প নামক প্রজাতিকে বিচার করবার পদ্ধতি আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। আঠারো-উনিশ শতকের অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজের মনোভূমিকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে তার পরিণতি হিশেবেই আধুনিক ছোটগল্প বিশ্লেষিত হয়ে থাকে। তাই ছোটগল্পের শারীরিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন হলেও তার চারিত্র্য একালে সম্পূর্ণ বদলে গেছে এমন অভিমত এখন মোটামুটি জাঁকিয়ে রয়েছে।

সারা পৃথিবীতে বুধসমাজে সাহিত্য পত্রের আবির্ভাবে ছোটগল্প নামক প্রজাতিটি আধুনিক যুগে প্রচার ও ব্যাপ্তি পেয়েছে। উনিশ শতকেই এ প্রক্রিয়ার শুরু হয়েছিল এবং এজন্যই ছোট গল্পকে সাধারণভাবে Peculiar product of nineteenth century বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে ছোটগল্প উনিশ শতকের এক সম্পূর্ণ নিজস্ব সামগ্রী -- যা ইত:পূর্বে অন্তত এই রূপে বিদ্যমান ছিল না। এ নভেলও নয়, রোমান্সও নয়। এ কবিতার মতো ঐক ভাবাশ্রয়ী-অথচ কল্পনামুখ্য নয়, জীবন নির্ভর। আবার সেই জীবনের সামগ্রিকতার প্রতিচ্ছবিও এতে নেই -- এত খণ্ডতার ব্যবহার। সুতরাং এ বস্তু স্পষ্টই 'অভিনব'-এ হল একটি Peculiar product। এবং 'আধুনিক ছোটগল্প হল যন্ত্রণার ফসল' (সাহিত্য ছোটগল্প: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।) শিল্প বিপ্লব ও যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসন সমাজ ও সভ্যতার বুকে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তারই একটি বিচিত্রমুখী অনবদ্য প্রকাশ

ঘটেছে ছোটগল্পের আঙ্গিকে। ফ্রান্স থেকে রাশিয়া, আমেরিকা থেকে ভারত পর্যন্ত চলেছে তার অনবদ্য আগ্রাসন। লক্ষণীয় যে পৃথিবীর ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা বিভিন্ন প্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন একই সময়ে। আমেরিকার এডগার এলান পো একটু বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও ফ্রান্সের মোপাসাঁ, রাশিয়ার চেকভ, আমেরিকাব ও হেনরি এবং ভারতের রবীন্দ্রনাথ কাছাকাছি সময়েই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এঁদের উত্তরাধিকার মেনেই সব দেশে ঘটেছে ছোটগল্পের বিস্ফোরক সমারোহ। তার মানে এই নয় যে এঁরাই ছিলেন একমাত্র প্রারম্ভক, সকলেরই কিছু সমর্থ পূর্বসূরী ছিলেন। ফ্রান্সে মোপাসাঁর গুরু ফ্লোবেয়ার তো ছিলেনই যদিও তিনি মূলত ছিলেন ঔপন্যাসিক, ও হেনরির শিল্পীমনকে রসদ জুগিয়েছিলেন স্বয়ং এডগার এলান পো। দস্তয়ভস্কি বলেছিলেন তাঁব সমধর্মী সব লেখক এবং অবশ্যই তিনি নিজেও বেরিয়ে এসেছেন গোগোলের ছোটগল্প 'ওভার কোট'-এর পকেট থেকে। কিন্তু তবু চেকভই শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের লেখক বলে স্বীকৃত। ছোটগল্পকাব হিশেবে রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী অবশ্য কেউ ছিলেন না। বাংলা ছোটগল্পেব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রেরণা থেকে।

অবশ্য এ বিস্তারেব পরিবেশ রচনায় অনুঘটক হিশেবে গুরুতর দায়িত্ব পালন করেছিল উল্লিখিত দেশসমূহে সাময়িক সাহিত্য পত্রের প্রকাশ। মোপাসাঁ থেকে ও হেনরি, চেকভ থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলেরই আত্মপ্রকাশের তাগিদ ও অবলম্বন ছিল বিবিধ, সাময়িক সাহিত্যপত্র। মোপাসাঁব তিনশতাধিক ছোটগল্প প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল নানা পত্রিকায়। চেকভ তো সংসারের প্রাত্যহিক অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানোব জন্য ছাত্রাবস্থায় চটজলদি গল্প লিখে পত্রিকা দপ্তরে পাঠিয়ে অর্থ শিকার করতেন। এভাবেই লেখা হয়েছিল প্রচুর শিল্পসফল গল্প। আব রবীন্দ্রনাথ? তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করলেন বাংলা সাহিত্যেব ভূখণ্ডে তখন শুরু হয়ে গেছে নানাবিধ সাময়িকপত্রেব সদর্প পদসঞ্চাব। নিজেদের বাড়িব 'ভারতী' ও 'সাধনা'র জন্য তাঁকে প্রচুর গল্প লিখতে হয়েছিল। অবশ্য তাঁর গল্পরচনাব প্রবাহের ভগীরথ হিসেবে দেখা দিয়েছিল 'হিতবাদী'। তারপর নানাধর্মী পত্রিকাব আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁকে সারা জীবন লিখতে হয়েছে ক্রমাগত। তার ফলে তাঁর গল্পের বিষয় ও আঙ্গিকে এসেছে অভিনব বৈচিত্র্য যার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ঘটেছে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে 'সবুজ-পত্র' পত্রিকার আবির্ভাবে।

এ পরম্পরাকে মেনেই যেন গত একশো বছর ধরে যে সকল সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়ে এসেছে তাদের সারস্বত সাধনার অন্যতম উপকরণ হিশেবে দেখা দিয়েছে ছোটগল্প রচনা সমারোহ। সাহিত্য, নারায়ণ, মানসী ও মর্মবাণী, বিচিত্রা, কল্লোল, কালিকলম প্রভৃতি প্রতিটি পত্রিকা ঘিরে গড়ে উঠেছিল ছোটগল্পের সমারোহপূর্ণ বিচিত্র ভাণ্ডার। গত শতকের বিশের দশকে যদি এ ব্যাপারে গুরুত্ব পেয়ে থাকে কল্লোল (১৯২৩), শনিবারের চিঠি (১৯২৪), উত্তরা (১৯২৫), কালিকলম (১৯২৬) এবং বিচিত্রা (১৯২৭), তাহলে ত্রিশের দশকে অবশ্যই উল্লিখিত হতে পারে পরিচয় (১৯৩১), বঙ্গশ্রী (১৯৩২), দেশ (১৯৩৩) পূর্বাশা (১৯৩২) ও চতুরঙ্গ (১৯৩৮) পত্রিকা প্রকাশের সংঘটনা। প্রতিটি পত্রিকার

নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব ছিল যাদের সমগ্রতা বাংলা সাহিত্যকে, বিশেষ করে, ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল। লক্ষ করবার বিষয় হল উপরোক্ত পত্রিকাসমূহের মধ্যে তিনটি এখনো প্রাণবন্ত। পূর্বর্বাশা অবশ্য বিলুপ্ত হয়েছে দীর্ঘকাল আগে।

মনস্ক পাঠকেরা অবশ্যই স্মরণে আনতে পারবেন সারা পৃথিবীতে এবং তারই সূত্র ধরে বাংলায় কি ধরণের সংকট ক্রমশ ঘণীভূত হয়ে আসছিল যার অভিঘাতে উৎপন্ন হয়েছিল চল্লিশের দশকে ব্যাপক বিপর্যয়। অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় । গোল টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা সারা ভারতকে উদ্বেল করে তুলেছিল। তখন ক্রমে বেড়ে উঠছিল সাম্প্রদায়িকতার নানা স্ফূরণ, নতুন নির্বাচনী পদ্ধতিও যার টেনশনকে প্রশমিত করতে পারে নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী একদল মৃত্যুভয়হীন যুবকদলেব সগর্ব আত্মপ্রকাশ যার বিস্ফোরণ দেখা গিয়েছিল অবিভক্ত বাংলাব দুই প্রান্তে- চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরে। ত্রিশের দশকের প্রথম তিনটি বছর যদি হয সশস্ত্র বিপ্লববিশ্বাসী তরুণদলের কর্মকাণ্ডের কাল, তাহলে শেষ তিনটি বছরকে অবশ্যই বলতে হবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ভাবতের জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধ। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ভাবতেব অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শগত মতভেদ। তাব পবিণামে কংগ্রেসেব সভাপতি হিশেবে নির্বাচিত হয়েও সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ ও কংগ্রেস থেকে তাঁর বিদায়। ইতিমধ্যে যুক্ত নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টি বিজয়ী হয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে কংগ্রেসের রাজনীতিগত বিভ্রান্তির পরিণামে বাধ্য হয়ে মুসলিম লিগেব কোয়ালিশনে মন্ত্রীসভাগঠন বাংলার বিপর্যয়পূর্ণ ভবিষ্যৎকে যেন প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেল যার ফলশ্রুতি এক দশকের মধ্যেই হল দেশভাগ। ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীতেও তখন টালমাটাল অবস্থা। সোভিয়েত ইউনিয়নে জোসেফ স্তালিনের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং জার্মানীতে হিটলারেব উত্থান বিশ্বের বেশিব ভাগ জনসমাজকে যেন যুযুধান দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিল। তার সঙ্গে যুক্ত হল ধনতান্ত্রিক সভ্যতাব নিজস্ব সংকট। ত্রিশের দশকেব গোড়ায় দেখা দিল ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা, তৈরি হল দিশেহাবা ক্রুদ্ধ বেকাব বাহিনী। জাতিসমূহের পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস যাব পবিণতি হিশেবে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ঘরে বাইবের এ বিপর্যযের অভিঘাত আছড়ে পড়ল বাঙালিব চেতনার উপব। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ যেন পবস্পবেব প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠল। ফ্যাসিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রভৃতি সব যেন তালগোল পাকিয়ে এক মহাসংকট নির্মাণ কবল। এ পরিবেশে পবিচয়, পূর্বর্বাশা, দেশ, চতুবঙ্গ প্রভৃতি পত্রিকা একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক বাতাববণ তৈরি করাব জন্য নিজেদেব নিযুক্ত করেছিল। আমরা এখানে শুধু চতুবঙ্গ পত্রিকা নিয়েই আলোচনা করব।

চতুরঙ্গ পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাব দিকে লক্ষ করলেই উপবোক্ত সিদ্ধান্তেব সমর্থনে বেশ কিছু তথ্য পেশ করা যায়। এ সংখ্যায় লেখকবৃন্দের মধ্যে কয়েকজনেব নাম উল্লেখ কবলেই পাঠক হয়ত উদ্দেশ্য ও আদর্শের খানিক আভাস পাবেন। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, সুশোভন সরকার, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, হুমাযুন কবির, সৈয়দ মুজতবা আলী, কাজী আবদুল ওদুদ, গোলাম কুদ্দুস, আবদুল কাদির, হোসেন জুবেবী লেখকদেব মধ্যে এ নামগুলি স্বভাবতই

উদ্বোধিত করে। বিগত বাষট্টি বছর ধরে চলেছে এ ঐতিহ্যেরই সম্প্রসারণ। রচনা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উদার মানবিকতা ও কোটারিমুক্ত মনোনিবেশও অলক্ষ্য থাকে না।

ছোটগল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ মনোভাব যেন আরো সমর্থতা নিয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথম সংখ্যাতেই ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'বোমা'। তারপর বিভিন্ন সংখ্যায় পরিবেশন করা হয় প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবুল মনসুব আহমদ্, শওকত ওসমান, সন্তোষ ঘোষ, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকের প্রচুর গল্প। এ নির্বাচনের অন্তত দুটি বৈশিষ্ট্য পাঠকদের নজরে পড়বে। দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও সদ্য প্রতিষ্ঠিত গল্পকারগণ যেমন গুরুত্ব পেয়েছেন তেমনি একেবারে নতুন লেখকদেরও অবহেলা করা হয়নি। বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, মানিকদের সঙ্গে আছেন আবুল মনসুর আহমেদ, আবু রুশদ, মাফরুহা চৌধুরীর গল্প, শওকত ওসমান লিখেছেন একাধিক গল্প, আবার অচ্যুত গোস্বামী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রতিভা বসুর মতো গল্পকারগণও। অমিয়ভূষণ মজুমদার সম্ভবত এ পত্রিকাতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। অসীম রায়, আবুল খায়ের মুসলেহ্উদ্দীন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখদের লেখা যখন এ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল, তাঁরা তখন তেমন প্রতিষ্ঠিত লেখক বোধ হয় ছিলেন না।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল গল্প নির্বাচনে কোনো সংকীর্ণ মতাদর্শের মাপকাঠি এ পত্রিকার সম্পাদকসমূহ কখনো অনুসরণ করেন নি। তাঁদের কাছে শর্ত ছিল একটাই এবং তা হল বিশুদ্ধ নন্দনের সমর্থন। সে নন্দন যদি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শেরও অনুগত হয় তাতেও আপত্তি নেই কিন্তু গল্প হিশেবে তাকে সার্থক হতে হবে। আমাদের সংকলিত গল্পসমূহে এ বিশেষত্ব পাঠক লক্ষ্য করতে পারবেন। শাণিত বিদ্রূপ থেকে কঠোর ব্যঙ্গ আবেগ ও আসক্তির পরিপূর্ণ সমারোহ, বিষাদ ও আনন্দের বিবিধ উপচার পরিবেশিত গল্পসমূহে বিধৃত আছে। তির্যক ব্যঞ্জনাময় গল্পের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে সবল অকপট নন্দনময় উপলব্ধির প্রকাশ।

এ প্রবাহে যেমন ছিলেন প্রবীণ লেখক সমূহ তেমনি আছেন দিব্যেন্দু পালিত, মতি নন্দী থেকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী, মধুময় পাল প্রমুখ তরুণতর গল্পকারগণ। বিগত ছয় দশক ধরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া পাঠকদের রুচি ও প্রবণতাকে নান্দনিক সমর্থন জুগিয়ে গেছে 'চতুরঙ্গ পত্রিকা'য় প্রকাশিত গল্পসমূহ। কাজেই কেউ যদি বলেন এ পত্রিকা নির্মাণ করেছিল গল্প উপভোগের একটি স্বতন্ত্র ধারা তাহলে বোধহয় ভুল হবে না।

বিষ্ণু বসু

সূচী

নেহাত গল্প নয়

আবুল মন্‌সুর আহ্‌মদ

[জন্ম ১৮৯৮ সালে ময়মনসিংহের ধানীখোলা গ্রামে। সাংবাদিকতার সূত্রেই উদ্‌বুদ্ধ হন সাহিত্যচর্চায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: আয়না, সত্যমিথ্যা, জীবনক্ষুধা, আবেহায়াত, ইত্যাদি। ছোটগল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত। মৃত্যু: ১৯৭৯ সালে।]

আদুভাই চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেন। ঠিক অধ্যয়ন করতেন না বলে অবস্থান করতেন বলাই ভাল।

কারণ ঐ বিশেষ শ্রেণী ব্যতীত আর কোনো শ্রেণীতে তিনি কখনো পড়েছেন কিনা, পড়ে থাক্‌লে ঠিক কবে পড়েছেন, সে কথা ছাত্ররা কেউ জান্‌তো না। শিক্ষকরাও অনেকে জান্‌তেন না বলেই বোধ হতো।

শিক্ষকরাও অনেকে তাঁকে 'আদুভাই' বলে ডাক্‌তেন। কারণ নাকি এই যে, ওঁরাও এককালে আদুভাইর সমপাঠী ছিলেন, এবং সবাই নাকি এক চতুর্থ শ্রেণীতেই আদুভাইর সঙ্গে পড়েছেন।

আমি যখন চতুর্থ শ্রেণীতে আদুভাইর সমপাঠী হলাম, ততদিনে আদুভাই ঐ শ্রেণীর পুরাতন টেবিল ও ব্ল্যাক বোর্ডের মতই নিতান্ত অবিচ্ছেদ্য এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছেন।

আদুভাইর এই অসাফল্যে আর যেই হতাশ হোক, আদুভাইকে কেউ সেজন্য কখনো বিষণ্ণ দেখেনি। কিম্বা নম্বর বাড়িয়ে দেবার জন্য তিনি কখনো কোনো শিক্ষক বা পরীক্ষককে অনুরোধ করেন নি। যদি কখনো কোনো বন্ধু বলেছে : "যান না আদুভাই, যে কয় সাবজেক্টে শর্ট আছে, শিক্ষকদের বলে 'কয়ে' নম্বরটা নিন না বাড়িয়ে।" তখন গম্ভীরভাবে আদুভাই জবাব দিয়েছেন : সব সাবজেক্টে পাকা হয়ে উঠাই ভাল।

কোন্ কোন্ সাবজেক্টে শর্ট, সুতরাং পাকা হওয়ার প্রয়োজন আছে তা কেউ জান্‌তো না, আদুভাইও জান্‌তেন না; জানবার জন্য চেষ্টাও কখনো করেন নি; জানবার আগ্রহও যে তাঁর আছে, তাও বোঝবার উপায় ছিল না। বরঞ্চ তিনি যেন মনে করতেন, ও-রকম আগ্রহ প্রকাশ করাই অন্যায় ও অসঙ্গত। তিনি বল্‌তেন : যেদিন তিনি সব সাবজেক্টে পাকা হবেন, প্রমোশন সেদিন তাঁর কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। সে শুভ দিন যে একদিন আসবেই, সে বিষয়ে আদুভাইর এতটুকু সন্দেহ কেউ কখনো দেখে নি।

কত খারাপ ছাত্র প্রশ্ন-পত্র চুরি করে, অপরের খাতা নকল করে আদু-ভাইর ঘাড়ের উপর দিয়ে প্রমোশন নিয়ে চলে গিয়েছে, এ ধরণের ইঙ্গিত আদুভাইর কাছে কেউ করলে তিনি গর্জ্জে উঠে বলতেন : জ্ঞানলাভের জন্যই আমরা স্কুলে পড়ি, প্রমোশন লাভের জন্য পড়ি না।

সেজন্য অনেক সন্দেহবাদী বন্ধু আদুভাইকে জিজ্ঞেস করেছে : আদুভাই, আপনার কি সত্যই প্রমোশনের আশা আছে?

নিশ্চিত বিজয়- গৌরবে আদুভাইর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি তাচ্ছিল্যভরে বলেছেন: আজ হোক, কাল হোক, প্রমোশন আমাকে দিতেই হবে। তবে হাঁ, উন্নতি আস্তে আস্তে হওয়াই ভাল। যে গাছ লক্‌লক্ করে বেড়েছে, সামান্য বাতাসেই তার ডগা ভেঙেছে।

সেজন্য আদুভাইকে কেউ কখনো পেছনের বেঞ্চিতে বস্‌তে দেখে নি। সামনের বেঞ্চিতে বসে তিনি শিক্ষকদের প্রত্যেকটী কথা মনোযোগ দিয়ে শুন্‌তেন, হাঁ করে গিল্‌তেন, মাথা নাড়তেন ও প্রয়োজনমত নোট করতেন। খাতার সংখ্যা ও সাইজে আদুভাই ছিলেন শ্রেণীর একজন অন্যতম।

শুধু ক্লাসের নয়, স্কুলের মধ্যে তিনি সবার আগে পৌঁছুতেন। এ ব্যাপারে কি শিক্ষক কি ছাত্র কেউ তাঁকে কোনো দিন হারাতে পেরেছে বলে শোনা যায় নি।

স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় আদুভাইকে আমরা বরাবর দুটো পুরস্কার পেতে দেখেছি। আমরা শুনেছি, আদুভাই কোন্ অনাদিকাল থেকে ঐ দুটো পুরস্কার পেয়ে আস্‌ছেন। তার একটা, স্কুল কামাই না করার জন্য, অপরটা, সচ্চরিত্রতার জন্য। শহরতলীর পাড়া-গাঁ থেকে রোজ পাঁচ মাইল রাস্তা তিনি হেঁটে আসতেন বটে, কিন্তু ঝড়-তুফান, অসুখ-বিসুখ কিছুই তাঁর এ কাজে অসুবিধে সৃষ্টি করে উঠ্‌তে পারে নি। চৈত্রের কাল্- বোশেখী বা শ্রাবণের ঝড়-ঝঞ্ঝায় যেদিন পশু-পক্ষীও ঘর থেকে বেরোয় নি, সেদিনও ছাতার নীচে মুড়িসুড়ি হয়ে, বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে আদুভাইকে স্কুলের পথে এগোতে দেখা গিয়েছে। মাইনের মমতায় শিক্ষকরা অবশ্য স্কুলে আস্‌তেন। তেমন দুর্যোগে ছাত্ররা কেউ আসে নি নিশ্চিত জেনেও নিয়ম রক্ষার জন্য তাঁরা ক্লাসে একটা উঁকি মারতেন। কিন্তু তেমন দিনেও অন্ধকার কোণ থেকে 'আদাব, সার' বলে যে একটা ছাত্র শিক্ষককে চমকিয়ে দিতেন, তিনি ছিলেন আদুভাই। আর চরিত্র? আদুভাইকে কেউ কখনো রাগ কিম্বা অভদ্রতা করতে কিম্বা মিছে কথা বল্‌তে দেখে নি।

স্কুলে ভর্তি হবার পর প্রথম পরীক্ষাতেই আমি ফার্স্ট হলাম। সুতরাং আইনতঃ আমি ক্লাসের মধ্যে সব চাইতে ভাল ছাত্র এবং আদুভাই সবার চাইতে খারাপ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কী জানি কেন, আমাদের দুজনার মধ্যে একটা বন্ধন সৃষ্ট হলো। আদুভাই প্রথম থেকেই আমাকে যেন নিতান্ত আপনার লোক বলে ধরে নিলেন। আমার উপর যেন তাঁর কতকালের দাবী!

আদুভাই মনে করতেন, তিনি কবি ও বক্তা। স্কুলের সাপ্তাহিক সভায় তিনি বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ করতেন। তাঁর কবিতা ও বক্তৃতা শুনে সবাই হাস্‌তো। সে হাসিতে আদুভাই লজ্জাবোধ করতেন না, নিরুৎসাহও হতেন না। বরঞ্চ তাকে তিনি প্রশংসা-সূচক হাসিই মনে করতেন। তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যেতো।

অন্য সব ব্যাপারে আদুভাইকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হতো। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে তাঁর নির্বুদ্ধিতা দেখে আমি দুঃখিত হতাম। তাঁর নির্বুদ্ধিতা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই তামাসা করছেন, অথচ তিনি তা বুঝ্‌তে পারছেন না, দেখে আমার মন আদুভাইর পক্ষপাতী হয়ে উঠ্‌লো।

গেল এইভাবে চার বছর। আমি ম্যাট্রিকের জন্য টেষ্ট্ পরীক্ষা দিলাম। আদুভাই কিন্তু সেবারও যথারীতি চতুর্থ শ্রেণীতেই অবস্থিতি করছিলেন।

ডিসেম্বর মাস।

সব শ্রেণীর পরীক্ষা ও প্রমোশন হয়ে গিয়েছে। প্রথম বিবেচনা, দ্বিতীয় বিবেচনা, তৃতীয় বিবেচনা ও বিশেষ বিবেচনা ইত্যাদি সকল প্রকারের 'বিবেচনা' হয়ে গিয়েছে। 'বিবেচিত' প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যা অন্যান্য বারের ন্যায় সেবারও পাশ-করা প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যার দ্বিগুণেরও উর্দ্ধে উঠেছে।

কিন্তু আদুভাই এসব বিবেচনার বাইরে। কাজেই তাঁর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। নির্বাচন-পরীক্ষা দিয়ে আমরা টিউটরিয়েল ক্লাস করছিলাম। ছাত্ররা শুধুশুধু স্কুল-প্রাঙ্গণে জটলা করছিল — প্রমোশন-পাওয়া ছেলেরা নিজেদের কীর্ত্তি-উজ্জ্বল চেহারা দেখাবার জন্য, না-পাওয়া ছেলেরা প্রমোশনের কোনো প্রকার অতিরিক্ত বিশেষ বিবেচনার দাবী জানাবার জন্য।

এমনি দিনে একটু নিরালা জায়গায় পেয়ে হঠাৎ আদুভাই আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেল্‌লেন। আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম্। আদুভাইকে আমরা সবাই মুরুব্বি মান্‌তুম, তাই তাঁকে ক্ষিপ্রহস্তে টেনে তুলে প্রতিদানে তাঁর পা ছুঁয়ে বল্‌লাম : কী হয়েছে আদুভাই, অমন পাগ্‌লামো করলেন কেন?

আদুভাই আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁকে অমন বিচলিত জীবনে আর কখনো দেখি নি। তাঁর মুখের সর্ব্বত্র অসহায়ের ভাব।

তাঁর কাঁধে সজোরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম : বলুন, কী হয়েছে?

আদুভাই কম্পিত কণ্ঠে বললেন : প্রমোশন।

আমি বিস্মিত হলুম, বল্‌লুম : প্রমোশন? প্রমোশন কী? আপনি প্রমোশন পেয়েছেন?

-- না, আমি প্রমোশন পেতে চাই।

-- ও : পেতে চান? সে ত সবাই চায়।

আদুভাই অপরাধীর ন্যায় উদ্বেগ-কম্পিত ও সঙ্কোচ-জড়িত অনেক প্যাঁচমোচড় দিয়ে যা বললেন, তার মর্ম্ম এই যে, প্রমোশনের জন্য এত দিন তিনি কারো কাছে কিছু বলেন নি; কারণ, প্রমোশন জিনিষটাকে যথাসময়ের পূর্ব্বে এগিয়ে আনাটা তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবার তাঁকে প্রমোশন পেতেই হবে। সে নির্জ্জনতায়ও তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে সে কারণটা বল্‌লেন। তা এই যে, আদুভাইর ছেলে সেবার চতুর্থ শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছে। নিজের ছেলের প্রতি আদুভাইর কোনো ঈর্ষা নেই। কাজেই ছেলের সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়ায় তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু আদুভাইর স্ত্রীর তাতে গুরুতর আপত্তি আছে। ফলে, হয় আদুভাইকে সেবার প্রমোশন পেতে হবে, নয় ত পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হবে। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আদুভাই বাঁচবেন কী নিয়ে?

আমি আদুভাইর বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। তাঁর অনুরোধে আমি শিক্ষকদের কাছে

সুপারিশ করতে যেতে রাজী হলাম।

প্রথমে পারসী-শিক্ষকের কাছে যাওয়া স্থির করলাম। কারণ তিনি আমাকে খুব ভালবাস্‌তেন। এক পরীক্ষায় তিনি আমাকে মোট একশত নম্বরের মধ্যে একশ পাঁচ নম্বর দিয়েছিলেন। বিস্মিত হেডমাষ্টার তার কারণ জিজ্ঞেস করায় মৌলবী সাব বলেছিলেন : ছেলে সমস্ত প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দেওয়ায় সে পূর্ণ নম্বর পেয়েছে। পূর্ণ নম্বর পাওয়ার পুরস্কার স্বরূপ আমি খুশী হয়ে তাকে পাঁচ নম্বর বখ্‌শিশ দিয়েছি। অনেক তর্ক করেও হেডমাষ্টার মৌলবী সাবকে এই কার্য্যের অসঙ্গতি বুঝাতে পারেন নি।

মৌলবী সাব আদুভাইর নাম শুনেই জ্বলে উঠলেন। অমন বেতমিজ ও খোদার নাফরমান বান্দা তিনি কখনো দেখেন নি বলে আস্ফালন করলেন এবং অবশেষে টীনের বাক্স থেকে অনেক খুঁজে আদুভাইর খাতা বের করে আমার সাম্‌নে ফেলে দিয়ে বল্‌লেন : দ্যাখো।

আমি দেখলাম, আদুভাই মোটে তিন নম্বর পেয়েছেন। তবু হতাশ হলাম না। পাশের নম্বর দেওয়ার জন্য তাঁকে চেপে ধরলাম।

বড় দেরী হয়ে গিয়েছে, নম্বর সাবমিট্ করে ফেলেছেন, বিবেচনার স্তর পার হয়ে গিয়েছে, ইত্যাদি সমস্ত যুক্তির আমি সন্তোষজনক জবাব দেবার পর তিনি বললেন, তুমি কার জন্য কী অন্যায় অনুরোধ করছ, খাতাটা খুলেই একবার দেখ না।

আমি মৌলবী সাবকে খুশী করবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং অনাবশ্যক বোধেও খাতাটা খুল্‌লাম। দেখ্‌লাম পারসীর পরীক্ষা বটে, কিন্তু খাতার কোথাও একটা পারসী অক্ষর নেই। তার বদলে ঠাসাবুনোনো বাঙলায় অনেক কিছু লেখা আছে। কৌতূহলবশে পড়ে দেখ্‌লাম: এই বঙ্গদেশে পারসী ভাষা আমদানীর অনাবশ্যকতা এবং ছেলেদের উহা শিখাবার চেষ্টার মূর্খতা সম্বন্ধে আদুভাই যুক্তিপূর্ণ একটা 'থিসিস' লিখে ফেলেছেন।

পড়া শেষ করে মৌলবী সাবের মুখের দিকে চাইতেই তিনি জয়ের ভঙ্গিতে বললেন : দেখেছ বাবা, বেতমিজের কাজ? আমি নিতান্ত ভাল মানুষ বলেই তিনটে নম্বর দিয়েছি, অন্য কেউ হলে বাস্‌টিকেটের সুপারিস করতো।

যাহোক শেষ পর্যন্ত মৌলবী সাব আমার অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। খাতার উপর ৩ এর পৃষ্ঠে ৩ বসিয়ে ৩৩ করে দিলেন।

আমি বিপুল আনন্দে অঙ্কের পরীক্ষকের বাড়ী ছুট্‌লুম।

সেখানে দেখলুম : আদুভাইর খাতার উপর লাল পেন্সিলের একটা প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল আঁকা রয়েছে। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝেও আমার উদ্দেশ্য বল্‌লাম। অঙ্কের মাষ্টার ত হেসেই খুন। হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি আদুভাইর খাতা বের করে আমাকে অংশবিশেষ পড়ে শোনালেন। তাতে আদুভাই লিখেছেন যে, প্রশ্নকর্ত্তা ভাল ভাল অঙ্কের প্রশ্ন ফেলে কতকগুলো বাজে ও অনাবশ্যক প্রশ্ন করেছেন, সেজন্য এবং প্রশ্নকর্ত্তার ত্রুটি সংশোধনের জন্য আদুভাই নিজেই কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রশ্ন লিখে তার বিশুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন, এইরূপ ভূমিকা করে আদুভাই যে সমস্ত অঙ্ক কষেছেন, শিক্ষকমশায় প্রশ্ন-পত্র ও খাতা মিলিয়ে আমাকে দেখালেন যে, প্রশ্নের সঙ্গে সত্যি আদুভাইর উত্তরের কোনো সংশ্রব নেই।

প্রশ্ন-পত্রের সঙ্গে মিল থাক্ আর নাই থাক্, খাতায়-লেখা অঙ্ক শুদ্ধ হলেই নম্বর পাওয়া উচিত বলে আমি শিক্ষকের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করলাম। শিক্ষক মশায়, যাহোক, প্রমাণ করে দিলেন যে, তাও শুদ্ধ হয়নি। সুতরাং আমার অনেক অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও তিনি পাশের নম্বর দিতে রাজী হলেন না। তবে তিনি আমাকে এই আশ্বাস দিলেন যে, অন্য সব সাব্জেকটের শিক্ষকদের রাজী করতে পারলে তিনি আদুভাইর প্রমোশনের সুপারিশ করতে প্রস্তুত আছেন।

নিতান্ত বিষণ্ন মনে অন্যান্য পরীক্ষকদের নিকট গেলাম। সর্বত্র প্রায় একরূপ। ভূগোলের খাতায় তিনি লিখেছেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এমন গাঁজাখুরী গল্প তিনি বিশ্বাস করেন না। ইতিহাসের খাতায় তিনি লিখেছেন যে, কোন্ রাজা কোন্ সম্রাটের পুত্র এসব কথার কোনো প্রমাণ নেই। ইংরাজীর খাতায় তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলা ও লর্ড ক্লাইভের ছবি পাশাপাশি আঁকবার চেষ্টা করেছেন — অবশ্য কে যে সিরাজ, আর কে যে ক্লাইভ নীচে লেখা না থাকলে তা বুঝা যেত না।

হতাশ হয়ে হোস্টেলে ফিরে এলাম। আদুভাই আগ্রহ-ব্যাকুল প্রাণে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

'আমি ফিরে এসে নিষ্ফলতার খবর দিতেই তাঁর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তবে আমার কী হবে ভাই? — বলে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

কিছু একটা করবার জন্য আমার প্রাণও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। বল্লাম : তবে কি আদুভাই আমি হেডমাষ্টারের কাছে যাবো?

আদুভাই ক্ষণেক আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বললেন : তুমি আমার জন্য যা করেছ, সেজন্য ধন্যবাদ, হেডমাষ্টারের কাছে তোমার গিয়ে কাজ নেই। সেখানে যেতে হয় আমি যাব। হেডমাষ্টারের কাছে জীবনে আমি কিছু চাই নি। এই প্রথম প্রার্থনা তিনি আমার ফেল্‌তে পারবেন না।

— বলেই তিনি হনহন্ করে বেরিয়ে গেলেন। আমি একদৃষ্টে দ্রুতগমনশীল আদুভাইর দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি দৃষ্টির আড়াল হলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নিজের কাজে মন দিলাম।

সেদিন বড়দিনের বন্ধ আরম্ভ। শুধু হাজিরা লিখেই স্কুল ছুটী দেওয়া হল।

আমি বাইরে এসে দেখ্‌লাম : স্কুলের গেটের সাম্‌নে একটা পোস্তার উপর একটা উঁচু টুল চেপে তার উপর দাঁড়িয়ে আদুভাই হাত পা নেড়ে বক্তৃতা করছেন। ছাত্ররা ভিড় করে তাঁর বক্তৃতা শুনছে এবং মাঝে মাঝে করতালি দিচ্ছে।

আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

আদুভাই বল্‌ছিলেন : হাঁ, প্রমোশন আমি মুখ ফুটে কখনো চাই নি। কিন্তু সেজন্যই কি আমাকে প্রমোশন না দেওয়া এঁদের উচিত হয়েছে? মুখ ফুটে না চেয়ে এতদিন আমি এঁদের আক্কেল পরীক্ষা করলাম; এঁদের মধ্যে দানাই বলে কোনো জিনিষ আছে কিনা, আমি তা যাচাই

করলাম। দেখ্‌লাম, বিবেচনা বলে কোনো জিনিষ এঁদের মধ্যে নেই। এঁরা নির্ম্মম, হৃদয়হীন। একটা মানুষ যে চোখ বুজে এঁদের বিবেচনার উপর নিজের জীবন ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, এঁদের প্রাণ বলে কোনো জিনিষ থাক্‌লে সে কথা কি এঁরা এতদিন ভুলে থাক্‌তে পারতেন?

আদুভাইর চোখ ছল্‌ছল্‌ হয়ে উঠ্‌লো। তিনি বাম হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে আবার বল্‌তে লাগলেন : আমি এঁদের কাছে কী আর বিশেষ চেয়েছিলাম? শুধুমাত্র একটা প্রমোশন। তা দিলে কী এমন এঁদের লোক্‌সান হতো? মনে করবেন না, প্রমোশন না দেওয়ায় আমি রেগে গিয়েছি। রাগ আমি করি নি। আমি শুধু ভাবছি, যাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর হাজার হাজার বাপ-মা তাঁদের ছেলেদের জীবনের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন তাঁদের আক্কেল কত কম, তাঁদের প্রাণের পরিসর কত অল্প।

একটু দম নিয়ে আদুভাই আবার আরম্ভ করলেন : আমি বহুকাল এই স্কুলে পড়ছি। একদিন এক পয়সা মাইনে কম দেই নি। বছর বছর নতুন নতুন পুস্তক ও খাতা কিন্‌তে আপত্তি করি নি। ভাবুন, আমার কতগুলো টাকা গিয়েছে। আমি যদি প্রমোশনের এতই অযোগ্য ছিলাম, তবে এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে একজন শিক্ষকও আমায় কেন বল্‌লেন না যে : 'আদু মিঞা, তোমার প্রমোশনের কোনো চান্‌স্‌ নেই, তোমার মাইনেটা আমরা নেব না।' মাইনে দেবার সময় কেউ বারণ করলেন না, পুস্তক কিনবার সময় কেউ নিষেধ করলেন না, শুধু প্রমোশনের বেলাতেই তাঁদের যত নিয়ম-কানুন এসে বাধ্‌লো? আমি চতুর্থ শ্রেণীতে পাশ করতে পারলুম না বলে তৃতীয় শ্রেণীতেও যে পাশ করতে পারতুম না, একথা এঁদের কে বলেছে? অনেকে ম্যাট্রিক-আই-এ-তে কোনোমতে পাশ করে বি-এ, এম-এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আমি অনেক দেখাতে পারি। কোনো কুগ্রহের ফলে আমি চতুর্থ শ্রেণীতে আট্‌কে পড়েছি, একবার কোনো মতে এই শ্রেণীটা ডিঙোতে পারলে আমি ভাল করতে পারতাম, এটা বোঝা মাষ্টার বাবুদের উচিত ছিল। আমাকে একবার তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দিয়ে আমার লাইফের একটা চান্‌স্‌ এঁরা দিলেন না।

আদুভাইর কণ্ঠরোধ হয়ে এলো। তিনি খানিক থেমে ধুতির খুঁটে নাক-চোখ মুছে নিলেন। দেখ্‌লাম, শ্রোতৃগণের অনেকের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

গলা পরিষ্কার করে আদুভাই আবার আরম্ভ করলেন : আমি কখনো এতসব কথা বলতাম না। আজ বললাম শুধু এই জন্য যে, আমার বড় ছেলে এবার চতুর্থ শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছে। সে ও এই স্কুলেই পড়তো। এই স্কুলের শিক্ষকদের বিবেচনায় আমার আস্থা নেই বলেই আমি গতবারই আমার ছেলেকে অন্য স্কুলে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলাম। যথাসময়ে এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে, আজ আমাকে কি অপমানের মুখে পড়তে হতো, তা আপনারাই বিচার করুন।

আদুভাইর শরীর কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল।

এই সময় স্কুলের দারোয়ান এসে সভা ভেঙে দিল। হৈচৈ করতে করতে ছাত্ররা যে যার পথে চলে গেল। আমিও আদুভাইর দৃষ্টি এড়িয়ে চুপে চুপে সরে পড়লাম।

তারপর যেমন হয়ে থাকে — সংসার-সাগরের প্রবল স্রোতে কে কোথায় ভেসে গেলাম, কেউ জানলাম না।
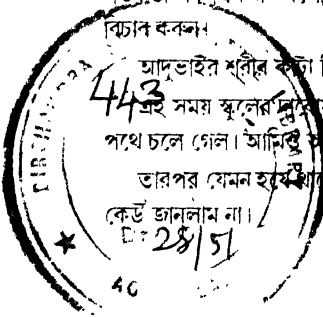
আমি সেবার বি-এ পরীক্ষা দেব। খুব মন দিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ লাল লেপাফার এক পত্র পেলাম। কারো বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র মনে করে খুললাম। ঝরঝরে তকতকে সোনালী হরফে ছাপা পত্র। পত্র-লেখক আদুভাই। তিনি লিখেছেন, তিনি সেবার চতুর্থ শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছেন বলে বন্ধুবান্ধবদের জন্য কিছু ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করেছেন।

দেখলাম, তারিখ অনেক আগেই চলে গিয়েছে। বাড়ী ঘুরে এসেছে বলে পত্র দেরীতে পেয়েছি।

ছাপা চিঠির সঙ্গে হাতের-লেখা একটা পত্র। আদুভাইর পুত্র লিখেছে : বাবার খুব অসুখ, আপনাকে দেখবেন তাঁর শেষ সাধ।

পড়াশোনা ফেলে ছুটে গেলাম আদুভাইকে দেখতে। এই আট বছর তার কোনো খবর নেই নি বলে লজ্জা-অনুতাপে ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম।

ছেলে কেঁদে বললে : বাবা মারা গিয়েছেন। প্রমোশনের জন্য তিনি এবার দিনরাত এমন পড়া আরম্ভ করেছিলেন যে তিনি শয্যা নিলেন তবু পড়া ছাড়লেন না। আমরা সবাই তাঁর জীবন সম্বন্ধে ভয় পেলাম। পাড়াশুদ্ধ লোক গিয়ে হেডমাস্টারকে ধরায় তিনি স্বয়ং এসে বাবাকে প্রমোশনের আশ্বাস দিলেন। বাবা অসুখ নিয়েই পাল্কী চড়ে স্কুলে গিয়ে শুয়ে শুয়ে পরীক্ষা দিলেন। আগের কথা মত তাঁকে প্রমোশন দেওয়া হল। তিনি তাঁর প্রমোশন উৎসব উদ্‌যাপন করবার জন্য আমাকে হুকুম দিলেন। কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে, তার লিস্টও তিনি নিজ হাতে করে দিলেন। কিন্তু সেই উৎসবে যাঁরা যোগ দিতে এলেন, তাঁরা সবাই তাঁর জানাজা পড়ে বাড়ী ফিরলেন।

আমি চোখের পানি মুছে কবরের কাছে যেতে চাইলাম। ছেলে আমাকে গোরস্থানে নিয়ে গেল। দেখলাম, আদুভাইর কবরে খোদাই-করা মার্বেল পাথরের টেবলেটে লেখা রয়েছে :

Here sleeps Adu Mia who was promoted from Class VII to Class VIII

ছেলে বললে : বাবার শেষ ইচ্ছেমতই এ-ব্যবস্থা করা হয়েছে।

[প্রকাশকাল. বর্ষ ১/ সংখ্যা ১: ১৩৪৫]

হতাশা

বুদ্ধদেব বসু

[জন্ম ১৯০৮ সালে কুমিল্লায়। কবি, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, সম্পাদক। দীর্ঘকাল 'কবিতা' পত্রিকা কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : তিথিডোর, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, দ্রৌপদীর শাড়ি, শীতের প্রার্থনা, বসন্তের উত্তর, ইত্যাদি। একাডেমি ও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত। মৃত্যু: ১৯৭৪-এ।]

-- কী, শুয়ে পড়লে যে বড়ো? আপিসে যাবে না আজ?

— আহা, এই খেয়ে উঠলুম, একটু জিরোতে দাও না। আর-একটা পান দাও।

সুরমা পানের ডিবেটা নিয়ে স্বামীর শিয়রের কাছে রাখলো। অনুপম একটা পান মুখে দিয়ে খবরের কাগজের ছবির পৃষ্ঠাটা চোখের সামনে খুলে ধ'রে বললে -- বিলিতি মেয়েগুলো কী অসভ্যই হচ্ছে দিন-দিন! ঐটুকু কাপড় গায়ে না রাখলেই বা কী! দেখেছো?

কিন্তু পাশ ফিরে তাকিয়ে সুরমাকে সেখানে দেখতে পেলো না। কোথায় সে? অনুপম হাঁক দিলে — সুরমা!

সুরমা পাশের ঘর থেকে বললে -- যাই। কোন্ জুতোটা পরবে আজ?

— গেছে আবার জুতো বুরুশ করতে! বেশ একটু বিরক্তির সুরেই বললে অনুপম।

একটু পরে সুরমা একজোড়া চকোলেট রঙের জুতো হাতে ক'রে ঢুকলো। ঝকঝক করছে আয়নার মতো। জুতোটা নামিয়ে রেখে বললে — ওঠো এখন।

অনুপম খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টালো;কথাটা তার কানে গেছে কিনা বোঝা গেলো না। সুরমা টেবিলের কাছে স'রে এসে বললে — বারোটা বাজে যে।

অনুপম তবু চুপ। এত গভীর মন দিয়ে খবরের কাগজে কী পড়ছে সে-ই জানে। চেয়ারের পিঠের উপর তার পাৎলুন, কোট, নেকটাই সব সাজানো, সেগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া ক'রে সুরমা আবার বললে — ওঠো না!

এবার অনুপম জবাব দিলে — কী যে বিরক্ত করো! আপিসের বাঁধা কাজ তো নয় যে দশটা বাজতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে।

— কাল তো দশটা না-বাজতেই বাড়ি মাথায় ক'রে তুলেছিলে। একটু ঝাঁঝালো স্বরেই বললে সুরমা। ঝাঁঝের কারণ ছিলো। কাল আপিসে বেরোবার আগে অনুপমের নতুন নেকটাই খুঁজে পাওয়া যায়নি — তাই নিয়ে কী কাণ্ড! সুরমা একাই নয়, তার শাশুড়ি, তার ইস্কুলগামী ছোটো ননদ সকলকেই হাঁকে-ডাকে বিপর্যস্ত ক'রে অনুপম শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলো যে এমন বিশৃঙ্খল বাড়িতে মানুষের বসবাস অসম্ভব। স্বয়ং শ্বশুরমশাই আপিসে বেরোবার মুখে বলেছিলেন — কী বিশ্রী মেজাজ হয়েছে ছেলেটার। তা তোমরাও তো আগে থেকেই ওর কাপড়চোপড়গুলো একটু .....

লজ্জায় সুরমা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। স্বামীর তুচ্ছতম সুখ-সুবিধের জন্য সে তো প্রাণপণ করে, তবে মানুষ যদি এমন হয় যে পুরোনো চিঠিপত্রের দেরাজে নতুন নেকটাই ঢুকিয়ে রেখে তারপর বাড়িশুদ্ধ লোকের উপর মেজাজ ফলিয়ে বেড়ায় ...

সেইজন্যে আজ সকালবেলাই সে কাপড়চোপড় সব ঠিক ক'রে রেখেছে, কিন্তু আজ অনুপমের তাড়া নেই। একটু পরে বললে — আজ কি তাহ'লে বেরোবেই না?

অনুপম গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে বললে — উঠছি। কিন্তু তার ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না।

টেবিলের উপর কয়েকটা জিনিস নিয়ে অকারণে নাড়াচাড়া করতে-করতে সুরমা বললে — কাজে এ-রকম গাফিলি করা কি ভালো? মাসের শেষে ওরাই মাইনে দেবে তো!

— ওঃ, তা দিলেই বা। আমাদের তো আর দশটার সময় আপিসে হাজিরা দিতে হয় না। আমাদের হ'লো ফীল্ড-ওয়ার্ক। নিজের ইচ্ছে-মতো কাজ।

— তা হোক, বিছানায় শুয়ে থাকলে কোনো কাজই তো চলবে না।

অনুপম হঠাৎ চ'টে উঠে বললে — আমার ইচ্ছে শুয়ে থাকবো। আমার শোয়া বসাও তোমার হুকুমে হবে নাকি?

— আমার হুকুমে হবে কেন? সমস্ত সংসারটাই হুকুমে চলছে। ইচ্ছে মতো শোয়া বসা কার আছে?

— ওঃ, ভাবি তো একশো পঁচিশ টাকার চাকরি — ছেড়ে দিলেই বা কী?

এবার সুরমার মুখে সত্যি-সত্যি আশঙ্কার ছায়া পড়লো। — বলো কী, এমন ভালো চাকরিটা ছেড়ে দেবে! ভালো ক'রে কাজ তো আরম্ভই করলে না এখানে।

অনুপম যেমন হঠাৎ চ'টে উঠেছিলো, তেমনি হঠাৎ নরম হ'য়ে বললে, না, না, ছাড়বো কী! উঠি এবার। ব'লে সে সত্যি-সত্যি উঠে বসলো।

সুরমা আশ্বস্ত বোধ করলে, তবু বললে — দ্যাখো, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ ছেড়ে-টেড়ে দিয়ো না কিন্তু। শ্বশুরমশাই তাহ'লে মনে বড়ো কষ্ট পাবেন।

আর-কোনো কথা সুরমা বলতে পারলে না; তার নিজের দিকটা মনে এলো না তার, অনুপমের দিকটাও নয়, শ্বশুরের কথাই মনে হ'লো। বয়েসের চাইতে বেশি বুড়ো হয়েছেন। সরকারি চাকরিতে পেন্সন নেবার দু'চার বছর বাকি। দু'চার বছর পরে দেড়শো টাকাতে পেন্সন নেবেন — তখন এই বৃহৎ সংসার চলবে কেমন ক'রে? সারাজীবনের সঞ্চয় নিঃশেষ ক'রে টালিগঞ্জে এই ছোট্ট বাড়িটি করেছেন। তার উপর বিস্তর দেনা। আশ্রিত, অতিথি, নিঃসম্বল আত্মীয়ের অভাব নেই। নিজের পড়ুয়া-ছেলে, অবিবাহিত মেয়ে আছে এখনো। অনুপম বড়ো ছেলে। বছর চারেক আগে বি-এ পাশ করেছে। বিয়ে হয়েছে বছর-খানেক। বিবাহটা মা-বাপের কর্তব্য সম্পাদন। সুরমা খুব সুখে আছে শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুর-শাশুড়ি অত্যন্ত স্নেহ করেন। এত স্নেহ করেন ব'লেই শ্বশুরের জন্য তার এত কষ্ট হয়। উপার্জন একজনের, দাবি দশজনের। বুড়ো ভদ্রলোক একটা সার্ট ছিঁড়ে গেলে সহজে আর-একটা কেনেন না। অথচ পুত্রবধূর জন্যে ঘন-ঘন সাড়ি কেনা হচ্ছে — পাছে ছেলের মনে কষ্ট হয়। সুরমার ভারি লজ্জা করে।

অনুপমই একমাত্র আশা। কিন্তু .... আজকালকার দিনের সাধারণ বি.এ. পাশ ছেলে, কতটুকু আশা তার, কতটুকু মূল্য? সেরা পাশিয়েরা খাবি খাচ্ছে। তাই ব'লে অনুপমের কোনো উৎকণ্ঠাও নেই। সে দিব্যি খায়-দায় ঘুমোয়, বিকেলে হাওয়া খেতে বেরোয়, সিনেমাও দ্যাখে। এই পরম নিশ্চিন্ত ভাবটা সুরমার ভালো লাগে না। আজকালকার দিনে কি নিজের উপর মমতা করলে চলে! জীবন পণ ক'রে খাটতে হবে .... অমনি ক'রেই কিছু হ'য়ে যাবে। কী আর হবে? কতটুকু হবে? যেটুকুই হোক্‌, বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা হবে তো। তাছাড়া, শুয়ে-ব'সে কি আর পুরুষমানুষের দিন কাটে? না কি সেটা ভালোই দেখায়?

তবে কিছুদিন থেকে অনুপমের ভাবটা যেন বদলেছে। বাড়ি থেকে সে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যায় সাড়ে-দশটা বাজতেই, ফিরে যখন আসে তখন প্রায় সন্ধে। তার রোদে-পোড়া ক্লান্ত মুখ দেখে সুরমার ভারি কষ্ট হয়। কিন্তু এই তো পুরুষের জীবন .... মনে-মনে তার কেমন একটা আনন্দে-মেশা গর্বও হয। সে নিজে .... সে তো দুপুরবেলা ঠাণ্ডা পাটিতে প'ড়ে ঘুমিয়েছে, কিন্তু এ ছাড়া আর কী কববে সে? সে তো অতি সাধারণ স্ত্রীলোক .... তাকে দিয়ে সংসারের যা-যা কাজ হ'তে পারে, তাতে সে কখনো ত্রুটি করে না। অনুপম ফিরে এসেই চা তৈরি পায়, স্নান করতে যাবার সময় কাপড়ের জন্যে হাৎড়াতে হয় না, বাথরুমের আলনায় সব সাজানো আছে। এব বেশি সুবমাব সাধ্য নেই, সাবেকি পরিবারের আড়ালে-আবডালে সে মানুয হয়েছে, বৃহৎ পুরুয-পৃথিবীর কোনো ব্যাপারই সে জানে না, সে গেঞ্জি কেচে দিয়ে ধোপাব খবচ বাঁচাতে পাবে, দশবার ঘব ঝাঁট দিয়ে স্বামীর মেজাজ ভালো রাখতে পারে, দিতে পারে জুতো বুরুশ ক'রে, দরকার হ'লে সুখাদ্য রেঁধে খাওয়াতে পারে — এই পর্যন্ত। সুরমার বাপেব বাড়ি বড়োলোক নয়, টানাটানিব সংসাবকে নিজের বুদ্ধি আর পবিশ্রম দিয়েই সুশ্রী ক'রে তুলতে সে তার মাকে দেখেছে। সে-ও কি তা পারবে না?

বাত্রে সে স্বামীকে জিজ্ঞেস কবে -- কোথায় থাকো সারাদিন?

অনুপম গম্ভীবভাবে শুধু একটি কথা বলে — কাজ। এর চাইতে মহৎ কথা আজকালকাব ভাষায় নেই।

— সুবিধে হচ্ছে কিছু?

— চেষ্টা তো কবছি। দেখি কী হয়। অনুপম তাব কথায় বেশ একটা বহস্যের ভাব বজায় রাখে, সুরমা আর প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। আর সত্যি অনুপম যখন পর-পর পাঁচ-সাতদিন সাড়ে দশটায় বেরিয়ে গিয়ে নিতান্তই ক্লান্ত চেহারা ক'রে সন্ধেবেলা ফিবে আসতে লাগলো, তখন আর সন্দেহ করবার কোনো উপায় থাকলো না যে সে সত্যি-সত্যি এবার কর্মক্ষেত্রে নেমেছে।

তারপর একদিন সে তার স্ত্রীকে চুপি-চুপি বললে — কাউকে বোলো না এখন, একটা চাকরি পেয়েছি।

-- পেয়েছো সত্যি?

অনুপম একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানির নাম করলে। সেখানে, জানা গেলো, তাকে একটা চাকরি নেবার জন্যে সাধাসাধি করছে অনেকদিন থেকে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে বনিবনা হচ্ছিলো

না। এবারে রফা হয়েছে -- বেশি কিছু নয়, একশো পঁচিশ দেবে গোড়াতে। ছ'মাস পরে কাজকর্ম দেখে বাড়িয়ে দেবার কথা। তাছাড়া কমিশন। মোটর য়্যালাউয়েন্স গোটা পঞ্চাশ দিতেও রাজি আছে, তবে গাড়ি তো ...

এখানে বাধা দিয়ে সুরমা বলেছিলো -- বলো কী! সত্যি?

অনুপম অবিচলিতভাবে বললে -- নেহাৎ মন্দ নয়, কী বলো? আমি অনেক ভেবে-চিন্তে আজ রাজি হ'য়ে এসেছি।

-- রাজি হবে না! সুরমা এবার রীতিমতো উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। যে দিনকাল পড়েছে, কত সব ভালো-ভালো এম এ পাশ ছেলে পঞ্চাশ টাকার জন্যে ঘুরে মরছে -- আর এ তো চমৎকার! ক'টা লোক আজকাল একশো টাকা রোজগার করে! তার উপর আবার কমিশনও দেবে, য়্যাঁ?

অনুপম বললে -- এম্-এ পাশ হ'লেই তো হ'লো না, কাজের লোক হওয়া চাই। ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি বিদ্যা বোঝে না, কাজ বোঝে।

-- তা কাজটা কী করতে হবে?

-- ওঃ, কাজ! কাজ বিশেষ-কিছু নয়। আমার অধীনে সব এজেন্ট থাকবে, তারা বিজনেস জোগাড় করবে, তাদের একটু দেখাশোনা করতে হবে, এই আর কি। ভাবছি ছ'মাস পরে ছোটো একটা গাড়ি কিনেই ফেলবো। বাইরে ঘোরাঘুরি আছে কিছু।

মাইনে ভালো, অথচ কাজ কিছু নেই! সুরমার ঠিক যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না। আর এমন একটা সুখের কাজ বাংলাদেশের এত ছেলেকে এড়িয়ে তার স্বামীর হাতে কেমন ক'রে এলো ভাবতে সে রীতিমতো অবাক হ'লো। তা অবাক হ'য়ে আর কী হবে -- মানুষের কপাল যখন ফেরে, তখন এই রকমই।

-- কাউকে বলতে বারণ করলে কেন? -- সুরমা নিজের সৌভাগ্য একা একা সহ্য করতে পারছিলো না -- হ'য়েই তো গেছে।

-- হ'য়ে গেলোই বা। কাজকর্মের ব্যাপারে -- বাইরে বেশি বলাবলি না-করাই ভালো।

-- আহা, বাইরে আমি কাকে আর ঢাক পিটিয়ে বেড়াবো! শ্বশুরমশাইকে বলেছো?

-- না, বলিনি এখনো। বাবার ইচ্ছে ছিলো আমি গবর্মেন্টের চাকরিতে ঢুকি, হয়তো তিনি খুব খুসি হবেন না। হাজার হোক্, সামান্য কোম্পানির চাকরি বই তো নয়।

-- কী যে বলো! সামান্য হ'লো কিসে! আর গবর্মেন্টের চাকরি চাইলেই যে পাওয়া যাচ্ছে তা তো নয়। শ্বশুরমশাই খুবই খুসি হবেন, দেখো।

হ'লেনও। অনুপমের এ-কাজে বিলিতি কাপড়চোপড় না হ'লে চলবে না, ও-সব করাতে গোটা পঞ্চাশ টাকা খরচ হ'য়ে গেলো। হেমবাবু ধার ক'রে এনে দিলেন টাকাটা। তারপর কয়েকদিন সেই শ্বেতাঙ্গ বেশে অনুপম নিয়মিত যাতায়াত করলে -- ইতিমধ্যে গোটা দুই নতুন টাই কেনা হ'য়ে গেলো। সুরমা বিছানার তলায় পাৎলুন ভাঁজ ক'রে রাখে, টাই মোজা রুমালের হিসেব রাখে, আর বাড়ির মধ্যে সারাদিন অকারণে অফুরন্ত কাজ ক'রে বেড়ায়।

আজ তাই স্বামীকে খাওয়ার পর শুয়ে পড়তে দেখে সে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলো। রোজ এক-সময়ে আপিসে না গেলেও হয়তো চলে, কিন্তু একেবারে শুয়ে থাকলে চলে কি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুপম উঠলো, উঠে একটা পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে বললে -- চললুম।

-- আজ স্যুট পরবে না?

-- না, যা গরম।

স্বামীর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে সুরমার একটু কষ্ট হ'লো। ভাদ্রমাসের রোদ্দুর সমস্ত গায়ে পিন ফুটিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে বেরুনো! তাই সে বললে -- আজ না-বেরোলেও চলে নাকি?

-- বেরোলেও হয়, না বেরোলেও হয়। শরীরটা আজ মোটে ভালো লাগছে না।

-- তাহ'লে আজ আর না বেরোলে। একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও।

অনুপম হেসে বললে -- আমাদের ছুটির জন্যে দরখাস্ত পাঠাতে হয় না, যতদিন খুসি না গেলে কেউ কিছু বলবার নেই।

-- বলো কী! যতদিন খুসি না গেলেও চলে?

-- তা চলে বইকি। ওদের কাজ পাওয়া দিয়েই কথা।

-- কাজটা তাহ'লে ওরা কেমন ক'রে পাবে?

-- তুমি তা বুঝবে না।

সুরমা আর কিছু বললে না। সত্যি, কাজটা যে কী রকম তা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। অনুপমও আর কথা না ব'লে পাঞ্জাবিটা খুলে রেখে এসে শুয়ে পড়লো, এবং খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়লো। উঠলো যখন, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। সুরমা চা ক'রে এনে দিল। চা খেয়ে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় প'রে অনুপম বেরিয়ে গেলো বোধ হয় কোনো বন্ধুর বাড়িতে।

তার পরের দুটো দিন এইভাবেই কাটালো সে। সুরমা মাঝে-মাঝে দু'একবার তাড়া দিলে, কিন্তু অনুপম নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে বললে -- তুমি তো দেখছি ভারি ছেলেমানুষ। এজেন্টরাই সব কাজ করে যে। আমার বেরোবার কী দরকার। এই তো আজ বিকেলেই দু'জনের আসবার কথা আছে আমার কাছে।

সত্যিও সেদিন বিকেলে দুটি ছেলে এলো তার কাছে। অনুপম তাদের সঙ্গে ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ কথা বললে। সুরমা চা পাঠালে, খাবার পাঠালে, পান পাঠালে। ভারি খুসি হ'লো সে মনে-মনে।

পরের দিন সকালে ন'টা না বাজতেই অনুপমের বেরোবার তাড়া লেগে গেলো। আজ তাকে যেতে হবে ভাটপাড়া, সেখানে একজন বড়োদরের মক্কেলের খোঁজ পাওয়া গেছে। অসম্ভব তাড়াহুড়ো ক'রে, কোনো রকমে দুটো গরমভাত আর মাছের ঝোল গলাধঃকরণ ক'রে, পোষাক প'রে, মা-র কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে সে বেরিয়ে গেলো। তার কিছুই খাওয়া হয়নি ভাবতে পেরে সুরমাও ভালো ক'রে খেতে পারলে না -- তিনটে না বাজতেই উঠে স্টোভ ধরিয়ে নানারকম খাবার তৈরি করতে বসলো।

এদিকে অনুপম আপিসে গিয়ে খবর পেলো ভাটপাড়ার ভদ্রলোককে অন্য কোম্পানির লোক পাকড়ে ফেলেছে। ব'সে-ব'সে আড্ডা দিলো ঘন্টা তিনেক, তারপর আর-একজনের সঙ্গে বেরিয়ে ড্যালহৌসি স্কোয়ার, ক্লাইভ স্ট্রিটে এ-আপিস ও-আপিস ঘুরে বেড়ালো যেখানে যত চেনা লোক আছে। কোথাও এক পেয়ালা চা, কোথাও পান, নানারকম লাখ-বেলাখের গল্প, সময়টা কাটলো মন্দ না। কিন্তু রোদ্দুরে ঘুরতে আর ভালো লাগে না, যা-ই বলো।

বিকেলে বাড়ি ফিরে যখন চা খাচ্ছে, সুরমা জিজ্ঞেস করলে — কেসটা পেলে?

-- কোন্....?

-- ভাটপাড়ায় গেলে যে?

অনুপম বলতে পারলে না যে ভাটপাড়ায় সে যায়নি। সংক্ষেপে বললে -- আর-একদিন যেতে হবে।

-- কবে যাবে? কাল?

-- এত খবর দিয়ে তোমার দরকার কী? আমার কাজ আমি ভালো বুঝি।

পরের দিনও সে যথাসময়ে রাজবেশ প'রে বেরুলো, যথাসময়ে ফিরে এলো। তারপর একদিন সে সুরমাকে বললে — আর-একটা অফার পেয়েছি, এর চেয়ে ভালো।

-- কী রকম?

-- এক ভদ্রলোক একটা বিজনেস করবেন, আমাকে পার্টনার ক'রে নিতে চান। লায়ন্স রেঞ্জে আপিসের ঘর খোঁজা হচ্ছে। এখন অবশ্য মাত্র হাজার দশেক নিয়ে আরম্ভ হবে — তবে ভদ্রলোক কুড়ি হাজার পর্যন্ত ফেলতে রাজি। তাঁর নিজের আরো অনেক কাজ আছে — আমাকেই ম্যানেজার হ'তে হবে। আপিসে আলাদা ঘরে বসবো, টেলিফোন থাকবে, বাড়িতেও একটা রাখতে হবে। তুমি যখন-তখন দরকার হ'লে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। বেশ ভালো — কী বলো?

সুরমা জিজ্ঞেস করলে — ব্যবসাটা কিসের?

- সে নানারকম আছে। ঐ ভদ্রলোকের দশরকম ব্যবসা আছে। কলকাতায় -- কাগজ, কাঠ, কয়লা, তা ছাড়া, একটা জুয়েলারি দোকানও আছে। মস্ত বড়োলোক। পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেলতেও ওর আটকাবে না। আমাকে গোড়াতে দু'শো দেবে, আস্তে আস্তে পাঁচশো উঠবে। লাভের উপর আমার টু পার্সেন্ট শেয়ারও থাকবে, তাইতে বা কোন্ না দু-চার হাজার হবে বছরে। আর আপিসের গাড়িটা অবিশ্যি আমার জন্যই থাকবে। আমাদের কয়েকজন কেরানি দরকার -- আছে নাকি তোমার জানাশোনা কোনো ছেলে-ছোকরা?

সুরমা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে — তুমি তাহ'লে ইনশিয়োরেন্সের কাজটা ছেড়ে দেবে?

— ছেড়ে দেবো না তো কী! ঐ মাইনেতে কোনো ভদ্রলোকের কি চলে! আর যা খাটুনি! রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে হায়রান।

-- তা যেখানেই যাও ব'সে-ব'সে তো তোমাকে কেউ খাওয়াচ্ছে না।

— তুমি কিছু বোঝো না। এটা কত ভালো। আপিসটাই আমার। সবই আমার ইচ্ছেমত হবে। আমার পার্টনার নিজে বিশেষ-কিছু দেখতে শুনতে পাববেন না, আমি রাজি হয়েছি বলেই তিনি ব্যবসাটা ফাঁদবেন।

— অত বড়ো একটা ব্যবসা চালাতে তুমি পাববে তো? ব্যবসাতে তো খাটুনি সব চেয়ে বেশি শুনি।

— ওঃ, সে ঠিক হ'য়ে যাবে দু'দিনেই। দু'চারখানা বইপত্র দেখে নিলেই হবে। তাছাড়া, আমার নিজের তো বিশেষ-কিছু করতে হবে না, নিচে তো সব কেবানিবাই থাকবে। শিগগিরই আমরা আরম্ভ ক'রে দেব — আপিসের একটা ভালো ঘর পেলেই হয়।

হঠাৎ সুরমাব কী-বকম একটা সন্দেহ হ'লো। জিজ্ঞেস করলে -- ইনশিয়োরেন্সের কাজটা এক্ষুনি ছেড়ে দাওনি তো?

অনুপম মুচকি হেসে বললে — তা একবকম ছেড়েই দিয়েছি বলতে পারো।

সুরমার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। ক্ষীণস্বরে বললে — একেবারে ছেড়েই দিলে! ওটাব তো এখনো কিছুই ঠিক নেই! শ্বশুরমশাইকে একবার জিজ্ঞেসও কবলে না!

— ওঃ, বাবাকে আবার জিজ্ঞেস করবো কী। এ-সব ব্যাপাবেব উনি বোঝেনই ভারি। তাছাড়া, কিছু ঠিক নেই বলছো কেন? কোম্পানি শিগগিরই রেজিস্টার্ড হবে। আবো ভাবছো কেন—বাবার দুঃখ এতদিনে দূর হ'লো। বাবাকে আব একবছরের বেশি চাকরি করতে দেব নাকি ভেবেছো!

কথাটা শুনে সুরমা রোমাঞ্চিত হ'লো, কিন্তু ছোট্ট একটু সন্দেহ তার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছিলো না। তাই সে বললে — কিন্তু ব্যবসা তো, তাব নিশ্চয়তা কী? বাঁধা একটা চাকরি হুট ক'রে ছেড়ে দিলে!

— ভাবি তো বাঁধা চাকরি। ব্যাটারা ভারি পাজি, ছোটোলোক, কথা দিয়ে কথা বাখে না, টাকাপয়সা কিছু দিতে চায় না!

সুরমা অবাক হ'য়ে বললে— বলো কী! চাকবিতে কখনো মাইনে না দিয়ে পাবে! মাস পুরলে নিশ্চয়ই দেবে। তুমি ওদেব সঙ্গে খামকা ঝগড়া করোনি তো?

এবারে অনুপম বেশ উত্তেজিত স্বরেই বললে — ওদের যা ব্যবহার, তাতে ঝগড়া না ক'রে পারা যায় না। আছে, ভিতরে অনেক ব্যাপার আছে। মান-সম্মান নিয়ে ওদের কাজ করা যায় না। দিয়েছি আজ খুব দু'কথা শুনিয়ে।

সুরমা হতাশ স্বরে বললে — তাহ'লে ছেড়েই দিয়েছো!

অনুপম একটু হেসে বললে — আহা, তুমিও যেমন! এমন একটা ভাব করছো যেন কত বড়ো একটা লোকসান। ও-রকম চাকরি পথে-ঘাটে অনেক ছড়িয়ে থাকে।

কথাটা আসলে সত্য, কেননা বীমার দালালি আজকাল চাইলেই পাওয়া যায়। কিন্তু যতখানি কাজ করতে পারলে তা থেকে মাসে পঞ্চাশটা টাকা আয় করা যায়, অনুপমের পক্ষে তা অসম্ভব। অবশ্য আসল কথাটা জানে না ব'লেই সুরমা চোখ বড়ো-বড়ো ক'বে বললে— বলো

কী! আজকালকার দিনেব পক্ষে ও তো চমৎকাব চাকরি ছিলো। আমি তো মনে করি ও-রকম একটা কাজ পাওয়া ভাগ্যেব কথা।

অনুপম তাচ্ছিল্যের সুরে বললে — তুমি ভাবতে পারো সৌভাগ্য, আমি ভাবিনে। তাছাড়া, কত একটা বড়ো কাজে যাচ্ছি। দ্যাখো না, দু'পাঁচ বছরে কী হয়। দ্যাখো, ভদ্রলোক বলছেন আমাকেও কিছু টাকা ফেলতে। বেশি নয়, হাজাব পাঁচেক। তাহ'লে লাভের টেন পার্সেন্ট দিতে রাজি। টেন পার্সেন্ট মানে জানো? বছরে হাজার কুড়ি তো বটেই। বলবো নাকি বাবাকে একবার?

সুরমা ঠাণ্ডা গলায় বললে -- দেখতে পারো ব'লে।

একটু যেন দ্বিধা ক'রে অনুপম বললে • আচ্ছা, তোমাব বাবা কি কিছু দিতে পারেন না?

সুরমা ম্লান হ'য়ে গিয়ে বললে -- আমাব বাবা গরিব মানুষ, তিনি অত টাকা কোথায় পাবেন?

একটু যেন লজ্জিতভাবেই অনুপম বললে – আচ্ছা, থাক, থাক। এমনি একটা কথার কথা বলছিলাম। তুমি কিছু ভেবো না। এ-ব্যবসায় লাভ আমাদের হবেই। অবশ্য রিস্ক্ যে কিছু নেই তা নয়— রিস্ক্ সব ব্যবসাতেই আছে -- তা একটু রিস্ক্ না নিলে জীবনে কি বড়ো হওয়া যায়! তুমিই বলো!

সুরমা আবার জিজ্ঞেস করলে -- ব্যবসাটা কিসেব?

অনুপম আবার জবাব দিলে – আছে নানারকম।

— ইনশিয়োরেন্সের কাজটা এ-ক'দিন ক'রেই ছেড়ে দিয়ে ভালো কবলে কিনা কে জানে। কিছুদিন করলে হয়তো ভালো লাগতো। মোটে তো ভালো ক'রে কবলেই না।

-- আরে ছি-ছি, এ-কাজ কি ভদ্রলোকে কবতে পারে। দু'দিনেই আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। বললুম না তোমাকে, ওরা অত্যন্ত বদ লোক -- কথায়-কথায় অপমান করে।

-- তা এ-ক'দিনেব মাইনে দিয়ে দিয়েছে তো?

-- তা দিলেও তো বুঝতুম। কিছু না, এক পয়সাও না।

— বলো কী, এ-ক'দিন খাটিয়ে নিলে, তাব মজুরি দিলে না। একি সম্ভব নাকি?

-- ওদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

-- বাঃ, এমন কথা তো কোনোদিন শুনিনি। আইন আছে কী করতে। একটা উকিলের চিঠি দাও -- বাপ-বাপ ক'রে টাকা দিয়ে দেবে।

-- ব'য়ে গেছে এখন আমার সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে অত হাঙ্গামা করতে। বিজনেস-এর জন্য এখন ভয়ানক খাটতে হবে কিছুদিন! অত সময় কোথায় আমাব?

— তাই ব'লে তুমি চুপ ক'রে এ-ও সহ্য করবে।

— খুব দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে চ'লে এসেছি — আবার কী? আমাদের ব্যবসাটা জাঁকিয়ে উঠুক, তখন ঐ পচা কোম্পানির ম্যানেজারকে কেরানি রাখবো।

এর পর কয়েকদিন অনুপমকে সত্যি খুব ব্যস্ত দেখা গেলো। দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার সে বেরোয় আর বাড়ি ফেরে। অদ্ভুত সময়ে ও অদ্ভুত জায়গায় তার সব এনগেজমেন্ট থাকে। টেলিফোন ছাড়া কাজের বড্ড অসুবিধে হচ্ছে, সামনের মাসের গোড়ার দিকেই একটা আনিয়ে ফেলবে। কিছুদিন তার পকেটে কিছু টাকা-পয়সাও দেখা যেতে লাগলো। তাছাড়া, পকেটে তার প্রায়ই সচিত্র পুস্তিকা দেখা যায় — মোটর গাড়ির ক্যাটালগ। আপিসের গাড়ি কেনা হবে — সে-ভারও তারই উপর পড়েছে।

দিন পনেরো এইভাবে কাটলো। ততদিনে সুরমারও প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়ে এসেছে যে বাণিজ্যেই বসতে লক্ষ্মী। এখন ভালোরকম সব চললেই হয়।

রাত্তিরে শোবার সময় ছাড়া অনুপম আজকাল প্রায় বাইরে-বাইরেই থাকে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর পাছে ভেঙে যায়, সে ভাবনায় তার মা অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে থাকেন। কিন্তু অনুপমের সে-সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই তার। তার নামে সব বড়ো-বড়ো খামে টাইপ-করা চিঠিপত্র আসে। নানারকমের লোক আসে বাড়িতে। হ্যাঁ— এ না হ'লে আর ব্যবসা কী! সুরমা ভাবে, এতদিনে তার স্বামী নিজের প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছেন, একদিন সত্যি-সত্যি বিরাট কিছু হ'য়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। কার মধ্যে কী থাকে বলা তো যায় না।

আরো কিছুদিন গেলো। তারপর একরাত্রে শুয়ে-শুয়ে অনুপম বললে — দ্যাখো, কলেজ স্কোয়ারের কাছে পাঁচশো টাকায় একটা চায়ের দোকান বিক্রি হচ্ছে। ভাবছি বাবাকে ব'লে সেটা কিনে ফেলি। পাঁচশো টাকা তিনি নিশ্চয়ই দিতে পারবেন।

সুরমা অবাক হ'য়ে বললে — কেন, চায়ের দোকান কিনে তুমি কী করবে?

— কী আবার করবো? চালাবো। মাসে দু'শো টাকা নেট-প্রফিট।

— বলো কী! মাসে দু'শো টাকা যাতে লাভ সে-দোকান পাঁচশো টাকায় ছেড়ে দিচ্ছে। লোকটা কি পাগল?

সঙ্গে-সঙ্গে সুর নামিয়ে অনুপম বললে— না, ঠিক দুশো হয়তো হবে না। দেড়শো— হ্যাঁ, একশো তো হবেই। ব'লে-ক'য়ে পাঁচশোতেই রাজি করাতে পারবো বোধ হয়। লোকটার ব্যামো হয়েছে — পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে চ'লে যেতে চায়।

— তোমার হাতে সেই কোম্পানি রয়েছে — এত বড়ো ব্যবসা —

— হ্যাঁ, বিজনেসটা রয়েছে বটে। তা চায়ের দোকানটাও থাক্ না। গোটা কুড়ি টাকা মাইনে দিয়ে একটা লোক রেখে দিলেই হবে। আমি তো আর নিজে গিয়ে দোকানে বসতে পারবো না। বুঝলে না — চার-পাঁচটা কলেজের কাছে কিনা, ছাত্রদের ভিড় খুব হয়। বেশ লাভ।

— নিজে না দেখলে দোকান চলে না।

— হ্যাঁ, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবো বইকি। কালই বলবো বাবাকে। আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে একটা ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁও ক'রে তোলা যায়। তাহ'লে অবশ্য চৌরঙ্গি পাড়ায় তুলে আনতে হয়।

হঠাৎ সুরমার মনে পড়লো সেই ব্যবসার কথা স্বামীর মুখে কিছুদিন শোনা যাচ্ছে না। কেমন একটা ভয়ের ভাব এলো তার মনে, খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলে — তোমাদের ব্যবসা কবে থেকে আরম্ভ হবে?

-- জোগাড়যন্ত্র চলেছে। এ-প্রসঙ্গে অনুপমের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেলো না।

-- এ-মাসের প্রথমেই আরম্ভ করবার কথা ছিলো না?

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এইভাবে অনুপম বললে — চায়ের দোকানটাই কিনে নেব। আমাদের কালীপদ বেশ বিশ্বাসী লোক, তাকেই বসিয়ে দেয়া যাবে। ও তো বাড়িতে আট টাকা মোটে মাইনে পাচ্ছে, আমি কুড়ি টাকা দেব — আচ্ছা না-হয় পঁচিশই দেয়া যাবে। ওর পক্ষে কত বড়ো একটা লিফ্‌ট ভাবো তো।

বোধ হয় সেই কথাই ভাবতে-ভাবতে অনুপম খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়লো।

আরো কয়েকমাস কাটলো। অনুপম যেদিন খুসি হয় বাড়িতে প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোয়, যেদিন খুসি হয় পোষাক প'রে বেরোয়। কোথায় যায়? একটি মান্থলি টিকিট নিয়ে সহরের এমন জায়গা নেই যেখানে সে না যায়। বড়োবাজারে তার আনাগোনা, ড্যালহৌসি স্কোয়ারে বহু আপিসে তার ঘন-ঘন আবির্ভাব। কিছু কাজ নেই, সুতরাং সে সব চেয়ে ব্যস্ত। তার পাশ দিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকার স্রোত ব'য়ে চলেছে, সেই ঘূর্ণির মারপ্যাচে ঢোকবার যতবারই চেষ্টা করে, ততবারই ফিরে আসে ধাক্কা খেয়ে। ঘর্মাক্ত ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে এসে বলে — উঃ, এত ভয়ানক পরিশ্রম আর সয় না।

সত্যি, অকারণে নিরুদ্দেশে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়ানো -- কতদিন মানুষ তা সইতে পারে? কতদিন, আর কতদিন?

এটাও মানতে হবে যে সে এখন বিজনেসম্যান। অবশ্য সেই কুড়িহাজারি কোম্পানিটা শেষ পর্যন্ত হ'লো না, সমস্ত ঠিকঠাক হবার পরে যে-লোকটি টাকা দেবে, সে-ই শেষ মুহূর্তে পেছ্‌-পা হ'লো -- লোকটাকে শূকরসন্তান বললে কিছুমাত্র অন্যায় বলা হয় না। পৃথিবীর সব লোকই এইরকম -- ইতর, অশিক্ষিত, ধূর্ত, স্বার্থপর ও প্রতারক — এতগুলো খারাপ লোকের মধ্যে একমাত্র ভালো লোক অনুপমের উপায় কী? তা সেও একটা বিজনেস চালাচ্ছে, ক্লাইভ রোতে এক বন্ধুর আপিসে একটা চেয়ারে গিয়ে মাঝে মাঝে দু' তিনঘন্টা ব'সে থাকে। বিজনেসটা কী, সেটা সুরমা এখনো জানে না, যখন বেশ ফেঁপে উঠবে তখন জানতে পারবে। তবে সেটা চায়ের দোকান নয়। দোকানদারি করাটা ঠিক ভদ্রলোকের কাজ কি? 'দোকানে যাচ্ছি', বলতেই কেমন বিশ্রী লাগে না? 'আপিসে যাচ্ছি', কথাটাই বেশ। তাও নিজের আপিস। অনুপম এখন নিজের আপিসে যাচ্ছে।

এইভাবেই আরো এক বছর কাটলো। হেমবাবু মলিন জিনের কোট প'রে আপিসে যান, আপিস থেকে ফিরে খালি গায়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকেন; মাসের পয়লা তারিখে প্রচুর ধার শোধ করেন ও সাত তারিখে আবার ধার করতে ছোটেন। বড়ো ছেলের সঙ্গে বিশেষ দেখাশোনা হয় না তাঁর। একদিন, সন্ধেবেলায় অনুপম বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, বাইরের ঘরে বাপের মুখোমুখি প'ড়ে গেলো। সে এড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, হেমবাবু তাঁকে ডাকলেন। একটুখানি কেশে, অত্যন্ত যেন লজ্জিতভাবে বললেন —

শোন্ -- আমাদের আপিসে একটা চাকরি খালি হয়েছে।

অনুপম চুপ ক'রে রইলো, যেন এ ব্যাপারে তার কিছুই এসে যায় না।

-- আমি তোর কথা সায়েবকে বলেছি, তবে যা দিনকাল --

-- কী চাকরি?

-- মন্দ নয় খুব। পঞ্চাশ টাকা থেকে আরম্ভ--

-- ওঃ, পঞ্চাশ টাকা! অনুপম খুব মৃদুস্বরে বললে কথাটা, অসম্ভব আজগুবি কিছু শুনে যেন সে প্রায় হতবাক হ'য়ে গেছে।

-- পঞ্চাশ থেকে সওয়াশ', তারপর ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় উৎরোলে হয়তো তিনশো পর্যন্ত যাওয়া যাবে। গবর্মেন্টের বাঁধা স্কেলে আস্তে-আস্তে উঠে যাবি -- বেশ ভালোই তো।

অনুপম বললে -- পঞ্চাশ টাকায় আমার কী হবে'

খুব কুণ্ঠিতস্বরে বললেন হেমবাবু -- আপাতত আর কিছু যখন হচ্ছে না --। আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করিয়ে রেখেছি -- কাল সেটা দিতে হবে।

অনুপম বাপের মুখের উপর আর-কিছু বললে না, পরের দিন দরখাস্ত সই করে দিলে। স্ত্রীকে বললে -- দুঃখেকষ্টে বাবার মাথা-খারাপ হ'য়ে গেছে। আমাকে পঞ্চাশ টাকার কেরানিগিরি করতে বলছেন।

সুরমা বললে -- ঐ পেলেই কত লোক আজকাল কৃতার্থ।

কত লোক হ'তে পারে, আমার কথা আলাদা। বিজনেস্-এর লাইন আমি ছাড়বো না। আমার একটা স্কীম আছে -- সেটা হ'য়ে গেলে তো আর কথাই নেই। দস্তুরমতো গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি জাঁকিয়ে থাকতে পারবো।

স্কীমটা কী, সুরমা তা শুনতে চাইলো না। শুনেই বা কী হবে, সে সামান্য মেয়েমানুষ, ও-সব বড়ো-বড়ো ব্যাপার বুঝবে না।

অনুপমই আবার বললে -- কলকাতা সহরে একটু বুদ্ধি থাকলে মাসে শ পাঁচেক আয় করা তো কিছুই না। দ্যাখো না সব মাড়োয়ারিদের -- না জানে লেখাপড়া, না পারে ভদ্রলোকের মতো একটা কথা বলতে। একজন মাড়োয়ারির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তার কাছ থেকে সব ফন্দি-ফিকির শিখে নিচ্ছি। দেখবে আর দু'দিন পরে। -- হ্যাঁ, আমাকে একটা টাকা দাও তো।

সুরমা বললে -- একটা টাকা?

-- একটা টাকাও নেই তোমার কাছে?

-- আমার কাছে টাকা থাকবে কোত্থেকে?

-- কেন, বাজার-খরচ তো তোমার হাতেই আজকাল। আচ্ছা, এক টাকা না পারো আট আনা দাও।

-- এক টাকাই দিচ্ছি। নিজের জমানো দুটি আধুলি সুরমা বার ক'রে দিলে।

মাঝে মাঝে এমন দেয়। তার হাতে দু'চার আনা পয়সা যা আসে সব সে সযত্নে জমিয়ে রাখে, যে কোন দিন স্বামীর দরকার হ'তে পারে।

পরের দিন হেমবাবু আপিস থেকে খানকয়েক বই নিয়ে এলেন। অনুপমকে ডেকে বললেন -- এগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখিস তো একটু -- ইন্টারভিয়ুর জন্যে ডাকতে পারে।

-- পঞ্চাশ টাকার চাকরি, তার আবার ইন্টারভিয়ু!

-- ইনকম-ট্যাক্সের আইনগুলো একটু দেখে নিস। কিছু জিজ্ঞেস করলে দু'একটা কথা বলতে পারলেই হ'লো।

-- বাবার একদম মাথা-খারাপ হয়েছে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুপম বললে। আমাকে বলছেন ইনকম-ট্যাক্সের বই পড়তে। এখনো যেন আমার পরীক্ষা পাশ করবার বয়েস আছে। হো-হো ক'রে হেসে উঠলো সে, হাসিটা অত্যন্তই উচ্চ।

-- ভালোই তো। বছরে একখানা বই তো ছুঁয়ে দ্যাখো না। তবু একটু পড়াশুনোর চর্চা হবে।

-- ওঃ, পড়াশুনোর এই তোমার ধারণা! ইনকম-ট্যাক্সের আইন! অনুপম আরো জোরে হেসে উঠলো।

বইগুলো সে একবার ছুঁয়েও দেখলো না। সন্ধেবেলা আপিস থেকে ফিরে নাকের নিচে চশমা নামিয়ে হেমবাবুই সেগুলো পড়তে বসলেন। রোজই এ-রকম হ'তে লাগলো; যখনই সময় পান, হেমবাবু ব'সে ব'সে ইনকম-ট্যাক্সের আইনের সমস্ত মারপ্যাঁচ আয়ত্ত করেন। অনুপম তাঁকে একদিন দেখে ফেললো। হাসতে-হাসতে সুরমাকে বললে -- দেখেছো বাবার কাণ্ড। তিনি বই পড়লে কি আমার বিদ্যে হবে!

সুরমা শান্তভাবে বললে -- ও, সেটা তাহ'লে বোঝো!

-- আমাকে দিয়ে ও-সব বাবিশ চাকরি পোষাবে না তা তো আমি ব'লেই দিয়েছি।

তারপর, একদিন আপিসে সায়েবের কাছে তার ডাক পড়লো। না গেলে বাবা নেহাৎই দুঃখিত হবেন, শুধু সেই কারণেই সাজগোজ ক'রে গেলো সে। ফিরে এসে বললে -- সায়েব আমাকে বললে, তুমি আমাদের হেমবাবুর ছেলে, তোমাকে নিতে পারলে তো ভালোই হয়। তা আপাতত এটা নিলে কেমন হয়, বলো তো? বিজনেসটা একটু ফেঁপে উঠলে ছেড়ে দিলেই হবে। হাত-খরচটার জন্য আর কি -- বুঝলে না?

সুরমা বললে -- আপাতত হাতখরচ ছাড়া আর কোনো খরচও তো নেই তোমার।

-- আহা, কোনরকমে দিন কাটলেই কি হ'লো! বাবার অবস্থা দেখছো তো! সেই মাড়োয়ারিটা যা বলে তাতে তো মনে হয় ছ'মাসের মধ্যেই খুব সুবিধে হ'য়ে যাবে।

কয়েকদিন পরে অনুপম বাড়ি ফিরে দেখে সুরমার মুখ ভারি গম্ভীর। জিজ্ঞেস করলে -- কী হয়েছে তোমার?

-- তোমার চাকরির খবর এসেছে।

-- কী খবর? অনুপম খুব তাচ্ছিল্যের সুরেই জিজ্ঞেস করলে, তবু তার গলাটা একটু কেঁপে গেলো।

— হয়নি। শ্বশুরমশাই ভারি ভেঙে পড়েছেন।

মুহূর্তের জন্য ম্লান হ'য়ে গেলো অনুপমের মুখ। কিন্তু তক্ষুণি আবার বললে — ওঃ, বাঁচলাম। হ'লে মুস্কিলই হ'তো — বাবার জন্য না নিয়েও তো পারতাম না। আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি এখন থেকে শেয়ার মার্কেটেই মন দেবো। এ ছাড়া আর কিছুতেই পয়সা নেই। গোড়াতে হয়তো মাসে দু'শো আড়াইশোর বেশি হবে না — ক্যাপিট্যাল না থাকার তো এই মুস্কিল। তবে বছরখানেকের মধ্যে পাঁচশো মত সহজেই হ'য়ে যাবে। আমাদের এ-বাড়িটা ভারি ছোটো — এটা ভাড়া দিয়ে তখন বড়ো বাড়িতে যাবো, কী বলো?

[প্রকাশকাল: বর্ষ ১/ সংখ্যা ২: ১৩৪৫]

অনর্থক

প্রতিভা বসু

আমি একথা কখনোই বুঝিনি যে সমীর আমাকে ভালবাসে। বাপ ওর সবজজি ক'রে চুল পাকিয়েছেন, এসব বিষয়ে তাঁর শ্যেন-দৃষ্টি। মাঝে-মাঝে এ বাড়ি আসবার অপরাধে ছেলেকে লাঞ্ছিত করতেন শুনেছি। আমার বাবা মহাদেব — তাঁর মনে দুর্বুদ্ধি নেই, একথা তাই মনে করেননি যে সমীরের সঙ্গে মেশামেশির ফলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। চরিত্র খারাপ হবার ভয়ে তিনি আমাকে চেপেও রাখেননি। অতিশয় সহজে মনের আনন্দে আমি স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, বন্ধুতা পাতিয়েছি এবং ছেলেবেলা থেকে মেলামেশায় বাধা না পেয়ে স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে অতটা সচেতনও হইনি।

সমীরকে ভাল লাগতো, সমীর এলে খুসী হতাম এবং যতক্ষণ সমীর থাকতো সময়টা কাটতো ভাল। ওর বিলেত-ফেরত দাদার কাছে ও নানারকম খেলা শিখেছিল, সে-সব খেলা আমাকে শেখাতো. আমি পাড়া থেকে ছেলে-মেয়ে সংগ্রহ ক'রে খেলার সঙ্গী করতাম। সবাই বলতো সমীর দেখতে সুন্দর, আমি বলতাম না। ও ফর্সা ছিল বটে, কিন্তু পুরুষমানুষ অত ফর্সা আমি পছন্দ করতাম না। ওর চোখ বড় বড় ছিল, কিন্তু আমি তাতে বুদ্ধির দীপ্তি দেখিনি। ওর হাত ছিল গোল গোল নরম আর ধব্‌ধবে ফর্সা। পুরুষমানুষের ঐ ননীর শরীর দেখলেই আমার মোটাবুদ্ধি রাখু গয়লাকে মনে পড়তো। একথা ব'লে আমি সমীরকে ঠাট্টা ক'রে রাখতাম না। সমীর ম্লানমুখে বলতো, 'আমার কিছুই কি তোমার ভাল লাগে না? আমার রং ফর্সা তার আমি কি করতে পারি, আমার হাত গোল তাতেই বা আমার কি হাত আছে, আমার চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধি খেলে না সেও বিধাতার অভিশাপ।' আমি ওর হাতের উপর হাত রেখে বলতাম, 'রাগ করলে?' তক্ষুনি লক্ষ্য করেছি ওর চোখে আলো জ্ব'লে উঠেছে — হাসিতে ভ'রে উঠেছে মুখখানা।

আমার বয়স যখন চোদ্দ তখনই আমার সমীরের সঙ্গে প্রথম দেখা। ও তখন সবে আই-এ পড়ছে। চোদ্দ বছরের মেয়ের মধ্যেই সাধারণত জোয়ার আসে, আমার এসেছিলো দেরিতে। অর্থাৎ ষোলো বছর বয়সে আমি প্রথম উন্মনা হ'তে শিখলাম। ফাল্‌গুন মাসে আমার জন্ম, আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেবার যারা এলো তারা সবাই বল্‌ল, আমার আর আগের মত উদ্দাম আনন্দ নেই। ওরা বুঝল না আমার মনে এখন উদ্দাম বসন্ত নেমেছে। আর দেরিতে নেমেছিল ব'লে তার গভীরতা হয়তো একটু বেশী হ'য়েছিল। সেদিন আমি একজনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সে যখন আমার কাছে পান চেয়েছিল তার চোখের দিকে চেয়ে বুক কেঁপে

উঠেছিল। সমীর সেখানে ছিল — কি ভেবেছিলো জানি না হঠাৎ উঠে বাড়ি চ'লে গেল।

পরের দিন বিকেলে এলো না, তারপরের দিনও এলো না। আমার বাবার এক বন্ধু থাকেন ওদের পাড়ায়, বাবার সঙ্গে তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, সেখান থেকে সমীরের খোঁজেও গেলাম তাদের বাড়ি। ওর সঙ্গে পরিচয় আমাদের আত্মীয়তার ছেঁড়ালতায়। আর পরিচয়ের পর থেকে এমন দিন যায়নি যেদিন বিকেলে সমীরকে আমাদের বাড়ি-ছাড়া কেউ দেখেছে। পারলে সে সমস্ত দিন থাকে, কিন্তু প্রশয়ের অভাবে সে-ইচ্ছা ও চেপে রাখতো অতি কষ্টে। গিয়ে দেখলাম বাড়িতে কেউ নেই, অন্ধকার ঘরে সমীর কপালে হাত রেখে ডেক্-চেয়ারে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে লাফিয়ে উঠলো। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝছি ওর বুক তখন ধ্বক্‌ধ্বক্ ক'রে কাঁপছিল, হয়তো আমার কান থাকলে সে-স্পন্দন শোনা কিছুই কষ্ট হ'ত না। 'এ কি, তুমি এসেছ?' মুখে ওর রক্ত উঠে এসেছিলো বোধ হয়। দৌড়ে গিয়ে সুইচ্ টিপলো। আমি বললাম, 'তুমি যে যাও না?'

'এমনি।'

'এমনি মানে?'— আমি একটু রাগ ক'রে বললাম।

সমীর কোনো জবাব দিল না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'পিসীমা কোথায়?'

'বিয়ের নেমন্তন্নে গেছেন।'

'তুমি গেলে না যে?'

'বিয়েতে যেতে আমার ভাল লাগে না।'

তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌ল, 'অশোকের সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?'

'ও, অশোক?' আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'ও তো ছোটমামার বন্ধু, আমার সঙ্গে ঐ সেদিনই দেখা। ভারি চমৎকার কিন্তু।'

বিদ্রূপের স্বরে সমীর মুখে মুখে ব'লে উঠলো, 'তাই নাকি?'

ওর বিদ্রূপ বুঝতে পেরে একটু যেন বিরক্ত বোধ করলাম। অশোকের মুখ তখনো স্পষ্ট আমার মনে দাগ কেটে আছে। প্রথম দেখেছি, তাও হয়তো বড় জোর আধ ঘন্টার দেখা। অথচ এ দু'দিন ক্রমাগত ওর প্রসঙ্গ উঠলে আমি যেন উত্তাল হ'য়ে উঠতাম। সমীরের কথার জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

'রাগ করলে নাকি?' — সমীর কোমল গলায় বললে।

'রাগ করব কেন?'

'কথা বলছ না যে?'

'এবার যাই — আর কি।'

'না, না, বোসে বোসো' — তারপর হঠাৎ একান্ত কাছে এসে বসলো - বল্‌ল, 'মণি', আমি বি.এ. পাশ ক'রে কলকাতা চ'লে যাবো।'

'বেশ তো, বেড়িয়ে আসবে।'

'না ভাই, বেড়াতে না — পড়তে।'

'কেন?'

'ভাল লাগছে না এখানে। পরীক্ষার আমার দেরী নেই বেশী -- অথচ একটুও পড়ায় মন দিতে পারছিনে।'

ঠাট্টা ক'রে বল্লাম, 'প্রেমে পড়েছো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

সমীর যে হ্যাঁ কথাটা উচ্চারণ করলো তার মধ্যে এতটুকু হাল্‌কা সুর ছিলো না। কথাটা যেন সত্যি ক'রেই বল্‌ল। আমি জানতাম সমীরের বাবা যখন খুলনা ছিলেন তখন ছোট্ট একটি মেয়েকে তাঁরা বৌ করবেন এরকম জল্পনা কল্পনা করতেন। সেখানকারই এক মুন্সেফের মেয়ে। হঠাৎ পাঁচ বছর পরে সেই মুন্সেফ যখন পেন্সন নিয়ে এসে ঢাকায় বাড়ি ক'রে বসলেন তখন সমীরের মা কথাটা প্রায় পাকা ক'রে ফেলবার চেষ্টা করলেন। মেয়েটি তের বছরের। সমীরের মা বলেছিলেন কথা এখন ঠিক ক'রে রাখবো তারপর ছেলে এম্‌ এ. পাশ করলে বিয়ে দিয়ে বিলেত পাঠাবো। বিলেতের খরচাটি অবিশ্যি মুন্সেফবাবুই দেবেন।

সমীর একটু পরে আবার বল্‌ল, 'আচ্ছা মণি, অশোককে তোমার কেমন লাগল? ব্রিলিয়েন্ট ছেলে শুনেছি, কিন্তু দুর্নাম অনেক।'

ঠোঁট উল্টিয়ে বল্‌লাম, 'ভারি দুর্নাম, কেউ একটু মাথা তুললেই লোকেরা অমন বলতে থাকে -- আমি ওসব মানি না।'

সমীর সে কথার জবাব দিল না, একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌ল, 'আমি কলকাতা যাবার আগে তোমাদের বাড়ি আর যাব না ভেবেছি।'

'ভালই তো ভেবেছো।' আমি রাগ ক'রে মুখ ঘোরালাম।

সমীর মৃদুস্বরে বল্‌ল, 'তুমি তো তা হ'লে খুসীই হও।'

'তুমি তো দেখছি অন্তর্যামী।'

'আর কারো না হই, তোমার অন্তর্যামী অন্ততঃ।'

'তবে যেয়ো না।' আমি রাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালাম।

'পাগল নাকি' -- সমীর আমার হাত টেনে বসালো। শুনতে পেলাম বাবার পায়ের শব্দ। জুতোর শব্দ করতে করতে উনি উঠে এসে বল্‌লেন, 'মণি -- যাবি না?' সমীরকে জিজ্ঞেস করলেন 'তোমার মা কোথায়?' 'বিয়ে বাড়ি গেছেন, বসুন না একটু।' সমীর কাকুতি করতে লাগলো আর একটু বসবার জন্যে, কিন্তু বাবা আর বসলেন না। চলে এলাম।

তারপরে ওর সঙ্গে আমার একমাস মাত্র আর ভাল ক'রে দেখাশোনা হয়েছিল। সত্যি সত্যিই ও বি.এ. পরীক্ষা হবার পরে কলকাতা চ'লে এলো পড়তে। আমার ভারি কষ্ট হয়েছিল ওর চ'লে আসবার দিন। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা যখন বল্‌ল, 'কাল থেকে তোমাকে দেখবো না ভাবতে বড় কষ্ট হয়', আমার কান্না পেয়েছিল, ভাঙা গলায় বলেছিলাম, 'তুমি তো যাচ্ছ নতুন জায়গায় -- আমি তো এখানেই থাকলাম -- আমারই অভাবটা লাগবে বেশী।'

'তোমার কষ্ট হবে? আমার কথা তুমি ভাববে এরকম সময়? কথাটার যেন জবাব শুনবে ব'লে উৎসুক হ'য়ে তাকিয়েও রইলো আমার মুখের দিকে। আমি চুপ ক'রে রইলাম।

তারপরে দেখা আমাদের পুরো এক বছর পরে। ওর বাবা মাও কলকাতা গিয়েছিলেন কিছু দিন। ছেলেকে লায়েক ক'রে দিয়ে শেষে হষ্টেলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এলেন এতদিনে। সমীরকে দেখে আমার লজ্জা করলো যেন। চমৎকার বাবু হয়েছে দেখলাম। চেহারাও বদ্‌লেছে কিছু। কথাবার্তায় দিব্যি সপ্রতিভ। আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে বল্‌ল, 'বাঃ, এতদিন পরে এলাম, প্রণাম করলে না?'

'ঈস্‌!'

'ঈস্‌ কি — আমি তো তোমার বড়' — ব'লেই আমার কাপড়ের আঁচল টেনে বসিয়ে দিলো। বললাম, 'কেমন আছ?'

' দেখ্‌ছোই তো — তুমি কেমন আছ?'

'ভালই।'

'আমার চিঠির জবাব দাওনি যে?'

'কী আর জবাব দেবো।'

'তা দেবে কেন — আমাকে মনেই থাকতো ভারি।'

'চিঠিটাই নাকি মনে রাখার নিদর্শন!'

'নিশ্চয়ই।'

'তবে এবার থেকে দেবো।'

তারপর এ-কথা সে-কথার পরে হঠাৎ বলল, 'তোমার অশোক রায়ের খবর কী?'

বল্‌লাম, 'আমি কী জানি!' সত্যিই আমি জান্‌তাম না। সেই যে একদিন এসেছিলো — তারপর বড় জোর আর দু'দিন এসেছিলো কিনা সন্দেহ।

হেসে টিপ্পনি কেটে বল্‌ল, 'তোমার বন্ধুর খবর তুমি রাখো না, ভারি আশ্চর্য্য তো।'

টিপ্পনিটুকু আমার কোথায় যেন বাজলো। বললাম, 'বন্ধু হ'লে খুসী হতাম, কিন্তু বন্ধু না হ'য়েও একথা সবাই জানে যে অশোক রায় এবার এম.এ-তে ফার্ষ্ট হয়েছে।'

সমীর গম্ভীর হ'য়ে রইল।

গ্রীষ্মের আড়াই মাস ছুটির মধ্যে দেড় মাসই প্রায় কলকাতায় কাবার ক'রে এসেছিল। দিনকুড়ি থেকে আবার চ'লে গেল। প্রথম প্রথম গিয়ে আমাকে চিঠি লিখতো কিন্তু ওর মাথায় কী যে এক অশোকের চিন্তা ঢুকেছিল — সব চিঠিতেই একটা রূঢ় মন্তব্য না ক'রে পারতো না। ফলে আমি জবাব দিতাম না, কাজে কাজেই সম্পর্কটা শিথিল হ'য়ে এলো। তাছাড়া একবার লিখলো মুন্সেফের মেয়েটিকে বিবাহ করবার জন্য পিড়াপিড়ি করায় মার সঙ্গে ও ঝগড়া কোরেছে। আমি অবাক হ'লাম, কিন্তু সত্যি-সত্যি তার পরে যে ও এলো সে একেবারে এম-এ পরীক্ষা শেষ ক'রে। বল্‌ল, বিলেত যাচ্ছে একমাসের মধ্যে। যাবার দিন আমাকে একটা ফাউন্টেন্‌ পেন্‌ উপহার দিয়ে বলেছিলো, 'চিঠি লিখো।' আমি সেদিন কেঁদেছিলাম।

সমীরের জন্য নয়— একজন মানুষ অতদূর চ'লে যাচ্ছে ভেবে। সমীর কী বুঝলো জানি না — আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বল্‌ল, 'তিনটি বছর আরো, আরো তিনটি বছর। আমি এখনো সম্পূর্ণ মা-বাপের হাতের মুঠোয়; আমি এখনো নাবালক।' কথাটা বলতে বলতে ও উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। হঠাৎ পলকে যেন আমি ওর মনের কথাগুলো বুঝতে পেরে লাল হ'য়ে উঠলাম, কিন্তু কয়েকদিন পরেই তা আর মনে রইলো না।

এক বিকেলে বক্‌সিবাজার থেকে ফিরছিলাম ঘোড়ার গাড়ীতে। প্রত্যেক রবিবার আমার এক বন্ধুর বাড়ি আমার নিমন্ত্রণ থাকতো। বন্ধুটি আমার চেয়ে কম ক'রেও দশ বছরের বড়। নতুন ফিরেছেন বিলেত থেকে — তারপরে কাজ নিয়ে এসেছেন মেয়েদের কলেজে। আমার সঙ্গে দেখা হবার কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা বয়সের অত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের বন্ধু হলাম। মাধুরীদি যে আমাকে কেবলমাত্র স্নেহ করতেন তা নয়, কেমন একটা বন্ধুতা হয়েছিল যার জন্য দু'জনে সমস্ত দিন একসঙ্গে কাটিয়েও আমরা বিরক্ত বোধ করতাম না। স্নেহাস্পদের সঙ্গে মানুষ কখনোই সমস্তদিন হাসি-গল্প ক'রে কাটাতে পারে না — কিন্তু আমরা একখাটে শুয়ে সমস্তটি দুপুর যে-রকম উচ্চস্বরে হেসেছি আর কথা বলেছি তাতে কেউ একথা মনে করতে পারেনি যে আমি মাধুরীদির অত ছোট, এবং সমস্ত দিক দিয়েই ছোট।

বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন। সমস্ত দিন পরে বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় একটু যেন থামলো। আমি মাধুরীদির চাপরাশি নিয়ে গাড়ি ক'রে ফিরছিলাম, কিন্তু একটু পরেই বৃষ্টি আবার ঘন হ'য়ে নামলো। ত্রস্তে জানালাটা টেনে দিতে গিয়েই পথে দেখলাম অশোক। কোঁচা লুটিয়ে সে ভিজতে ভিজতে চলেছে, হাতে ছাতা নেই। আদ্দির পাঞ্জাবি ভিজে ভিতরের শরীরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমি নিমেষে গাড়ি থামাবার আদেশ করলাম, তারপর মুখ বাড়িয়ে ইসারায় তাকে ডাকলাম। গাড়ির দরজাটা ধ'রে মৃদু হেসে নমস্কার করলো। চেয়ে দেখলাম তার হাসির তুলনা নেই, তার চোখের তুলনা নেই। কুণ্ঠিতভাবে বললাম, 'গাড়িতে আসুন' — কথা কয়টার সুরে আমার মনের সমস্ত ইচ্ছা হয়তো জড়ানো ছিল। সে আপত্তি করলো না, ইতস্ততঃ করলো না — অত্যন্ত সহজে গাড়ির মধ্যে ঢুকে বল্‌ল, 'বাঁচালেন।' তারপর সমস্তটা পথ প্রায় চুপ ক'রেই কাটলো। অশোকদের বাড়ি পথে পড়ে না, আমি গাড়োয়ানকে ডেকে ওদের বাড়ির দিকে যাবার কথা বলতে যাচ্ছিলাম। অশোক বাধা দিয়ে বল্‌ল, 'ক্ষেপেছেন — আপনি একজন মহিলা, আপনাকে ফেলে আমি আগে নেমে যাবো? আপনাকেই আগে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি চলুন।'

হেসে ফেললাম — 'বাঃ, আমিতো একাই যাচ্ছিলাম।'

'তা যাচ্ছিলেন — কিন্তু এখন যখন সঙ্গী জুটলো তখন তাকে এই সম্মানটুকু অন্তত দিন।'

কী বলবো, চুপ ক'রে রইলাম।

বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে সে সেই গাড়িতেই চ'লে গেল। অনেক বলেছিলাম, কিন্তু নামলো না। গাড়ি-ভাড়াও দিতে দিলে না। পরের দিন বিকেলের ডাকে ধন্যবাদ বহন ক'রে শুধু এইটুকু একলাইন চিঠি এলো।

জবাব দেবার কিছু নেই, তবু সমস্তদিন সে ইচ্ছার তাগিদে আমি উন্মনা হ'য়ে ঘুরে বেড়ালাম।

চিঠির লাইন দু'টি একশোবার মনে মনে আবৃত্তি করলাম, তারপর সন্ধ্যার নির্জ্জন অবকাশে আবছা অন্ধকারে ব'সে ব'সে দেয়ালের গায়ে ইঁটের কণা দিয়ে লিখলাম, 'আমি তাকে ভালোবাসি' -- কতবার লিখ্‌লাম তা জানি না — একবার, দু'বার, তিনবার, অসংখ্যবার একটার গায়ের উপর আর একটা লিখে চললাম।

এর ঠিক ছ'মাস পরে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। ছ'মাসের মধ্যে তিনমাস অশোক ঢাকা ছিল — আর সে তিনমাসেই আমরা পরস্পরকে সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছিলাম, এতটুকু মেকি বা ফাঁকি ছিল না তিনমাস পরে অশোক কলকাতার এক কলেজে প্রোফেসরি নিয়ে চ'লে এলো — ব'লে এলো, 'ভাল ক'রে ভেবে দেখো এ তিন মাস।'

সুদীর্ঘ তিনমাস পরে বাবাকে বললাম। বাবা একটু অবাক হলেন। এমন কিছু ওঁরা পাননি আমাদের ব্যবহারে যা থেকে একটু আঁচও করতে পারেন। তাছাড়া এ তিনমাসে অশোক আর আমি চিঠি পত্র লেখা লেখিও করিনি। মা বল্‌লেন, 'অশোক তো এখানে নেই।' আমি বললাম, 'তাতে কী।'

'তবে কি ক'রে হবে?'

আমি অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে অস্ফুটে বললাম, 'আমি লিখবো।' মা-বাবা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, আমি কুণ্ঠিতভাবে পাশের ঘরে চ'লে এলাম। কয়েকদিন পরে মার নামে চিঠি এলো অশোকের মার কাছ থেকে।

বিয়ে হবার এক বছর পরে শুন্‌লাম সমীর ফিরে এসেছে। মনটা ব্যগ্র হ'লো দেখবার জন্যে।

অশোককে বললাম, সমীর আমার অত্যন্ত বন্ধু ছিল, কতদিন পরে এলো, দেখতে ইচ্ছে করছে।' অশোক বলল, 'কোথায় আছে জানো?'

'তা তো জানি না।'

'তবে?'

'তাই তো।'

মাকে লিখ্‌লাম ঠিকানার জন্যে। মা লিখলেন তিনিও জানেন না। আরো কিছুদিন পরে খবর পেলাম সমীর ভাল কাজ পেয়েছে, আছে কলকাতায়ই। আমার আগ্রহও ততদিনে নিবে এসেছিল। দেখা হ'লে খুসী হই এ পর্য্যন্ত।

হঠাৎ সেদিন সমীরের মামাতো ভাই বাব্‌লুর সঙ্গে পথে দেখা। কথায় কথায় বল্‌ল, 'সমীরদার খবর রাখো?' আগ্রহের সঙ্গে বললাম, 'তুমি রাখো নাকি? ঠিকানা জানো?'

'নিশ্চয়ই— আরো সে যে মস্ত সাহেব হ'য়ে ফিরেছে, শুনছি নাকি মেম বিয়ে ক'রে এসেছে। মা-বাপ তো বিয়ে দেবার চেষ্টায় খুন হ'য়ে গেল।'

'তাই নাকি? — অবাক হ'য়ে বললাম।

বাব্‌লু একটু ঠাট্টার সুরে বল্‌লে, ' কেন, তোমার সঙ্গে এত ভাব, আমরা তো তখন কতই ভেবেছিলাম — তোমার সঙ্গেও দেখা করেনি?'

আমি সে কথার জবাব না দিয়ে বললাম, 'আমাকে ওর ঠিকানাটা দিতে পার?' বাব্লু একটা টুক্‌রো কাগজ বার করলো পকেট থেকে -- তারপর ঠিকানা লিখে দিল।

কী যে কৌতূহল হ'লো, ঠিকানা নিয়ে এসেই অশোককে বললাম, 'এই চলো না — সমীরকে দেখে আসি।'

'তুমি যাও, আমি তো চিনি না।'

'তাতে কী! আমারই তো বন্ধু। আর এই তো কাছে থাকে।' অশোকের কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যিই যাওয়া হোলো না। অগত্যা আমি একাই গেলাম দেখা করতে।

দোতলার ফ্ল্যাট। বিলিতি ধরণে সাজানো গোছানো। বসবার ঘরে গিয়ে বস্‌তেই 'বয়' এসে অত্যন্ত বিনয় ক'রে বলল, 'মাইজি থোড়া বৈঠিয়ে — সাব বাহার গিয়া।'

আমি অত্যন্ত হতাশ হ'য়ে গেলাম। এত কষ্ট ক'রে বাড়ি খুঁজে এলাম, তাও কিনা বাবু বাড়ি নেই। উদ্বিগ্ন ভাবে বল্‌লাম, 'সাহেব কখন আসবেন জান?' মাথা নিচু ক'রে বয় বিনয়ের ভঙ্গিতে বল্ল 'এই আব্‌ভি আ যায়গা মাইজি -- আপ থোড়া বৈঠিয়ে।' বসলাম একটুখানি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম এদিক ওদিক। কিন্তু মিনিট পনেরো কাট্‌লো, তবু সমীর এলো না। কতক্ষণ আর বস্‌বো। তার চেয়ে বরং একখানা চিঠি লিখে রেখে চ'লে যাই। বয়কে বল্‌তেই সে পুরু নীল কাগজের একটা প্যাড আর কলম নিয়ে এলো। প্যাডের মলাটটি ওলটাতেই অর্দ্ধ সমাপ্ত একখানা চিঠি চোখে পড়লো। সমীরের হাতের লেখা এতদিনেও একটু বদলায়নি দেখলাম। পাতাটা ওলটাতে গিয়ে হঠাৎ একটা জায়গায় আমার নামটা চোখে পড়তেই আমি থমকে গেলাম। বুঝতে পারছিলাম খুব অন্যায় হবে তবু কিছুতেই চিঠিটা পড়বার লোভ সামলাতে পারলাম না। চিঠিটি কোনো একজন বন্ধুকে লেখা, এবং তা এই রকম --

'তুমি আমায় জিজ্ঞেস করেছো, এখনো কেন আমি বিয়ে করতে চাই না। মা-বাবা কষ্ট পাচ্ছেন সে কথার উল্লেখ করতেও ভোলোনি। মা-বাবার মনের কথা জানিনে- আমি নিজে যে বিয়ে না ক'রে কষ্টে নেই এ কথা তুমি বিশ্বাস কোরো। তাছাড়া বিয়ে যদি করতেই হয় তবে আমার মতে মা-বাবাকে সুখী করবার চাইতে নিজের সুখের কথাটাই বেশী ভাবা দরকার। কিন্তু আসলে সুখী হবার যোগ্যতাই বোধ হয় আমার নেই, নয়তো অকারণে এমন একটা অনর্থ ঘটবে কেন। এখন অবশ্য খুব স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে আমি আগাগোড়াই মণিকে ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল — যাক্‌গে, সে কথা ব'লে আর কি হবে। তবে এটুকুই বাঁচোয়া যে মণিও বরাবর আমাকে ভুল বুঝেছিল। নয়তো লজ্জায় আমাকে ম'রে যেতে হ'তো। তুমি বলবে এ সব কথা দুঃখবিলাস মাত্র — যথেষ্ট সময় কাটলে এ দাগের উপর পলিমাটি পড়বে সে কথাও সত্য, তবে যতদিনে সেই সুদিন আসবে, ততদিনে —'

এই পর্যন্ত লিখেই চিঠিটা শেষ হ'য়ে গেছে। চিঠিটা পড়বার পরে আমি একটু ব'সে রইলাম চুপ ক'রে, তারপর মলাট উল্টিয়ে প্যাডটি বয়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আস্তে নেমে এলাম সিঁড়িতে। ঠিক শেষ সিঁড়িটির মুখেই সমীরের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল একেবারে মুখোমুখি।

'আরে মণি যে, এসো এসো।'

বিস্ময়ে আনন্দে সমীর থম্‌কে দাঁড়ালো।

'অনেকক্ষণ ব'সে ছিলাম, এবার আমাকে যেতেই হবে।'

'ক্ষেপেছো নাকি -- একটু বসবে চল' -- দুসিঁড়ি লাফিয়ে উঠে ও আমাকে ডাকতে লাগলো। আমি তবু নেমে এলাম নিচে -- 'সত্যি সমীর এবার আমার না গেলেই নয়।'

সমীর আস্তে আস্তে নেমে এলো কাছে, আর আমি একটু ফিরে দাঁড়ালাম, চকিতে তাকালাম ওর মুখের দিকে।

সমীর সঙ্গে সঙ্গে এলো একটুখানি, তারপর দাঁড়িয়ে রইল স্থির হ'য়ে।

মনটা বড়ই খারাপ লাগছিলো, কিন্তু আমি কী করতে পারি।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ১/সংখ্যা ৩ : ১৩৪৫]

নতুন বাসা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[১৯০৪ সালে বারাণসীতে জন্ম। একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, চলচ্চিত্রকার। কল্লোল-এর অন্যতম স্তম্ভ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: সাগর থেকে ফেরা, পাঁক, সূর্য কাঁদালে সোনা, শ্রেষ্ঠ গল্প, ইত্যাদি। একাডেমি ও। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত। মৃত্যু: ১৯৭৪ সালে।]

শীর্ণ কঙ্কালসার বেড়ালছানাটা পাশের নর্দ্দামা থেকে সারা গায়ে কাদা মেখে কোন মতে রাস্তার ধারে উঠে এসে কাতরভাবে ডাকছে। গলা তার অবশ্য এখন অত্যন্ত ক্ষীণ — একেবারে থেমে যাবার আর দেরী নেই।

অমল নোংরা সবকারী কলতলার পাশ দিয়ে সরু গলিটায় ঢোকবার আগে এক মুহূর্ত্তের জন্যে বুঝি একটু থমকে দাঁড়ায়। গত দুই রাত বেড়াল ছানাটা বড় জ্বালিয়েছে — কোথা থেকে কে ছানাটাকে এই নর্দ্দামায় ফেলে দিয়ে গেছল কে জানে — সারা দিনরাত তার কাতর একঘেয়ে ডাকে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

কিন্তু অমলের অস্বস্তিটা শুধু বিরক্তির দরুণ নয়, মনের কোথায় একটা অক্ষমতার গ্লানিও যেন তাকে বিঁধেছে। সেটা আমল দেবার জিনিয নয় অমল বুঝেছে — একটা আধমরা নোংরা বেড়াল ছানা, অমল তার কি করতে পারে। কিছু করতেই বা তাকে হবে কেন? যতই কাতর ভাবে সেটা চেঁচাক, তাকে বাঁচান ত আর অমলের দায় নয়!

নর্দ্দমার ধারের জানলাটা ভালো ক'রে বন্ধ করে দিয়ে অমল কাল রাত্রে শুয়ে পড়েছিল। তাকে ঘুমোতে হবেই। সকাল থেকে তার অনেক কাজ। কিন্তু তবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম কিছুতেই আসেনি।

বেড়াল ছানাটার দিকে একবার তাকিয়েই অমল আবার হনহন ক'রে এগিয়ে যায়। একটা আধমরা বেড়াল ছানার কথা ভাবলে তার চলবে না।

বাইরের দরজাটা ঠেলে উঠোনে পা দিতেই পিসিমা চেঁচিয়ে ওঠেন — হ্যাঁরে, ক'টা মুটে আর একটা গরুর গাড়ী ডাকতে এই এত দেরী! কখন জিনিযপত্র তোলা হবে, আর কখনই-বা সেখানে গিয়ে ঘর-দোর গুছোব!

গরুর গাড়ী পাইনি, একটা লরী ঠিক করে এসেছি — ব'লে অমল উঠোন পার হয়ে তাদের দিকের রকে গিয়ে ওঠে।

লরী! পিসিমা প্রথমটা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান, লরী — সে যে অনেক ভাড়া!

অনেক ভাড়া নয়! তোমার এই রাজ্যের মাল ত আর একটা গরুর গাড়ীতে হ'ত না — লরীতে এক খেপেই হয়ে যাবে, তাড়াতাড়িও হবে! — দুটো টাকা বেশী তাতে লাগলই বা।

অন্যদিন হ'লে পিসিমা বোধ হয় এত সহজে প্রবোধ মানতেন না। দুটো টাকা যে কতখানি, কতদিক সামলে কি পরিশ্রমে, কি ভাবে দুটো টাকা যে তাঁকে সংসারে সঞ্চয় করতে হয়, কি সামান্য আয় থেকে কি ভাবে তিনটি অনাথ ভাইপোকে তিনি মানুষ ক'রে তুলেছেন, সমস্ত সুদীর্ঘ ইতিহাসই হয়ত অমলকে শুনতে হ'ত। কিন্তু আজ তাঁর মেজাজটা অত্যন্ত প্রসন্ন, তিনি একটু উদারভাবেই বলেন, তা বেশ করেছিস, তাড়াতাড়ি গিয়ে ওঠা যাবে ত'!

পাশের ঘরের ভাড়াটেদের বৌ মানদা কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে, এঁটো বাসন-কোষন হাতে নিয়ে কলতলায় যেতে একটু কৌতূহলভরে থেমে দাঁড়িয়েছিল, তাকে উদ্দেশ ক'রে পিসিমা বলেন-গরুর গাড়ীর যা টিমে চাল সেই এবেলা আর ওবেলা, তাতে কি আর আজকেব মধ্যে ঘব-দোর গুছোন হ'ত। যেমন তেমন দুটো খুপরি ত নয়, যে এখানকার মত জিনিষ-পত্র ঠাসাঠাসি ক'রে রাখলেই হবে -- পাকা ঘব, অঢেল জায়গা, ভালো ক'রে একটু গুছিয়ে না বসলে পাড়াপড়শী বলবে কি!

নতুন ভাড়া করা বাসার গুণ বর্ণনা একবার সুরু হ'লে আর শেষ হবে না জেনে মানদা তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। এ কয়দিন পিসিমার কাছে নতুন বাসার বর্ণনা সবিস্তারে শুনতে এ বাড়ীব কোন ভাড়াটের বাকী নেই। সে যে এমন টিনে ছাওযা কাঁচা গাঁথুনীর পাঁচ ভাড়াটে একত্র কবা বাড়ী নয়, দস্তুরমত ভালো রাস্তায় ভদ্র পাড়ায় একখান আলাদা পাকা বাড়ী,-তার আশে পাশে এমন নোংরা নর্দ্দামা যে নেই -- যত রাজ্যেব উড়ে খোট্টা ছোটলোকের সঙ্গে সেখানে যে সরকারী কলতলায় জল নিতে যেতে হয় না, ইত্যাদি সকল সংবাদই তারা পেয়েছে।

পিসিমার কাছে বাড়ী বদল একটা বাহাদুরীব ব্যাপাব, প্রতিবেশীদেব একটু ঈর্ষা, একটু বিস্ময় জাগাতে পেরেই তিনি সুখী। কিন্তু অমলের কাছে সত্যিই এই বাড়ী বদল একটা মুক্তি-একটা পরিত্রাণ!

এই আবেষ্টনের মধ্যেই সে মানুষ হয়েছে সত্য, কিন্তু তবু এখানে সে হাঁপিযে ওঠে, এর চেয়ে বিস্তৃত মুক্ত জীবনের স্বাদ তাব মনে আছে।

তাদের তিনটি অনাথ ভাইকেই পিসিমা কোন রকমে মানুষ করেছেন। ভাইএবা সাবালক হ'তে না হ'তেই কাজে ঢুকেছে, তাদেব রোজগারে ও পিসিমাব হিসাবী পরিচালনাতেই এ সংসার দিন দিন উন্নতি করেছে। অমলকে তাই আর পড়াশুনা ছেড়ে অল্প বয়সে রোজগারের চেষ্টা করতে হয়নি, সে কলেজে পড়ে।

একটি ছোট খুপরীর মত ঘর তার জন্যে এ বাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট। একটি প্রমাণ তক্তপোষেই ঘরটি জুড়ে যায়, জামা কাপড়ের আলনাটা থেকে কাপড়-চোপড় তার বিছানাব ওপরই ঝুলে থাকে। বই কাগজ রাখবার একটা চৌকি আছে এক পাশে। পড়াশুনা তাকে তক্তপোষের ওপরে করতে হয়।

ঘরে একটি মাত্র জানলা। পেছনের খোলা নর্দ্দামার দুর্গন্ধের দরুণ সেটা অধিকাংশ সময়েই বন্ধ রাখতে হয়। দুর্গন্ধ যখন না আসে তখনও নিস্তার নেই। পাশের বাড়ীর একটি

কলহপ্রবণ দম্পতীর প্রতিদিনের ঝগড়া লেগেই আছে।

নতুন যে বাড়ীতে তারা উঠে যাচ্ছে, সেখানে একটি চমৎকার ঘর সে নিজের জন্যে ঠিক ক'রে নিয়েছে। দোতালার ওপর প্রকাণ্ড বড় বড় দু'টি জানলা সমেত ঘর। একদিকের জানলা দিয়ে আবার পাশের বাড়ীর সাজান একটি বাগান পেরিয়ে তাদের রাস্তাটুকু দেখা যায়।

সে ঘরটুকুই যেন এই দুঃসহ আবেষ্টন থেকে মুক্তির প্রতীক। অন্ততঃ সে ঘরে গভীর রাত্রে দেযাল ভেদ ক'রে পাশের কুঠুরির অসহায় মেয়ের রুদ্ধ কান্না ত' শোনা যাবে না।

পাশের ঘরের এই চাপা কান্নায় কতদিন তার ঘুম ভেঙে গেছে গভীর রাত্রে। এ যেন কোন একজন বিশেষ মানুষের নয়, সমস্ত নোংরা দরিদ্র দুর্ব্বল বস্তিটারই রুদ্ধ আক্ষেপ।

কান্না যেদিন বাড়ে সেদিন এখানে অস্থিরভাবে তাকে পায়চারী ক'রে বেড়াতে হয় নিজের ঘরে। কি করতে পারে সে! কিছুই না। পৃথিবীতে এত অবিচার এত দুঃখ এত শোক -- তবে তা নিয়ে অস্থির হয়ে লাভ কি।

কার বেকার স্বামী দেনার দায়ে স্ত্রী-পুত্র ফেলে পলাতক হয়েছে, কোন্ হতভাগিনী সারাদিন মুখ বুঁজে পরের বাড়ী দাসীগিরি ক'রে কোনমতে ছেলে-মেয়ের মুখে অন্ন দেবার চেষ্টা করে, গভীর রাত্রে নির্জ্জনে নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারে না-তা নিয়ে তার মাথা ঘামাবার কি দরকার।

মেয়েটিকে সে দিনের বেলায় ভালো ক'রেই দেখেছে। প্রতিবেশী হিসেবে ভাল ক'রেই তাকে জানে। অত্যন্ত ঝাঁজালো তার মুখ,-তার দিনের বেলার সে উগ্র চেহারা দেখে মনে হয় না গভীর রাত্রে তার কণ্ঠ থেকে অমন কাতর কান্না বা'র হতে পারে।

হয়ত নিষ্ঠুর পৃথিবীর সামনে এই মুখোস তুলে ধ'রে মেয়েটি ভালোই ক'রেছে। কিন্তু এই মুখোস দিয়েই সে পার পেয়ে যাবে কি! এ বাড়ীর লোকেরা তার সম্বন্ধে বলাবলি করে - তার চাল-চলন নাকি ভালো নয়।

হবেও বা। কিন্তু কি দরকার তার এ সব দুর্ভাবনার। সে এই আবেষ্টন থেকে সরে যেতে চায়-যেখানে এসব ভাবনা তার দরকার হবে না

-যেখানে প্রতিদিন বাড়ীর দরজা দিয়ে বা'র হ'তে রুগ্ন অবিনাশের সঙ্গে দেখা হবে না।

লাঠিটায ভর ক'রে প্রতিদিন সকালে প্রৌঢ় অবিনাশ গলিটার মুখে পৈঠেটার ওপর গিয়ে বসে হাঁপায়। তার বেশী তার যাবার ক্ষমতা নেই।

কলেজে যাচ্ছ বুঝি অমল-ব'লে অবিনাশ কাশতে থাকে।

অমলের সত্যি এই রুগ্ন লোকটার পাশে দাঁড়াতে কেমন একটা অস্বস্তি হয়। কি রোগ তার কে জানে।

কিন্তু তবু তাকে দাঁড়াতে হয়।

অবিনাশ কাশি থামিয়ে বলে,-তোমার সেই ডাক্তারের কাছে আর ত নিয়ে গেলে না ভাই!

অমল একদিন তার দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে নিজে থেকেই এ প্রস্তাব করেছিল। তার পর আর সময় হয়নি।

অমল নিজের ত্রুটিটাকে চাপা দেবার জন্যেই বলে-আপনাকে নিয়ে গিয়ে লাভ কি বলুন, আপনি ত অত্যাচার ছাড়বেন না। অত কুপথ্যি করলে রোগ সারে।

কুপথ্যি, বল কি অমল! আমার মেয়েটা বুঝি লাগিয়েছে। – অবিনাশের কাশির বেগ অত্যন্ত বেড়ে ওঠে। অমলকে ধৈর্য্য ধ'রে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে অবিনাশ বলে – পথ্যিরই পয়সা জোটে না তা কুপথ্যি করব কোথা থেকে বল!

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, অমল জানে।

আচ্ছা এবার ঠিক নিয়ে যাব। বলে সে চলে যাবার উপক্রম করতেই অবিনাশ তার জামার প্রান্তটা নোংরা জীর্ণ আঙ্গুলে ধ'রে ফেলে।

একটু ভালো ওষুধ হ'লেই আমার এ রোগ সেরে যায়, প্রেসের চাকরীটা এখনো তাহ'লে করতে পারি। আমায় না হয় একটা হাসপাতালেই ব্যবস্থা ক'রে দাওনা ভাই।

হাসপাতালে কি সহজে যাকে তাকে নিতে চায়। – অমল জামার প্রান্তটা একরকম জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু অবিনাশ নাছোড়বান্দা। এবার গলা যথাসাধ্য নামিয়ে আসল প্রস্তাবটা সে ক'রে ফেলে, – চারটে খুচরো পয়সা তোমার কাছে হবে ভাই। আমি কালই দিয়ে দেব।

অমলের কাছে কলেজে যাবার ট্রাম ভাড়ার বেশী পয়সা সত্যিই থাকে না। পিসিমা সে দিকে অত্যন্ত সাবধানী। তবু অবিনাশের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই সে চারটে পয়সা তাড়াতাড়ি বা'র করে দেয়। হপ্তা খানেক অন্তত অবিনাশ আর তাহলে তাকে বিরক্ত করবে না সে জানে। এক হপ্তাই বা তার আর পরমায়ু।

রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ে অমলের মনে হয় বাস্তবিক কলে হাতটা ধুয়ে ফেল্লে হয়। পয়সা দেবার সময় অবিনাশের ঘর্ম্মাক্ত ভিজে ঠাণ্ডা হাতটার স্পর্শ লেগে কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ হ'তে থাকে।

কিন্তু অমলের হাত ধোয়াও হয় না। কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়। নিজের সম্বন্ধে কেমন একটা লজ্জা।

লরীতে সমস্ত মাল বোঝাই ক'রে অমলই সবার শেষে এ বাড়ী ছেড়ে যায়। পিসিমা আর সকলের সঙ্গে ঘর দোর গুছোবার জন্যে আগেই নতুন বাসায় গিয়ে উঠেছেন।

শেষ মালপত্র তুলে, বোঝাই করা লরীর ড্রাইভারের পাশের সীটে উঠে ব'সে সে হুকুম দেয়, 'চালাও'।

পিছন ফিরে আর সে তাকাতেও চায় না। এখানকার কোন ভাবনা তার মনে অস্বস্তি যেন না জাগায়, তার নতুন পাওয়া মুক্তির অনুভূতি যেন ক্ষুণ্ণ না করে।

আসবার সময় সকলের কাছে সে নেহাৎ আলগাভাবে বিদায় নিয়ে এসেছে।

সকলের সঙ্গে অবশ্য দেখা হয়নি। দিনের বেলাকার মুখোস খুলে গভীর রাত্রে যে মেয়েটি লুকিয়ে কাঁদে, সে তখন সম্ভবতঃ নিজের কাজের ধান্দাতেই বাড়ী ফেরেনি। শুধু রুগ্ন অবিনাশ মানা সত্ত্বেও জোর ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে গলির মুখ পর্যান্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে চার আনা পয়সা ধার চেয়ে নিয়েছে, ডাক্তার দেখাবার কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতেও ভোলেনি।

অমল কোন উত্তর দেয়নি। সত্য মিথ্যা কোন উত্তরই সে আর দিতে চায় না। এখানকার সঙ্গে সকল সম্পর্ক তার শেষ। এ আবেষ্টন থেকে সে মুক্তি পেয়েছে এইটুকু শুধু সে মনে রাখতে চায়।

এ ভাড়াটে বাড়ীর জীবনযাত্রা আবার এমনি ক'রেই চলবে সে জানে। তাদের খালি করা ঘরে আবার আর কোন দুঃস্থ পরিবার এসে কালই হয়ত আশ্রয় নেবে, কি দরকার এ সব ভাবনার – ভেবে সে কিছু করতে পারে!

লরীতে ষ্টার্ট দেওয়া হয়। সশব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে লরীটা যাত্রা করবার সঙ্গে সঙ্গে অমলের দৃষ্টি হঠাৎ আপনা থেকে রাস্তার ধারে গিয়ে পড়ে।

কাদামাখা বেড়াল ছানাটা কখন সেখানে ম'রে প'ড়ে আছে।'

|প্রকাশকাল: বর্ষ ১/সংখ্যা ৪ : ১৩৪৫|

মানুষ কাঁদে কেন

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[জন্ম ১৯০৮ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। বিজ্ঞানের ছাত্র. বাজি রেখে গল্প লিখে শেষে সাহিত্যকর্মই জীবিকা হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী ঔপন্যাসিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: পদ্মানদীর মাঝি, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, মাশুল, হলুদ পোড়া, উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ, ইত্যাদি. মৃত্যু ১৯৫৬ সালে।]

একদিনে ভূপেনের বৌ আর ছেলে মরিয়া গেল, কিন্তু ভূপেন কাঁদিল না। প্রথমে মরিল তার বৌ, কয়েক ঘন্টা পরে ছেলেটা।

ভূপেনের আর ছেলেমেয়ে নাই। বছর দু'য়েক বয়স হইয়াছিল ছেলেটার। মাসখানেক আগে তার টাইফয়েড হয়। ছেলের সামান্য কিছু হইলেই ভূপেনের বৌ বড় অস্থির হইয়া পড়িত। ভাবিয়া ভাবিয়া এবং কারও বারণ না মানিয়া দিনরাত ছেলের সেবা করিয়া সে বড়ই কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। আরও বড় একটা কারণও ছিল তার কাবু হইয়া পড়ার। মারা সে গেল সেই কারণটাতেই — মরা একটা মেয়েকে জন্ম দিতে গিয়া।

প্রথম মরণটা যখন ঘটে, ভূপেন আনমনে একটা সিগারেট ধরাইয়া মেয়েদের কান্নার শব্দ কানে আসা মাত্র আধপোড়া সিগারেটটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। ছেলের মরার সময়ও সে তেমনি আনমনে একটা সিগারেট ধরাইল এবং মেয়েদের কান্নার শব্দ নতুন আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠামাত্র আবার সিগারেটটা ফেলিয়া দিল।

বন্ধু ও প্রতিবেশী ভদ্রলোকেরা আসিয়াছিল। ভূপেনের বৌ মারা গেলে তারা ভাবিল, ছেলের ভাবনায় শোক মানুষটার চাপা পড়িয়া গিয়াছে, সে পরে কাঁদিবে, ছেলের একটা কিছু হইয়া গেলে। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর তারা ভাবিল, পর পর দু'টি দুর্ঘটনায় মানুষটার ধাঁধাঁ লাগিয়া গিয়াছে, থতমত ভাবটা কাটিয়া গেলেই সে পাগলের মত মাথা কপাল কুটিয়া কাঁদাকাটা করিতে থাকিবে।

কিন্তু অল্পে অল্পে সময় কাটিয়া গেল, দেহ দুটিকে শ্মশানে নেওয়ার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, ভূপেন কাঁদিল না। না কাঁদিলে যে সব পাগলামী করার রীতি আছে এ অবস্থায় সে রকম কোন পাগলামীও করিল না। কেবল মুখখানা তার দেখাইতে লাগিল অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ। কদিন দাড়ি কামায় নাই, স্নান হয় নাই দু'তিন দিন, ভূপেনের মুখখানা এমনিই শোকাতুর মানুষের মুখের মত হইয়া গিয়াছিল। সকলে তাই আরও বেশী অস্বস্তির সঙ্গে ভাবিতে লাগিল মুখে যার গভীর মর্মান্তিক শোকের এমন স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে সে কাঁদে না কেন?

দুটি মানুষ যে বাড়ীতে মারা গিয়াছে সদ্য সদ্য, সে বাড়ীতে অসাধারণ একটা অবস্থা সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক, সে জন্য কিছু আসিয়া যায় না, অস্বাভাবিক কিছু ঘটিলেই মানুষ পীড়া

সুখলাল বললো — যদি না কেনে?

মীমাংসা হয়েই যাচ্ছিল, সুখলালের প্রশ্নে আবার বিতণ্ডা শুরু হল।

সঞ্জয় উঠে দাঁড়িয়ে বললো — কিনতে বাধ্য হবে। লড়াই শুরু করে দাও। বট পাতা ছুঁয়ে সকলে কসম খাও।

সঞ্জয়ের কথার মধ্যে অদ্ভুত এক আশ্বাসের উদ্দীপনা ছিল। যেটুকু সংশয়েব মেঘ ছিল, সকলের প্রতিজ্ঞা আর উৎসাহের ঝড়ে তাও কেটে গেল! পুণ্য বাতাসে শিবালযের ঐ নিরেট বধিব বিগ্রহটা সত্যিই যেন জেগে উঠলো এত দিনে। বৈঠক শেষ হল।

রুক্মিণীর ঘরের কাছাকাছি এসে সঞ্জয় বললো — নেমিয়ার, তুমি এইবার যাও। আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। খুব ভাল করে অর্গানাইজ কর।

— বহুৎ আচ্ছা বাবুজী।

নেমিয়ার চলে গেলে সঞ্জয় অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এম-এ পাশ সঞ্জয় কাশমুন্সী হয়ে গেছে। তার অপমানিত প্রতিভা যেন ব্যর্থ রোযে ফণা নামিয়ে দিন গুণছিল। এইবাব ফিরে ছোবল দিতে হবে, যতখানি বিয ঢালতে পারা যায়।

অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে তার সমস্ত ভাবনাকে সংগ্রামেব সাজে সাজিয়ে তৈরী হল সঞ্জয়। রতনলাল মিলের চিমনিটা অস্পষ্ট দেখা যায়। ডাইনোসরের মত ঘাড় উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে চুবাশী পরগণাব বিস্তীর্ণ আখেব ক্ষেতের দিকে। ঐ দানবীয় চর্বির স্তূপের ভিতর কোথাও হৃৎপিণ্ড লুকিয়ে আছে, তা সঞ্জয়ের অজানা নয়. ঠিক সেখানেই তাক করে আঘাত দিতে হবে।

মন-ভরা উল্লাস নিয়ে সঞ্জয় রুক্মিণীর ঘরে ঢুকলো।

আদরেব বাড়াবাড়ি দেখে রুক্মিণী প্রশ্ন করে — বড় সস্তার সওদা পেয়েছ, না? তবুও একদিন তো ছেড়েই দেবে!

— সস্তা? আমাব কি দেবাব বাকী আছে? আর ছেড়েই বা দেব কেন?

রুক্মিণী যেন একটু অনুতপ্ত হয়ে হাত দিয়ে সঞ্জয়ের মুখ চেপে ধরে বললো — আচ্ছা' মাপ করো। আর বলবো না। তবে তুমি নিজেই সেদিন নেশার ঘোরে বলছিলে, আমি নাকি সরবতের গেলাস, সরবত নই!

সঞ্জয়েব প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই রুক্মিণী বললো — আমার কিছু থোক টাকা চাই। একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ তো আমার দিকে।

রুক্মিণী গায়েব আঁচলটা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো — বুঝেছ? আমার চলবে কি করে?

— হ্যাঁ বুঝেছি। সঞ্জয় গম্ভীর হয়ে গেল।

রতনলাল মিলের সমস্ত মেশিন বন্ধ। অতিকষ্টে দু'চার গাড়ি মাল যোগাড় হয়েছে। কলকাতার মার্কেটের অর্ডার মেটাবার শেষদিন এগিয়ে আসছে। রায়বাহাদুর প্রায় পাগল হয়ে সদরে এস্-ডি-ও'র বাংলোতে দৌড়াদৌড়ি করছেন।

চুরাশী পরগণার ফসল শুকোচ্ছে মাঠে মাঠে। এজেন্টরা গাড়ি আর টাকার তোড়া নিয়ে বস্তি বস্তি ঘুবে বেড়াচ্ছে! মাল ছাড়বে তো ছাড়। পাতা লাল হয়েছে কি এক আনাও দর দেব

না। কিষাণরা হেসে চুপ করে থাকে।

নেমিয়ার একেবারে উধাও হয়েছে। বাড়িতেও থাকে না, অফিসেও আসে না। দাঁড়কাকের মত সে দিনরাত চুরাশী পরগণার মাঠে ঘাটে বস্তিতে উড়ে বেড়ায়। -- খবরদার এজেন্টদের কথায় কেউ ঘাবড়িয়ো না। রতনলাল মিল ঠান্ডা হয়ে আসছে।

চুরাশী পরগণার ওপর শকুন উড়ছে ক'দিন থেকে! গো-মড়ক লেগেছে। মুনিরামের একটা ছেলেও মারা গেছে বসন্তে।

সাহুরা খেরোবাঁধা খাতা আর তমসুকের নথি নিয়ে দরজায় দরজায় হানা দিচ্ছে তাগাদার। একজন রিক্রুটার ত্রিশজন তুরীকে গেঁথে নিয়ে সরে পড়েছে মালয় ববার বাগানের জন্যে। জিতেন নগরের সড়কে গরুর গাড়ি লুঠ হয়েছে। মিলিটারী পুলিশ রুট মার্চ করে গেছে।

পঙ্গপালের মত করমপুরের গয়লারা এসেছে দলে দলে। মোষ কিনছে পাঁচ টাকায়, দুধেল গরু আট টাকায়, বাছুর বার আনা। সাহুরা চড়া সুদে রুপোর গয়না বন্ধক নিচ্ছে, পেতল কাঁসার বাসন বিকিয়ে যাচ্ছে মাটির দরে।

চুরাশী পরগণার ঘরে ঘরে সেদ্ধ হচ্ছে কোনার গাছের পাতা। ঘরে ঘরে দানা আনাজ নিঃশেষ।

এক মাস হতে চললো। রায়বাহাদুর এজেন্টদের গালাগালি দিয়েছেন। -- যেমন করে পার মাল নিয়ে এস। মার্কেটে আর ইজ্জৎ থাকে না' মেশিনে যে মরচে পড়ে গেল।

এস্-ডি-ও এসে মিল দেখে গেছেন। পেযাদা দিয়ে চুরাশী পরগণায় ঢোল পিটিয়ে দিয়েছেন। -- সব কোই হুশিয়ার হো যাও। ফসল ছাড়, একদিন মাত্র সময় দেওয়া গেল। নইলে কাল থেকেই লয়াবাদ পরগণা থেকে ফসল আনা হবে।

মুনিরাম আর সুখলাল এল সন্ধ্যাবেলা। ঘেয়োকুকুরের মত চেহারা। এখনও ভরসা জ্বলজ্বল করছে ওদের চোখে, হাত পেতে হুকুম চাইছে -- বাবুজী, এইবার কি করতে হবে হুকুম দাও।

সঞ্জয় বললো -- আর ক'টা দিন সবুর কর।

মুনিরাম আর সুখলাল চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। তাদের একটা কিছু বলবার হয়তো ছিল। বলা আর হল না।

ঘটনাগুলি কেমন ঘোরাল হয়ে আসছে। রায়বাহাদুর এখনও তাকে ডাকলো না, এই সঙ্কটে একটা পরামর্শের জন্য। আভাসে সঞ্জয় একদিন জানিয়েও ছিল -- যদি বলেন তো কিষাণদের আমি শান্ত করি।

এদিকে রুক্মিণী আবার এক কাঁটা গিলে বসে আছে। দুদিকেই একটা ব্যবস্থা এবার করা উচিত। কিন্তু নেমিয়ার ছাড়া কি করে কাজ হয়। কাজের বেলা লোকটা সত্যিই বড় সহায়।

নেমিয়ার এসে সামনে দাঁড়ালো।

কেরোসিনের বাতির ময়লা আলো। নোংরা খাকি প্যান্ট, ছেঁড়া কামিজ, পাখীর বাসার মত রুক্ষ চুলে ভরা মাথাটা। কেন্নো নেমিয়ার দাঁড়িয়ে আছে লোহার মূর্তির মত ঋজু ও কঠিন। গোত্রহীন মানুষের স্বরূপ দেখে আজ সঞ্জয় আঁতকে উঠেছে, বসে আছে মাথা নীচু করে।

নেমিয়ার চাইতে এসেছে মিলের ক্যাশঘরের চাবি। গিরগিটির মত চেটে নিয়ে আসবো যা কিছু ক্যাশ আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো। ফাইল রেজিস্টার ছাই হয়ে যাবে! তোমাকে

দায়ী করবে কি দিয়ে। কে বলবে কত ব্যালান্স ছিল? দাও, চাবি দাও।

সঞ্জয় ঘাড়টা একবার তুলে তাকালো বাইরের অন্ধকারের দিকে। আলোটা একটু উজ্জ্বল থাকলে দেখা যেত, দম্‌কা শিহরে তার হাঁটু দুটো থরথর করে উঠলো।

নেমিয়ার যেন ভয়ঙ্কর অর্থহীন এক ব্যালাড গাইছে — চুরাশী পরগণার রসদ চাই। তারপর দেখবো, লয়াবাসের সড়ক দিয়ে কোন্ মরদকা বাচ্চা বাইরের মাল আনতে পারে। কেউ বেচবে না ফসল, ক্ষেতে ক্ষেতে শুকিয়ে যাবে, পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে। কিষাণেরা সব কসম খেয়েছে। আজ রাত্রে লাঠি মাজা হচ্ছে ঘরে ঘরে। সব তো গেছে, কিন্তু রতনলাল মিলকে দেখে নেবে তারা। মাথা দেবে, মাথা নেবে।

বসন্তে ক্ষতাক্ত মুখ, গোল গোল চোখ, বেঁটে রোগা ঘুঁটে রঙের চেহারা নেমিয়ারের, যাকে চড়ুই পাখীও ভয় পায় না, সে-ই এসে দাঁড়িয়েছে সঞ্জয়ের সুমুখে, অতি আসন্ন এক বিপ্লবের ফরমান হাতে নিয়ে।

নেতিয়ে পড়েছে সঞ্জয়। নেমিয়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো -- অত ভাবনা কিসের কমরেড দাদা। তোমার কিষাণ ফৌজকে খেতে হবে তো। দাও, আর দেরী করো না।

ক্যাশঘরের চাবির তোড়া নিয়ে নেমিয়ার অন্ধকারে পিছলে সরে পড়লো।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো অনেকক্ষণ পায়চারি করে সঞ্জয় এসে দাঁড়ালো ঘরের বাইরে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পেতে। একটা সামান্য দলাদলির এ রুদ্র পরিণাম সে কল্পনা করতে পারেনি। সার্কাস দেখাবার জন্যে যে সিংহকে খাঁচার বাইরে আনা হয়েছে, একটু সামান্য খোঁচা দিতেই সেটা যে বুনো হাঁক ছেড়ে অবাধ্য হয়ে উঠবে, কে এতটা ভেবেছিল?

— নেমিয়ার! অন্ধকারে সঞ্জয়ের ভাঙা গলা কেঁপে উঠলো।

দৌড় দিল সঞ্জয়।

রুক্মিণীর ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে মৃদু আলোর সঙ্গে তারযন্ত্রের বিলাপের মতো একটা স্বর ঠিকরে এসে পড়েছে। সঞ্জয় দম বন্ধ করে জানালার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেঝের ওপর লুটোচ্ছে রুক্মিণী। শাড়ীর ভার খসে গিয়ে কোমরে শুধু গেরোটা লেগে আছে। খোঁপাটা মাটিতে ঘষা খেয়ে খেয়ে নোংরা হয়ে গেছে। কাঁচের চুড়িগুলো ভেঙে ছড়িয়ে রয়েছে এদিক ওদিক। আহত নাগিনীর মতো রুক্মিণী যেন কোমর ভেঙে অবশভাবে পড়ে আছে। শুধু এপাশে ওপাশে মোচড় দিয়ে কাতরাচ্ছে।

রুক্মিণীর প্রাণবায়ু যেন করাল ঝঞ্ঝার মতো সমস্ত শরীরে একবার গুমরে উঠলো। এমন অবস্থায় অনেকে তো মারা যায়। রুক্মিণীর কপালেও কি তাই আছে?

অনাবৃত মসৃণ হাঁটুর ওপর অতি পরিচিত সেই নীল শিরার আঁকা-বাঁকা রেখাগুলি, জোঁকের মতো ফুলে উঠেছে। ঠোঁটের ওপর দাঁতের পাটি চেপে বসে গেছে। চোখের কোণ থেকে তোড়ে তোড়ে জল গড়িয়ে পড়ছে কান ভাসিয়ে। চাপা আর্তস্বর পর্দায় পর্দায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। ফুসফুসটা ফেটে যায় বুঝি। এই কি মৃত্যু?

কী নিষ্ঠুর বিভ্রম। সমস্ত যন্ত্রণা ধন্য করে কপট মৃত্যুর আড়ালে এক নবজীবনের রক্তবীজ পৃথিবীর মাটিতে হাত বাড়িয়েছে। সঞ্জয় এক লাফে পিছনে এসে গাছের নিচে দাঁড়ালো!

নেমিয়ার কোথায়? সঞ্জয় এগিয়ে যায়, নেমিয়ারের ঘরের দরজার ফাঁকে উঁকি দেয়।

কালো প্যান্ট পরে, কোমরে একটা চওড়া বেল্ট কষে নেমিয়ার বসে বসে চিবোচ্ছে বাসি রুটি। হাঁড়ি থেকে ঢেলে পচাই খাচ্ছে এক-এক চুমুক। একটা ধারালো ভোজালি সামনে রাখা। মুখে অদ্ভুত এক প্রসন্নতা; শুকনো ঠোঁট দুটো নেকড়ের ঠোঁটের মতো হাসছে।

এ-ঘরে ভাই, ও-ঘরে বোন। পুরাকল্পের বর্বর পৃথিবীর দু'জন কুপিত ডাইন ও ডাইনী যেন তুক্ করে সর্বনাশের আহ্বান করছে!

নদীতে বান ডাকে, ভয়াল তোড় আসে, গর্জন করে। জেলে তার যথাসর্বস্ব ঘাড়ে তুলে দৌড় দেয়। সঞ্জয় দৌড় দিল। সড়ক না ধরে, মাঠের ঢালু খাড়াই খাদ গর্ত ডিঙিয়ে সঞ্জয় দৌড়তে থাকে। মিল ফটকের আলোটা ঘোলাটে আলেয়ার মতো কুয়াশায় দপ-দপ-দপ করছে। আর বেশি দূর নয়।

মকতপুরই বা কতদূর? আজ শেষরাত্রে ট্রেন ধরলে কাল বিকালে পৌঁছে যাবে। শিরিষ গাছে হয়তো সুঁটি পেকেছে। সোনালী বৈকালে হাল্কা বাতাসে মোটা ঘুঙুরের মতো শব্দ করে বাজে। বড়দা বারান্দায় বসে গুড়ের তৈরী চা খান। মা উঠোনে বসে লক্ষ্মীর পিঁড়ি ধুতে থাকেন। পুতুল আকাশে আঙুল তুলে শঙ্খচিলের ঝাঁক গোনে — এক দুই তিন। সুমিত্রা, হয়তো তার বিয়ে হয়নি। তার শবরীদৃষ্টি ঘুরে বেড়ায় মকতপুরের বাড়ির জানালায় — পথে — আগন্তুক মোটরবাসের দিকে।

রায়বাহাদুর রতনলাল, সূর্যবাবু, মুনিবজী — সামনে টুলের ওপর বসে আছে সঞ্জয় — বিশীর্ণ রোগীর মতো। ভাঙা কাঁসরের মতো গলার আওয়াজ। এক গেলাস গরম দুধ সঞ্জয়কে খেতে দেওয়া হয়েছে।

রায়বাহাদুর ডাকলেন — শঙ্কর পালোয়ান, ক্যাশঘরে পাহারা বসাও। নেমিয়ার বাবুজীকে ছুরি দেখিয়ে চাবি নিয়ে গেছে। আজ রাতেই চুরি করতে আসবে। চোট্টা শালাকে ধরে কাঁচা খেয়ে ফেলতে হবে।

রায়বাহাদুর এবার মুনিবজীকে হুকুম দিলেন — বাবুজী স্টেশনে যাবেন। এখনই একটা ভাল ঘোড়ায় গদি চড়িয়ে দাও। আর আমার সিন্দুক খোল, বকশিশ দিতে হবে। বড় ইমানদার ছেলে!

বকশিশের পঞ্চাশটা টাকা হাতে নিয়ে আর আদাব জানিয়ে সঞ্জয় উঠলো। রায়বাহাদুর বললেন — কটা দিন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর। তারপর এসো আমার গোরখপুর মিলে — শও রুপেয়া তন্‌খা।

রামখড়ির রেঞ্জের গায়ে সরু জংলী পথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সঞ্জয়। আকাশের বুকটা লাল হয়ে গেছে। কিষাণেরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে নিজের নিজের ক্ষেতে। যেন পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হচ্ছে চুরাশী পরগণা।

সামনের মাঠটা পার হলেই স্টেশন, ডিস্টান্ট সিগনালের আলোটা নীল তারার মতো ভেসে রয়েছে। ছপ্ করে একটা শব্দ। ঘোড়াটা একটা স্রোতে পা দিয়েছে।

সঞ্জয় ঘোড়া থেকে নেমে স্রোতের ধারে বসে আঁজলা ভরে জল খেল। গেরস্থের মুর্গি চুরি করে একটা শেয়াল ভেজা বালির ওপর বসে গোঁপের রক্ত চাটছিল। সেও জল খাবার জন্য স্রোতে মুখ নামালো।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৩/ সংখ্যা ৪: ১৩৪৭]

বরমলাগের মাঠ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[জন্ম ১৮৯৮ সালে বীরভূমের লাভপুর গ্রামে। বাংলায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: গণদেবতা, আরোগ্য নিকেতন, কবি, দুই পুরুষ, রসকলি, বেদেনী, ইত্যাদি। জ্ঞানপীঠ, একাদেমী ও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত। মৃত্যু: ১৯৭১ সালে।]

বিংশশতাব্দীর অর্দ্ধেক শেষ হয়ে এল; মানুষের জীবনবাদের সুখনীড় দেউলে-পড়া বনিয়াদী ধনীর দালানের মত ফাটলে ভরে গিয়েছে, পলেস্তারা-খসা ইটের গাঁথুনির মসলার মধ্যে বট অশথের চারা শিকড় চালিয়ে দস্তুর মত মোটা হয়ে উঠেছে, বনেদের তলায়-তলায় ইঁদুরে সুড়ঙ্গ কেটে ধবসে পড়ার পথ সুগম করেছে। লক্ষ্মীর কাঠের সিংহাসনে উই ধরেছে, গৃহদেবতা মানুষের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে রক্ষণাবেক্ষণে অক্ষমতা জানিয়ে প্রায় পুতুলে পরিণত হয়েছেন। অনেকে এখনও এই সব ঘরকেই মেরামত করবার জন্য মাল-মসলা প্রয়োগ করে চলেছে, অনেকে নতুন ঘর গড়বার জন্য উৎসুক, তারা ঘরখানা আপনি ভেঙে পড়বে এই প্রত্যাশায় আছে। কিন্তু আদালত এলাকায় গেলে এ সব কথা ভুলে যেতে হয়। সেখানে গেলে দেখা যায় দেবতা বসে আছেন সনাতন রূপে। আইনের ঘরে এক চুল ফাটল দেখা যায় না; সেখানে ঢুকলেই মনে হয় -- 'যাবৎ চন্দ্রার্ক মেদিনী' -- অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য মেদিনী যতকাল থাকবে ততকাল এও থাকবে অক্ষয়। ভাঙা ঘরের মানুষেরা তা সে যে দলেরই হোক -- এখানে ঢুকলেই বদলে যায়। যারা ভাঙা ঘর মেরামতে বিশ্বাসী তারা বুকে বল পায়, যারা ঘর ভেঙে পড়লে বাঁচা যাবে মনে করে তারা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, ভড়কে যায়, অনেক ক্ষেত্রে পুরানো ঘরের লক্ষ্মীর উই-ধরা কাঠের সিংহাসনের উই ঝেড়ে তাতে বার্ণিশ মাখাবার জন্য বার্ণিশও সংগ্রহ করে ফেলে।

শিবনাথ শেষের দলের মানুষ, আদালতে এসেছিল নেহাৎ দায়ে পড়ে, ফৌজদারী মামলার সাক্ষীর শমন পেয়ে। না-এলে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বার হবার কথা। সাক্ষী দিয়ে ফিরবার মুখে দেওয়ানী আদালতের দরজার মুখে এসে ভিড় দেখে দাঁড়াল। সেখানে চলছিল নিলাম। ওই লক্ষ্মীর সিংহাসনে দেবার বার্ণিশ অথবা রঙ যাই বলা যাক না কেন -- তাই নীলাম হচ্ছিল। একের পর এক ডাকের উপর ডাক চড়ছে -- ঘন্টা পড়ছে। সিকি-টাকা দাখিল হচ্ছে। বাকী খাজনায় জোত নিলাম হচ্ছিল। হঠাৎ কানে এল এত নম্বর লাটের অমুক মৌজার রায়তিস্থিতিবান জোত -- এত একর এত ডেসিমল জমি -- খাজনা এত টাকা, ডিক্রীদার জমিদার অমুক, দেনাদার অমুক, দাবী একশত কয়েক টাকা কয়েক আনা কয়েক পাই। ডাক আরম্ভ হয়ে গেল। জমিদার ডাকলেন তাঁর দাবী ভোর, অর্থাৎ তাঁর দাবী পর্য্যন্ত। শিবনাথের কি হয়ে গেল। মৌজাটা তার গ্রামের বাড়ীর কাছেই, মৌজাটির জমির উর্ব্বরতা সম্বন্ধে খ্যাতি আছে এবং জমির পরিমাণের অনুপাতে খাজনা নিতান্তই কম। সে নতুন জীবনবাদে বিশ্বাসী, সে বিশ্বাস

করে লাঙল যার জমি তার হওয়াই উচিত, এবং নিজে সে কখনও লাঙল ধরবে না এও সে জানে, তবু কি যে হ'ল তার, জমিটা নীলামে সে ডেকে ফেললে। লাট কাষ্টগড়ায় মৌজা গোপেরগ্রামে বরমলাগের মাঠে -- বারোশো পঁচিশ টাকায় আঠারো বিঘা জমি, খাজনা মাত্র দশ টাকা। বার্ণিশের কোয়ালিটি ভাল, পরিমাণে অনেকটা, দামেও খুব সস্তা;লোভ সে সামলাতে পারলে না।

জমিদার শিবনাথের বন্ধু। তিনি হেসে বললেন, "তুমি বলেই ছেড়ে দিলাম আমি। নইলে --।" অর্থপূর্ণ হাসি হেসে কথাটা অসমাপ্তই রেখে দিলেন ওই আদালতের জনতার মধ্যে। তিনিই তাঁকে সাহায্য করলেন সিকি-টাকা দাখিল করা, রসিদ নেওয়া ইত্যাদি করণীয় কাজে। পেশকার থেকে পিওন পর্য্যন্ত এসে হাত পেতে দাঁড়ালে তাদের দাবীর সঙ্গে শিবনাথের সামর্থ্যের একটা রফাও করে দিলেন। বেরিয়ে এসে বললেন -- "ওটা আমি খাস করব বলে অনেক তদ্বির ক'রে নীলামের ব্যবস্থা করেছিলাম। পশু পক্ষীতে জানে না নীলামের কথা। নইলে যুদ্ধের বাজারে দশটাকা মণ ধান বেচে চাষা বেটারা হয়ে উঠেছে টাকার কুমীর। জমির নামে বেটাদের লঘুগুরু জ্ঞান লোপ পায়, হরিণ দেখে বাঘের জিভে জল পড়ার মত বেটাদেব জিভে জল সরতে থাকে। ঠোঁট চাটে আর ডাক বাড়িয়ে চলে। এক এক ডাকে আমরা উঠি পাঁচ টাকা ওরা উঠে অন্ততঃ পঁচিশ টাকা। যাক -- এখন বাকী টাকাটা দাখিল করে দিয়ো। দেনাদার নাবালক, দেশ থেকেও পালিয়েছে -- টাকা দাখিল হবার কোন ভয় নাই; সময়ে দখল নিয়ো। জমিতে হাজা শুকো নাই। আমাকে কিন্তু খারিজ ফি-টা দিয়ো ভাই। আইনে অবিশ্যি উঠে গিয়েছে কিন্তু ওটা আমাদের ধর্ম্মত ন্যায়ত প্রাপ্য। সিকি আমি চাইব না তোমার কাছে, টাকাতে দু আনা, মানে পঞ্চাশটা টাকা আর গোমস্তাকে কিছু, নন্দীর কিছু, মানে গোটা পাঁচেক আর নায়েবকে গোটা পাঁচেক। আর ভাই একটা খাসী। আমি অবিশ্যি একা খাব না। তোমাদের পাঁচ জনকে নিয়ে বুঝেছ --"। মিষ্ট হাসি হেসে পিঠ চাপড়ে সমাদর করে জমিদার বিদায় নিলেন।

জমিদার লোভের পরিচয় অবশ্যই দিয়েছিলেন কিন্তু মিথ্যে কথা বলেন নি। যথা-সময়ে যথা-নিয়মে বিনা বাধায় জমি দখল হয়ে গেল। শ্বেতকায় মানুষদেব সমুদ্রের মধ্যে জনহীন দ্বীপ জয় করার মতই ঢোল বাজল, পতাকা পোঁতা হল, কিন্তু বাধাও কেউ দিলে না, পরাধীনতার বেদনাতেও কেউ কাঁদল না। শুধু গাঁয়ের চাষারা হুঁকো হাতে করে গাঁয়ের ধারের তেঁতুল তলায় এসে দেখলে। কানে একবার আঙুল দিলে মাত্র, কারণ নীলামেব ঢোলের বাদ্য অশুভ, ও শুনতে নাই। শিবনাথ নিজে যায় নাই এ ক্ষেত্রে, সে বাড়ীতে খানিকটা উদ্বেগ নিয়ে বসে ছিল, খবরটা পেয়ে সে নিশ্চিত হ'ল। যাদের জমি তারা সত্যই দেশত্যাগী। দখলের পরওয়ানা নিয়ে ধর্ম্মাধিকরণের যে পিওন এসেছিল সে দাবী করলে অন্ততঃ একটাকা বকশিস তাকে দিতেই হবে;শিবনাথ তাকে খুসী হয়ে দু'টাকা দিয়ে দিলে।

একা বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সোস্যালিজিম্ সম্বন্ধে চার্চ্চিল সাহেবের একটা মন্তব্য তার মনে পড়ে গেল। "The brute fact is that socialism means mismanagement,

bad house keeping, incompetence and progressive degeneration." লোকটার মত এমন সুন্দর দুর্ম্মুখ বোধ করি পৃথিবীতে আজও জন্মায় নি। রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে কাব্য রচনা করে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করেছেন, সীতারামের বিরহ নিয়ে বাল্মিকী লিখেছেন অমর কাব্য;কিন্তু জটিলা কুটিলা কি সূর্পনখাকে নিয়ে যদি চার্চ্চিল কাব্য লেখে তবে সে কাব্য সাহিত্যগুণে ভাগবত রামায়ণ বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে সমান আসন পাবে বলেই শিবনাথের দৃঢ় ধারণা হ'ল।

— বাবু মাশায়!

নারী কণ্ঠের আহবান শুনে সচকিত হয়ে উঠল শিবনাথ। -- কে?

-- আজ্ঞে মাশায আমরা।

দুটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। একজন অবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া — অপরজন অবগুণ্ঠন হীনা যুবতী। বহুদিন দেশছাড়া হ'লেও শিবনাথের চিনতে দেরী হ'ল না -- হাড়ি বাউড়ী ডোম কাহার জাতির মেয়ে দুটি। মাথায় দুধের বড় ঘটি, একজনের হাতে একটি লাউ অপবেব হাতে একটি 'খাড়ুই' অর্থাৎ মাছের ছোট চুবড়ী।

-- কি?

একটি দুধভরা ঘটি, লাউ, মাছের চুপড়ীটি নামিয়ে দিয়ে যুবতীটি কাপড়ের আঁচল খুলে ঢেলে দিলে একবাশি চাঁপানটের শাক। বললে - বাবা পাঠিয়ে দিয়েছে। মা আর আমাকে বললে মনিবকে দিয়ে আয় গিয়ে -- আর করে ঘরে আয়। সে আসবে --

-- কে তোমার বাবা? এ সব আমায় কেন পাঠালে সে?

মেয়েটি হাসলে। সলজ্জ ভাবে বললে -- আমার বাবার নাম বলবাম আপনি আমাদের লো — তুন মনিব হলা কি না তাই পাঠিয়েছে।

বিব্রত হল শিবনাথ। কি বিপদ! হঠাৎ বলবাম বাউড়ীব সঙ্গে তার সম্বন্ধ কেমন ক'রে গজিয়ে উঠল সে বুঝতে পারলে না। সে বললে তোমাদের বোধ হয় ভুল হচ্ছে —

অবগুণ্ঠনবতী বার বার ঘাড় নেড়ে উঠল, তাব অর্থ না না না। ভুল নয়।

মেয়েটি স্পষ্ট করে বললে -- না ভুল কেন হবে মাশায়? আপনাকে কি আমি চিনি না? আপনি কলকাতাতে থাক। এবারে লো -- তুন জমি কিনেছ। সেই জমিব দখল লেবাব জন্যে আইচ এখানে। বাড়ীতে মেয়া ছেলা কেউ নাই। আপনার নাম তো মুখে আনতে পারি না, লইলে তাও বলে দিতাম সে মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল।

শিবনাথ কি বলবে ভেবে পেলে না।

অবগুণ্ঠনবতী ফিসফিস করে বললে যুবতীটিকে, ফিস্‌ফিস্ করে বললেও শিবনাথ সে কথা শুনতে পেলে, বললে -- আমি দুধ দিয়ে আসি, তু মনিবের ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে মাছ বেছে দে।

মেয়েটি বললে -- হোক!

শিবনাথ ব্যস্ত হয়ে বললে -- না না না। ওসব তোমরা নিয়ে যাও। ওতে আমার দরকার নাই। ও নিয়ে আমি করব কি?

সে কথার তারা কেউ কর্ণপাত করলে না, অবগুণ্ঠনবতী মেয়েটি চলে গেল, মেয়েটি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। শিবনাথের কথার জবাব দিলে সেই, বললে -- সেবা করবেন আপুনি। ঘরের খাঁটি দুধ এক ফোঁটা জল দিই নাই। ক্ষীর করে খাবা। কচিলাউয়ের তরকারী খেলে জিউটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, মাগুর মাছ যুত করে 'আন্না' (রান্না) করলে পাঁঠার মাসের (মাংসের) চেয়েও ভাল লাগবে। চাঁপলটের শাকও খেতে খুব ভাল।

-- কি বিপদ! ভাল তো বুঝলাম। কিন্তু রাঁধবে কে আমার?

মেয়েটি খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বললে -- আমরা তো ছোটলোক মাশায়, নইলে না হয় এঁদেও (রেঁধেও) দিয়ে যেতাম। তা খাও যদি তো বলেন।

শিবনাথের কপালে সারি সারি কুঞ্চন রেখা দেখা দিল। মেয়েটির কথা, হাসি, অঙ্গ-হিল্লোল ক্রমশ যেন বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত মুখর এবং চঞ্চল হয়ে উঠছে।

শিবনাথ ভাবছিল এ আপদকে অবিলম্বে কেমন করে বিদায় করা যায়। আট দশ বছর যাবৎ বিদেশবাসী হলেও এই শ্রেণীর নরনারীর প্রকৃতি ও পরিচয় তার অজানা নয়। এরা সব পারে। সম্পদশালী উচ্চবর্ণের মানুষের চারি পাশে এরা মাছির মত উড়ে বেড়ায়। মনের মধ্যে দুর্ব্বলতার ক্ষত আবিষ্কার করতে এবং সেখানে ব'সে বিষ সঞ্চারিত করে দিতে ওই মাছির মতই এদের পটুত্ব এবং প্রবৃত্তি অসাধারণ এবং স্বাভাবিক। জীবনে স্বভাব ছাড়া শিক্ষা-দীক্ষা নাই, সুতরাং উপদেশে ফল হয় না; মাছিকে যেমন তাড়ানো ছাড়া উপায় নাই তেমনি এদের না তাড়িয়ে এদের হাত থেকেও পরিত্রাণ নাই। শিবনাথ বললে -- আচ্ছা, থাকুক ওগুলো. তুমি যাও।

মেয়েটি হেসে বললে -- দুধের সাথে ঘটিটা শুদ্ধ লেবা নাকি মাশায়?

শিবনাথ উঠল, নিজেই ঘটির দুধটা অন্যপাত্রে ঢেলে নিয়ে ঘটিটা নামিয়ে দিলে।

মেয়েটি এবার বললে -- ঝাঁটা কই মাশায় আপনার।

-- ঝাঁটা কি হবে?

মেয়েটি বললে -- ঘর দুয়ারটা ঝাঁট দিয়ে সাফ করে দিয়ে যাই।

কি বিপদ! শিবনাথ বিরক্ত হয়ে বললে -- ঝাঁটার দরকার নাই। তুমি যাও।

-- তাড়িয়ে দিচ্ছ মাশায়?

শিবনাথ মুখ তুলে তাকালে। চোখে চোখ পড়তেই সে খিল খিল করে হেসে উঠে বললে -- তা তাড়িয়ে যদি দেবা তবে না হয় ঝাঁটা মেরেই দিয়ো, এখন ঝাঁটা কোথা তাই বল। মেয়েটা নিজেই খুঁজতে লাগল এবং অনতিবিলম্বে ঝাঁটাগাছটা আবিষ্কার করে খস খস শব্দে বাড়ীটার একপ্রান্ত থেকে ঝাঁটা বুলাতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

শিবনাথ রূঢ় কণ্ঠে বললে -- শুনছ! কি নাম তোমার?

মেয়েটি বললে -- 'ময়না'। ব্যাস, তারপর সে ঝাঁটা টেনেই চলল, শিবনাথ আর কি বলছে সে কথা শুনবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলে না। তার ক্ষিপ্র এবং সবল টানে ঝাঁটার মুখে ধূলো উড়ে সমস্ত বাড়ীটাতে যেন কাল-বোশেখীর ঝড় তুলে ফেললে। বহুকাল, আজ

ন-দশ বৎসর ধরে বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে কেউ বাস করে না, মধ্যে মধ্যে দশ পনের দিনের জন্য কি মাসখানেকের জন্য মেয়েছেলে আসে কিন্তু এমন ভাবে পরিমার্জ্জনা করবার প্রয়োজনই কখনও তারা অনুভব করে নি। মেয়েটি বাড়ীর একপ্রান্ত থেকে আরম্ভ করেছে, খানিকটা ঝাঁটা বুলিয়ে টানতেই ধূলোর এক একটি ছোট খাটো স্তূপ হয়ে উঠছে, সে স্তূপটিকে সেইখানে ছেড়ে আবার টেনে চলছে। মেয়েটার চেহারা হয়েছে অদ্ভুত, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত ধূলোর একটা লেপন পড়ে গেছে। মেয়েটা কি পাগল না কি?

ঠিক এই সময়েই এসে উপস্থিত হল সেই অবগুণ্ঠনবতী, মেয়েটির মা। তেমনিই যেমন বলেছিল মেয়েটি। আর তাই-ই হবে। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা থাকলেও খাটো কাপড়ে হাত পা ভালো ক'রে ঢাকা পড়ে নাই। কালো চামড়ার উপর বয়সের মালিন্য এবং কুঞ্চন এখন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। সেও এসে দুধের খালি ঘটি নামিয়ে লেগে গেল মেয়ের সঙ্গে শিবনাথের ঘরের পরিচর্য্যায়। একটা ঝুড়ি খুঁজে এনে স্তূপীকৃত ধূলো ময়লা মাথায় ক'রে বাইরে ফেলে এসে বললে -- ঘর হ'ল লক্ষীর আটন। সেই ঘরের দশা এমুনি করে রেখেছেন মাশায়? আজ আব হ'ল না, কাল এসে জল দিয়ে ধুয়ে, নিকিয়ে চুকিয়ে দিয়ে যাব। আসি আমি, হাত পা ধুয়ে আসি।

শিবনাথের বাড়ীর পাশেই পুকুর। পুকুর না, গড়ে। পানায় ভরা পচা জলের ডোবা একটা। মা ও মেয়েতে তার খবরও রাখে। শিবনাথ অবশ্য বিস্মিত হল না এতে। গ্রাম গ্রামান্তরের পুকুরে মাছ গুগলি ঝিনুক সংগ্রহ করে এরা; পুকুরের পাড়ের উপর থেকে জঙ্গল কেটে জ্বালানীর বোঝা মাথায় বয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং শিবনাথের বাড়ীর পাশে পুকুরের অস্তিত্ব ওদের গোচর থাকায় আশ্চর্য্য হবার কি আছে! কিন্তু এই যে, অযাচিত সেবা, এর অর্থ কি? জমিটার সঙ্গে যে কিছু সংশ্রব আছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি সে সংশ্রব? দিনকাল খারাপ -- মেয়েটার বাপ কি প্রজাস্বত্ব দাবী করছে না কি? কোর্ফা বন্দোবস্ত গোছের কোন একটা কিছু --! চিন্তিত হ'ল শিবনাথ!

মা ও মেয়েতে মুখ ধোয়ার বদলে স্নান করে এসে দাঁড়াল। শিবনাথ চমকে উঠল।-- একি তোরা চান করলি এই গড়েতে?

গা সুঙসুঙ করছিল মাশায়। চানই করলাম।

-- সর্ব্বনাশ! এই পচা জলে?

-- কিছু হবে না মাশায় আমাদের। ওতে আমাদের কিছু হয় না। মেয়েটার মা ঘোমটার মধ্যে থেকে ফিস্ ফিস্ করে বললে।

মা ঘটিগুলি তুলে নিলে, মেয়েটি একটি প্রণাম করে সামনে উপু হয়ে বসে বললে -- মুনিবানকে নিয়ে আসেন মাশায়। আমাদের মুনিবান খুব সোন্দর -- লয় মাশায়? মেয়েটা নির্লজ্জার মত হাসতে লাগল।

মেয়েটির মা এবার প্রণাম করে আবার সেই দীর্ঘ ঘোমটার মধ্য থেকে সুস্পষ্ট ফিস-ফিস শব্দে বললে -- ময়নার বাবা আসবে আপনকার চরণে পেনাম করতে।

ময়নার বাবা এসে প্রণাম করলে শিবনাথের চরণে। চমকে উঠল শিবনাথ সন্ধ্যার অন্ধকারে তাকে দেখে। বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছিল শিবনাথ। বাড়ীর দরজায় একপাশে পথের ধূলোর উপরেই বসেছিল সে। উবু হয়ে বসে হাঁটুর উপরে হাত দুটিকে ভেঁজে রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে কিছু ভাবছিল হয় তো। প্রচুর ধেনো মদের গন্ধ থেকেই শিবনাথ তার অস্তিত্ব অনুভব করলে। নইলে কালো কাপড় এবং দেহবর্ণ অন্ধকারের সঙ্গে এমন মিশে গিয়েছিল এবং এমন স্থির হয়ে সে বসেছিল যে তাকে কোন জড় বস্তু বলে উপেক্ষা করাই ছিল স্বাভাবিক। মদের গন্ধে শিবনাথ নাক সিঁটকে চারিদিক চেয়ে দেখতেই তার নজরে পড়ল লোকটা। প্রথমটা মনে হ'ল কেউ বোধ হয় মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। বিরক্ত হয়ে সে রুক্ষ ভাষায় প্রশ্ন করলে -- কে? কে ওখানে?

সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা কালো পাথরে গড়া মূর্ত্তি যেন উঠে দাঁড়াল। কিম্বা মাটির বুক চিরে কোন গুহাবাসী মানুষের কঙ্কাল রক্তমাংসে সজীব হয়ে উঠে এল। অন্ধকারের মধ্যেও তাকে খুব অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল না। খর্ব্বাকৃতি মানুষটি; কিন্তু কাঁধ বুক-হাত স্থূল কঠিন এবং তার মধ্যে একটা প্রচণ্ডতা আছে। শিবনাথ চমকে উঠল -- প্রশ্ন করলে -- কে?

মোটা গলায় সে উত্তর দিলে -- আজ্ঞেন -- আমি বলরাম মাশায়!

সঙ্গে সঙ্গে সে ভূমিষ্ঠ হয়ে শিবনাথের চরণে প্রণত হল। প্রণাম সেরে -- মুখটি ঈষৎ তুলে বললে -- ছোঁব আজ্ঞে? চরণের ধূলো লোব?

শিবনাথ এবার টর্চটা বের করে জ্বাললে। তার আরক্ত চোখ দুটি সঙ্কুচিত হয়ে এল। মুখ সরিয়ে নিয়ে সবিনয়ে হেসে বললে -- ওরে বাপরে। ওটা 'ফুটায়েন না' (জ্বালবেন না) মাশায়!

শিবনাথ মুগ্ধ হয়েছিল তাকে দেখে। হ্যাঁ মুগ্ধই হয়েছিল। দৃষ্টির মধ্যে যে ভঙ্গি এবং সন্ধান থাকলে সকল রূপের মধ্য থেকে অপরূপকে আবিষ্কার করা যায় -- তা তার ছিল। সে সবিস্ময়ে বললে -- তুমিই বলরাম!

একমুখ হেসে সে সবিনয়ে আবার বললে -- আজ্ঞেন হ্যাঁ। আমিই বলরাম মাশায়।

-- তুমিই বলরাম মাশায়? তা তুমি মহাশয় বটে।

বলরাম এবার লজ্জিত হ'ল। সে বুঝতে পারলে তার উক্তির ত্রুটি এবং মনিবের উক্তির রসিকতা। সলজ্জভাবে বললে -- 'আজ্ঞেন না -- আপনাকেই মাশায় বললাম মাশায়।' তারপর, নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বললে -- 'আমরা আপনাদের চি-চরণের দাস। আপনাদের দৌলতে আমাদের 'জেবন'।'

কথাগুলির মধ্যে, কণ্ঠস্বরের মধ্যে এতটুকু স্তাবকতার ভঙ্গি নেই, কৃত্রিমতার রেশ নেই, কপটতার ছাপ নাই। কথা শেষ করে সে উঠে খানিকটা সরে গিয়ে দাঁড়াল -- এতক্ষণে তার প্রণামপর্ব্ব শেষ হ'ল।

শিবনাথ বললে -- 'এস'। ভেতরে এস'। সে উৎকণ্ঠিত হয়েছিল, বলরামের বক্তব্য শুনবার জন্য। কি চায় সে? এ দেশের ভক্তির কথা তার অজানা নয়, এই দেশেরই মানুষ সে। কিন্তু তবু এতখানি ভক্তির আতিশয্য তার কাছে অস্বাভাবিক বলে বোধ হচ্ছিল। এর অন্তরালে অন্ধকার-নিঃশব্দগতি শীতলস্পর্শ সরীসৃপের পাকের মত ভক্তির একটা জটিল বেষ্টনী রচিত

হচ্ছে তার চারিদিকে বলে তার সন্দেহ হচ্ছিল। মুক্ত নির্বিকার যে ভগবান তিনিও নাকি ভক্তি ডোরে এমন বাঁধনে বাঁধা পড়েন যে, তাঁর অক্ষয় ভাণ্ডারের কিছুখানি ক্ষয় না করে পরিত্রাণ পান না।

পরিপূর্ণ আলোয় শিবনাথ তাকে দেখে আরও বিস্মিত হ'ল। লোকটি যেন একটা পুরাকালে গড়া পাথরের মূর্ত্তি, মাটির তলায় পড়েছিল বা পড়ে থাকে -- ধূলার ছাপ সর্ব্বাঙ্গে, পাথর, লোহা, বৃষ্টি-শিলাপাতে ছোট বড় বহু ক্ষতচিহ্নে চিহ্নিত। সবিস্ময়ে শিবনাথ বলরামের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মাথার চুলগুলি সব সাদা হয়ে গিয়েছে। মাথায় গামছার পাগড়ী ছিল বলে এতক্ষণ দেখা যায় নি। শিবনাথের চরণতলে বসে সম্মান প্রদর্শনের রীতি অনুযায়ী মাথার গামছার পাগড়ী খুলতেই শিবনাথের চোখে পড়ল তার মাথার সাদা চুল। শুধু তাই নয়, লোকটির চেহারাও যেন মুহূর্ত্তে পাল্টে গেল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের ভয়াল রূপ তার ওই সাদা চুলের মহিমায় শোভায় -- সৌম্য সুন্দর হয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

বলরামই কথা আরম্ভ করলে, কথা আরম্ভ করবার জন্যই সে সবিনয়ে হেসে বললে -- ভাল ছিলেন বাবু মাশায়? মা ঠাকরুণ ভাল আছেন? ছেলেপিলেরা ভাল আছেন?

শিবনাথ সচেতন হয়ে উঠল বিস্ময়বিমুগ্ধতার আচ্ছন্নতা থেকে। হেসে সে বললে -- হ্যাঁ। ভাল আছি এবং আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল দেখি? কি কথা আমার সঙ্গে? ওবেলা তোমাব স্ত্রী এসেছিল, মেয়ে এসেছিল, দুধ-মাছ আরও যেন কি কি দিয়ে গেল। বাড়ী ঘরের ধূলো পরিষ্কার করে গেল, আবার বলে গেল কাল এসে ধুয়ে, নিকিয়ে দিয়ে যাবে। ব্যাপাব কি?

বলরাম বললে -- আজ্ঞে বাবু, আমি যে আপনকার চাকব হলাম। আপুনি আমার মনিব হলেন। মনিব বাড়ীব এ সব কাজ যে আমাদিগে কবতে হয়।

-- বুঝলাম। কিন্তু হঠাৎ মনিব হলাম কি ক'রে?

বলরামেব মুখ যেন শুকিয়ে গেল, সে শঙ্কিত শুষ্কস্বরে বললে -- আমাকে কি জমি দেবেন না তা' হ'লে?

-- জমি?

-- আজ্ঞেন হ্যাঁ। ওই বরমলাগের মাঠের জমি। আপনি কিনেছেন!

শিবনাথ সোজা হয়ে বসল। বললে -- ও জমির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?

-- আজ্ঞে বাবু মাশায় -- আমিই ওই জমি 'ঠেকো' (ঠিকায়) করি কি না। আজ দু'পুরুষ ধরে আমরা ওই জমিতে খেটে 'প্যাটের রন্ন' (পেটের অন্ন) জুটিয়ে আসছি। আপুনি আজ ছাড়িয়ে লেবেন মাশায়?

ঠিকাদার; -- যাক তবু রক্ষা। শিবনাথ তবু ভাবছিল। সে বিদেশবাসী, বৎসরের মধ্যে কদাচিৎ আসে। এর পর অবশ্য আসতে হবে, জমির টানেই আসতে হবে। বর্ষায় আসতে হবে -- জমি চায হ'ল কিনা দেখতে, মাঘে আসতে হবে ধান আদায় করতে। সঙ্গতিপন্ন ভাগীদের বা ঠিকাদার না হলে তার চলবে না। কে পাহারা দিয়ে বসে থাকবে -- যাতে ঠিকা বা ভাগেব ধান খেয়ে শেষ ক'রে না দেয় বলরাম। ঠিকা হলে অজন্মার বৎসরে এই বলরাম বাউড়ী

কেমন ক'রে কোথা থেকে দেবে তার প্রাপ্য ধান?

শিবনাথের নীরবতা দেখে বলরাম হাত জোড় ক'রে বললে -- আপুনি মারলে আমি ম'রে যাব। ওই জমি। – বলরামের চোখে জল এসে গেল, কথা শেষ করতে পারলে না সে, মাঝখানেই থেমে গিয়ে মোটা খসখসে হাতের উল্টো পিঠ চোখ দিয়ে মুছতে লাগল।

শিবনাথ বললে -- দেখ -- তুমি দুঃখ করো না। বুঝে দেখ তুমি। আমি হলাম বিদেশে থাকিয়ে মানুষ। আমার ঠিকেদার দরকার সদগোপ চাষী কি অবস্থাপন্ন লোক। যে আমার ধানটি আসবামাত্র দেবে। অজন্মা হলে ঘর থেকে দিতে পারবে।

আমিও দেবে মাশায়। আপনার ধান আমি কখন ভেঙে খাব না। দেবতার জিনিষের মত তুলে রাখব। অজন্মা হলে – যা ধান হবে -- আগে আপনার দোব। না-পারি ফিরে বছরে দোব।

শিবনাথ একটু চুপ করে থেকে বললে -- দেখ-- জমিতো তো দেশে অভাব নাই। বরং চাষ করবার লোকেরই অভাব হয়েছে। আমার জমি নাই যদি পাও --

বলরাম বললে – বাবু, ওই জমি আমার মা-লক্ষ্মী। দু পুরুষ ওই জমি করছি। 'বরমলাগের' মাঠ – , লাগের বিষে হোথা ঘাস গজাত না, ধূ-ধূ করত।

শিবনাথ সচকিত হয়ে প্রশ্ন করল -- কি – কি? লাগের বিষে ধূ-ধূ করত? মানে?

– লাগ মাশায় 'ব্রহ্মলাগ'! সাপ --। ভেষণ সাপ।

-- ও নাগ। ব্রহ্মনাগ।

-- আজ্ঞে হ্যাঁ। সাপের সাপ্‌। তার বিষে -- ঘাস গজাত' না ওখানে। ধূ-ধূ করত' – লাল পোড়ামাটির মাটির ডাঙ্গা।

পুরাকালে গড়া পাথরের দৈত্যমূর্ত্তি কি ভৈরবমূর্ত্তির মত অবয়ব বলরামের, তার হাতের তেলো দুখানিও সেই অনুপাতে গড়া; বরং লাঙলের মুঠো এবং কোদাল কুড়ুলের বাঁট ধরে বোধ করি অনুপাতের শোভনতাকে ছাড়িয়ে একটু বেশী স্থূল-বেশী চওড়া। হাতের তেলো দুখানিকে পাশাপাশি জুড়ে ঈষৎ বেঁকিয়ে সাপের ফণার মত করে বললে, এই এমনি কুলোর মত ফণা মশায়, ঘোর কালো মা কালীর অঙ্গের মত 'বরণ'- সেই কালোর ওপর কুলোর মত ফণায় শ্বেতবরণ চক্র! ভেতরের দিকটি-মানে গলা, পেট দুধের মত সাদা। ফণা তুলে দাঁড়াত মাশায়, মানুষের বুক বরাবর উঁচু হয়ে উঠত। লকলক করত দুখানি জিভ। উদয় কালে একবার আর একবার ঠিক 'সনজের' সময় ওই ডাঙ্গার ধারে গেলেই লোকে দেখতে পেত, ফণা তুলে সূর্য্যের পানে তাকিয়ে দুলছেন। বাঁয়ে একবার ডাইনে একবার মধ্যে মাঝে ছোবল দিয়ে ঝড়ার মত মাটিতে পড়ছেন 'সাঁট-পাট' (লুটিয়ে) হয়ে। ছোবল মারছেন না, সূর্যিদেবকে পেনাম করছেন। তিনিই ছিলেন ওখানে, তাঁর বিষে ওখানকার মাটি পোড়ামাটির মতন লাল হয়ে গিয়েছিল। ঘাস হ'ত না। জীব জন্তু মানুষ জন কেউ যেত না। ধূ-ধূ, ধূ-ধূ, করত। সেই ডাঙ্গা আমার বাবা ভেঙেছিল মাশায়।

শিবনাথ স্তব্ধ হয়ে শুনছিল, ভাল লাগছিল তার, বলরামের গল্প বলার ভঙ্গিটিও ভাল। কণ্ঠস্বরে বিপুল আবেগ সঞ্চারিত করে, বিস্ফারিত চোখে আতঙ্কের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে হাত

পা নেড়ে কথাগুলি বলে যাচ্ছিল -- মনে হচ্ছিল সে যেন সেই নাগকে চোখে দেখছে, শিবনাথেরও মনে হল এই সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর সেও যেন দেখতে পাচ্ছে মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মনাগকে। আদিমকালের মানুষের মত অন্ধবিশ্বাস ভরে এই অর্দ্ধ বন্য মানুষটির এই কাহিনী তাকে যেন মোহগ্রস্ত করে তুলেছিল। বলরাম স্তব্ধ হ'তেই সে বললে, -- তারপর?

মৃদু হেসে বলরাম বললে, তারপর মাশায়?

-- হ্যাঁ তারপর? মানে, তোমার বাবা ভেঙেছিল ওই ডাঙ্গা। কিন্তু নাগ গেল কোথায়?

-- লাগ?

-- হ্যাঁ-হ্যাঁ। তোমার বাবা কি নাগকে মেরেছিল?

ঘাড় নাড়লে বলরাম। -- বাবার সাধ্যি কি মাশায়? আমার বাবার বাবা। দুটি হাত জোড় করে বলরাম কপালে ঠেকালে, সম্ভবত পিতামহকেই নমস্কার করলে।

-- বিদ্যা জানতেন তিনি। 'পেলয়' (প্রলয়) পুরুষ, এই লম্বা, এই বুকের ছাতি, মাথায় বড় বড় চুল, এই দাড়ি 'মোচ' (গোঁফ)। এই আমাকে দেখছেন তো -- আমার বাবা বলতো, আমার চেয়েও একহাত লম্বা ছিল মাথায়। এই মোটা মোটা চোখ, রাগলে রাঙা কুচবরণ হয়ে উঠত। লোকে বলত 'ডাকিনী বাউরী'। নাম ছিল নটবর; তা সে নাম লোকে ভুলেই গিয়েছিল। এক বেদের মেয়ের সঙ্গে জোয়ান বয়সে হয়েছিল ভালবাসা। সেই দিয়েছিল 'তাকে কাঁউরেব' (কামরূপেব) বিদ্যে।

বাউরীর ছেলে নটবর শাহী জোয়ান, শান্ত শিষ্ট মানুষ, চাষ করত। গিয়েছিল সদগোপ চাষী মনিব মহাশয়ের তত্ত্ব মাথায় করে তার জামাই বাড়ী। বিশ ক্রোশ পথ। জ্যৈষ্ঠ মাস; জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব সেখানে পৌঁছে দিয়ে, বিদায়ের লাল গামছা মাথায় বেঁধে, আধুলীটি ট্যাঁকে গুঁজে পরের দিন ভোর ভোর বাড়ী ফিরবার জন্য বেরুল। দশ ক্রোশের মাথায় প্রকান্ড দু ক্রোশ লম্বা মাঠ। মাথার উপর সূর্য্য যেন জ্বলছে। আগুন যেন গলে গলে পড়ছে, মাঠের মাটি আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, বাতাসের প্রবাহের মধ্যে বিষ নিশ্বাসের জ্বালা বয়ে যাচ্ছে। নটবর তারই মধ্য দিয়ে চলেছিল। ষষ্ঠীর দিন, বাড়ীতে স্ত্রী অপেক্ষা করে থাকবে, মনিব বাড়ী থেকে রুটির প্রসাদ আনবে, শাশুড়ী আসবে কাঁকুড় আম তালশাঁস ভিজে কলাই সাজিয়ে 'বাঁটো' নিয়ে, ফোঁটা দিয়ে হলুদ সুতো বেঁধে দেবে, দুটি ছেলে আছে বাড়ীতে তারা থাকবে পথ চেয়ে। আট আনা বকশিস পেয়েছে, তা থেকে দুখানি গামছা কিনে দেবে তাদের, কখনও সে গামছা তারা পরবে, কখনও মাথায় বাঁধবে, কখনও গায়ে দেবে চাদরের মতন। খাঁ খাঁ করছে মাঠ, দূরে ঝির ঝির করে কাঁপছে আবছা অস্পষ্ট কিছু, তারই মধ্যে হন হন করে চলেছিল নটবর।

-- "রোদ বলেন, 'তাত' বলেন -- ও সবে আমাদিগে কাবু করতে পারে না। জল ঝড় ওসবে আমাদের মাতন লাগে। কাবু করে 'পাথরে' (শিলাবৃষ্টিতে)। তা আমরা বুঝতে পারি। 'বুয়েচেন কি না'। -- বলরাম অহঙ্কারের সঙ্গে বললে। বললে -- বলেন না কেনে বলরাম -- তু বেটাকে যেতে হবে এই রাত্রিতে দশ কোশ পথ। হন হন করে চলে যাব। দেবতার নাম করে 'অঙ্গবন্ধন' করব, নির্ভয়ে চলে যাব। আমার কত্তাবাবা ছিল অসুর। রোদ তাতকে সে ডরাবে

কেনে? জন মনিষ্যি নাই মাঠে, গরু বাছুর পর্য্যন্ত দুপুরের আগেই ঘরে নিয়ে গিয়েছে রাখালেরা; খাঁ খাঁ করছে চারিদিক, ক্রোশ খানেক দূরে গেরাম, গেরামের গাছপালার মাথা গুলান পর্য্যন্ত ধূলো লেগেছে -- মনে হচ্ছে যেন ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে; মনে হচ্ছে যেন অনেক দূর, অনেক দূর -- এ পথ আর ফুরোবার নয়। এই দুকোশ লম্বা মাঠের মধ্যে একটি বটগাছ। সেই গাছের তলায় বুয়েচেন কিনা আড়ে দীঘে বেবাক আলপথ এসে মিলেছে।"

দীর্ঘ মাঠের মধ্যে একটি বটগাছ ছত্রছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠখানার বুকের উপর দিয়ে যতগুলি পথ উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে চলে গিয়েছে সবগুলি স্বাভাবিকভাবেই উপনীত হয়েছে ওই বটগাছের তলায়। নটবরের গাছতলায় বিশ্রাম করবার ইচ্ছা ছিল না, সে চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখতে পেলে গাছটার ও পাশে একটি মেয়ে। কালো মেয়ে কিন্তু নটবরের মনে হল এমন রূপ সে জীবনে কখনো দেখে নি। রূপ তার রঙে নয়, রূপ তার সর্ব্বাঙ্গে, দীঘল গড়নে, কোঁকড়া চুলে, টিকালো নাকে, টানা চোখে, রং কালো হলেও তার রূপের একটা ছটা আছে; সকল অঙ্গ সুন্দর না হলে এ ছটা কখনও ফোটে না। গাছকোমর বেঁধে কাপড় পরেছে—কাপড়খানা যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। লতা যেমন পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরে কচি কিশোর গাছকে। মেয়েটি গাছের ওপাশে একটা উইটিপির মত ঢিপির সামনে বসে শাবল চালিয়ে মাটি খুঁড়ছিল।

বটতলার ছায়ায় অঙ্গ জুড়িয়ে গেল কিন্তু তার চেয়েও জুড়িয়ে গেল তার চোখ ওই কালো মেয়েটিকে দেখে। বরমলাগের ডাঙ্গায় টিলার নীচে আছে ছোট একটি ঝর্ণা, তলায় কালো ঝিকমিকে বালি, তার উপর ছিলছিলে কাঁচ-স্বচ্ছ জল, ওই কালো বালির রঙ তার কাঁচের মত জলের সর্ব্বাঙ্গে ফুটে থাকে। দুই কিনারায় বারোটি মাস সবুজ ঘাসের বেড়। মেয়েটিকে দেখে মনে পড়ল সেই ঝর্ণাটির কথা। দাঁড়াতে হ'ল নটবরকে। জোয়ান বয়স, নটবরের মত অসুরের মত পুরুষ, সে কি এমন মেয়েটিকে দু দন্ড চোখ ভ'রে না দেখে যেতে পারে? দেখতে দেখতে নটবরের ইচ্ছে হ'ল দুটো কথা বলে। মেয়েটির গলার আওয়াজ শোনে। ইচ্ছে হ'ল কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার মাথার কোঁকড়া চুলের বাস নেয় বুক ভ'রে। মেয়েটির কিন্তু কোন দিকে নজর নাই। সে ঢিপিটা খুঁড়ছেই। নটবর বুঝতে পেরেছিল সে কি করছে। হাতে শাবল, পাশে বাঁশের শলার ঝাঁপি, পিছন দিক থেকে গলার উপর দেখা যাচ্ছে কালো চকচকে পদ্ম'টাটির' (বীজের) মালা, হাতে লাল সূতোয় জড়িবুটির তাগা। এ-মেয়ে বেদের মেয়ে, ওই ঢিপিটার মধ্যে সাপের সন্ধান পেয়েছে। তাকে ডেকে কথা বলা এখন ঠিক হবে কিনা তাই ভাবছিল নটবর। ঠিক এই সময় গর্ত্ত থেকে ফুঁসিয়ে বেরিয়ে পড়ল এক কাল কেউটে। সঙ্গে সঙ্গে বেদের মেয়ে উঠালে তার হাত। ওদিকে ঠিক পাশের গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে পড়ল আর একটা কেউটে। এরপর কি হ'ল সে আর দেখতে পেলে না নটবর। এতবড় পুরুষটা, ভয়ে সে চোখ বুঁজে ফেললে — আপনি যেন চোখের পাতা নেমে এল। বিদ্যুতের ছটার তেজ সইতে না পেরে চোখ যেমন আপনি বন্ধ হয়ে যায় সেই ভাবে বুকের ভিতরটা চমকে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে বেদের মেয়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল, ক্রুদ্ধ বাজপাখীর ধারালো সূচালো ডাকের মত সে আওয়াজ -- এ-ই -- ও! তারপর আবার বেদের মেয়ের আওয়াজ পেলে সে,

এবার আওয়াজ সে আওয়াজ নয়, ব্যস্ত ত্রস্ত কিন্তু সে আওয়াজ মিষ্টি, বললে -- কে তুমি? ও ভাই! তারপরই সে হেসে উঠল খিল খিল ক'রে। -- ও-মা! এতবড় মরদ, ভয়ে চোখ বুজেছ? খোল-খোল চোখ খোল।

চোখ খুলে নটবর শিউরে উঠল। বেদের মেয়ে দুই হাতে দুটো কেউটের মুখ চেপে ধরেছে কিন্তু কেউটে দুটো নিষ্ঠুর পাকে জড়িয়ে ধরেছে তার লম্বা কালো হাত দুটি। পাকের ফাঁকে ফাঁকে হাতের মাংস ফুলে উঠেছে।

বেদের মেয়ে বললে -- ঝাঁপির পাশে কাস্তে আছে। কাস্তে দিয়ে কেটে দিতে পারবে ডান হাতের সাপটাকে পাকে পাকে? শিগ্রি ভাই -- নইলে হাতের মুঠো আর রাখতে পারব না। জীবনটা যাবে।

নটবর ছুটে গিয়ে নিয়ে এল কাস্তেখানা। সাপ দুটোর গলায় -- বেদেনীর মুঠোর নীচে কাস্তে চালিয়ে দু টুক্‌রো ক'রে দিলে। বেদেনী বললে -- এইবার এক কাজ কর ভাই, আমি সাপের মুখ দুটো ফেলব, কিন্তু ছুঁড়ে দূরে ফেলবার জোর নাই আড়ষ্ট হাতে। পড়বে পায়ের কাছে, তুমি আমাকে পিছন থেকে টেনে নিতে পারবে?

নটবর তার সামনে মেলে ধরলে তার মাথাব নতুন লাল গামছাখানা; বললে -- দাও, এতে ফেলে দাও, ঝোলাব মধ্যে ভিক্ষের মত পড়বে।

বেদের মেয়ের নাম লালমণি।

কাটা সাপেব বাঁধন কেটে হাত দুখানি মুক্ত হতেই বললে -- কি তোমাকে দিব ভাই, আমি বেদের মেয়ে, কি বা আমার আছে ? তুমি আমায বাঁচিয়েছ আজ।

নটবব বললে -- কেনে ভাই, তুমি নিজেই বলে সাতরাজার ধন মাণিক। আমাব গামছায় দিয়েছ সাপের ফণার মাণিক তুমি -- তোমাকে পেলে মাথায় নিযে আমি যে রাজা হ'তে পারি।

বেদের মেয়েব চোখ ঝকমকিয়ে উঠল। নটবরেব বিশাল দেহখানার দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। তারপর হঠাৎ উঠে নটবরেব গলা জড়িয়ে ধরে বললে -- আমার সোয়ামী নাই কিন্তু বাপ আছে -- ভাই আছে; তারা তো তোমাকে সইবে না। তুমি আমাকে তোমার ঘরে নিতে পারবে?

- মাতায় ক'রে নিয়ে যাব।

- ঘরে কে আছে তোমার?

-- পরিবার আছে -- দুটি ছেলে আছে।

-- তবে তোমার ঘরে নয়। সতীন নিয়া ঘর করতি পারব না ভাই। দেশান্তরী হতে পারবে আমাকে নিয়া?

নটবর উঠে দাঁড়াল। বললে -- চল,এখুনি পথ ধরি।

বলরাম বললে -- সেই যে গেল কত্তাবাবা (ঠাকুরদাদা) পথে পথে বেদের মেয়ের সাঁতে (সাথে), ফিরল পনেব বছর পর। মাথায় লম্বা চুল, মুখে এই দাড়ি 'মোচ' (গোঁফ), হাতে

লোহার তাগায় মাদুলী কবচ জড়িবুটি, গলায় পদ্মটাটির মালা, কাঁধে একটা বাঁকে ঝোলানো বেদের ঘরের সাজসরঞ্জাম, তুমড়ী বাঁশী, বিষম ঢাকীর বাজনা, গর্ত্তখোঁড়া শাবল, কি একটা লতার ডালের লাঠি, ঝাঁপিতে সাপ নিয়ে গেরামে ফিরে এল। কেউ চিনতে পারলে না। দুই ছেলেকে রেখে গিয়েছিল সাত বছরের আর পাঁচ বছরের -- আমার জেঠা আর বাবা -- তারা তখন জোয়ান হয়ে উঠেছে। গরুর সেবার চাকরী ছেড়ে বাপের মনিব বাড়ীতে চাষের মাইনে করা কৃষান হয়েছে। বাপ রইল ছেলেদের দিকে চেয়ে ছেলেরা রইল বাপের পানে তাকিয়ে, কেউ কাউকে চিনতে পারলে না। চিনতে পারলে যে চিনবার সে। পরিবার ঠিক চিনলে। ঘাটে গিয়েছিল জল আনতে আমার কত্তা মা। সে জলভরা কলসী কাঁখে বাড়ীতে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। কত্তাবাবার লম্বা চওড়া কাঠামোর দিকে তাকিয়েই সে বললে,--

-- কে গো তুমি?

নটবর হেসে বললে -- আমাকে চিনতে পারছিস না বউ?

নটবরের স্ত্রীর কাঁখাল থেকে কলসীটা খসে পড়ে ভেঙে গেল, সে ছুটে পালিয়ে গেল।

ছেলেরা অবাক হয়ে গেল। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই তারা ব্যস্ত হয়ে মায়ের পিছনে ছুটে গিয়ে ডাকলে -- মা--মা।

নটবরও এগিয়ে গিয়ে ডাকলে -- বউ -- বউ।

মা হেঁকে বললে -- না। না।

নটবর বললে -- বুঝেছি আমি বুঝেছি। ফিরে আয় তু ফিরে আয়। তোর দোষ আমি ধরব না, আমার দোষ তুই ধরিস না।

নটবরের স্ত্রী দাঁড়াল এবার। বললে -- মা কালীর দিব্যি কর তুমি।

নটবর বললে -- মা কালীর দিব্যি।

ফিরল নটবরের স্ত্রী। ফিরে এসে বললে -- এতকাল পরে কেনে ফিরলে তুমি?

নটবর বললে -- পনের বছরের বারোটা বছর মনের সঙ্গে যুঝে যুঝে আর পারলাম না বউ, এদিকে মা কামিক্ষ্যেও খালাস দিলেন, লালমণি ম'ল। আমি আর থাকতে পারলাম না, ফিরে এলাম।

নটবরের স্ত্রী বললে -- ফিরে এলে; থাকতে পারবে? ভাল লাগবে?

নটবর পরিবারের দিকে চেয়ে হাসলে! বললে -- বললাম তো পনের বছরের বারোটা বছর মনে মনে পুড়েছি -- 'ঘর ঘর আর ঘর' ক'রে। লালমণি তোকে ভুলিয়েছিল -- ছেলে দুটোকেও ভুলিয়েছিল কিন্তু ঘর ভুলাতে পারে নাই।

বর্ষার সময় ঝমঝম করে জল নামত, আকাশ ঘোর ক'রে মেঘ আসত, গর গর করে ডাকত, লোকের ঘরের দাওয়াতে, নয় তো কোন চালায় শুয়ে থাকত তারা, লালমণি -- বর্ষার আমেজে অঘোরে ঘুমাতো, আশেপাশে ব্যাঙ ডাকতো, মাথার শিয়রে ঝাঁপিতে সাপের নিশ্বাস পড়তো, নটবর ঠায় জেগে থাকত। ঘর মনে পড়ত; চাষবাসের কথা মনে পড়ত। কাড়ান লাগবে, জলে থৈ থৈ করবে মাঠ, মাটি দলদল করবে, ভাই বন্ধুরা চাষ করবে, সেই সব মনে

সুখলাল বললো — যদি না কেনে?

মীমাংসা হয়েই যাচ্ছিল, সুখলালের প্রশ্নে আবার বিতণ্ডা শুরু হল।

সঞ্জয় উঠে দাঁড়িয়ে বললো — কিনতে বাধ্য হবে। লড়াই শুরু করে দাও। বট পাতা ছুঁয়ে সকলে কসম খাও।

সঞ্জয়ের কথার মধ্যে অদ্ভুত এক আশ্বাসের উদ্দীপনা ছিল। যেটুকু সংশয়েব মেঘ ছিল, সকলের প্রতিজ্ঞা আব উৎসাহেব ঝড়ে তাও কেটে গেল! পুণ্য বাতাসে শিবালয়ের ঐ নিরেট বধিব বিগ্রহটা সত্যিই যেন জেগে উঠলো এত দিনে। বৈঠক শেষ হল।

রুক্মিণীর ঘরের কাছাকাছি এসে সঞ্জয় বললো — নেমিয়ার, তুমি এইবার যাও। আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। খুব ভাল করে অর্গানাইজ কর।

— বহুৎ আচ্ছা বাবুজী।

নেমিয়ার চলে গেলে সঞ্জয় অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এম-এ পাশ সঞ্জয় ক্যাশমুন্সী হয়ে গেছে। তার অপমানিত প্রতিভা যেন ব্যর্থ রোষে ফণা নামিয়ে দিন গুণছিল। এইবার ফিরে ছোবল দিতে হবে, যতখানি বিষ ঢালতে পাবা যায়।

অন্ধকাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে তাব সমস্ত ভাবনাকে সংগ্রামের সাজে সাজিয়ে তৈবী হল সঞ্জয়। বতনলাল মিলেব চিমনিটা অস্পষ্ট দেখা যায়। ডাইনোসরেব মত ঘাড় উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে চুবাশী পবগণাব বিস্তীর্ণ আখেব ক্ষেতের দিকে। ঐ দানবীয চর্বিব স্তূপের ভিতর কোথাও হৃৎপিন্ড লুকিযে আছে, তা সঞ্জযেব অজানা নয়, ঠিক সেখানেই তাক করে আঘাত দিতে হবে।

মন-ভরা উল্লাস নিয়ে সঞ্জয় রুক্মিণীর ঘরে ঢুকলো।

. আদবেব বাড়াবাড়ি দেখে রুক্মিণী প্রশ্ন করে — বড সস্তার সওদা পেযেছ, না? তবুও একদিন তো ছেড়েই দেবে!

— সস্তা ? আমাব কি দেবাব বাকী আছে? আর ছেড়েই বা দেব কেন?

রুক্মিণী যেন একটু অনুতপ্ত হয়ে হাত দিয়ে সঞ্জয়ের মুখ চেপে ধবে বললো — আচ্ছা' মাপ করো। আব বলবো না। তবে তুমি নিজেই সেদিন নেশার ঘোরে বলছিলে, আমি নাকি সরবতের গেলাস, সরবত নই!

সঞ্জয়ের প্রত্যুত্তবেব অপেক্ষা না করেই রুক্মিণী বললো — আমাব কিছু থোক টাকা চাই। একবার ভাল কবে তাকিয়ে দেখ তো আমার দিকে।

রুক্মিণী গায়েব আঁচলটা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো — বুঝেছ? আমার চলবে কি করে?

— হ্যাঁ বুঝেছি। সঞ্জয় গম্ভীব হয়ে গেল।

রতনলাল মিলের সমস্ত মেশিন বন্ধ। অতিকষ্টে দু'চার গাড়ি মাল যোগাড় হয়েছে। কলকাতার মার্কেটের অর্ডার মেটাবার শেষদিন এগিয়ে আসছে। রায়বাহাদুর প্রায় পাগল হয়ে সদরে এস্-ডি-ও'র বাংলোতে দৌড়াদৌড়ি করছেন।

চুরাশী পরগণার ফসল শুকোচ্ছে মাঠে মাঠে। এজেন্টরা গাড়ি আর টাকার তোড়া নিয়ে বস্তি বস্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাল ছাড়বে তো ছাড়। পাতা লাল হয়েছে কি এক আনাও দর দেব

না। কিষাণরা হেসে চুপ করে থাকে।

নেমিয়ার একেবারে উধাও হয়েছে। বাড়িতেও থাকে না, অফিসেও আসে না। দাঁড়কাকের মত সে দিনরাত চুরাশী পরগণার মাঠে ঘাটে বস্তিতে উড়ে বেড়ায়। — খবরদার এজেন্টদের কথায় কেউ ঘাবড়িয়ো না। রতনলাল মিল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

চুরাশী পরগণার ওপর শকুন উড়ছে ক'দিন থেকে! গো-মড়ক লেগেছে। মুনিরামের একটা ছেলেও মারা গেছে বসন্তে।

সাহুরা খেরোবাঁধা খাতা আর তমসুকের নথি নিয়ে দরজায় দরজায় হানা দিচ্ছে তাগাদার। একজন রিক্রুটার ত্রিশজন তুরীকে গেঁথে নিয়ে সরে পড়েছে মালয় রবার বাগানের জন্যে। জিতেন নগরের সড়কে গরুর গাড়ি লুঠ হয়েছে। মিলিটারী পুলিশ রুট মার্চ করে গেছে।

পঙ্গপালের মত করমপুরের গয়লারা এসেছে দলে দলে। মোষ কিনছে পাঁচ টাকায়, দুধেল গরু আট টাকায়, বাছুর বার আনা। সাহুরা চড়া সুদে রুপোর গয়না বন্ধক নিচ্ছে, পেতল কাঁসার বাসন বিকিয়ে যাচ্ছে মাটির দরে।

চুরাশী পরগণার ঘরে ঘরে সেদ্ধ হচ্ছে কোনার গাছের পাতা। ঘরে ঘরে দানা আনাজ নিঃশেষ।

এক মাস হতে চললো। রায়বাহাদুর এজেন্টদের গালাগালি দিয়েছেন। — যেমন করে পার মাল নিয়ে এস। মার্কেটে আর ইজ্জৎ থাকে না! মেশিনে যে মরচে পড়ে গেল।

এস্‌-ডি-ও এসে মিল দেখে গেছেন। পেয়াদা দিয়ে চুরাশী পরগণায় ঢোল পিটিয়ে দিয়েছেন। — সব কোই হুশিয়ার হো যাও। ফসল ছাড়, একদিন মাত্র সময় দেওয়া গেল। নইলে কাল থেকেই লয়াবাদ পরগণা থেকে ফসল আনা হবে।

মুনিরাম আর সুখলাল এল সন্ধ্যাবেলা। ঘেয়োকুকুরের মত চেহারা। এখনও ভরসা জ্বলজ্বল করছে ওদের চোখে, হাত পেতে হুকুম চাইছে — বাবুজী, এইবার কি করতে হবে হুকুম দাও।

সঞ্জয় বললো — আর ক'টা দিন সবুর কর।

মুনিরাম আর সুখলাল চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। তাদের একটা কিছু বলবার হয়তো ছিল। বলা আর হল না।

ঘটনাগুলি কেমন ঘোরাল হয়ে আসছে। রায়বাহাদুর এখনও তাকে ডাকলো না, এই সঙ্কটে একটা পরামর্শের জন্য। আভাসে সঞ্জয় একদিন জানিয়েও ছিল — যদি বলেন তো কিষাণদের আমি শান্ত করি।

এদিকে রুক্মিণী আবার এক কাঁটা গিলে বসে আছে। দুদিকেই একটা ব্যবস্থা এবার করা উচিত। কিন্তু নেমিয়ার ছাড়া কি করে কাজ হয়। কাজের বেলা লোকটা সত্যিই বড় সহায়।

নেমিয়ার এসে সামনে দাঁড়ালো।

কেরোসিনের বাতির ময়লা আলো। নোংরা খাকি প্যান্ট, ছেঁড়া কামিজ, পাখীর বাসার মত রুক্ষ চুলে ভরা মাথাটা। কেন্নো নেমিয়ার দাঁড়িয়ে আছে লোহার মূর্তির মত ঋজু ও কঠিন। গোত্রহীন মানুষের স্বরূপ দেখে আজ সঞ্জয় আঁতকে উঠেছে, বসে আছে মাথা নীচু করে।

নেমিয়ার চাইতে এসেছে মিলের কাশঘরের চাবি। গিরগিটির মত চেটে নিয়ে আসবো যা কিছু ক্যাশ আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো। ফাইল রেজিস্টার ছাই হয়ে যাবে! তোমাকে

দায়ী করবে কি দিয়ে! কে বলবে কত ব্যালান্স ছিল? দাও, চাবি দাও।

সঞ্জয় ঘাড়টা একবার তুলে তাকালো বাইরের অন্ধকারেব দিকে । আলোটা একটু উজ্জ্বল থাকলে দেখা যেত, দমকা শিহরে তার হাঁটু দুটো থরথর করে উঠলো।

নেমিয়ার যেন ভয়ঙ্কব অর্থহীন এক ব্যালাড গাইছে — চুরাশী পরগণার রসদ চাই। তারপর দেখবো, লয়াবাসের সড়ক দিয়ে কোন্ মরদকা বাচ্চা বাইরের মাল আনতে পারে। কেউ বেচবে না ফসল, ক্ষেতে ক্ষেতে শুকিয়ে যাবে, পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে। কিষাণেরা সব কসম খেয়েছে। আজ রাত্রে লাঠি মাজা হচ্ছে ঘরে ঘরে। সব তো গেছে, কিন্তু রতনলাল মিলকে দেখে নেবে তারা। মাথা দেবে, মাথা নেবে।

বসন্তে ক্ষতাক্ত মুখ, গোল গোল চোখ, বেঁটে বোগা ঘুঁটে বঙের চেহারা নেমিয়ারের, যাকে চড়ুই পাখীও ভয় পায না, সে-ই এসে দাঁড়িয়েছে সঞ্জয়ের সুমুখে, অতি আসন্ন এক বিপ্লবের ফরমান হাতে নিয়ে।

নেতিয়ে পড়েছে সঞ্জয়। নেমিয়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো — অত ভাবনা কিসের কমরেড দাদা! তোমার কিযাণ ফৌজকে খেতে হবে তো। দাও, আব দেরী করো না।

ক্যাশঘবের চাবির তোড়া নিয়ে নেমিয়ার অন্ধকাবে পিছলে সরে পড়লো।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো অনেকক্ষণ পায়চাবি কবে সঞ্জয় এসে দাঁড়ালো ঘরের বাইরে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পেতে। একটা সামান্য দলাদলির এ রুদ্র পরিণাম সে কল্পনা করতে পারেনি। সার্কাস দেখাবার জন্যে যে সিংহকে খাঁচার বাইবে আনা হয়েছে, একটু সামান্য খোঁচা দিতেই সেটা যে বুনো হাঁক ছেড়ে অবাধ্য হয়ে উঠবে, কে এতটা ভেবেছিল?

— নেমিয়ার ! অন্ধকারে সঞ্জযেব ভাঙা গলা কেঁপে উঠলো।

দৌড় দিল সঞ্জয়।

রুক্মিণীর ঘরেব জানালার ফাঁক দিয়ে মৃদু আলোর সঙ্গে তাবযন্ত্রের বিলাপের মতো একটা স্বব ঠিকরে এসে পড়েছে। সঞ্জয় দম বন্ধ করে জানালার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে বইল।

মেঝের ওপর লুটোচ্ছে রুক্মিণী। শাড়ীর ভার খসে গিয়ে কোমরে শুধু গেরোটা লেগে আছে। খোঁপাটা মাটিতে ঘষা খেয়ে খেয়ে নোংবা হয়ে গেছে। কাঁচের চুড়িগুলো ভেঙে ছড়িয়ে রয়েছে এদিক ওদিক । আহত নাগিনীর মতো রুক্মিণী যেন কোমর ভেঙে অবশভাবে পড়ে আছে। শুধু এপাশে ওপাশে মোচড় দিয়ে কাতরাচ্ছে।

রুক্মিণীর প্রাণবায়ু যেন করাল ঝঞ্ঝার মতো সমস্ত শরীরে একবার গুমরে উঠলো। এমন অবস্থায় অনেকে তো মারা যায়। রুক্মিণীর কপালেও কি তাই আছে?

অনাবৃত মসৃণ হাঁটুর ওপর অতি পরিচিত সেই নীল শিরার আঁকা-বাঁকা রেখাগুলি. জোঁকের মতো ফুলে উঠেছে। ঠোটের ওপর দাঁতের পাটি চেপে বসে গেছে। চোখের কোণ থেকে তোড়ে তোড়ে জল গড়িয়ে পড়ছে কান ভাসিয়ে। চাপা আর্তস্বর পর্দায় পর্দায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। ফুসফুসটা ফেটে যায় বুঝি। এই কি মৃত্যু?

কী নিষ্ঠুর বিভ্রম! সমস্ত যন্ত্রণা ধন্য করে কপট মৃত্যুর আড়ালে এক নবজীবনের রক্তবীজ পৃথিবীর মাটিতে হাত বাড়িয়েছে। সঞ্জয় এক লাফে পিছনে এসে গাছের নিচে দাঁড়ালো!

নেমিয়ার কোথায়? সঞ্জয এগিয়ে যায়, নেমিয়ারের ঘরের দরজার ফাঁকে উঁকি দেয়।

কালো প্যান্ট পরে, কোমরে একটা চওড়া বেল্ট কষে নেমিয়ার বসে বসে চিবোচ্ছে বাসি রুটি। হাঁড়ি থেকে ঢেলে পচাই খাচ্ছে এক-এক চুমুক। একটা ধারালো ভোজালি সামনে রাখা। মুখে অদ্ভুত এক প্রসন্নতা; শুকনো ঠোঁট দুটো নেকড়ের ঠোঁটের মতো হাসছে।

এ-ঘরে ভাই, ও-ঘরে বোন। পুরাকল্পের বর্বর পৃথিবীর দু'জন কুপিত ডাইন ও ডাইনী যেন তুক্ করে সর্বনাশের আহ্বান করছে।

নদীতে বান ডাকে, ভয়াল তোড় আসে, গর্জন করে। জেলে তার যথাসর্বস্ব ঘাড়ে তুলে দৌড় দেয়। সঞ্জয় দৌড় দিল। সড়ক না ধরে, মাঠের ঢালু খাড়াই খাদ গর্ত ডিঙিয়ে সঞ্জয় দৌড়তে থাকে। মিল ফটকের আলোটা ঘোলাটে আলেয়ার মতো কুয়াশায় দপ-দপ-দপ করছে। আর বেশি দূর নয়।

মকতপুরই বা কতদূর? আজ শেষরাত্রে ট্রেন ধরলে কাল বিকালে পৌঁছে যাবে। শিরিষ গাছে হয়তো সুঁটি পেকেছে। সোনালী বৈকালে হাল্কা বাতাসে মোটা ঘুঙুরের মতো শব্দ করে বাজে। বড়দা বারান্দায় বসে গুড়ের তৈরী চা খান। মা উঠোনে বসে লক্ষ্মীর পিঁড়ি ধুতে থাকেন। পুতুল আকাশে আঙুল তুলে শঙ্খচিলের ঝাঁক গোনে — এক দুই তিন। সুমিত্রা, হয়তো তার বিয়ে হয়নি। তার শবরীদৃষ্টি ঘুরে বেড়ায় মকতপুরের বাড়ির জানালায় — পথে — আগন্তুক মোটরবাসের দিকে।

রায়বাহাদুর রতনলাল, সূর্যবাবু, মুনিবজী — সামনে টুলের ওপর বসে আছে সঞ্জয় — বিশীর্ণ রোগীর মতো। ভাঙা কাঁসরের মতো গলার আওয়াজ। এক গেলাস গরম দুধ সঞ্জয়কে খেতে দেওয়া হয়েছে।

রায়বাহাদুর ডাকলেন — শঙ্কর পালোয়ান, ক্যাশঘরে পাহারা বসাও। নেমিয়ার বাবুজীকে ছুরি দেখিয়ে চাবি নিয়ে গেছে। আজ রাতেই চুরি করতে আসবে। চোট্টা শালাকে ধরে কাঁচা খেয়ে ফেলতে হবে।

রায়বাহাদুর এবার মুনিবজীকে হুকুম দিলেন — বাবুজী স্টেশনে যাবেন। এখনই একটা ভাল ঘোড়ায় গদি চড়িয়ে দাও। আর আমার সিন্দুক খোল, বকশিশ দিতে হবে। বড় ইমানদার ছেলে!

বকশিশের পঞ্চাশটা টাকা হাতে নিয়ে আর আদাব জানিয়ে সঞ্জয় উঠলো। রায়বাহাদুর বললেন — কটা দিন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর। তারপর এসো আমার গোরখপুর মিলে — শও রুপেয়া তন্‌খা।

রামখড়ির রেঞ্জের গায়ে সরু জংলী পথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সঞ্জয়। আকাশের বুকটা লাল হয়ে গেছে। কিষাণেরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে নিজের নিজের ক্ষেতে। যেন পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হচ্ছে চুরাশী পরগণা।

সামনের মাঠটা পার হলেই স্টেশন, ডিস্ট্যান্ট সিগনালের আলোটা নীল তারার মতো ভেসে রয়েছে। ছপ্ করে একটা শব্দ। ঘোড়াটা একটা স্রোতে পা দিয়েছে।

সঞ্জয় ঘোড়া থেকে নেমে স্রোতের ধারে বসে আঁজলা ভরে জল খেল। গেরস্থের মুর্গি চুরি করে একটা শেয়াল ভেজা বালির ওপর বসে গোঁপের রক্ত চাটছিল। সেও জল খাবার জন্য স্রোতে মুখ নামালো।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৩/ সংখ্যা ৪: ১৩৪৭]

বরমলাগের মাঠ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[জন্ম ১৮৯৮ সালে বীরভূমের লাভপুর গ্রামে। বাংলায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: গণদেবতা, আরোগ্য নিকেতন, কবি, দুই পুরুষ, রসকলি, বেদেনী, ইত্যাদি। জ্ঞানপীঠ, একাদেমী ও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত। মৃত্যু: ১৯৭১ সালে।]

বিংশশতাব্দীর অর্দ্ধেক শেষ হয়ে এল; মানুষের জীবনবাদের সুখনীড় দেউলে-পড়া বনিয়াদী ধনীর দালানের মত ফাটলে ভরে গিয়েছে, পলেস্তারা-খসা ইটের গাঁথুনির মসলার মধ্যে বট অশথের চারা শিকড় চালিয়ে দস্তুর মত মোটা হয়ে উঠেছে, বনেদের তলায়-তলায় ইঁদুরে সুড়ঙ্গ কেটে ধ্বসে পড়ার পথ সুগম করেছে। লক্ষ্মীর কাঠের সিংহাসনে উই ধরেছে, গৃহদেবতা মানুষের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে রক্ষণাবেক্ষণে অক্ষমতা জানিয়ে প্রায় পুতুলে পরিণত হযেছেন। অনেকে এখনও এই সব ঘরকেই মেরামত করবার জন্য মাল-মসলা প্রয়োগ করে চলেছে, অনেকে নতুন ঘর গড়বার জন্য উৎসুক, তারা ঘরখানা আপনি ভেঙে পড়বে এই প্রত্যাশায় আছে। কিন্তু আদালত এলাকায় গেলে এ সব কথা ভুলে যেতে হয়। সেখানে গেলে দেখা যায় দেবতা বসে আছেন সনাতন রূপে। আইনের ঘরে এক চুল ফাটল দেখা যায় না; সেখানে ঢুকলেই মনে হয় -- 'যাবৎ চন্দ্রার্ক মেদিনী' -- অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য মেদিনী যতকাল থাকবে ততকাল এও থাকবে অক্ষয়। ভাঙা ঘরের মানুষেরা তা সে যে দলেরই হোক -- এখানে ঢুকলেই বদলে যায়। যারা ভাঙা ঘব মেরামতে বিশ্বাসী তারা বুকে বল পায়, যারা ঘর ভেঙে পড়লে বাঁচা যাবে মনে করে তাবা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, ভড়কে যায়, অনেক ক্ষেত্রে পুরানো ঘরের লক্ষ্মীর উই-ধরা কাঠের সিংহাসনের উই ঝেড়ে তাতে বার্ণিশ মাখাবার জন্য বার্ণিশও সংগ্রহ করে ফেলে।

শিবনাথ শেষের দলের মানুষ;আদালতে এসেছিল নেহাৎ দায়ে পড়ে, ফৌজদারী মামলার সাক্ষীর শমন পেয়ে। না-এলে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাব হবার কথা। সাক্ষী দিয়ে ফিরবার মুখে দেওয়ানী আদালতের দরজার মুখে এসে ভিড় দেখে দাঁড়াল। সেখানে চলছিল নিলাম। ওই লক্ষ্মীর সিংহাসনে দেবার বার্ণিশ অথবা রঙ যাই বলা যাক না কেন -- তাই নীলাম হচ্ছিল। একের পর এক ডাকের উপর ডাক চড়ছে -- ঘন্টা পড়ছে। সিকি-টাকা দাখিল হচ্ছে। বাকী খাজনায় জোত নিলাম হচ্ছিল। হঠাৎ কানে এল এত নম্বর লাটের অমুক মৌজার রায়াতস্থিতিবান জোত -- এত একর এত ডেসিমল জমি -- খাজনা এত টাকা, ডিক্রীদার জমিদার অমুক, দেনাদার অমুক, দাবী একশত কয়েক টাকা কয়েক আনা কয়েক পাই। ডাক আরম্ভ হয়ে গেল। জমিদার ডাকলেন তাঁর দাবী ভোর, অর্থাৎ তাঁর দাবী পর্য্যন্ত। শিবনাথের কি হয়ে গেল। মৌজাটা তার গ্রামের বাড়ীর কাছেই, মৌজাটির জমির উর্ব্বরতা সম্বন্ধে খ্যাতি আছে এবং জমির পরিমাণের অনুপাতে খাজনা নিতান্তই কম। সে নতুন জীবনবাদে বিশ্বাসী, সে বিশ্বাস

করে লাঙল যার জমি তার হওয়াই উচিত, এবং নিজে সে কখনও লাঙল ধরবে না এও সে জানে, তবু কি যে হ'ল তার, জমিটা নীলামে সে ডেকে ফেললে। লাট কাষ্টগড়ায় মৌজা গোপেরগ্রামে বরমলাগের মাঠে -- বারোশো পঁচিশ টাকায় আঠারো বিঘা জমি, খাজনা মাত্র দশ টাকা। বার্ণিশের কোয়ালিটি ভাল, পরিমাণে অনেকটা, দামেও খুব সস্তা;লোভ সে সামলাতে পারলে না।

জমিদার শিবনাথের বন্ধু। তিনি হেসে বললেন, "তুমি বলেই ছেড়ে দিলাম আমি। নইলে --।" অর্থপূর্ণ হাসি হেসে কথাটা অসমাপ্তই রেখে দিলেন ওই আদালতের জনতার মধ্যে। তিনিই তাঁকে সাহায্য করলেন সিকি-টাকা দাখিল করা, রসিদ নেওয়া ইত্যাদি করণীয় কাজে। পেশকার থেকে পিওন পর্য্যন্ত এসে হাত পেতে দাঁড়ালে তাদের দাবীর সঙ্গে শিবনাথের সামর্থ্যের একটা রফাও করে দিলেন। বেরিয়ে এসে বললেন -- "ওটা আমি খাস করব বলে অনেক তদ্বির ক'রে নীলামের ব্যবস্থা করেছিলাম। পশু পক্ষীতে জানে না নীলামের কথা। নইলে যুদ্ধের বাজারে দশটাকা মণ ধান বেচে চাষা বেটারা হয়ে উঠেছে টাকার কুমীর। জমির নামে বেটাদের লঘুগুরু জ্ঞান লোপ পায়, হরিণ দেখে বাঘের জিভে জল পড়ার মত বেটাদের জিভে জল সরতে থাকে। ঠোঁট চাটে আর ডাক বাড়িয়ে চলে। এক এক ডাকে আমরা উঠি পাঁচ টাকা ওরা উঠে অন্ততঃ পঁচিশ টাকা। যাক -- এখন বাকী টাকাটা দাখিল করে দিয়ো। দেনাদার নাবালক, দেশ থেকেও পালিয়েছে -- টাকা দাখিল হবার কোন ভয় নাই; সময়ে দখল নিয়ো। জমিতে হাজা শুকো নাই। আমাকে কিন্তু খারিজ ফি-টা দিয়ো ভাই। আইনে অবিশ্যি উঠে গিয়েছে কিন্তু ওটা আমাদের ধর্ম্মত ন্যায়ত প্রাপ্য। সিকি আমি চাইব না তোমার কাছে, টাকাতে দু আনা, মানে পঞ্চাশটা টাকা আর গোমস্তাকে কিছু, নন্দীর কিছু, মানে গোটা পাঁচেক আর নায়েবকে গোটা পাঁচেক। আর ভাই একটা খাসী। আমি অবিশ্যি একা খাব না। তোমাদের পাঁচ জনকে নিয়ে বুঝেছ --"। মিষ্ট হাসি হেসে পিঠ চাপড়ে সমাদর করে জমিদার বিদায় নিলেন।

জমিদার লোভের পরিচয় অবশ্যই দিয়েছিলেন কিন্তু মিথ্যে কথা বলেন নি। যথা-সময়ে যথা-নিয়মে বিনা বাধায় জমি দখল হয়ে গেল। শ্বেতকায় মানুষদের সমুদ্রের মধ্যে জনহীন দ্বীপ জয় করার মতই ঢোল বাজল, পতাকা পোঁতা হল, কিন্তু বাধাও কেউ দিলে না, পরাধীনতার বেদনাতেও কেউ কাঁদল না। শুধু গাঁয়ের চাষারা হুঁকো হাতে করে গাঁয়ের ধারের তেঁতুল তলায় এসে দেখলে। কানে একবার আঙুল দিলে মাত্র, কারণ নীলামের ঢোলের বাদ্য অশুভ, ও শুনতে নাই। শিবনাথ নিজে যায় নাই এ ক্ষেত্রে, সে বাড়ীতে খানিকটা উদ্বেগ নিয়ে বসে ছিল, খবরটা পেয়ে সে নিশ্চিত হ'ল। যাদের জমি তারা সত্যই দেশত্যাগী। দখলের পরওয়ানা নিয়ে ধর্ম্মাধিকরণের যে পিওন এসেছিল সে দাবী করলে অন্ততঃ একটাকা বকশিস তাকে দিতেই হবে;শিবনাথ তাকে খুসী হয়ে দু'টাকা দিয়ে দিলে।

একা বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সোস্যালিজিম্ সম্বন্ধে চার্চ্চিল সাহেবের একটা মন্তব্য তার মনে পড়ে গেল। "The brute fact is that socialism means mismanagement,

bad house keeping, incompetence and progressive degeneration." লোকটার মত এমন সুন্দর দুর্ম্মুখ বোধ করি পৃথিবীতে আজও জন্মায় নি। রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে কাব্য রচনা করে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করেছেন, সীতারামের বিবহ নিয়ে বাল্মিকী লিখেছেন অমর কাব্য;কিন্তু জটিলা কুটিলা কি সূর্পনখাকে নিয়ে যদি চার্চ্চিল কাব্য লেখে তবে সে কাব্য সাহিত্যগুণে ভাগবত রামায়ণ বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে সমান আসন পাবে বলেই শিবনাথের দৃঢ় ধারণা হ'ল।

-- বাবু মাশায়!

নারী কণ্ঠের আহবান শুনে সচকিত হয়ে উঠল শিবনাথ। -- কে?

-- আজ্ঞে মাশায় আমরা।

দুটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। একজন অবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া -- অপরজন অবগুণ্ঠন হীনা যুবতী। বহুদিন দেশছাড়া হ'লেও শিবনাথের চিনতে দেরী হ'ল না -- হাড়ি বাউড়ী ডোম কাহার জাতির মেয়ে দুটি। মাথায় দুধের বড় ঘটি, একজনের হাতে একটি লাউ অপরেব হাতে একটি 'খাড়ুই' অর্থাৎ মাছের ছোট চুবড়ী।

-- কি?

একটি দুধভবা ঘটি, লাউ, মাছের চুপড়ীটি নামিয়ে দিয়ে যুবতীটি কাপড়ের আঁচল খুলে ঢেলে দিলে একরাশি চাঁপানটেব শাক। বললে -- বাবা পাঠিয়ে দিয়েছে। মা আব আমাকে বললে মনিবকে দিযে আয গিয়ে -- আব করে ঘবে আয়। সে আসবে --

-- কে তোমার বাবা? এ সব আমায় কেন পাঠালে সে?

মেয়েটি হাসলে। সলজ্জ ভাবে বললে -- আমার বাবার নাম বলরাম আপনি আমাদেব লো -- তুন মনিব হলা কি না তাই পাঠিয়েছে।

বিব্রত হল শিবনাথ। কি বিপদ! হঠাৎ বলরাম বাউড়ীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কেমন ক'রে গজিয়ে উঠল সে বুঝতে পারলে না। সে বললে তোমাদের বোধ হয় ভুল হচ্ছে --

অবগুণ্ঠনবতী বার বার ঘাড় নেড়ে উঠল, তার অর্থ না না না। ভুল নয়।

মেয়েটি স্পষ্ট করে বললে -- না ভুল কেন হবে মাশায়? আপনাকে কি আমি চিনি না? আপনি কলকাতাতে থাক। এবারে লো -- তুন জমি কিনেছ। সেই জমির দখল লেবাব জন্যে আইচ এখানে। বাড়ীতে মেয়া ছেলা কেউ নাই। আপনার নাম তো মুখে আনতে পারি না, লইলে তাও বলে দিতাম সে মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল।

শিবনাথ কি বলবে ভেবে পেলে না।

অবগুণ্ঠনবতী ফিস্‌ফিস করে বললে যুবতীটিকে. ফিস্‌ফিস্ করে বললেও শিবনাথ সে কথা শুনতে পেলে, বললে -- আমি দুধ দিয়ে আসি. তু মনিবের ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে মাছ বেছে দে।

মেয়েটি বললে -- হোক।

শিবনাথ ব্যস্ত হয়ে বললে -- না না না। ওসব তোমরা নিয়ে যাও। ওতে আমার দরকার নাই। ও নিয়ে আমি করব কি?

সে কথার তারা কেউ কর্ণপাত করলে না, অবগুণ্ঠনবতী মেয়েটি চলে গেল, মেয়েটি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। শিবনাথের কথার জবাব দিলে সেই, বললে -- সেবা করবেন আপুনি। ঘরের খাঁটি দুধ এক ফোঁটা জল দিই নাই। ক্ষীর করে খাবা। কচিলাউয়ের তরকারী খেলে জিউটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, মাগুর মাছ যুত করে 'আন্না' (রান্না) করলে পাঁঠার মাসের (মাংসের) চেয়েও ভাল লাগবে। চাঁপলটের শাকও খেতে খুব ভাল।

-- কি বিপদ! ভাল তো বুঝলাম। কিন্তু রাঁধবে কে আমার?

মেয়েটি খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বললে -- আমরা তো ছোটলোক মাশায়, নইলে না হয় এঁদেও (রেঁধেও) দিয়ে যেতাম। তা খাও যদি তো বলেন।

শিবনাথের কপালে সারি সারি কুঞ্চন রেখা দেখা দিল। মেয়েটির কথা, হাসি, অঙ্গ-হিল্লোল ক্রমশ যেন বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত মুখর এবং চঞ্চল হয়ে উঠছে।

শিবনাথ ভাবছিল এ আপদকে অবিলম্বে কেমন করে বিদায় করা যায়। আট দশ বছর যাবৎ বিদেশবাসী হলেও এই শ্রেণীর নরনারীর প্রকৃতি ও পরিচয় তার অজানা নয়। এরা সব পারে। সম্পদশালী উচ্চবর্ণের মানুষের চারি পাশে এরা মাছির মত উড়ে বেড়ায়। মনের মধ্যে দুর্ব্বলতার ক্ষত আবিষ্কার করতে এবং সেখানে ব'সে বিষ সঞ্চারিত করে দিতে ওই মাছির মতই এদের পটুত্ব এবং প্রবৃত্তি অসাধারণ এবং স্বাভাবিক। জীবনে স্বভাব ছাড়া শিক্ষা-দীক্ষা নাই, সুতরাং উপদেশে ফল হয় না; মাছিকে যেমন তাড়ানো ছাড়া উপায় নাই তেমনি এদের না তাড়িয়ে এদের হাত থেকেও পরিত্রাণ নাই। শিবনাথ বললে -- আচ্ছা, থাকুক ওগুলো, তুমি যাও।

মেয়েটি হেসে বললে -- দুধের সাথে ঘটিটা শুদ্ধ লেবা নাকি মাশায়?

শিবনাথ উঠল, নিজেই ঘটির দুধটা অন্যপাত্রে ঢেলে নিয়ে ঘটিটা নামিয়ে দিলে।

মেয়েটি এবার বললে -- ঝাঁটা কই মাশায় আপনার।

-- ঝাঁটা কি হবে?

মেয়েটি বললে -- ঘর দুয়ারটা ঝাঁট দিয়ে সাফ করে দিয়ে যাই।

কি বিপদ! শিবনাথ বিরক্ত হয়ে বললে -- ঝাঁটার দরকার নাই। তুমি যাও।

-- তাড়িয়ে দিচ্ছ মাশায়?

শিবনাথ মুখ তুলে তাকালে। চোখে চোখ পড়তেই সে খিল খিল করে হেসে উঠে বললে -- তা তাড়িয়ে যদি দেবা তবে না হয় ঝাঁটা মেরেই দিযো, এখন ঝাঁটা কোথা তাই বল। মেয়েটা নিজেই খুঁজতে লাগল এবং অনতিবিলম্বে ঝাঁটাগাছটা আবিষ্কার করে খস খস শব্দে বাড়ীটার একপ্রান্ত থেকে ঝাঁটা বুলাতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

শিবনাথ রূঢ় কণ্ঠে বললে -- শুনছ! কি নাম তোমার?

মেয়েটি বললে -- 'ময়না'। ব্যাস, তারপর সে ঝাঁটা টেনেই চলল, শিবনাথ আর কি বলছে সে কথা শুনবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলে না। তার ক্ষিপ্র এবং সবল টানে ঝাঁটার মুখে ধুলো উড়ে সমস্ত বাড়ীটাতে যেন কাল-বোশেখীর ঝড় তুলে ফেললে। বহুকাল, আজ

ন-দশ বৎসর ধরে বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে কেউ বাস করে না, মধ্যে মধ্যে দশ পনের দিনের জন্য কি মাসখানেকের জন্য মেয়েছেলে আসে কিন্তু এমন ভাবে পরিমার্জ্জনা করবার প্রয়োজনই কখনও তারা অনুভব করে নি। মেয়েটি বাড়ীর একপ্রান্ত থেকে আরম্ভ ক'রেছে, খানিকটা ঝাঁটা বুলিয়ে টানতেই ধূলোর এক একটি ছোট খাটো স্তূপ হয়ে উঠছে, সে স্তূপটিকে সেইখানে ছেড়ে আবার টেনে চলছে। মেয়েটার চেহারা হয়েছে অদ্ভুত, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত ধূলোর একটা লেপন পড়ে গেছে। মেয়েটা কি পাগল না কি?

ঠিক এই সময়েই এসে উপস্থিত হল সেই অবগুণ্ঠনবতী, মেয়েটির মা। তেমনিই যেমন বলেছিল মেয়েটি। আর তাই-ই হবে। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা থাকলেও খাটো কাপড়ে হাত পা ভালো ক'রে ঢাকা পড়ে নাই। কালো চামড়ার উপর বয়সের মালিন্য এবং কুঞ্চন এখন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। সেও এসে দুধের খালি ঘটি নামিয়ে লেগে গেল মেয়ের সঙ্গে শিবনাথের ঘরের পরিচর্য্যায়। একটা ঝুড়ি খুঁজে এনে স্তূপীকৃত ধূলো ময়লা মাথায় ক'রে বাইরে ফেলে এসে বললে -- ঘর হ'ল লক্ষীর আটন। সেই ঘরের দশা এমুনি করে রেখেছেন মাশায়? আজ আব হ'ল না, কাল এসে জল দিয়ে ধুয়ে, নিকিয়ে চুকিয়ে দিয়ে যাব। আসি আমি, হাত পা ধুয়ে আসি।

শিবনাথের বাড়ীর পাশেই পুকুর। পুকুর না, গড়ে। পানায় ভরা পচা জলের ডোবা একটা। মা ও মেয়েতে তার খবরও রাখে। শিবনাথ অবশ্য বিস্মিত হল না এতে। গ্রাম গ্রামান্তরের পুকুরে মাছ গুগলি ঝিনুক সংগ্রহ করে এরা; পুকুরের পাড়ের উপর থেকে জঙ্গল কেটে জ্বালানীর বোঝা মাথায় বয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং শিবনাথের বাড়ীর পাশে পুকুরের অস্তিত্ব ওদের গোচর থাকায় আশ্চর্য্য হবার কি আছে! কিন্তু এই যে, অযাচিত সেবা, এর অর্থ কি? জমিটার সঙ্গে যে কিছু সংশ্রব আছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি সে সংশ্রব? দিনকাল খারাপ -- মেয়েটার বাপ কি প্রজাস্বত্ব দাবী করছে না কি? কোর্ফা বন্দোবস্ত গোছের কোন একটা কিছু --! চিন্তিত হ'ল শিবনাথ!

মা ও মেয়েতে মুখ ধোয়ার বদলে স্নান করে এসে দাঁড়াল। শিবনাথ চমকে উঠল।-- একি তোরা চান করলি এই গড়েতে?

গা সুঙসুঙ করছিল মাশায়। চানই করলাম।

-- সর্ব্বনাশ! এই পচা জলে?

-- কিছু হবে না মাশায় আমাদের। ওতে আমাদের কিছু হয় না। মেয়েটার মা ঘোমটার মধ্যে থেকে ফিস্ ফিস্ করে বললে।

মা ঘটিগুলি তুলে নিলে, মেয়েটি একটি প্রণাম করে সামনে উপু হয়ে বসে বললে -- মুনিবানকে নিয়ে আসেন মাশায়। আমাদের মুনিবান খুব সোন্দর -- লয় মাশায়? মেয়েটা নির্লজ্জার মত হাসতে লাগল।

মেয়েটির মা এবার প্রণাম করে আবার সেই দীর্ঘ ঘোমটার মধ্য থেকে সুস্পষ্ট ফিস-ফিস শব্দে বললে -- ময়নার বাবা আসবে আপনকার চরণে পেনাম করতে।

ময়নার বাবা এসে প্রণাম করলে শিবনাথের চরণে। চমকে উঠল শিবনাথ সন্ধ্যার অন্ধকারে তাকে দেখে। বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছিল শিবনাথ। বাড়ীর দরজায় একপাশে পথের ধূলোর উপরেই বসেছিল সে। উবু হয়ে বসে হাঁটুর উপরে হাত দুটিকে ভেঁজে রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে কিছু ভাবছিল হয় তো। প্রচুর ধেনো মদের গন্ধ থেকেই শিবনাথ তার অস্তিত্ব অনুভব করলে। নইলে কালো কাপড় এবং দেহবর্ণ অন্ধকারের সঙ্গে এমন মিশে গিয়েছিল এবং এমন স্থির হয়ে সে বসেছিল যে তাকে কোন জড় বস্তু বলে উপেক্ষা করাই ছিল স্বাভাবিক। মদের গন্ধে শিবনাথ নাক সিঁটকে চারিদিক চেয়ে দেখতেই তার নজরে পড়ল লোকটা। প্রথমটা মনে হ'ল কেউ বোধ হয় মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। বিরক্ত হয়ে সে রুক্ষ ভাষায় প্রশ্ন করলে — কে? কে ওখানে?

সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা কালো পাথরে গড়া মূর্ত্তি যেন উঠে দাঁড়াল। কিম্বা মাটির বুক চিরে কোন গুহাবাসী মানুষের কঙ্কাল রক্তমাংসে সজীব হয়ে উঠে এল। অন্ধকারের মধ্যেও তাকে খুব অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল না। খর্ব্বাকৃতি মানুষটি; কিন্তু কাঁধ বুক-হাত স্থূল কঠিন এবং তার মধ্যে একটা প্রচণ্ডতা আছে। শিবনাথ চমকে উঠল -- প্রশ্ন করলে -- কে?

মোটা গলায় সে উত্তর দিলে -- আজ্ঞেন -- আমি বলরাম মাশায়!

সঙ্গে সঙ্গে সে ভূমিষ্ঠ হয়ে শিবনাথের চরণে প্রণত হল। প্রণাম সেরে -- মুখটি ঈষৎ তুলে বললে — ছোঁব আজ্ঞে? চরণের ধূলো লোব?

শিবনাথ এবার টর্চটা বের করে জ্বাললে। তার আরক্ত চোখ দুটি সঙ্কুচিত হয়ে এল। মুখ সরিয়ে নিয়ে সবিনয়ে হেসে বললে -- ওরে বাপরে। ওটা 'ফুটায়েন না'(জ্বালবেন না) মাশায়!

শিবনাথ মুগ্ধ হয়েছিল তাকে দেখে। হ্যাঁ মুগ্ধই হয়েছিল! দৃষ্টির মধ্যে যে ভঙ্গি এবং সন্ধান থাকলে সকল রূপের মধ্য থেকে অপরূপকে আবিষ্কার করা যায় -- তা' তার ছিল। সে সবিস্ময়ে বললে -- তুমিই বলরাম!

একমুখ হেসে সে সবিনয়ে আবার বললে -- আজ্ঞেন হ্যাঁ। আমিই বলরাম মাশায়।

-- তুমিই বলরাম মাশায়? তা তুমি মহাশয় বটে।

বলরাম এবার লজ্জিত হ'ল। সে বুঝতে পারলে তার উক্তির ত্রুটি এবং মনিবের উক্তির রসিকতা। সলজ্জভাবে বললে -- 'আজ্ঞেন না -- আপনাকেই মাশায় বললাম মাশায়।' তারপর, নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বললে -- 'আমরা আপনাদের চি-চরণের দাস। আপনাদের দৌলতে আমাদের 'জেবন'।'

কথাগুলির মধ্যে, কণ্ঠস্বরের মধ্যে এতটুকু স্তাবকতার ভঙ্গি নেই, কৃত্রিমতার রেশ নেই, কপটতার ছাপ নাই। কথা শেষ করে সে উঠে খানিকটা সরে গিয়ে দাঁড়াল -- এতক্ষণে তার প্রণামপর্ব্ব শেষ হ'ল।

শিবনাথ বললে -- 'এস'। ভেতরে এস'। সে উৎকণ্ঠিত হয়েছিল, বলরামের বক্তব্য শুনবার জন্য। কি চায় সে? এ দেশের ভক্তির কথা তার অজানা নয়, এই দেশেরই মানুষ সে। কিন্তু তবু এতখানি ভক্তির আতিশয্য তার কাছে অস্বাভাবিক বলে বোধ হচ্ছিল। এর অন্তরালে অন্ধকার-নিঃশব্দগতি শীতলস্পর্শ সরীসৃপের পাকের মত ভক্তির একটা জটিল বেষ্টনী রচিত

হচ্ছে তার চারিদিকে বলে তার সন্দেহ হচ্ছিল। মুক্ত নির্বিকার যে ভগবান তিনিও নাকি ভক্তি ডোরে এমন বাঁধনে বাঁধা পড়েন যে, তাঁর অক্ষয় ভাণ্ডারের কিছুখানি ক্ষয় না করে পরিত্রাণ পান না।

পরিপূর্ণ আলোয় শিবনাথ তাকে দেখে আরও বিস্মিত হ'ল। লোকটি যেন একটা পুরাকালে গড়া পাথরের মূর্ত্তি, মাটির তলায় পড়েছিল বা পড়ে থাকে -- ধূলার ছাপ সর্ব্বাঙ্গে, পাথর, লোহা, বৃষ্টি-শিলাপাতে ছোট বড় বহু ক্ষতচিহ্নে চিহ্নিত। সবিস্ময়ে শিবনাথ বলরামের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মাথার চুলগুলি সব সাদা হয়ে গিয়েছে। মাথায় গামছার পাগড়ী ছিল বলে এতক্ষণ দেখা যায় নি। শিবনাথের চরণতলে বসে সম্মান প্রদর্শনের রীতি অনুযায়ী মাথার গামছার পাগড়ী খুলতেই শিবনাথের চোখে পড়ল তার মাথার সাদা চুল। শুধু তাই নয়, লোকটির চেহারাও যেন মুহূর্ত্তে পাল্টে গেল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের ভয়াল রূপ তার ওই সাদা চুলের মহিমায় শোভায় -- সৌম্য সুন্দর হয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

বলরামই কথা আরম্ভ করলে, কথা আরম্ভ করবার জন্যই সে সবিনয়ে হেসে বললে -- ভাল ছিলেন বাবু মাশায়? মা ঠাকরুণ ভাল আছেন? ছেলেপিলেরা ভাল আছেন?

শিবনাথ সচেতন হয়ে উঠল বিস্ময়বিমুগ্ধভাব আচ্ছন্নতা থেকে। হেসে সে বললে -- হ্যাঁ। ভাল আছি এবং আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল দেখি? কি কথা আমার সঙ্গে? ওবেলা তোমার স্ত্রী এসেছিল, মেয়ে এসেছিল, দুধ-মাছ আরও যেন কি কি দিয়ে গেল। বাড়ী ঘরের ধূলো পরিষ্কার করে গেল, আবার বলে গেল কাল এসে ধুয়ে, নিকিয়ে দিয়ে যাবে। ব্যাপার কি?

বলরাম বললে -- আজ্ঞে বাবু, আমি যে আপনকার চাকর হলাম। আপুনি আমার মনিব হলেন। মনিব বাড়ীর এ সব কাজ যে আমাদিগে করতে হয়।

-- বুঝলাম। কিন্তু হঠাৎ মনিব হলাম কি ক'রে?

বলরামের মুখ যেন শুকিয়ে গেল, সে শঙ্কিত শুষ্কস্বরে বললে -- আমাকে কি জমি দেবেন না তা' হ'লে?

-- জমি?

-- আজ্ঞেন হ্যাঁ। ওই বরমলাগের মাঠের জমি। আপনি কিনেছেন!

শিবনাথ সোজা হয়ে বসল। বললে -- ও জমির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?

-- আজ্ঞে বাবু মাশায় -- আমিই ওই জমি 'ঠেকো' (ঠিকায়) করি কি না। আজ দু'পুরুষ ধরে আমরা ওই জমিতে খেটে 'প্যাটের রন্ন' (পেটের অন্ন) জুটিয়ে আসছি। আপুনি আজ ছাড়িয়ে লেবেন মাশায়?

ঠিকাদার; -- যাক তবু রক্ষা। শিবনাথ তবু ভাবছিল। সে বিদেশবাসী, বৎসরের মধ্যে কদাচিৎ আসে। এর পর অবশ্য আসতে হবে, জমির টানেই আসতে হবে। বর্ষায় আসতে হবে -- জমি চায হ'ল কিনা দেখতে, মাঘে আসতে হবে ধান আদায় করতে। সঙ্গতিপন্ন ভাগীদের বা ঠিকাদার না হলে তার চলবে না। কে পাহারা দিয়ে বসে থাকবে -- যাতে ঠিকা বা ভাগের ধান খেয়ে শেষ ক'রে না দেয় বলরাম। ঠিকা হলে অজন্মার বৎসরে এই বলরাম বাউড়ী

কেমন ক'রে কোথা থেকে দেবে তার প্রাপ্য ধান?

শিবনাথের নীরবতা দেখে বলরাম হাত জোড় ক'রে বললে — আপুনি মারলে আমি ম'রে যাব। ওই জমি। — বলরামের চোখে জল এসে গেল, কথা শেষ করতে পারলে না সে, মাঝখানেই থেমে গিয়ে মোটা খসখসে হাতের উল্টো পিঠ চোখ দিয়ে মুছতে লাগল।

শিবনাথ বললে — দেখ -- তুমি দুঃখ করো না। বুঝে দেখ তুমি। আমি হলাম বিদেশে থাকিয়ে মানুষ। আমার ঠিকেদার দরকার সদগোপ চাষী কি অবস্থাপন্ন লোক। যে আমার ধানটি আসবামাত্র দেবে। অজন্মা হলে ঘর থেকে দিতে পারবে।

আমিও দেবে মাশায়। আপনার ধান আমি কখন ভেঙে খাব না। দেবতার জিনিষের মত তুলে রাখব। অজন্মা হলে — যা ধান হবে -- আগে আপনার দোব। না-পারি ফিরে বছরে দোব।

শিবনাথ একটু চুপ করে থেকে বললে -- দেখ-- জমিতো তো দেশে অভাব নাই। বরং চাষ করবার লোকেরই অভাব হয়েছে। আমার জমি নাই যদি পাও --

বলরাম বললে — বাবু, ওই জমি আমার মা-লক্ষ্মী। দু পুরুষ ওই জমি করছি। 'বরমলাগের' মাঠ — , লাগের বিষে হোথা ঘাস গজাত না, ধূ-ধূ করত।

শিবনাথ সচকিত হয়ে প্রশ্ন করল -- কি — কি? লাগের বিষে ধূ-ধূ করত? মানে?

-- লাগ মাশায় 'ব্রহ্মলাগ'! সাপ --। ভেষণ সাপ।

-- ও নাগ। ব্রহ্মনাগ।

-- আজ্ঞে হ্যাঁ। সাপের সাপা। তার বিষে -- ঘাস গজাত' না ওখানে। ধূ-ধূ করত' — লাল পোড়ামাটির মাটির ডাঙ্গা।

পুরাকালে গড়া পাথরের দৈত্যমূর্ত্তি কি ভৈরবমূর্ত্তির মত অবয়ব বলবামের, তার হাতের তেলো দুখানিও সেই অনুপাতে গড়া; বরং লাঙলের মুঠো এবং কোদাল কুড়ুলের বাঁট ধরে বোধ করি অনুপাতের শোভনতাকে ছাড়িয়ে একটু বেশী স্থূল-বেশী চওড়া। হাতের তেলো দুখানিকে পাশাপাশি জুড়ে ঈষৎ বেঁকিয়ে সাপের ফণাব মত করে বললে, এই এমনি কুলোর মত ফণা মশায়, ঘোর কালো মা কালীর অঙ্গের মত 'বরণ'- সেই কালোর ওপর কুলোর মত ফণায় শ্বেতবরণ চক্র! ভেতরের দিকটি-মানে গলা, পেট দুধের মত সাদা। ফণা তুলে দাঁড়াত মাশায়, মানুষের বুক বরাবর উঁচু হয়ে উঠত। লকলক করত দুখানি জিভ। উদয় কালে একবার আর একবার ঠিক 'সনজের' সময় ওই ডাঙ্গার ধারে গেলেই লোকে দেখতে পেত, ফণা তুলে সূর্য্যের পানে তাকিয়ে দুলছেন। বাঁয়ে একবার ডাইনে একবার মধ্যে মাঝে ছোবল দিয়ে ঝড়ার মত মাটিতে পড়ছেন 'সাঁট-পাট' (লুটিয়ে) হয়ে। ছোবল মারছেন না, সূর্যিদেবকে পেনাম করছেন। তিনিই ছিলেন ওখানে, তাঁর বিষে ওখানকার মাটি পোড়ামাটির মতন লাল হয়ে গিয়েছিল। ঘাস হ'ত না। জীব জন্তু মানুষ জন কেউ যেত না। ধূ-ধূ, ধূ-ধূ, করত। সেই ডাঙ্গা আমার বাবা ভেঙেছিল মাশায়।

শিবনাথ স্তব্ধ হয়ে শুনছিল, ভাল লাগছিল তার, বলরামের গল্প বলার ভঙ্গিটিও ভাল। কণ্ঠস্বরে বিপুল আবেগ সঞ্চারিত করে, বিস্ফারিত চোখে আতঙ্কের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে হাত

পা নেড়ে কথাগুলি বলে যাচ্ছিল -- মনে হচ্ছিল সে যেন সেই নাগকে চোখে দেখছে. শিবনাথেরও মনে হল এই সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর সেও যেন দেখতে পাচ্ছে মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মনাগকে। আদিমকালের মানুষের মত অন্ধবিশ্বাস ভরে এই অর্দ্ধ বন্য মানুষটির এই কাহিনী তাকে যেন মোহগ্রস্ত করে তুলেছিল। বলরাম স্তব্ধ হ'তেই সে বললে, -- তারপর?

মৃদু হেসে বলরাম বললে, তারপর মাশায়?

-- হ্যাঁ তাবপর? মানে, তোমার বাবা ভেঙেছিল ওই ডাঙ্গা। কিন্তু নাগ গেল কোথায়?

-- লাগ?

-- হ্যাঁ-হ্যাঁ। তোমার বাবা কি নাগকে মেরেছিল?

ঘাড় নাড়লে বলরাম। -- বাবার সাধ্যি কি মাশায়? আমার বাবার বাবা। দুটি হাত জোড় করে বলবাম কপালে ঠেকালে, সম্ভবত পিতামহকেই নমস্কার করলে।

-- বিদ্যা জানতেন তিনি। 'পেলয়' (প্রলয়) পুরুষ, এই লম্বা, এই বুকের ছাতি, মাথায় বড় বড় চুল. এই দাড়ি 'মোচ' (গোঁফ)। এই আমাকে দেখছেন তো -- আমার বাবা বলতো. আমার চেয়েও একহাত লম্বা ছিল মাথায়। এই মোটা মোটা চোখ, রাগলে রাঙা কুচবরণ হয়ে উঠত। লোকে বলত 'ডাকিনী বাউরী'। নাম ছিল নটবর; তা সে নাম লোকে ভুলেই গিয়েছিল। এক বেদের মেয়ের সঙ্গে জোয়ান বয়সে হয়েছিল ভালবাসা। সেই দিয়েছিল 'তাকে কাঁউরেব' (কামরূপের) বিদ্যে।

বাউরীব ছেলে নটবর শাহী জোয়ান, শান্ত শিষ্ট মানুষ. চাষ করত। গিয়েছিল সদগোপ চাষী মনিব মহাশয়ের তত্ত্ব মাথায় কবে তার জামাই বাড়ী। বিশ ক্রোশ পথ। জ্যৈষ্ঠ মাস, জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব সেখানে পৌঁছে দিয়ে, বিদায়ের লাল গামছা মাথায় বেঁধে, আধুলীটি ট্যাঁকে গুঁজে পরের দিন ভোর ভোর বাড়ী ফিরবার জন্য বেরুল। দশ ক্রোশের মাথায় প্রকান্ড দু ক্রোশ লম্বা মাঠ। মাথার উপর সূর্য্য যেন জ্বলছে। আগুন যেন গলে গলে পড়ছে, মাঠের মাটি আগুনেব মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, বাতাসের প্রবাহের মধ্যে বিষ নিশ্বাসের জ্বালা বয়ে যাচ্ছে। নটবব তারই মধ্য দিয়ে চলেছিল। ষষ্ঠীর দিন, বাড়ীতে স্ত্রী অপেক্ষা করে থাকবে, মনিব বাড়ী থেকে রুটির প্রসাদ আনবে, শাশুড়ী আসবে কাঁকুড় আম তালশাঁস ভিজে কলাই সাজিয়ে 'বাঁটো' নিয়ে, ফোঁটা দিয়ে হলুদ সুতো বেঁধে দেবে, দুটি ছেলে আছে বাড়ীতে তারা থাকবে পথ চেয়ে। আট আনা বকশিস পেয়েছে, তা থেকে দুখানি গামছা কিনে দেবে তাদের, কখনও সে গামছা তারা পরবে, কখনও মাথায় বাঁধবে, কখনও গায়ে দেবে চাদরের মতন। খাঁ খাঁ করছে মাঠ, দূরে ঝিব ঝির করে কাঁপছে আবছা অস্পষ্ট কিছু, তারই মধ্যে হন হন করে চলেছিল নটবর।

-- "রোদ বলেন, 'তাত' বলেন -- ও সবে আমাদিগে কাবু করতে পারে না। জল ঝড় ওসবে আমাদের মাতন লাগে। কাবু করে 'পাথবে' (শিলাবৃষ্টিতে)। তা আমরা বুঝতে পারি। 'বুয়েচেন কি না'। -- বলরাম অহঙ্কারের সঙ্গে বললে। বললে -- বলেন না কেনে বলরাম তু বেটাকে যেতে হবে এই রাত্রিতে দশ কোশ পথ। হন হন করে চলে যাব। দেবতার নাম করে 'অঙ্গবন্ধন' করব, নির্ভয়ে চলে যাব। আমার কত্তাবাবা ছিল অসুর। রোদ তাতকে সে ডরাবে

কেনে? জন মনিষ্যি নাই মাঠে, গরু বাছুর পর্য্যন্ত দুপুরের আগেই ঘরে নিয়ে গিয়েছে রাখালেরা; খাঁ খাঁ করছে চারিদিক, ক্রোশ খানেক দূরে গেরাম, গেরামের গাছপালার মাথা গুলান পর্য্যন্ত ধূলো লেগেছে -- মনে হচ্ছে যেন ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে; মনে হচ্ছে যেন অনেক দূর, অনেক দূর -- এ পথ আর ফুরোবার নয়। এই দুকোশ লম্বা মাঠের মধ্যে একটি বটগাছ। সেই গাছের তলায় বুয়েচেন কিনা আড়ে দীঘে বেবাক আলপথ এসে মিলেছে।"

দীর্ঘ মাঠের মধ্যে একটি বটগাছ ছত্রছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠখানার বুকের উপর দিয়ে যতগুলি পথ উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে চলে গিয়েছে সবগুলি স্বাভাবিকভাবেই উপনীত হয়েছে ওই বটগাছের তলায়। নটবরের গাছতলায় বিশ্রাম করবার ইচ্ছা ছিল না, সে চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখতে পেলে গাছটার ও পাশে একটি মেয়ে। কালো মেয়ে কিন্তু নটবরের মনে হল এমন রূপ সে জীবনে কখনো দেখে নি। রূপ তার রঙে নয়, রূপ তার সর্ব্বাঙ্গে, দীঘল গড়নে, কোঁকড়া চুলে, টিকালো নাকে, টানা চোখে, রং কালো হলেও তার রূপের একটা ছটা আছে সকল অঙ্গ সুন্দর না হলে এ ছটা কখনও ফোটে না। গাছকোমর বেঁধে কাপড় পরেছে—কাপড়খানা যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। লতা যেমন পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরে কচি কিশোর গাছকে। মেয়েটি গাছের ওপাশে একটা উইটিপির মত টিপির সামনে বসে শাবল চালিয়ে মাটি খুঁড়ছিল।

বটতলার ছায়ায় অঙ্গ জুড়িয়ে গেল কিন্তু তাব চেয়েও জুড়িয়ে গেল তার চোখ ওই কালো মেয়েটিকে দেখে। বরমলাগের ডাঙ্গায় টিলার নীচে আছে ছোট একটি ঝর্ণা, তলায় কালো ঝিকমিকে বালি, তার উপর ছিলছিলে কাঁচ-স্বচ্ছ জল, ওই কালো বালির রঙ তার কাঁচের মত জলের সর্ব্বাঙ্গে ফুটে থাকে। দুই কিনারায় বারোটি মাস সবুজ ঘাসের বেড়। মেয়েটিকে দেখে মনে পড়ল সেই ঝর্ণাটির কথা। দাঁড়াতে হ'ল নটবরকে। জোয়ান বয়স, নটবরের মত অসুরের মত পুরুষ, সে কি এমন মেয়েটিকে দু দন্ড চোখ ভ'রে না দেখে যেতে পারে? দেখতে দেখতে নটবরের ইচ্ছে হ'ল দুটো কথা বলে। মেয়েটির গলার আওয়াজ শোনে। ইচ্ছে হ'ল কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার মাথার কোঁকড়া চুলের বাস নেয় বুক ভ'রে। মেয়েটির কিন্তু কোন দিকে নজর নাই। সে টিপিটা খুঁড়ছেই। নটবর বুঝতে পেরেছিল সে কি করছে। হাতে শাবল, পাশে বাঁশের শলার ঝাঁপি, পিছন দিক থেকে গলার উপর দেখা যাচ্ছে কালো চকচকে পদ্মটাটির' (বীজের) মালা, হাতে লাল সূতোয় জড়িবুটির তাগা। এ-মেয়ে বেদের মেয়ে, ওই টিপিটার মধ্যে সাপের সন্ধান পেয়েছে। তাকে ডেকে কথা বলা এখন ঠিক হবে কিনা তাই ভাবছিল নটবর। ঠিক এই সময় গর্ত্ত থেকে ফুঁসিয়ে বেরিয়ে পড়ল এক কাল কেউটে। সঙ্গে সঙ্গে বেদের মেয়ে উঠালে তার হাত। ওদিকে ঠিক পাশের গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে পড়ল আর একটা কেউটে। এরপর কি হ'ল সে আর দেখতে পেলে না নটবর। এতবড় পুরুষটা, ভয়ে সে চোখ বুঁজে ফেললে -- আপনি যেন চোখের পাতা নেমে এল। বিদ্যুতের ছটার তেজ সইতে না পেরে চোখ যেমন আপনি বন্ধ হয়ে যায় সেই ভাবে বুকের ভিতরটা চমকে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে বেদের মেয়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল, ক্রুদ্ধ বাজপাখীর ধারালো সূচালো ডাকের মত সে আওয়াজ -- এ-ই -- ও! তারপর আবার বেদের মেয়ের আওয়াজ পেলে সে,

এবার আওয়াজ সে আওয়াজ নয়, ব্যস্ত ত্রস্ত কিন্তু সে আওয়াজ মিষ্টি, বললে -- কে তুমি? ও ভাই! তারপরই সে হেসে উঠল খিল খিল ক'রে। -- ও-মা! এতবড় মরদ, ভয়ে চোখ বুজেছ? খোল-খোল চোখ খোল।

চোখ খুলে নটবর শিউরে উঠল। বেদের মেয়ে দুই হাতে দুটো কেউটের মুখ চেপে ধরেছে কিন্তু কেউটে দুটো নিষ্ঠুর পাকে জড়িয়ে ধরেছে তার লম্বা কালো হাত দুটি। পাকের ফাঁকে ফাঁকে হাতের মাংস ফুলে উঠেছে।

বেদের মেয়ে বললে -- ঝাঁপির পাশে কাস্তে আছে। কাস্তে দিয়ে কেটে দিতে পারবে ডান হাতের সাপটাকে পাকে পাকে? শিগ্রি ভাই -- নইলে হাতের মুঠো আর রাখতে পারব না। জীবনটা যাবে।

নটবর ছুটে গিয়ে নিয়ে এল কাস্তেখানা। সাপ দুটোর গলায় -- বেদেনীর মুঠোর নীচে কাস্তে চালিয়ে দু টুক্‌রো ক'রে দিলে। বেদেনী বললে -- এইবার এক কাজ কর ভাই, আমি সাপের মুখ দুটো ফেলব, কিন্তু ছুঁড়ে দূরে ফেলবার জোর নাই আড়ষ্ট হাতে। পড়বে পায়ের কাছে, তুমি আমাকে পিছন থেকে টেনে নিতে পারবে?

নটবর তার সামনে মেলে ধরলে তার মাথার নতুন লাল গামছাখানা; বললে -- দাও, এতে ফেলে দাও, ঝোলার মধ্যে ভিক্ষের মত পড়বে।

বেদের মেয়ের নাম লালমণি।

কাটা সাপের বাঁধন কেটে হাত দুখানি মুক্ত হতেই বললে -- কি তোমাকে দিব ভাই, আমি বেদের মেয়ে, কি বা আমার আছে? তুমি আমায় বাঁচিয়েছ আজ।

নটবর বললে -- কেনে ভাই, তুমি নিজেই বলে সাতরাজার ধন মাণিক। আমার গামছায় দিয়েছ সাপের ফণার মাণিক তুমি -- তোমাকে পেলে মাথায় নিয়ে আমি যে রাজা হ'তে পারি।

বেদের মেয়েব চোখ ঝকমকিয়ে উঠল। নটবরের বিশাল দেহখানার দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। তারপর হঠাৎ উঠে নটবরের গলা জড়িয়ে ধরে বললে -- আমার সোয়ামী নাই কিন্তু বাপ আছে -- ভাই আছে; তারা তো তোমাকে সইবে না। তুমি আমাকে তোমার ঘরে নিতে পারবে?

-- মাতায় ক'রে নিয়ে যাব।

-- ঘরে কে আছে তোমার?

-- পরিবার আছে - দুটি ছেলে আছে।

-- তবে তোমার ঘরে নয়। সতীন নিয়া ঘর করতি পারব না ভাই। দেশান্তরী হতে পারবে আমাকে নিয়া?

নটবর উঠে দাঁড়াল। বললে -- চল, এখুনি পথ ধরি।

বলরাম বললে -- সেই যে গেল কত্তাবাবা (ঠাকুরদাদা) পথে পথে বেদের মেয়ের সাঁতে (সাথে), ফিরল পনের বছর পর। মাথায় লম্বা চুল, মুখে এই দাড়ি 'মোচ' (গোঁফ), হাতে

লোহার তাগায় মাদুলী কবচ জড়িবুটি, গলায় পদ্মটাটির মালা, কাঁধে একটা বাঁকে ঝোলানো বেদের ঘরের সাজসরঞ্জাম, তুমড়ী বাঁশী, বিষম ঢাকীর বাজনা, গর্ত্তখোঁড়া শাবল, কি একটা লতার ডালের লাঠি, ঝাঁপিতে সাপ নিয়ে গেরামে ফিরে এল। কেউ চিনতে পারলে না। দুই ছেলেকে রেখে গিয়েছিল সাত বছরের আর পাঁচ বছরের -- আমার জেঠা আর বাবা -- তারা তখন জোয়ান হয়ে উঠেছে। গরুর সেবার চাকরী ছেড়ে বাপের মনিব বাড়ীতে চাষের মাইনে করা কৃষান হয়েছে। বাপ রইল ছেলেদের দিকে চেয়ে ছেলেরা রইল বাপের পানে তাকিয়ে, কেউ কাউকে চিনতে পারলে না। চিনতে পারলে যে চিনবার সে। পরিবার ঠিক চিনলে। ঘাটে গিয়েছিল জল আনতে আমার কত্তা মা। সে জলভরা কলসী কাঁখে বাড়ীতে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। কত্তাবাবার লম্বা চওড়া কাঠামোর দিকে তাকিয়েই সে বললে,--

-- কে গো তুমি?

নটবর হেসে বললে -- আমাকে চিনতে পারছিস না বউ?

নটবরের স্ত্রীর কাঁখাল থেকে কলসীটা খসে পড়ে ভেঙে গেল, সে ছুটে পালিয়ে গেল।

ছেলেরা অবাক হয়ে গেল। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই তারা ব্যস্ত হয়ে মায়ের পিছনে ছুটে গিয়ে ডাকলে -- মা--মা।

নটবরও এগিয়ে গিয়ে ডাকলে -- বউ -- বউ!

মা হেঁকে বললে -- না। না।

নটবর বললে -- বুঝেছি আমি বুঝেছি। ফিরে আয় তু ফিরে আয়। তোর দোষ আমি ধরব না, আমার দোষ তুই ধরিস না।

নটবরের স্ত্রী দাঁড়াল এবার। বললে -- মা কালীর দিব্যি কর তুমি।

নটবর বললে -- মা কালীর দিব্যি।

ফিরল নটবরের স্ত্রী। ফিরে এসে বললে -- এতকাল পরে কেনে ফিরলে তুমি?

নটবর বললে -- পনের বছরের বারোটা বছর মনের সঙ্গে যুঝে যুঝে আর পারলাম না বউ, এদিকে মা কামিক্ষ্যেও খালাস দিলেন, লালমণি ম'ল। আমি আর থাকতে পারলাম না; ফিরে এলাম।

নটবরের স্ত্রী বললে -- ফিরে এলে; থাকতে পারবে? ভাল লাগবে?

নটবর পরিবারের দিকে চেয়ে হাসলে! বললে -- বললাম তো পনের বছরের বারোটা বছর মনে মনে পুড়েছি -- 'ঘর ঘর আর ঘর' ক'রে। লালমণি তোকে ভুলিয়েছিল -- ছেলে দুটোকেও ভুলিয়েছিল কিন্তু ঘর ভুলাতে পারে নাই।

বর্ষার সময় ঝমঝম করে জল নামত, আকাশ ঘোর ক'রে মেঘ আসত, গর গর করে ডাকত, লোকের ঘরের দাওয়াতে, নয় তো কোন চালায় শুয়ে থাকত তারা, লালমণি -- বর্ষার আমেজে অঘোরে ঘুমাতো, আশেপাশে ব্যাঙ ডাকতো, মাথার শিয়রে ঝাঁপিতে সাপের নিশ্বাস পড়তো, নটবর ঠায় জেগে থাকত। ঘর মনে পড়ত; চাষবাসের কথা মনে পড়ত। কাড়ান লাগবে, জলে থৈ থৈ করবে মাঠ, মাটি দলদল করবে, ভাই বন্ধুরা চাষ করবে, সেই সব মনে

পড়ত। অঘ্রান পোষ মাসে ধান উঠত, নটবর উদাস হয়ে যেত। কিন্তু সে কথা বলবার জো ছিল না লালমণিকে। সে জানত কাঁউরের ডাকিনী মন্তর;নটবরকে মন্তর শিখিয়েছিল — বিদ্যা দিয়েছিল, কিন্তু সব দেয় নাই, পাছে তার মন্তরের মায়া কেটে সে পালায়, তাই দেয় নাই। পালালে নটবরকে মেরে ফেলত বাণ মেরে কি নাগ ছেড়ে দিয়ে। যেখানে যাক না কেন — সে নাগ তাকে না-মেরে ছাড়ত না। লোহার বাসর ঘরের সরষে প্রমাণ 'ছিদ্দ' (ছিদ্র) বিষ নিশ্বেসে বড় হয়েছিল। সেই পথে ঢুকে লখাইকে ডংশেছিল কালীনাগ। তেমনি ক'রে ঘরে হোক,গাছে হোক, পাহাড়ের আড়ালে হোক যেখানে থাকতাম — ডংশাতো নটবরকে। "তাছাড়া—।" কথা বন্ধ ক'রে নটবর একটু হাসলে।

ছেলেরা, পরিবার অবাক হয়ে শুনছিল নটবরের কথা। তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল নটবরের মুখের দিকে। নটবর হাসিমুখেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে — "তা ছাড়া তার সে মন্তরের মায়া কাটাবার ক্ষ্যামতাই আমার ছিল না। লালমণি সে বিদ্যেটুকু আমাকে দেয় নাই। তার মুখের দিকে চাইলে আর চোখ ফেরাবার মত দুনিয়াতে কিছু খুঁজে পেতাম না। সব ভুলে যেতাম। তবে লালমণি আমার মনের কথা বুঝত। মধ্যে মধ্যে বলত। বলত — বল কি চাও তুমি। আমি বলেছিলাম — এক জায়গায় একখানি ঘর করি, সংসার পাতি।"

লালমণি বলত — তারপরে?

— আমি খাটব-খুটব চাষবাস করব, ভদ্দরলোকের জমি ভাগে কি কৃষাণীতে নেব;চলে যাবে দিন সুখে স্বচ্ছন্দে।

কিন্তু সে লালমণির পছন্দ হ'ত না। একবার এক জায়গায় এক বাবু মহাশয়দের বাড়ীতে সাপ ধরেছিল তারা;সাপের উপদ্রবে বাড়ীতে বাস করতে পারছিলেন না তাঁরা।তাঁদের বাড়ীতে সাপ ধরলে দুজনে । তাঁরা থাকতে একখানি বাড়ী দিলেন। লালমনি সেবার হেসে বললে — তাই কর, এবার তোমার যা ভাল লাগে তাই কর। নটবর বাবুদের বাড়ীতে কৃষাণী নিলে। ভারী আনন্দ। চাষ হল, আষাঢ় শাওন ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক; অঘ্রানে ধান পাকল, পৌষে ধান উঠল। ধানের ভাগের সময় ক্ষেপে গেল লালমণি। মনিবদের দুভাগ নটবরের একভাগ দেখে মুখ ভার করেছিল সে: কিন্তু হিসেব নিকেশ করে দেড়া বাড়িতে সে একভাগেরও যখন বারো আনা চলে গেল তখন সে হন হন করে পালিয়ে এল খামার থেকে । কিছুক্ষণ পরই তখন সন্ধ্যে হয়েছে, একজন এসে নটবরকে খবর দিলে তার ঘরে আগুন লেগেছে। নটবর ছুটে গিয়ে দেখলে ঝোলা ঝুলি-ভার-বাঁক উঠানে বার করে জলন্ত ঘরের দিকে চেয়ে লালমণি দাঁড়িয়ে আছে। মুখে রা নাই, বোল নাই, নটবর কাছে এসে দাঁড়িয়ে শুধু শুনতে পেলে দাঁতে দাঁতে ঘষে নিষ্ঠুর একটা কিস্‌ কিস্‌ শব্দ করছে লালমণি। নটবরকে বললে — ধান যা পেলি বেচে আয়, বাঁক কাঁধে নে, চল।

নটবর বুঝলে সব। ঘরে আগুন লালমণি নিজেই দিয়েছে। সেই আগুনের লালচে আভা পড়েছিল লালমণির মুখে, সেই মুখ দেখেই বুঝলে সব। শুধু তাই নয়, সে মুখ দেখে ভয় হল নটবরের। লালমণির সাদা চোখে লালচে আগুনের ছটার সঙ্গে কুহকী বিদ্যার মৃত্যুবাণও যেন ঝিলিক মারছে বলে মনে হল। লালমণি আবার আঙুল দেখালে বাঁকের দিকে। বললে — তোল্‌, ঘাড়ে তোল্‌।

নটবরকে ঘাড়ে তুলতে হল বাঁকে-বাঁধা সংসার, আবার ধরতে হল পথ। পথে লালমণি বললে -- আবার যদি কোন দিন বলবি ঘর বাঁধব, চাষবাস করব, মুখের ডগাতেও যদি আনবি তো আকামা সাপ দিয়ে তোর মাথার তালুতে ডংশাব, বলে দিলাম। ঘুমিয়ে থাকবি আর উঠবি না। 'শিরে হৈল সর্পাঘাত তাগা বাঁধবি কোথা?'

তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে বললে -- যে কুকুর এঁটো পাত একবার চাটে সে কখনও তার লোভ ছাড়তে পারে না। চাষা বাউড়ী চাষের গোলামির রস ছাড়তে পারলি না।

আবার বললে -- আমি মুনির মন ভুলাতে পারি কুহকী বিদ্যায়, তোকে ওই রস ভুলাতে লারলাম।

নটবর স্ত্রীকে বললে -- লালমণি মরল সেদিন। সাপের বিষেই মরল। ভেবেছিলাম পথে পথেই কাটাব জীবনটা। কিন্তু তা পারলাম না। ফিরে এলাম। বুড়ো বয়েসটা ঘরের আরামের লোভ সামলাতে পারলাম না। বড়ই সাধ চাষ আবাদ করব। ফসল কুটো হবে, নাতি পুতি হবে। তাই ফিরে এলাম।

নটবরের স্ত্রী কাঁদছিল।

নটবর বললে -- কাঁদিস না। গাঁয়ে এসেই খোঁজ নিয়েছি সব। যখন শুনলাম -- তুই আর সাঙা করিস নাই, তখুনই মনে মনে তোকে আশীর্ব্বাদ করলাম। সাঙা করলে তো চুকেই যেত সব। অন্য সোয়ামীর ঘর করতিস ছেলে পিলে নিয়ে। এ দুটোকে ভগবান বাঁচাতেন তো বাঁচতো, নইলে মরতো। লোকে বললে -- মনিবের নজরে পড়েছিলি -- তাকে ভজেই আছিস, ছেলেরাও কাজ করছে মনিব বাড়ীতে। তা বেশ করেছিস। ওতে আমি রাগ করি নাই।

হঠাৎ হেসে নটবর বললে -- মনিব বাড়ীতে যখন জমি ভাগে নি -- তখন আমিই তো তোকে দশবার করে পাঠাতাম মনিব বাড়ী ছুতো নাতা ক'রে।

নটবরের স্ত্রী এবার গালাগাল দিতে দিতে উঠে গেল। -- মরণ! হা' ঘ'রে মাগীর সঙ্গে থেকে সহবৎ হয়েছে দেখ। মুখে আর আটকায় না কিছু। ছেলেরা ব'সে রয়েছে -- আর --। মর-মর-মর বাউন্ডুলে বুড়ো!

নটবর এবার ছেলেদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলে। বড় ছেলের চেহারা ঠিক তার মত হয়েছে। তেমনি লম্বা চওড়া তেমনি চওড়া বুক। তাকে আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে বললে -- চাষ করতে পারছিস্? দুপুরে কতটা জমি চষতে পারিস?

ছেলে সলজ্জভাবে বাপের হাতের তাগা নাড়তে নাড়তে বললে -- তা পারি বৈকি অনেক।

নটবর বললে -- তাগা নেড়ে দেখছিস? তা' তোকে এ বিদ্যা দোব আমি।

ছোট ছেলে অর্থাৎ বলরামের বাপকে কাছে নিয়ে বললে -- এ বেটা মাথাতে খাটো হয়েছে।

বরমলাগকে পূজো দিত নটবর। নটবরের নাম তখন ডাকিনী বাউড়ী হয়ে গিয়েছে। জাত গিয়েছে, হা ঘ'রে বেদের মেয়ের সঙ্গে পনের বছর বসবাস করেছে, জাতি-জ্ঞাতিরা বললে -- আমরা মার্জ্জনা করলেও দশখানা গাঁয়ের স্বজাতিরা মার্জ্জনা করবে না। তোমার ছেলের বিয়ে হবে না।

ডাকিনী বাউড়ী বললে -- কুছ পরোয়া নাই। আমি আলাদা থাকব। গাঁয়ের ধারে ঘর তুলব।

তাতে কেউ আপত্তি করলে না। হাজার হলেও গুণীন মানুষ। কত উপকারে লাগবে। তা ছাড়া, ভয়ও আছে। কুহকী বিদ্যায় অঘটন ঘটাতে পারে ডাকিনী বাউড়ী। রোজ সকাল আর সন্ধ্যায় ব্রহ্মনাগ মানুষের বুক ভর উঁচু হয়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের লাল আকাশের দিকে চেয়ে হেলত' দুলত', ডাকিনী ডাঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে দেখত, নাগ চলে যেত, সেও প্রণাম করে ফিরে আসত।'

হঠাৎ সেবার নামল প্রলয় বর্ষা।

বলরাম বললে -- "তেমন বর্ষা মাশায় সেকালের লোকে কেউ দেখে নাই। একাল পর্য্যন্তও হয় নাই। তেরশো চল্লিশ সালে -- কঙ্কন গেরাস গেরনের (গ্রহণের) বারে বর্ষা নেমেছিল -- এই সেবারে সাইকোলোন হয়েছিল -- সে সবও তার কাছে কিছু লয়। সে যেন মেঘ শুদ্ধ আকাশ পিথিমীর উপর ঝাঁপিয়ে ভেঙে পড়ল। বরমলাগের মাঠ ছিল লাল কাঁকরের ঢিপি। সেই ঢিপি থেকে চারিপাশে জলের ঢল নামতে লাগল হুড় হুড় করে, নদীর মত তোড়; লাল মাটি গলা জল রাঙা হয়ে গেল, গোটা সমতল চাষের মাঠ লাল জলে থৈ থৈ করতে লাগল। লাল মাটির চাঙড় খসে পড়তে লাগল -- নদীর কিনারায় ধবসের মতন। বর্ষা শেষ হলে অবাক কান্ড।"

বর্ষার শেষে লোকে সবিস্ময়ে দেখলে -- বরমলাগের ডাঙ্গার কিনারা ধবসে গিয়ে তলায় বেরিয়েছে অপরূপ মাটি। মাখনের মতন নরম, দুধের মতন রঙ; শুধু তাই নয়—সে মাটিতে দূর্ব্বা ঘাস বেরিয়েছে। এক বিঘৎ পুরু হয়ে উঠেছে মৃত্তিকার উর্ব্বরতায়, ঘন সবুজ লাবণ্যে ঝলমল করছে।

সে ঘাসের লোভে একটার পর একটা করে পাঁচটা গরু মারা পড়ল বরমলাগের দংশনে। লোকে সাধ্যমত আগলে রাখত কিন্তু তবু দূর থেকে ওই সবুজ ঘাসের লোভে গরু ছুটে গিয়ে পড়ত রক্ষকের অন্যমনস্কতার অবসরে। ছুটে যেত, কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই চীৎকার করে উঠত, খানিকটা ছুটে এসেই বসে পড়ত, ওদিকে দেখা যেত বরমলাগ ভাঙনের তলা থেকে উঠে যাচ্ছে টিলার উপর। সে বিষের প্রতিকার ডাকিনী বাউড়ীও করতে পারলে না। সে গাঁয়ের লোককে বললে -- বরমলাগ শিবের গলার পৈতে, লাগের নিশ্বেস পড়ে, শিবের নাকে যায়, তাতেই বাবার চোখ হরদম ঢুলুঢুলু। ওর 'পিতিকার' নাই, যমের যমদন্ডের কাঁটা নিয়ে ওর দাঁত তৈরী হয়েছে! তোমরা বাপু নিজেরা সাবধান হও।

নাগের ডাঙ্গার কাছে দাঁড়িয়ে জোড় হাত ক'রে বলে -- তুমি যখন দেবতা তখন অবোলা জীবের অপরাধ নাও কেনে! যিনি যমরাজা তিনিই ধর্ম্মরাজ, অধর্ম্মের কাজ তো তিনি করেন না! তা ছাড়া -- গরু মা ভগবতী, ওই গরুর ক্ষুরের ছাপ নিয়ে তোমার ফণা তৈরী। ওই মায়ের দুধেই -- তোমার সব চেয়ে তৃপ্তি! বাবা শিবের বাহন। তোমার মাহাত্ম্যি যেমন -- গরুর মাহাত্ম্যিও তেমনি। মা বসুমতী বুকে ঘাস গজিয়েছেন, ওই সুরভি মায়ের ভোগের জন্যে। গরুর দোষ কি? এমন ক'রে 'কোধের' (ক্রোধের) মাথায় গো হত্যে ক'র না তুমি। 'কোধ' সামলাও, সম্বরণ কর!

বলতে বলতে সে এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেল ভাঙনের দিকে। প্রায় দু কাঠা জমি! দু কাঠা জমির উপরের লাল মাটির চাপ ভেঙে গলে গিয়েছে। সেখানে মাখনের মত নরম মাটি বেরিয়েছে। তার মধ্যে চাপড়াবন্দী হয়ে দূর্ব্বা ঘাস বেরিয়েছে, মধ্যে মধ্যে খালি জায়গায় বেরিয়ে আছে সেই মাটি। এক মুঠো মাটি হাতে নিয়েছে— ওমনি গর্জ্জন উঠল। টিলার উপরের কোন খন্দক থেকে মাথা তুলে উঠল বরমলাগ।

ডাকিনী বাউড়ীও ডাকিনী বাউড়ী। বললে — তুমিও লাগ আমিও মানুষ। তুমি বরমলাগ আমি ডাকিনী বাউড়ী। আমি অনিষ্ট করতে আসি নাই তোমার। তুমি বিনা দোষে আমার অনিষ্ট করলে — আমার হাতেও সর্পনাশা ডালের দন্ড আছে।

কিন্তু বরমলাগ মানলে না। মাথা তুলেই সে সর-সর করে নামতে লাগল, ডাকিনী বাউড়ী পিছু হটতে আরম্ভ করলে। হাতের ডান্ডা বাগিয়ে ধরলে। কিন্তু আবার মনে হ'ল, না — থাক। লাগ তখন এগিয়ে চলে এসেছে। ডাকিনী বাউড়ী ডান্ডা না তুলে — পরণের কাপড় খানা খুলে মন্তর পড়ে গন্ডী বন্ধন ক'রে লাগের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে চলে এল। বললে —থাক — থাক — ওই পর্য্যন্ত থাক। কাঁউরের মা কামিক্ষ্যের হুকুম, বিষহরির দোহাই, ওই হ'ল লক্ষণের গন্ডীবন্ধনের আঁক! রাম সীতা লক্ষণের দোহাই!

নাগ সত্য সত্যই আর অগ্রসর হ'তে পারলে না। সে সেই কাপড়খানার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। বারকতক দংশন ক'রে চলে গেল ফিরে সেই টিলার উপর।

খানিকটা ছুটে এসে উলঙ্গ ডাকিনী বাউড়ী ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে। গাঁয়ের লোক তখন ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে আরও খানিকটা পিছনে। অবাক হয়ে দেখছে ডাকিনী বাউড়ীর কান্ড। মেয়ে ছেলে মোড়ল মাতব্বর সবাই। লাগ চলে গেল টিলার উপরে, ঢুকে গেল একটা খোয়াইয়ের মধ্যে একটা গর্ত্তে ;ডাকিনী বাউড়ী হাতের মাটির মুঠোটা দেখতে-দেখতে ফিরল, এগিয়ে এল মাতব্বরদের দিকে। উলঙ্গ হয়ে আছে সেও হুঁস নাই হুঁসও নাই আর যে কাঁউরের বিদ্যা জানে তার লজ্জাও না কি থাকে না।

মেয়েরা লজ্জায় ছুটে পালাল। ছোট ছেলেরা হিহি করে হাসতে লাগল ছোকরারা মুখ ফেরালে। মাতব্বরেরা আঃ-আঃ করতে লাগল। ডাকিনীর বড় ছেলে নিজের গামছাখানা নিয়ে বাপের কোমরে জড়িয়ে দিলে।

ডাকিনী হেসে বললে অ! অর্থাৎ এতক্ষণে তার খেয়াল হল যে সে উলঙ্গ হয়ে রয়েছে।

ছেলে বললে -- হাতে কি?

ডাকিনী বললে -- মাটি।

— মাটি?

— ওই কাঁকড়ের তলায় কি মাটি আছে দেখ। ওপরটা জ্বরে গিয়েছে লাগের বিষে, তলাতে মা বসুমতীর চেহারা দেখ। ঘাস কি সাধে হয়েছে অমন!

মোড়লরা এগিয়ে এল। দেখি! দেখি! দেখি!

শিবনাথ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল। বলরাম হাত-পা নেড়ে বলে যাচ্ছিল। কণ্ঠস্বর তার কখনও গম্ভীর, কখনও হাস্যরসে সরস, কখনও বা সকরুণ, কখনও বা তত্ত্বদর্শিতার ঔদাস্যে

উদাস আর অন্তরালে বাজে প্রচ্ছন্ন আক্ষেপের সুর! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বলরাম। তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল ওই উদাস সুরের অন্তরে আক্ষেপের বেদনা। সামনে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে -- আকাশ ভরা নক্ষত্র। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বলরাম বললে — লোভ নাকি-নি পাপ। কিন্তু পাপের হাত এড়ানো তো সহজ লয় মাশায়। পাপের তাড়নাতেই পিথীমির মানুষ ছুটে বেড়ায়, শুয়েও চোখে ঘুম নাই, পেট ভরে খেয়েও পেটভরানোর চিন্তা ছাড়া চিন্তা নাই। এই দেখুন না কেনে, বারো বিঘে জমি ভাগে করি, খাই পরি, কিন্তু প্রতি বছর মনে হয় আর পাঁচ বিঘে জমি ভাগে নি।

ঘাড় নেড়ে আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলরাম বললে — পাপের ফের আর কি!

শিবনাথ প্রায় মোহগ্রস্থ হয়ে গিয়েছিল গল্পের ঘোরালো রঙের প্রভাবে। স্থূল বলরামের কাহিনী ঢাকের বাদ্যের মত শব্দের উচ্চতার জন্য এ যুগে অচল। তবু শিবনাথের সে গল্প ভাল লাগছিল। সে বললে, তারপর কি হ'ল বল!

বলরাম উদাস কণ্ঠেই বললে তাইতো বলছি মাশায়! ওই মাটি, একমুঠো মাটি দেখে গাঁয়ের লোক লোভে সারা হয়ে গেল।

এমন মাটি।

বরমলাগের ওই উঁচু ডাঙ্গাটি প্রায় পাঁচিশ বিঘা হবে। সমস্তটার তলায় তো এই মাটি রয়েছে! সাক্ষাৎ লক্ষ্মী রয়েছেন ওই বরমলাগের বিষে জ্বরে-যাওয়া কাঁকর ভরা লাল মাটির ঢিপির তলায়। কিন্তু সেখানে যাবে কে?

যাবে আর কে? মানুষই যাবে। আর যাবে কে? মানুষের যত লোভ তত সাহস। মানুষ অরণ্য বন নদ নদী পার হয়ে রাক্ষসের পুরী থেকে রাক্ষস মেরে টাকা পয়সা সোনাদানা মণি-মুক্তা নিয়ে আসে।

ভূত প্রেত দানা দত্যি কাউকে মানে না মানুষ। চোর বল, ডাকাত বল, ঠ্যাঙাড়ে বল, এদের কারও সামনে কখনও ভূত প্রেত দানা দত্যি কোন কালে কেউ দাঁড়িয়েছে বলতে পার?

যে দেশে বাঘ আছে, সে দেশে বনের ধারে গ্রামের মাঠ কি পতিত পড়ে আছে বলতে পার?

নদীর ধারে বাস যাদের তারা প্রতি বৎসরই বানে কষ্ট পায়, ঘর ভাঙে, মানুষ মরে, গরু বাছুর ভেসে যায়, জমিতে বালি পড়ে, মানুষকে কুমীরে ধরে, তবু কি মানুষ ছাড়ে?

বরমলাগের ঢিপির তলায় যখন এমন মাটির সন্ধান মিলেছে তখন কি মানুষ ছাড়ে? ওখানে যাবার মানুষের অভাব হয়? গেল ডাকিনী বাউড়ীর বড় ছেলে। বাপের মতই লম্বা চওড়া শাহী জোয়ান, নতুন চাষের নেশা, তার ওপর বাপের কাছে শিখেছে কাঁউরের বিদ্যা। এই বছরই ধরেছে সে তিন গন্ডা তিনটে সাপ। তার মধ্যে পাশের গ্রামের বাবুদের বাড়ীতে ধরেছে আড়াই হাত করে দুটো শাহী খরিস। মাঠের মধ্যে গোটা সাতেক কালো সাপ ধরেছে খেলা করার জন্য, কোনটা এক হাত, কোনটা দেড় হাত, কোনটা দু হাত। ধরে বিষ দাঁত ভেঙে কয়েক দিন খেলা করে ছেড়ে দিয়ে এসেছে ক্রোশ দুই দূরের নদীর ধারের জঙ্গলে। মনিব মশায়ের সঙ্গে শলা পরামর্শ করে সে বললে -- আমি যাব। বাবাকে বলো না যেন মাশায়!

মনিব বললে -- তুই কাউকে বলিস না। আর সবুর কর কয়েক দিন। আগে জায়গাটা বন্দোবস্ত করে নি জমিদার মশায়ের কাছে।

ঠিক কথা। নইলে, ওই মাখনের মত মাটির কথা এখানে কারও জানতে বাকী নাই। শুধু বরমলাগের ভয়ে ও জমি বন্দোবস্ত নিতে কেউ এগোয় নাই। বরমলাগের ভয় গেলে ওখানকার জমির দর বাড়বে হু হু করে। ডাকের উপর ডাক চড়বে।

বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

-- তারপর? শিবনাথ রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলে। -- ব্রহ্মনাগকে ধরলে তোমার জেঠা?

উদাস কণ্ঠে বলরাম বললে -- লোভে পাপ পাপে মৃত্যু মাশায়। নাগকে ধরার ক্ষ্যামতা কি জেঠার? কতটুকুই বা শিখেছেন বিদ্যে। আমার কত্তাবাবা পনের বছর লালমনির কাছে থেকে শিখে যে লাগকে ভয় খেয়েছে সেই লাগকে ধরবার এলেম কোথা থেকে পাবে সে! শুধু ছিল অপার সাহস, আর মনিব বলেছিল ও জমি তোরা পুরুষে পুরুষে করবি। তাতেই গিয়েছিল। বোশেখ মাস, ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরে রোদ, খাঁ-খাঁ করছে মাঠ, বাপের সেই সর্পনাশা লতার ডালের লাঠিটা নিয়ে আর জড়িবুটি নিয়ে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেল।

-- তারপর?

-- তারপর আর কি? বিকেল বেলা খোঁজ হল। কই? কই? কই? বাড়ীতে কেউ জানে না। একটা ছেলে বললে -- দুপুর বেলায় আমবাগানে আম কুড়াচ্ছিল সে -- সে তাকে লাঠি হাতে মাঠের দিকে যেতে দেখেছে। তখন ডাকিনী বাউড়ী উঠে দাঁড়াল। সে না কি ভীষণ মূর্ত্তি হল তার , চোখ দুটো রাঙা হয়ে উঠল; দাঁতে দাঁতে কড় কড় করতে লাগল, মাথা ঝাঁকি দিতে লাগল, লম্বা চুলগুলো ঝাঁকি খেয়ে এলোমেলো হয়ে গেল।

বন্য বর্ব্বর মানুষ, তার সঙ্গে আদিম বিদ্যার দম্ভের প্রতিহিংসা; ক্রোধে প্রতিহিংসায় নিষ্ঠুরতম মূর্ত্তি হয়ে উঠল ডাকিনীর। সে হন হন করে চলল বরমলাগের টিলার দিকে। পথে থমকে দাঁড়াল। মনিবকে জিজ্ঞাসা করলে -- তুমি পাঠিয়েছিলে কিনা বল!

মনিব বললে -- আমি যেতে বলি নাই নটবর। সে নিজে গিয়েছে। সেই আমাকে জোর করে ডাঙ্গা বন্দোবস্ত নিইয়েছে।

ঘাড় নাড়লে কয়েকবার নটবর।

তারপর বললে -- আমি মরি আর বাঁচি -- লাগকে আমি রাখব না। কিন্তু দেখো -- আমার ছোট ছেলে রইল -- তাকে তুমি ফাঁকি দিয়ো না।

সে আর দাঁড়ালে না মনিবের উত্তর শুনতে। তার ধর্ম্ম তার কাছে। তার বুকের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে। এমন শূরবীর বেটা তার সাকরেদ! ঘর করবে, সংসার করবে, এবারেই তার বিয়ে দিয়েছে, ঘরে যুবতী বউ! বুকে তার আগুন জ্বলছে।

সেই নতুন গজান ঘাসের উপর পড়ে ছিল তার ছেলে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ডাকিনী বাউড়ী। কুড়িয়ে নিলে সেই লতার ডান্ডা।

গ্রামের ধারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। যুদ্ধ হবে আজ বরমলাগে আর ডাকিনী বাউড়ীতে। ডাকিনী হাঁকলে -- আয়। দেখি! আমার ছেলেকে খেয়েছিস তু। দেবতাই হোস

আজ -- আর যাই হোস – আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

টিলার উপর মাথা তুলে দাঁড়াল নাগ।

হঠাৎ ডাকিনী পিছন ফিরে হাঁকলে ছোট ছেলেকে – ওরে একটা ছাতা। একটা ছাতা দিয়ে যা। শিগ্গি।

বলরামের বাপ একটা ছাতা নিয়ে ছুটল।

তখন এসে পড়েছে নাগ। নির্ভয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডাকিনী। নাগ মারলে ছোবল – ডাকিনী ডান্ডাটা বাড়িয়ে ধরে একপাশে সরে গেল। নাগের ছোবল লাগল ডান্ডায়। ডাকিনী সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে হাঁকড়ালে ডান্ডাটা যে তার ধাক্কায় নাগ উল্টে চিৎ হয়ে পড়ল।

ঠিক এই সময়ে বলরামের বাপ নিয়ে গেল ছাতা। সে হাঁকলে -- বাবা, ছাতা।

ডাকিনী চোখ ফেরালে না। বললে -- আর এগোস না তু। ছাতা রেখে চলে যা।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন হটতে লাগল। নাগও ওদিকে আবার উঠল দ্বিগুণ আক্রোশে। সে কি ভীষণ গর্জ্জন। লক লক করছে জিভ! ঝক ঝক করছে কালো মটরের মত দুটো চোখ – দুলতে দুলতে ছুটে এল। ডাকিনী তুলে নিলে ছাতা। ধরলে সামনে ঢালের মত। নাগ ছোবল মারলে, সঙ্গে সঙ্গে ছাতাটি নামিয়ে দিলে ডাকিনী। ভীষণ আক্রোশে ছোবলের পর ছোবল মারতে লাগল সেই ছাতার উপরেই। ডাকিনী বিদ্যুদ্বেগে ছাতার পাশ দিয়ে নাগের পিছনে এসে সেই দন্ড দিয়ে ধরলে চেপে তার ফণা মাটির সঙ্গে। অন্য হাতে ধরলে তার লেজ। নিষ্ঠুর আক্রোশে সে তাকে টানতে লাগল। মুখটা দিলে মাটির ভিতর গুঁজে, রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা। তারপর সে ছেড়ে দিলে তাকে। নাগ থ্যাঁতলানো মাথা দিয়ে ছটফট করতে লাগল।

ডাকিনী মরা ছেলের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে -- তাকে বললে -- দোষ নাই – তোর দোষ নাই! কিন্তু আমাকে না-বলে না - ডেকে এলি কেনে?

তারপর আক্ষেপ ক'রে বললে -- আঃ আমি কেনে বলি নাই তোকে আঃ হায়-হায়-হায়! আমার মনের কথা আমিই বা কেনে বললাম না রে!

বলরাম বললে -- মাশায় বরমলাগের মাঠে কখনও বর্ষায় 'নোনা' লাগে না, আজও এক পয়সার নূনও দিতে হয় নাই, লোকে বলে ডাকিনী বাউড়ীর চোখের জলের নুন বরমলাগের মাঠে আজ জমে আছে।

বুড়ো বলরাম মনের আনন্দে জোয়ান কালের গান ধরে দিলে। নেশার ঘোর, অন্ধকার রাত্রি, নির্জ্জন মাঠ' এর মধ্যে সে কোনমতেই আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। গলা ছেড়ে সে গান ধরলে -- "(আমার) পানের ঘরে বাঁধবে বাসা তোমার মন পাখী, ও আমার পান পেয়সী সখি!"

বাবু মহাশয় তাকেই জমিটা ভাগে দিয়েছেন। পাকা 'বাক্য' দিয়েছেন, বলেছেন, বরমলাগের মাঠ আমার ঘরে যতদিন থাকবে বলরাম ততদিন ও জমি তুমিই করবে।

ব্যাস, আর চাই কি! বরমলাগের মাঠ থেকে নাগকে তাড়াতে গিয়ে তার দংশনে প্রাণ

দিয়েছে তার জেঠা, তার কর্ত্তা বাপ ডাকিনী বাউড়ী লাগকে মেরেছে, তারপর ছোট ছেলে- বলরামের বাপকে নিয়ে সেই কাঁকুরে ডাঙ্গার কাঁকর তুলে ফেলে মোলাম মাটি বের ক'রে ভেঙেছে। বছরের পর বছর। ডাকিনী বুড়ো এর পরও বেঁচেছিল ন'বছর। এই ন'বছর সে ছোটকা' কেনিযে লাগের মাঠের মাটি কেটে সমান করেছে-আর কেঁদেছে! বড় ছেলের জন্যে কাঁদত' ডাকিনী বুড়ো, আর কাঁদত'—। শিউরে উঠল বলরাম। ডাকিনী বুড়ো আরও একটা কারণে কাঁদত'। তার বাপ তাকে বলে গিয়েছে কথাটা। — লাগ হলেন দেবতা। লাগের আত্মা ছাড়বেন না, শোধ নেবেন। মাটির ওপরে হঠাৎ কোন দিন সামনে ফণা তুলে দাঁড়াবেন, পরাণের বদলে পরাণ লেবেন। কিন্তু তাতে চাষী ভয় করে না। মাটি কাটতে গেলেই 'লাগের' সঙ্গে বিবাদ হয়। মাটির তলায় বাস;চাষ করতে গেলেই — 'লাগের' বাস তুলতে হয়। 'লাগকে' বধও করতে হয়। তার বদলে মা মনসার পূজো দেয় চাষী, ভগবানকে সাক্ষী রাখে। কিন্তু 'লাগ' যদি বুকের মধ্যে বাসা বাঁধে তবেই হয় সর্ব্বনাশ।

ডাকিনী বাউড়ীর বুকে লাগ জেগে উঠেছিল। লাগ নিজের মৃত্যুর শোধ নিয়েছিল-ছাড়ে নাই। ডাকিনী বুড়োকে ফাঁসী কাঠে ঝুলে মরতে হয়েছিল। একদিন ওই বরমলাগের মাঠের জমিকে উপলক্ষ্য ক'রে জোড়া খুন করেছিল ডাকিনী বুড়ো।

সে সব কথা মনে পড়তেই বলরামের আনন্দের গান বন্ধ হয়ে গেল।

গল্প করত তার অর্থাৎ বলরামের বাপ, গল্প করত' তার বুড়ী ঠাকুরমার।

বরমলাগের মাঠের জমির নীচের দিকে শেষ সীমানায় ডাকিনী বুড়ো পেতেছিলো মাছের আড়া। আজও আছে সে মাছের আড়া। মাঠের মধ্যে এমন মাছের আড়া আর নাই। ভিন গাঁয়ের সীমানা থেকে জল নিকাশি নালা বেয়ে জল নেমে আসে — সেই নালার সমস্ত মাছ প্রথম আটক পড়ে বরমলাগের মাঠের এই আড়ায়। লহনা পোনা থেকে আরম্ভ ক'রে কই, মাগুর, পুঁটী হরেক রকমের মাছে বোঝাই হয়ে যায় মাছের 'আড়াআড়ি' অর্থাৎ মাছ আটক করা গোল গর্ত্তটি। জমি ভাঙার সেবার ন'বছরের বছর। প্রথম চার বছর জমির ফসল থেকে আরম্ভ ক'রে মাছ পর্য্যন্ত ষোল আনা পেয়েছিল তারাই। মনিবের সঙ্গে কথা ছিল: গতরে খেটে — বাপ বেটায় বউ ঝিয়ে খেটে জমি তারা ভাঙবে, জমিদারের খাজনার টাকার ধান দিয়ে, বাকী ধান তারাই পাবে। পরের চার বছর হল আধা ভাগ। ন'বছরের বছর মনিব বললে -- আর না। অনেক খেলি, অনেক পেলি — এবার ভাগ কৃষানি। দুভাগ আর একভাগ। বলবার কিছু ছিল না। ডাকিনী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে — তাই হবে। লক্ষ্মীমন্তের অদৃষ্টে আর লক্ষ্মীছাড়ার অদৃষ্টে পার্থক্য কথার কথা নয়, বরমলাগ নাগজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ সে কথাও মিথ্যা নয়;শোনা কথা চোখে আঙুল দিয়ে ভগবান সেবার দেখিয়ে দিলেন বরমলাগের মাঠের ধানের ফসলের মধ্যে। সে কি ধান সেবার। কার্ত্তিক মাস, আউস ধান কেটে — ধান মাড়াই ক'রে ভাগ ক'রে আপনাদের অংশ নিয়ে বাড়ী ফিরে ডাকিনী-বুড়ো চোখ রাঙা করে চুপ ক'রে বসে রইল দাওয়ার উপর। হঠাৎ দাঁত কিষকিষ ক'রে বলে উঠল -- আজ মনে পড়ছে লালমণিকে।

বলরামের ঠাকুরমা শিউরে উঠে বলেছিল -- লালমণিকে!

-- হ্যাঁ। লালমণিকে। মাঝে একবার ঘর বেঁধে চাষ করেছিলাম। লালমণি ঘরে আগুন দিয়ে দাঁত কিষকিষ ক'রে বলেছিল, "আবার যদি কোন দিন বলবি ঘর বাঁধব, চাষবাস করব তো — আকামা সাপ দিয়ে তোর মাথার তালুতে ডংসাব।"

বলতে বলতে উঠে চলে গেল সে।

রাত্রে প্রচুর মদ খেয়ে যখন বাড়ী ফিরল — তখন আকাশ ভেঙে জল নেমেছে। চাষীরা দু হাত তুলে নাচছে। কার্ত্তিক মাস -- আমনের জমিতে জলের অভাব ঘটেছিল — চারিদিকে হাহাকার উঠেছিল — জলের জন্য। সেই জল নেমেছে। ডাকিনী আকাশের মেঘকে অভিসম্পাত দিলে; কেন নামলি, কেন নামলি? শুকিয়ে মরে যেত — বেশ হ'ত -- কেন নামলি?

ঠিক সেই সময়ে বাড়ী ফিরল মনিববাড়ী থেকে বিধবা পুত্রবধূ। লাগ দংশনে প্রাণ দিয়েছে বড় ছেলে — তারই বউ। বউকে ডাকিনী সাঙা করতে দেয় নাই, বাড়ীতে রেখেছিল ছেলের আদরে; কাজ করতে দিয়েছিল মনিব-বাড়ীতে। ভদ্র চাষীর বাড়ী — ভাল খাবে ভাল থাকবে; মনিবের বড় ছেলে — তাকে ভাল চোখে দেখে — বউটার মনও তার উপর পড়েছিল — সে কথাও অজানা ছিল না, তাতে আপত্তিও করে নাই ডাকিনীবুড়ো; যুবতী বয়স, যাতে তার মন ভাল থাকে তাই সে করুক। মনিবের বেটা — ভাবীকালে সেই হবে মনিব, সেও খুসী থাকবে গুষ্টীটার উপব। বউকে সে নিজেই চিনিয়ে দিয়েছিল গাছের শিকড়, যাতে বিধবার কলঙ্ক অনায়াসে ঘুচে যায় মুছে যায়।

বউ বললে -- শুনে এলাম ওপরের গাঁয়ের গড়ানতী পুকুরের মোহনা ভেঙেছে -- বড় বড় মাছ বেরিয়ে মাঠে ছয়লাপ হয়ে গিয়েছে।

ডাকিনী অকস্মাৎ বউয়ের চুলের মুঠোয় ধ'রে তাকে টেনে ফেললে মাটির উপরে আছড়ে। বললে — কলঙ্কিনী — তুই কলঙ্কিনী!

ফুঁসতে লাগল সে সাপের মতন।

তখন বরমলাগেব শাপ ফলেছে, বুকের মধ্যে লাগ জেগেছে। বলরামের বাপ তাকে জাপটে ধ'রে টেনে সরিয়ে এনে বললে -- করছ কি তুমি?

ডাকিনী বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল মরা ছেলের জন্য।

পরের দিন ভোরে উঠে আড়া ঝাড়তে গিয়ে গর্ত্তের মধ্যে পেলে পাঁচ সের এক রুই। মাছটা তুলে ডাঙায় আছাড় দিয়ে মারছে — এমন সময় ওদিক থেকে গড়াঞ্চী-পুকুরের মালিকের লোক ছুটে এসে বললে -- আমাদের পুকুরেব মাছ।

ডাকিনী বললে -- মাছ পড়েছে আড়ায়। মাছের গায়ে পুকুরের নাম লেখা নাই -- মাছ আমার।

পুকুরের মালিকের লোক মাছ চেপে ধরলে।

ডাকিনী ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে ফেলে দিয়ে মাছটা ছিনিয়ে নিলে।

লোকটা উঠেই এবার আচমকা মারলে এক চড় ডাকিনীর গালে।

ডাকিনীর কোমরে পিঠের দিকে গোঁজা ছিল মাথায় লোহার খন্তা লাগানো — সাপ ধরা

ছোট পাঁচন, বিদ্যুদ্বেগে সে খুলে নিলে সেই খন্তা লাগানো পাঁচন -- বসিয়ে দিলে সোজা লোকটার মাথায়। লোহার খন্তাটা বসে গেল -- ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, লোকটা পড়ে গেল। ডাকিনী সে দিকে ফিরেও চাইলে না -- মাছটা নিয়ে ফিরল বাড়ী। মাছটা বাড়ীতে ফেলে দিয়ে বললে -- আমি চললাম।

-- কোথায়?

কোন উত্তর দিলে না। হন হন করে চলে গেল। ফিরল রাত্রে। ডাকিনী চেয়েছিল পালিয়ে যেতে কিন্তু পারে নি। সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে ফিরে এসেছে, মাছ দিয়ে চারটি ভাত খাবে। ছেলেকে বলে যাবে --- "সাবধান বাবা, বরমলাগের শাপ লেগেছে -- আমাদের ওপর।" সমস্ত দিন চিন্তা ক'রে কথাটা সে উপলব্ধি করেছে -- বুঝতে পেরেছে, বুকের ভিতর যে ফুঁসিয়ে উঠছে -- সে বরমলাগের বিষ ছাড়া আর কিছু নয়।

অন্ধকারের মধ্যে লম্বা মানুষটা দাঁড়িয়ে ছিল প্রেতের মত।

রাগে ফুলে ফুলে উঠছিল, সাপের গর্জ্জনের মত নিঃশ্বাসের শব্দ উঠছিল -- আর উঠছিল -- কট কট শব্দ। দাঁতে দাঁতে পিষে নিস্ফল আক্রোশ প্রকাশ করছিল সে। ভাত খেতে বসে -- ভাতের থালা ছুঁড়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। রুই মাছের খানা নাই। এ যে শুধু পুঁটিমাছ -- শুধু পুঁটি --। কই রুই মাছ!

মনিবের বড় ছেলে এসে মাছটা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বলেছে -- এটা আমরা নিলাম -- তোরা চুনোগুলো সব নিস।

বলরামের বাপ মা -- প্রতিবাদ করতে পারে নি। ও মাছে তাদের রুচিও হয় নি, মাছটার জন্যে ডাকিনী গড়ানতীর লোকটাকে প্রায় খুন করে এসেছে, লোকটা মরেনি, কিন্তু বাঁচে কিনা সন্দেহ। ও মাছ কি তারা মুখে দিতে পারে?

চীৎকার করে উঠল ডাকিনী -- মাছ খাবার জন্যে আমি ফিরে এলাম। মাছ কই -- আমার মাছ কই? মাছের জন্যে খুন করেছি, আমার সে মাছ কই?

ডাকিনীর স্ত্রী বললে -- দাঁড়াও।

সে বিধবা পুত্রবধূর ঘরে গিয়ে ডাকলে -- বউ মা।

ডাকিনী দাঁড়াল গিয়ে দরজায়। আগড়ের দরজা। ঘরের মধ্যে বউ বড় মাছের খানা দিয়ে ভাত খেতে বসেছে। সে ভাত নিয়ে আসে মনিব বাড়ী থেকে। পাতের পাশে মোটা মোটা মাছের কাঁটা পড়ে আছে এক রাশি।

দেখে ধ্বক ধ্বক ক'রে জ্বলতে লাগল ডাকিনীর চোখ। সে লাফ দিয়ে পড়ল বউয়ের উপর। বুকের উপর চেপে বসে দুই হাতে টিপে ধরল তার গলা।

বলরামের বাপ যখন তাকে টেনে ছাড়ালে -- তখন বউটি মরে গেছে।

বলরামের বাপ বললে -- করলে কি তুমি?

অনেকক্ষণ পর শান্ত হয়ে কপালে হাত দিয়ে ডাকিনী বললে, অদৃষ্ট। তারপর বুকে হাত দিয়ে বললে -- বরমলাগ জেগে বসেছে বুকে। আমি কি করব?

ব'লে সরাসরি থানায় গিয়ে উঠল — বললে - হাতে পায়ে বেঁধে রাখুন মাশায় আমাকে। আমাতে আর আমি নাই -- আমাকে লাগে পেয়ে বসেছে; কি যে কখন করব -- তা জানি না।

হঠাৎ আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠল বলরাম। অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট হলেও সে বেশ দেখতে পাচ্ছে -- হাত কয়েক দূরে সামনে কি যেন দাঁড়িয়ে দুলছে। কি? বেঁকিয়ে ঘাড় তুলে প্রকাণ্ড ফণা মেলে মৃদু মৃদু দুলছে -- ওটা কি? মানুষের সমান মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এত বড় সাপ। ব্রহ্মনাগ?

সে চীৎকার করে উঠল — ভীতার্ত্ত ভাষাহীন চীৎকার — তার সঙ্গে মিশে আছে কোণঠাসা বিড়ালের মত ক্রুদ্ধ গর্জ্জন। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। হাতের পাঁচনটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে। পিছন ফিরে পালাতে ইচ্ছা হ'লেও সাহস হ'ল না। ওর সঙ্গে কে দৌড়ে পারবে? সাপের সঙ্গে দৌড়ে মানুষ পারে না, দৌড়াতে হলে এঁকে-বেঁকে দৌড়াতে হয়; কিন্তু এই অন্ধকারে অসমান মাঠের মধ্য দিয়ে সে সম্ভবপর নয়। যুদ্ধোদ্যত হয়েই সে দাঁড়িয়ে রইল। আয়-আয়-আয়। বলরাম মরবেই কিন্তু তোকে না নিয়ে সে যাবে না।

সেটা কিন্তু এগিয়ে এল না। সেইখানে দাঁড়িয়েই মৃদু মৃদু দুলতে লাগল। বলরামের সন্দেহ হল এবার। এক এক পা এগিয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। হঠাৎ সে চীৎকার ক'রে হেসে উঠল। সাপ নয়, শুকনো তালপাতার বাঁকা গোড়ার দিকটা — মাটির উপর পড়ে আছে, বাতাসে অল্প অল্প নড়ছে।

জয় ভগবান, জয় মা মনসা।

মনে পড়ল বাপের কথা। বাবা বলে গিয়েছে -- বলরাম, মা মনসার পূজো দিস, লাগ পঞ্চমীর দিন মাটি খুঁড়িস না -- লাঙল ধরিস না, উনোন জ্বালিস না, গরম খাস না; বরমলাগ কোন দিন ছামু ছামু দাঁড়াবে না — অনিষ্ট করবে না। তবে বাবা সাবধান, বুকের মধ্যে উনি জাগবেন। আমার বাবার জেগেছিল, আমারও জেগেছিল রে! কেউ জানে না, তোকে বলে যাই, শেষ বয়সে তোকে না বলে শান্তি পাব না।

মনিবের ঘরে ডাকাতির কথা মনে পড়ে?

পড়ে বৈকি! বলরামের বয়স তখন আঠারো উনিশ, ভরা জোয়ান! বাপের সঙ্গে সে তখন চাষ করছে, বরমলাগের মাঠে সেই তখন লাঙলের মুঠো ধ'রে মাটি চষে। বরমলাগের মাঠের ফসলে - তখন মনিব বাড়ীতে সারি সারি ধানের গোলা উঠেছে। লোকে বলত — বরমলাগের শাপ নিয়ে ডাকিনী বাউড়ী ফাঁসী গেল, লক্ষ্মীর দয়া পড়ল মনিবের উপর। যে লক্ষ্মীকে আগলে রেখেছিল বরমলাগ -- সেই লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে এসে ঢুকলেন জমির মালিকের ঘরে।

অন্ধকার মেঘলা রাত্রি; শাওন মাস; রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে; হঠাৎ — দুম দুম শব্দ উঠতে লাগল -- তারপর চীৎকার উঠল - মেয়ে ছেলের কান্নায় রাত্রির অন্ধকার যেন ফেটে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। তার সঙ্গে উঠল -- রে-রে-রে চীৎকার!

বলরাম লাফ দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল উঠানে। ডাকলে -- বাবা!

বাবারও ঘুম ভেঙেছিল -- ঘরের ভেতর থেকেই সাড়া দিলে -- বললে -- হাঁ।

-- শুনছ?

— শুনেছি। ডাকাত পড়েছে। বার হস না, শুয়ে পড় গা।

— শুয়ে পড়ব? বেরুব না? কার বাড়ীতে দেখব না?

— না। ধমক দিয়ে উঠেছিল বাবা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নিজেই উঠে এসে বলরামকে ডেকেছিল -- ওঠ। চল, দেখি নইলে হয় তো দোষ পেতে হবে।

দোষ সত্যিসত্যিই ছিল। দোষ নয় — বরমলাগের বিষ। মনিবের ঘরের বাড় বাড়ন্ত দেখে বলরামের বাবা ডাকাতের দলের সঙ্গে যোগসাজস করেছিল। কোথায় কি থাকে -- কোন ঘরের কোন দরজা — কে কোন ঘরে শোয়, কার কোমরে চাবী, মায় ক'দিন আগে বারশো টাকার ধান বিক্রী ক'রে আসার খবর পর্য্যন্ত সে দিয়েছিল তাদেব। কোন দিকে কোনখানে ঘাঁটি পাততে হবে — ঠিক ঠিক জানিয়ে দিয়েছিল। তার বেশী কিছু না।

বলরামের বাপ শেষ বয়সে সে দিন তাকে বলেছিল -- ওরে বাবা, দু'ভাগ ধান মনিব নিয়েছে, এক ভাগ ধান সুদ সয়দা কেটে দিয়ে শুধু হাতে ঘর ঢুকেছি --- কোন দিন তো এমন ইচ্ছে হয় নাই, এমন কাজ করি নাই। সেবার দিয়েছিলাম জমিতে অল্প চারটি সোনামুগ। সোনামুগ ফলে কি না দেখবার তরে দিয়েছিলাম। হয়েছিল --- মোটমাট সাত সের সোনামুগ হ'ল। মনিব বললে — ও কটা আর তু পাবি না। ও আমি নিলাম। বললাম, সেরখানেক দেন আমাকে। মনিব বললে -- এক ছটাক আমি দোব না। ওর বদলে মসুরী নিস তুই। সেই হ'ল কাল। মনে হ'ল --- বলরাম — মনে হ'ল মনিবকে খুন ক'রে দি। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠে ভয়ে পালিয়ে এলাম বাড়ী। সারা দিনটা আপন মনে গর্জ্জালাম -- তোর মায়ের ওপর -- তোব ওপর, বউমার ওপর -- বেহ্মাণ্ডের ওপর। তোর মা বলেছিল — সাপের মতন গর্জ্জে গর্জ্জে বেড়াইছে দেখ। সাপই বটে রে সাপ্পই বটে। তারপরে আর তাকে থামাতে পারলাম না। জষ্টি মাসে আবার মনিব করলে এক কাণ্ড। তরমুজের থানা দিয়েছিলাম। গাছ হ'ল -- কিন্তু সব গাছ ম'রে গিয়ে থাকল শুধু একটি লতা। চার পাঁচটি তরমুজ ধরেছিল। প্রথম তরমুজটি আমি চুরি ক'রে খেয়েছিলাম। মনিব আমাকেই সন্দ করেছিল। সন্দ ক'রে বললে — তোমার ভাগ ওই ওতেই গেল। ওটাই ছিল সব চেয়ে বড়। বাকী কটা আমি নিলাম। ব'লে সব কটা তুলে নিলে। পাকেও নাই সব কটা ভাল ক'রে — তবু তুলে নিলে। এবার আর বাগ মানলে না; বরমলাগের বিষ মনের মধ্যে সাত কলসী হয়ে ফেঁপে ফুলে উঠল। যোগসাজস করলাম ডাকাতের দলের সঙ্গে। ওরাও ঘর সন্ধানী লোক খুঁজছিল। আমি দিলাম খোঁজ। কুড়ি টাকা ওরা আমাকে দিয়েছিল, কিন্তু তার চেয়ে সুখ হয়েছিল আমার মনিবের দুর্দ্দশায় আর মনিব বাড়ী 'ভাঙটা' পড়ায়। পাপ-পাপ; তা জানি — তবু মন মানে নাই। ওই মনিবই তো মাছটা নিয়েছিল -- যে মাছের জন্যে বাবা ফাঁসী গিয়েছিল, ওই মনিবই যে আমার ভাজ বউকে নষ্ট করেছিল, ওই তো নিয়েছে আমার ভাগের মুগ, ওই নিলে কাঁচা তরমুজগুলা তুলে। জ্বলন্ত মশালের বাড়ি মেরে বুড়োর পিঠ বুক সব ছিঁচকে পোড়া করে দিয়েছিল, তাতেই আমার সুখ হয়েছিল বেশী! কিন্তু আজ --- আর কাল ফুরিয়ে এল বাবা, ভাবছি পারে গিয়ে কি জবাব দোব!

উদাস হয়ে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলরামের বাপ বলেছিল -- বলব — আমি নিজে করি নাই ধরমদেব, বরমলাগের শাপ আমাকে করিয়েছে। কিন্তু সে কি শুনবে?

ধরমদেব পরকালে এ কথা শোনেন কি না কে জানে, কিন্তু বলরাম জানে বুকের মধ্যে বরমলাগের শাপ কোন কথাই শোনে না, কোন পাপের ভয়কেই সে মানে না। বুকের মধ্যে ধিক্ ধিক্ করে তুষের আগুনের মত জ্বলছেই সে জ্বলছেই। স্পষ্ট বুঝতে পারে সে। মাথার মণির মত মনিব মহাশয়কে দেখে তার মধ্যে মধ্যে বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে। মনিব বাড়ীর অকল্যাণে যখন মনটা টন টন করতে থাকে — চোখ দিয়ে সত্যি সত্যিই জল পড়ে -- তখন হঠাৎ মনের ভিতর থেকে এক সময় ওই আগুনটা দপ ক'রে জ্বলে ওঠে;মন বলে ওঠে — বেশ হয়েছে -- আচ্ছা হয়েছে! শিউরে উঠে সঙ্গে সঙ্গে সে বলে ওঠে — হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

মনিব বাড়ীতে ধানের ভাগ দিয়ে মনিবের গোলা ভর্ত্তি করে দিয়ে নেমে এসে যখন খুসী হয়ে বলে — আসছে বারে আবার নতুন গোলা করতে হবে মাশায়, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে আঁধার রাত্রে রাঙাবরণ আগুনের শিখা জ্বলে ওঠার ছবি। চট পট শব্দে ধান পুড়ে খই হওয়ার শব্দ সে যেন কানে শুনতে পায়!

সে চঞ্চল হয়ে উঠে ঘস ঘস ক'রে সর্ব্বাঙ্গ চুলকাতে থাকে — অস্থির হয়ে ওঠে। মনিব বলেন — কি রে? ধানের ধুলোয় শরীর সুঙ সুঙ করছে বুঝি।

— আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে সে দ্রুত চলে গিয়ে পুকুরের জলে নেমে পড়ে — ডুব দিতে থাকে দুটো চারটে দশটা! তারপর হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে উঠে আসে শান্ত সুস্থ হাসি মুখে।

যে দিন স্নান করেও মন শান্ত না হয় -- সে দিন অধীর হয়ে বাড়ী ফিরে প্রচুর পরিমাণে মদ খায়, স্ত্রী কন্যাকে প্রহার করে। তারপর নেশার ঝোঁকে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে উঠে শান্ত সুস্থ হয়ে সে হরিকে ডাকে, তারপর খুঁজে খুঁজে কোন একটি দুর্লভ ফল -- শশা কিম্বা পেঁপে কিম্বা চালকুমড়ো কি লাউ — তার সঙ্গে এক ঘটি দুধ নিয়ে মনিব বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়। অকৃত্রিম প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে হাসতে থাকে।

মধ্যে মধ্যে কাজকর্ম্মের বরাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘরের কোণে কাঠের র‍্যাকে ঠেসানো শিবনাথের উইনচেষ্টার রিপিটারটার দিকে শঙ্কাতুর বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে দেখে — ঘরে লোকজন না থাকলে বন্দুকটার নলে হাত দিয়ে তার অদ্ভুত শীতল কঠিন স্পর্শ অনুভব করে।

পুরানো মনিব মণ্ডল মহাশয়দের বাড়ীতে ছিল দুখানা বগি দা।

বন্দুকটার গায়ে হাত দিয়ে বলরাম হঠাৎ হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে — শালা!

কিন্তু বরমলাগের অভিশাপের বিষ যে দিন পাথার হয়ে উথলে ওঠে সে দিন ও ভয়ও থাকে না। জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে দলের সামনে বলরাম নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে একটা বন্য চীৎকার করে উঠল। পশুর মত চীৎকার। নাকের মধ্য দিয়ে যে নিঃশ্বাস পড়ছে সে আগুন। চোখ দুটো লাল কুঁচ। ওরা ধান লুঠ করতে এসেছে।

শিবনাথ তার রিপিটারে ছ'টা কার্টিজ পুরে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সকলের সম্মুখে বলরামকে মশাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। বলরাম! বলরাম দাঁড়িয়েছে সকলের আগে?

১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার জন্য সপরিবারে সে দেশে এসে বাস করছে। দেশে এসেও শান্তি নেই। চাষী কৃষাণদের মধ্যে ঢেউ উঠেছে -- তেভাগা। এতদিন মনিবে পেয়েছে দু ভাগ এবার তারা দাবী করছে দু ভাগ।

বলরাম শিবনাথের কাছে এসে পায়ের কাছে শঙ্কিত বিবর্ণ মুখে বলেছিল -- বাবু মাশায় আমাকে বাঁচান!

-- কি! ব্যাপার কি?

বলরাম কম্পিত কণ্ঠে বলেছিল -- ওরা বলছে -- দু'ভাগ নইলে চাষ করব না!

হেসে শিবনাথ বলেছিল -- তার আমি কি করব? আমার কাছে তুমি কি দু ভাগ দাবী করছ?

-- আজ্ঞে? উত্তরে বিহ্বলের মত প্রশ্নই করেছিল বলরাম।

-- আমার কাছে কি দুভাগ চাচ্ছ তুমি?

একটু চুপ ক'রে থেকে বলরাম বলেছিল -- আমি বলেছি মাশায়, দশ বার বলেছি অন্যায়, আমরা দু'ভাগ নিলে বাবুদের চ'লবে কি ক'রে? তা ছাড়া টাকা দিয়ে জমি কিনেছে জমির মালিক তার এক ভাগ -- কোন আইনে হবে? ধরমে সইবে কেনে? তা' কিছুতে শুনবে না ওরা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভেবে শিবনাথ বলেছিল -- দু'ভাগ যদি দেশচলিত পাওনা হয় বলরাম -- আমি তাই দোব তোমাকে। তাতে আমি আপত্তি করব না। যদি নাও হয় -- তবে ভাগ এবার তোমার বাড়িয়ে দোব। দোব না, দিলাম। আঠারো বাইশে ভাগের -- তোমার বাইশ আমার আঠারো। কেমন?

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিল বলরাম। পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। আজ সকালে নিজেই এসে সংবাদ দিয়ে গেছে -- ব্যাপার খারাপ বাবু মাশায়! ধান লুঠ করবার জটলা হচ্ছে। কিছুতেই মানবে না।

সেই বলরাম এসে দাঁড়িয়েছে দলের পুরোভাগে। এবং সর্ব্বাগ্রে এসেছে তারই বাড়ীতে লুঠ করতে!

শিবনাথ বন্দুকটা তুলে ধরলে!

হাসপাতালে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলে -- কেন কেন এমন করলে বলরাম? আমি তো তোমাকে বেশীই দিতে চেয়েছিলাম!

উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বলরাম। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বললে -- বরমলাগ!

দু ফোঁটা জল দু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৯/ সংখ্যা ১-৩ : ১৩৫৩]

বাঁদী

সন্তোষকুমার ঘোষ

[১৯২০ সালে ফরিদপুরের রাজবাড়ি গ্রামে জন্ম। বিখ্যাত সাহিতিক ও সাংবাদিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: শেষ নমস্কার, শ্রীচরণেষু মাকে, মোমের পুতুল, কিনু গোয়ালার গলি, জল দাও, ইত্যাদি। একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত। মৃত্যু: ১৯৮৫ সালে।]

[শশী বলেছিল মেমসাহেবের দয়ার শরীর। কুঞ্জ আরেকটু বেশি দেখেছিল: স্বাধীন, সহজ, নিঃশঙ্ক। বকুলদিকে মনে পড়েছিল, কুড়িতে বুড়ি, স্বামীর কাছে ক্রীতদাসী। দুই মেরু। বকুল যদি তমসা, মেমসাহেব তবে জ্যোতি, তারপর —]।

সিনেমায় কী হয়েছিল, সেদিন বোঝেনি কুঞ্জ। ফিরে এসে বকুল ভালমন্দ কিছুই বললে না। কেমন গল্প, ক'টা গান, কিছু না। কুঞ্জও জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলে না।

দিন তিনেক বাদে প্রাণকৃষ্ণ বলল, চটপট তৈরি হয়ে নাও। বিকেলে বেড়াতে যাব। সুবোধ চক্কোত্তি আসবে গাড়ি নিয়ে।

বকুলেব মুখ মড়াফ্যাকাশে হয়ে গেল, প্রাণকৃষ্ণ সেটা নজর করল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু কুঞ্জ দেখে নিয়েছে ঠিক।

— আজকে? আবার!

বিবর্ণ মুখ প্রাণকৃষ্ণ দেখতে পায় নি, কিন্তু বিবস গলা শুনল ঠিক। চটে গিয়ে বলল, কী রাজকার্য করছ এখানে বল দেখি। সুবোধ চক্কোত্তির মেলা পয়সা বকুল, খাবার লোক নেই, লোকটা তাই মনমরা হয়ে থাকে। নইলে টাকাকে টাকা জ্ঞান কবে না। আজ ধরেছে ডায়মণ্ডহারবার যাবে।

-- যাক না। বকুল বলল, যত খুশি বেড়িয়ে বেড়াক। আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন।

কথার ছিরিতে প্রাণকৃষ্ণ ক্ষেপে গেল। – টানাটানি আবার কিসের। যেতে ইচ্ছে হয় যাবে, না হয়, যাবে না। আমার চাকরিও হবে না।

স্থির চোখে একবাব স্বামীর চোখেব দিকে তাকাল বকুল, বলল, বেশ, চল।

ফিরে এসে সটান শুয়ে পড়ল। কুঞ্জ আগেই মুড়ি-বাতাসা খেয়ে নিয়েছিল। সেদিন আর উনুন জ্বলল না।

নাটকীয় সেই ঘটনাটা ঘটল আরো দিন চারেক পরে।

একটা টাকা দিয়ে লোকটা ওকে ফরমাস করল, যাও তো খোকা, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এস, আর দু'খিলি পান।

ঝাঁঝা দুপুর, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, ফিরে আস্‌তে কুঞ্জর মিনিট পোনেরো লাগল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে যাবে, পারল না।

রুদ্ধশ্বাস বকুলদি, আরক্তমুখী, বলছে, যান, এখুনি বেরিয়ে যান আপনি। নইলে --

মিটি মিটি হাসছে সুবোধ। -- নইলে কী।

-- নইলে উনি এসে আপনাকে ঘাড় ধরে বার করে দেবেন।

-- প্রাণকেষ্টোর কথা বলছ? তেমনি হাসছে সুবোধ, -- আরে না, সে আসছেনা বকুল, তোমার ভয় নেই। প্রাণকেষ্টকে মোড়ের দোকানে বসিয়ে এসেছি, সে এখন চিংড়ির কাটলেটের কাঁটা চুষছে।

সেই মুহূর্তে কী হল কুঞ্জর, ঘরে ঢুকল ঝড়বেগে, অন্ধের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সুবোধের, গায়ে, হাতের কাছে কিছু না পেয়ে শুধু নখে রক্তক্ষত করে দিতে থাকল।

ছিটকে পড়ল অবশ্য মুহূর্তেই। সুবোধ চক্রবর্তী লিকলিকে হলেও কুঞ্জর মত পুঁচকেকে কায়দা করার জোর রাখে। মেজেয় ঠোকর খেয়ে কেটে গেল কপালের খানিকটা, আর, তখন আর, জ্ঞান রইল না কুঞ্জর। হাতের মুঠোয় ছিল খুচরো ক'আনা পয়সা, দেশলাই, সিগারেটের প্যাকেট। সব আবীরছোঁড়ার মত ছুঁড়ে দিল সুবোধের চোখ লক্ষ্য করে। চশমাটা চুরমার হয়ে পড়ল মাটিতে, তারই দু'একটা টুকরো বিঁধে থাকবে সুবোধের চোখে। দু'হাতে মুখ ঢেকে সুবোধ মাথাহেঁট-অপমানে ঘর থেকে সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সেতো শুধু প্রথমাঙ্কের যবনিকা। প্রাণকৃষ্ণের প্রবেশ হল বেলা গড়িয়ে যেতে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, সুবোধ আসেনি?

হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল বকুল, এতক্ষণে ভেঙে পড়ল কান্নায়। গোঙানির সঙ্গে ইনিয়ে বিনিয়ে কী বললে, বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল না কুঞ্জ।

প্রাণকৃষ্ণ ততক্ষণ কঠিন হাতে ঠেলছে বকুলকে। -- যাওনি, যাওনি তবে সুবোধ চক্কোত্তির সঙ্গে?

মিনমিন স্বরে বকুল একবার বলতে চেষ্টা করল, তুমি ছিলে না --

-- সতীনোকখি! কই, পাতানো ভাইয়ের সঙ্গে গলাগলি করে সিনেমায় যাওয়ার সময় এই হিসেব তো ছিলনা। ওর সঙ্গে কিসের এত গুজগুজ ফুসফুস। ও শালাকে আজই মেরে তাড়াব।

দম নিল প্রাণকৃষ্ণ, ফের হতাশার ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে শুরু করল : আর কী, যা কিছু আশা ও ভরসা ছিল, সব ফর্সা হয়ে গেল। কী খোয়া যেত তোমার সুবোধের কথাটা রাখলে। আর মাস খানেকের মধ্যেও একটা কাজ যদি না জোটাতে পারি, তখন কোথায় থাকবে তোর এত তেজ। বেশ্যাবিত্তি করেও কূল পাবিনি।

মেরে তাড়াতে হল না, কুঞ্জ সেদিন নিজে থেকেই সরে পড়ল। তারপরেও কিন্তু একদিন লুকিয়ে দেখা করতে এসেছিল বকুলের সঙ্গে। দেখল তালা বন্ধ।

মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, দেখল গাড়ি থেকে নামল বকুল।

ভাঙ্গা চশমা জোড়া লাগেনি, নতুন চশমা সুবোধের চোখে। ভুরুর ওপরে ছোট একটু ব্যাণ্ডেজ।

উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে হনহন-রাগে কুঞ্জ চলতে শুরু করল।

সব শুনে শশী বলল, রাগের কী আছে। বকুল ঠিকই করেছে কুঞ্জ।

শশীর সব ঠাণ্ডামাথা বিবেচনা। বলল, স্বামীর ইচ্ছেই তো ইস্ত্রীর ইচ্ছে। স্বামীর ভালই তো ইস্ত্রীর ভাল। তার আবার আলাদা সুখ কী, আলাদা ইজজৎ কী।

কুঞ্জ তবু বলল, তাই বলে পরপুরুষের ....

শশী বলল, পরপুরুষ আবার কী। স্বামী যার হাতে সঁপে দেন তার মধ্যেই তো স্বামীকে ধ্যান করতে হয়। গোপিনীরা যেমন করেছেন। নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের কাছে সঁপে দিতেন, পড়িসনি? এর মধ্যে কোন পাপ নেই কুঞ্জ। বকুলের কোন দোষ নেই।

চার নম্বর পোলের পাশের দু'নম্বর বস্তির দিনগুলো এখন মনে হয় দুঃস্বপ্নের মত। সেই নর্দমার আঢাকা গন্ধ, ফুটো চালে উঁকি দেওয়া শতনেত্র ইন্দ্র আকাশ, আর শতছিদ্র কাপড়ে রোগারোগা কতগুলো মেয়েমানুষের ঘোরাঘুরি।

এখানে শুধু ফুলে ফুলে রামধনু, সবুজ ঘাসগালিচা, ঝাউউদাস হাওয়া, আর, – মেম সাহেব।

স্বল্পালোক একটি স্বপ্নসুড়ঙ্গের মত দিনগুলোর স্মৃতি মনে এখন ছায়াছায়া মাত্র আছে। পরম্পরা নেই, বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সম্মোহিত দিন।

কোথায় কোন্ স্পোর্টসে বখশিস বিতরণ করে এসেছেন মেমসাহেব। এসেই শুয়ে পড়েছেন বিছানায়। মাথা ধরেছে। একটু ওডিকোলন ছিটিয়ে দিলেন কপালে, তাতেও ব্যথা কমল না, অস্ফুট গোঙানি শুনতে থাকল কুঞ্জ, দূরে বসে। একটু পরে মেমসাহেব ওকে ইসারায় ডাকলেন, ছোট রুমালটা শুকিয়ে গিয়েছিল, আবার ভিজিয়ে আনতে বললেন।

শয়নকক্ষলগ্ন স্নানঘর। এটুকু পথ যেতে আসতে কুঞ্জর তিন মিনিট কেটে গেল। এতক্ষণ ধরে নিবিড় স্পর্শে ইন্দ্রাণীর কপালের সবটুকু তাপ আহরণ করেছে রুমালটা, সেই তাপটুকু কুঞ্জ শুষে নিতে চাইছে করতলের রোমকূপ দিয়ে। বেসিনে জল ঝরছে ঝবছে ত ঝরছেই: ইন্দ্রাণী কাতর গলায় ডাকলেন, কুঞ্জ! কী করছিস এতক্ষণ ধরে।

চকিতে সম্বিত ফিরে এল। থরথর হাতে ভিজে রুমালটা মেম সাহেবের হাতে কুঞ্জ তুলে দিল।

একটু পরেই ঘরে ঢুকেছেন চৌধুরী সাহেব। সুইচবোর্ডে হাত দিতেই ইন্দ্রাণী বলেছেন, প্লীজ, ডোন্ট।

মাথা ধরেছে?

পাশ ফিরে শুয়ে ইন্দ্রাণী বলেছেন, ইয়েস, বীষ্টলি।

তখনকার মত কেটে গেছে বটে, কিন্তু সেই স্বপ্নমোহ বারবার ফিরে এসেছে কুঞ্জর।

আর্ট একজিবিসনে যাবেন, বিছানা থেকে উঠে মেমসাহেব চোখে মুখে জল দিতে গেছেন, বিছানাটা ফের ঠিক করতে গিয়েও কুঞ্জর হাত সরেনি। চাদরে বালিশে একটি দিব্যদেহের ছাঁচ, একটি অস্পষ্ট মধুর সুরভি।

জুতো পালিশ করতে গিয়েও দেরি হয়েছে, ধমক খেয়েছে, তবে কুঞ্জর হুঁশ হয়েছে।

আরেক দিন।

দামী শাড়িখানা কুঞ্জই ধুতে দিয়েছিল। ভাঁজ খুলেই মেমসাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, একী, এমন করে আঁচলটা কাটলে কে!

তলব পড়ল কুঞ্জর।

-- এটা কে ধুয়ে এনেছে, তুমি?

কুঞ্জ স্বীকার করল। তৎক্ষণাৎ ওকে শাড়িটা দিয়ে ইন্দ্রাণী বললেন, যাও, এক্ষুনি এটা ওদের দোকানে দেখিয়ে নিয়ে এস। বল, পুরো দাম কাটব আমি।

কুঞ্জ তবু নড়ে না।

মেমসাহেব ধমক দিলেন আবার। --

-- যা -- আও! দাঁড়িয়ে আছ যে।

পলক পড়ছে না কুঞ্জর চোখের। ওর পেছনের দেয়ালে বিজলী আলো, সামনে মেম সাহেব। হঠাৎ কুঞ্জর নজরে পড়েছে, মেম সাহেবের গায়ে ওর সম্পূর্ণ দেহের ছায়া। কুঞ্জর চিনতে ভুল হয় নি, সে-ছায়া ওর নিজেরই। নিনখ শুভ্র পায়ের আঙুর-আঙুল ছুঁয়ে সাপের মত বেয়ে বেয়ে উঠেছে সে ছায়া, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে বাধা পেয়ে পেয়ে, বাধা না মেনে, ছায়া করাঙ্গুলি থরথর করে কাঁপছে ইন্দ্রাণীর দুঃশাসন উচ্চচূড় স্তনে, কুঞ্জর রুগ্ন, ধুক ধুক বুক ছায়া হয়ে মিশে আছে ইন্দ্রাণীর অবারিত গ্রীবামূলে, আর ইন্দ্রাণীর ঈষদ্ভিন্ন অধরোষ্ঠ কুঞ্জর ছায়া কণ্ঠে আসক্ত। মাথায় কুঞ্জ ইন্দ্রাণীর ছোট, কিন্তু ছায়া হয়ে ছাড়িয়ে গেছে।

ইন্দ্রাণী ফের অসহিষ্ণু ধমক দিলেন, কই গেলে না? যাও!

যাবে, কুঞ্জ এবার যাবে। কায়া দিয়ে যার পায়ের পাতাটুকু ছোঁবারও অধিকার কোন দিন পাবে না, ছায়া হয়ে তার সর্ব দেহের নিবিড় স্পর্শ পেয়েছে। কুঞ্জর আর আপশোষ নেই।

কিন্তু কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। ক'দিন ধরে স্পষ্ট টের পেয়েছে কুঞ্জ।

বাগানে জল দেওয়া বন্ধ। ঘাস বিবর্ণ, হলিহক, ভায়োলেট, পপি আর প্রিমরোজ নির্জীব। গাছগুলো ঝাঁকরাচুল হল, তবু ছাঁট নেই। শশী বলল, এ বছর আর ফুল হবে না, বাড়তি খরচ সাহেব সব বন্ধ করে দিয়েছেন। একটু থেমে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে আবার বলল, আমারও জবাব হয়ে যাবে কুঞ্জ।

-- জবাব হয়ে যাবে শশীদা!

কুঞ্জর শহর বাস বেশ কিছুদিন হয়ে গেল, গলায় আর তেমন আন্তরিকতা ফোটে না। এমন কি শশীর সুপারিশেই যে এখানে ঢুকেছিল সেটাও যেন ভাল মনে নেই কুঞ্জর।-- জবাব হয়ে যাবে শশীদা! কারুর পুত্র বিয়োগের খবর পেয়ে মেমসাহেব ফোন তুলে যে সুরে শোকাতুরাকে সান্ত্বনা দেন, কুঞ্জর গলাতেও সেই নিরুত্তাপ নাগরিকতা।

আসল খবর জানা গেল ক্রমে ক্রমে। শেয়ারের খেলায় ফকির হয়েছেন চৌধুরী সাহেব। কাঁচা টাকা প্রায় সবই খাঁচাছাড়া চিড়িয়ার মত উধাও, স্থায়ী জিনিসের মধ্যে এই বাড়ি, এই গাড়ি আর কিছু জমি -- সেখানেও স্পেকুলেশন -- সেও বঁড়শে বেহালার দক্ষিণে, নীচুডাঙ্গায়, ভূমণ্ডলের মত তারও তিনভাগ জল, একভাগ স্থল।

ভেজান দরজার বাইরে কুকুরটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে, কেউ ফিরেও চায় না, দরজার আড়ালে সাহেব-মেমের কলহ চলে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোয় কুঞ্জ, কী কথা হয় বোঝে না, শুধু চাপা গলার ক্রুদ্ধ তর্জন কানে আসে।

মাঝে মাঝে কুঞ্জ চমকে ওঠে, এই এক্ষুণি পর্দা ঠেলে মেমসাহেব বেরিয়ে আসবেন, একটি মাত্র আঙ্গুলের ইশারায় ওর জবাব হয়ে যাবে। যে পথে গেছে বাগানের ফুল, লনের ঘাস, দেয়ালের কলি, সেই পথেই কুঞ্জকে যেতে হবে।

শক্ত করে টুলটা চেপে ধরে কুঞ্জ, চোখের পাতা ভিজে ওঠে। যাবে না, যেতে পারবে না। কাঁপা কাঁপা আঙ্গুল দিয়ে কুর্তার পকেটটা হাতড়ায়, মুঠি করে ধরে। কে জানে কুঞ্জ ওখানে কী রেখেছে।

পা টিপে টিপে দরজায় চোখ রাখে। সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন টুলের ওপর পা রেখে, একটা হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে, স্পষ্টই উত্তেজিত।

-- দেখাবে না, দেখাবে না তুমি আমাকে তোমার হিসাব।

—না। সংসার খরচের টাকায় তোমাকে হাত দিতে দেব না;এটা আমার।

-- তোমার! এমন স্বরে সাহেব হেসে উঠলেন যে কুঞ্জর মনে হল জানালার সার্সি ঝন ঝন করে উঠল। -- তোমার! তোমাকে কে চেনে ইন্দু, সবাই চেনে মিসেস চৌধুরীকে। এর কোন জিনিশটা তোমার। সংসার খরচের টাকার কথা ছেড়ে দাও, এই মুহূর্তে তোমার বাক্সের চাবি ছিনিয়ে নিতে পারি, দেখতে পারি কত আছে তোমার পাশ বইয়ে, এমন কি, এক টানে ছিঁড়ে নিতে পারি তোমার কানের ওই বার্লিংটনের বাড়ির জড়োয়া দুল....

কুঞ্জ শিউরে উঠল, দেয়ালটা ধরে সামলে নিল, সরলনা তবু। সভ্য মানুষটির মুখোস বুঝি একেবারে খসে খসে!

কিন্তু না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন ইন্দ্রাণী, দেবী প্রতিমার মত, সাহেবের মাথাও যেন ছাড়িয়ে গেছেন। দেবীর মত অস্ত্র শস্ত্র নেই হাতে, কিন্তু ভঙ্গিটা এক। তা ছাড়া ওই দ্রুত ওঠাপড়া বুকের সাহস, প্রোজজ্বল চোখের ঘৃণা, ওই তো তাঁর আয়ুধ।

একটি কঠিন আঙ্গুল তুললেন ইন্দ্রাণী, একটি নিশিত ছুরিকার মত, রঞ্জিত নখাগ্রে বিজলী ঝলসে গেল। -- যাও, এক্ষুণি চলে যাও তুমি। যাও।

সেই মুহূর্তে ইন্দ্রাণীর পায়ের কাছে কুঞ্জ মূর্ছিত হয়ে পড়তে পারত। পেরেছেন, ইন্দ্রাণী পেরেছেন। তার কুড়িবুড়ি বকুলদি যা পারেনি, একটি মাত্র নির্ভীক আঙ্গুল তুলেই মেমসাহেব সেই অসাধ্য সাধন করেছেন।

সাহেব বেরিয়ে যেতেই মেমসাহেব শুয়ে পড়লেন, আলো নিবিয়ে। পা টিপে টিপে সেই ঘরে ঢুকল কুঞ্জ। কী ঠেকল পায়ে। কুঞ্জ কুড়িয়ে নিল। একটা কাঁটা। বোধহয় মেমসাহেবের চুলের।

সেই যে বেরিয়ে গেলেন সাহেব, আর সাত দিনের মধ্যে ঘরমুখো হলেন না। বাগান তো কবেই শুকিয়েছিল, এখন ধুলোর সর পড়েছে বারান্দায়, পর্দায়, আসবাবে। মেমসাহেবের ভ্রুক্ষেপ নেই। ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু মিলিয়ে গেছে, এসেছে একটু কঠিন দৃঢ়তা। পোষাকের

সেই ঝিমঝিম এসেন্সগন্ধটুকু নেই, এ ক'দিন মেমসাহেব মোটে প্রসাধনই করেন নি। কাছেও ডাকেন নি কুঞ্জকে। তবু, দূর থেকে দেখেই, কুঞ্জর বুক ভরে গেছে। ইন্দ্রাণী বিদ্রোহী, বন্দিনী, তবু বিজয়িনী।

সাতদিন পরে ফের ঘরের মধ্যে গুন গুন আলাপ শুনে কুঞ্জর অবাক লাগল। শশী বলল, সাহেব কাল ফিরেছেন যে। অনেক রাত্তিরে গাড়ি এল, শুনিসনি? সাহেব গিয়েছিলেন বোম্বাইয়ে।

— কেন? অর্থ নেই, তবু কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করল।

পুরাণো চাকর, কী করে সব খবরই যেন চটপট জানা হয়ে যায় শশীর। একটা ফিলিম কোম্পানী খোলার ইচ্ছে সাহেবের অনেক দিনের। এবার শেয়ার বাজারে মার খেয়ে সেই ইচ্ছেটা আরও প্রবল হয়েছে। যা কিছু ঝরতি-পড়তি পুঁজিপাটা আছে, সব একত্র করেছেন। বোম্বাই থেকে পাকড়ে এনেছেন জন কয়েক চাঁইকে। বেশির ভাগ টাকা তারাই দেবে, বাংলা বই কলকাতাতে তোলা হবে।

তারা সব কোথায়, কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করল।

তারা উঠেছে একটা বড় হোটেলে, আজ বিকেলে জোর একটা পার্টি।

সাহেব বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। শিষ দিলেন খানিকক্ষণ, নীল আকাশটার দিকে চেয়ে। লুপিকে কোলে তুলে আদর করলেন।

মেম সাহেবও এসেছেন পিছনে পিছনে। চৌধুরী বললেন, আমি তা হলে এখন চললুম, ছ'টার আগেই ওদের নিয়ে আসব। তুমি সব ব্যবস্থা এদিকে ঠিক করে রেখ, হোটেলে ফোন করলেই ওরা সব ঠিক ঠিক পৌঁছে দিয়ে যাবে।

-- পারব না।

সাহেব চটলেন না, হাসলেন — 'নটি গর্ল্; সেম এ্যাজ এভর।'

— বিকেলে আমার কাজ আছে; আর্টগ্যালারিতে সিম্পোসিয়ম।

— টু হেল ভিথ্ ইয়োর সিম্পোসিয়ম। সাহেব বললেন, না না, এ কাজটা তোমাকে করতেই হবে ইন্দু; এটা হাসিল হলে আমার ভাল, তোমার ভাল। ইউ ক্যান ডু ইট, এ্যাণ্ড আই নো ইউ উইল।

মেমসাহেব জবাব দিলেন না, ধীরে পায়ে ঘরে ঢুকলেন। উঁকি দিয়ে কুঞ্জ দেখেছে, সোফায় ইন্দ্রানী আধশোয়া হয়ে। করপল্লবে দু'চোখ আচ্ছাদিত। অনেক পরে মেমসাহেব উঠলেন, চাবি দিয়ে খুললেন আলমারি। কুঞ্জ তখনো দেখছে। থরে থরে সাজানো শাড়ি, জামা, পেটিকোট। ভাঁজ খুলে খুলে মেমসাহেব দেখছেন।

নিঃশ্বাস পড়ে না কুঞ্জর। সাহেব নেই, এই অবসরে তবে পালিয়ে যাবেন মেম সাহেব। বেছে নিচ্ছেন শুধু নিজের পছন্দমত দু'চারখানা জামা কাপড়।

কিন্তু না। মেমসাহেব সবই ফের একে একে গুছিয়ে রাখলেন আলমারিতে। শুধু চোখ ঝলসানো এক প্রস্থ পোষাক নিয়ে গোসল কামরায় ঢুকলেন।

একটু পরে বেরিয়ে এলেন নব রূপে; আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরলেন কর্ণাভরণ, যাতে তাঁকে সব চেয়ে মানায়।

কুঞ্জর তলব পড়ল খানিকক্ষণ বাদে। আজ ক'জন লোক আসবে, মেমসাহেব বললেন. তুমি দরজা জানালাগুলো একটু ঝেড়ে পুঁছে রাখ।

বেলা পড়তে না পড়তেই হোটেলের গাড়িতে খাবার এল। নার্সারির লোক পৌঁছে দিয়ে গেল গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেত পদ্ম। ধবধবে ঢাকনা পড়ল ছোট-ছোট টেবিলে; ঝকঝকে চিনেমাটির বাসন বেরুল অনেক দিন পরে।

তারপর, বেলা গড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গনে ঘস ঘস শব্দ শোনা গেল কয়েকটা গাড়ির; সিঁড়িতে এক সঙ্গে অনেকগুলো ঠকঠক জুতো।

কুঞ্জ চেয়ে দেখল, সব সিল্ক পাৎলুন আর হাওয়াই কুত্তার দল।

সবার সঙ্গে আলাপ করছেন মেমসাহেব, হেসে হেসে করমর্দন করছেন।

ওদের জন্যেই মেমসাহেব পিয়ানোতে একটা গৎ বাজালেন; তারপর, চৌধুরী সাহেবের ইসারায় বেছে বেছে খেতে বসলেন এমন একটা লোকের পাশে যার ভুঁড়ি ঠেকেছে প্লেটের কিনারে, রোমশ একটি হাতের আঙ্গুলে চারটি আংটির ঝিকিমিকি।

কয়েকটা খাবার নিজের পাতে নিল লোকটা; কটা দিল মেমসাহেবের ডিশে। হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল, মেমসাহেব হাত সরালেন না, সরেও বসলেন না পর্যন্ত। কুঞ্জর তখন চোখ দুটি জ্বলছে।

তারপর কী একটা রসিকতা করল লোকটা, সবাই হেসে উঠল, চৌধুরী সাহেবও যোগ দিলেন। মেমসাহেব লাল হলেন, কিন্তু মুহূর্তমাত্র, যেন রাগ করলেন, তারপর নিজেও সেই হাসিতে যোগ দিলেন।

চৌধুরী বললেন. এসব বলে ইন্দুকে তুমি লজ্জা দিতে পারবে না ছবিলাল। ও 'প্রুফ' হয়ে গেছে কবে। স্টেজ-শাই নয়। এম্পায়ারে নেচেছেও তো কয়েকবার।

রিয়েলি! ছবিলাল বলল, আসুন না মিসেস চৌধুরী, এই ছবিতেই নেমে পড়ুন তবে।

মেমসাহেব বললেন. আই ওন্ট মাইণ্ড ইফ আই ডু — হেসে উঠলেন খিল খিল করে। কুঞ্জ কথাটা বুঝল না, হাসিটা বুঝল।

সরে এল কুঞ্জ বাগানের এক কোণে। শরীরেব সব কটা বগ যেন কেরোসিনভেজা সলতের মত জ্বলছে।

ওর কুর্তার পকেটে হাত দিতেই সযত্নে রাখা ক'টা জিনিস বেরুল; কুঞ্জ একটার পর একটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। যত দূর পারে।

শাড়ির আঁচলের কাটা টুকরো, চুলের কাঁটা, চিরুণী থেকে ফেলে দেওয়া কয়েক গাছি দীর্ঘ চুল, কয়েকটি রঞ্জিত নখাগ্র।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছে কুঞ্জ। ওর এতদিনের গোপন সংগ্রহ, এতদিনের চুরি. পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে দিতে দিতে অস্ফুট ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, বাঁদী সব বাঁদী।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ১৪/সংখ্যা ১: ১৩৫৯]

স্ট্যাম্প

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[১৯১২ সালে কুমিল্লায় জন্ম। যশস্বী কথাসাহিত্যিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বারো ঘর এক উঠোন, শালিক কি চড়াই, মীরার দুপুর, প্রেমের চেয়ে বড়ো, ইত্যাদি। মৃত্যু: ১৯৮২ সালে।]

ওর সাপের মত কালো কুচকুচে বেণীটা দু'বার আমার টেবিলের কাগজ-পত্রের ওপর ছোবল মারল। দু'বারই চমকে উঠলাম। ও খিলখিল ক'রে হাসল।

হঠিয়ে দেবার চেষ্টা করতে ও উত্তেজিত হয়ে বলল, 'জানেন, আমাদের টিচার সেদিন বলছিলেন তো দের নানা জিনিস দেখবার, শুনবার, সংগ্রহ করবার ইচ্ছাকে বড়রা উৎসাহ দেবে। না দেওয়া অন্যায়। যারা তা করে না তারা আধুনিক নয়। দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ তোমরা ছোট আছ কাল তোমরা বড় হয়ে দেশকে আরো বড় করবে। তোমাদের গড়ে তোলার ভার আমাদের ওপর।'

মুগ্ধ হয়ে শুনলাম।

বয়স তেরো থেকে চৌদ্দ। চৌদ্দ ছুঁই ছুঁই করছিল। দেখে অনুমান হ'ল। শাদা শাটিনের ফ্রক। ফ্রকের নীচেটা কোমল হলুদ অতসী-ফুল রঙের বর্ডারে মোড়া। মাথায় কচিপাতা রঙ রিবন। মার্বেল শাদা সুন্দর মসৃণ দাঁত। ডালিমদানা রঙ উজ্জ্বল ঝকঝকে মাড়ির হাসি। এক আশ্বিনের সকালে আমায় বড় বেশি রোমান্টিক ক'রে তুলল ও।

উলাপুরের পোস্টমাস্টার আর তার রতনের কথা মনে পড়ছিল আমার।

কিন্তু রতন ছিল গেঁয়ো বোকাসোকা।

আর এই রত্না শহুরে, বেজায় চটপটে ভীষণ চালাক মেয়ে। ওর চোখের রঙই অন্য রকম।

'যদি সব রকম ডাকটিকিট না রাখবেন তো আর এটাকে ডাকঘর বলি কেন। আপনাকেই বা মাস্টারবাবু বলা কেন।' রত্না আমায় তৎক্ষণাৎ খোঁচা দিলে।

নর্থ ক্যাল্‌কাটার ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস। কি তার চেয়েও ছোট। একটা কি দু'টো পাড়া নিয়ে এই ডাকঘর করা হয়েছে। আর তার মাস্টার আমি। পাড়ার আর দু'তিনটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রত্না কোন ফাঁকে আমার টেবিলের সামনে এসে হাজির। ওরা স্ট্যাম্প কুড়োচ্ছে। বয়সে রত্নাই সকলের বড় ছিল।

বললাম ওকে, 'কোন কোন দেশের স্ট্যাম্প জোগাড় করলে? নিশ্চয় ইতিমধ্যে তোমার অনেকগুলো জমেছে!'

চোখ বুঁজে মুখস্থ বলার মত গড় গড় ক'রে বলল ও, 'কানাডা, ইটালী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক,

নরওয়ে, রাশিয়া, চীন, নিউজিল্যাণ্ড, ঝকানওয়াল্ড, বার্মা, উরুগুয়ে,—'

'অনেক তো হয়েছে', বললাম, 'বাকি রইল কি?'

'এখনো অনেক বাকি।' রত্না ভুরু বাঁকালো। 'ইরাক ইজিপ্ট তুরস্ক – ধারেকাছের দেশগুলির একটা ডাকটিকিট আমার জোগাড় হচ্ছে না, ভারি মুস্কিলে পড়েছি।'

'তা তো বটেই।' আমি ওর সুন্দর ভুরুর দিকে তাকালাম।

রত্না চোখ বড় ক'রে বলল, 'জানেন, আগে যিনি এখানে মাস্টারবাবু ছিলেন আমায় দু'টো চেকোশ্লোভাকিয়া দিয়েছিলেন। প্রহ্লাদ বাবু। অদ্ভুত মিশুক ছিলেন ভদ্রলোক।'

আমি চুপ।

'তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন তাই মন খারাপ ক'রে ইচ্ছা ক'রে বদলি হয়ে বাইরে চলে গেছেন।'

আগের পোস্ট-মাস্টারের এই বদলির কারণ আমি এ পাড়ার রত্নার কাছে প্রথম জানতে পারলাম।

অল্প হেসে ধীরে ধীরে বললাম, 'বেশ তো আমিও দেব। এই সবে এখানে এসেছি, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হ'লো। লক্ষ্মীটি, এই বেলা তোমরা যাও। আমাকে কাজ করতে দাও। ঠিক স্ট্যাম্প দেবো।'

ডাকের ভ্যান এসে গেছে বলে রত্নাদের সঙ্গে আমার বেশিক্ষণ কথা বলার সুযোগ ছিল না। উঠে পড়লাম।

পরদিন, কি সেদিনই বিকেলে আবার এসে হাজির। এবার ও একলা। কচিপাতা রঙ সবুজ রিবনের বদলে গাঢ় কমলা রঙ রিবন বেঁধেছে চুলে। চোখে কাজলের বিন্যাস। এসেই রত্না হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দিন আমার স্ট্যাম্প।'

হেসে বললাম, 'এখনো আমি খুঁজতে আরম্ভ করিনি, খুঁজব তবে তো? প্রহ্লাদ বাবু কি প্রথম দিন চাইতেই তোমায় স্ট্যাম্প দিয়েছিলেন? আমি বিশ্বাস করি না।'

'না তা নয়।' রত্না স্বীকার করল, 'একমাস দু'বেলা তাগিদ দিয়ে তবে আদায় করতে পেরেছিলাম।

'তালেই দ্যাখো, রত্নার সরলতায় খুসি হ'য়ে বললাম, 'একমাস কেন, এই দিন সাত আট দু'বেলা এসে তুমি আমায় মনে করিয়ে দিও, ঠিক পেয়ে যাবে।'

'না না সাতদিন অনেক বেশি, তিন দিন বলুন। এর মধ্যে চেষ্টা করলে নিশ্চয় আপনি জোগাড় করতে পারবেন।'

আমার ওপর এই অগাধ বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞেস না ক'রে বললাম, 'বেশ তাই হবে।' ওর হাত ধরে পরে আদরের সুরে বললাম, 'এই বেলা যাও, আমায় কাজ করতে দাও।'

কিন্তু রত্না নড়ল না।

অগত্যা প্রশ্ন করলাম ক'নম্বরের বাড়ি ওদের, বাড়িতে রত্নার আর কে আছে।

রত্না উত্তর দিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ও আমায় পাল্টা প্রশ্ন করতে ছাড়ল না।

'আপনি? কোলকাতায় থাকেন? না কি ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করেন? কোলকাতায় যদি আছেন

আপনার বাসা কোথায়? রাস্তার নাম?'

এতগুলি প্রশ্নের এক কথায় জবাব দিলাম, 'বৌবাজারে একটা মেসে থাকি।'

শুনে রত্না খুব উৎসাহ পেল না।

' ও, এখানে বাড়ি খুঁজে পাচ্ছেন না, তাই, -- আহা, আপনার তা'হলে খুব কষ্ট তো -- বৌদি বুঝি বাপের বাড়ি আছেন?'

হেসে উত্তর করলাম, 'বিয়ে করিনি।'

রত্না হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। একটু পর আস্তে আস্তে বলল, 'তা'হলে আর মেস ছাড়া আপনার উপায় কি। কত টাকা লাগে মাসে মেসে?'

'পয়যট্টি', বললাম, 'তোমার বাবার নাম কি?'

'শ্রীজওহরলাল চট্টোপাধ্যায়। জে চ্যাটার্জি ব'লে বাবাকে এখানে সবাই জানে, অফিসে চ্যাটার্জি সাহেব। আপনার পুরো নাম? মিঃ নাগ বললে কিছু বোঝা গেল না কিন্তু।'

হেসে বললাম, 'আমার নাম শ্রীবিভূতি নাগ। হ'ল? এই বেলা যাও।'

রত্না ভুরু কুঁচকালো এবং চলে যাওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ না ক'রে গম্ভীরভাবে বলল, 'সেদিন সেকেণ্ড ক্লাশের বীণার হাতে একটা ম্যাগাজিন, বাংলা মাসিক পত্রিকায় যেন বিভূতি নাগ নামটা দেখছিলাম। আপনি কি কবিতা লেখেন?'

করুণ হেসে বললাম, 'আমি কবিতা লিখি না, পড়তে ভালবাসি। তা-ও প্রকৃতির কবিতা।'

'কি রকম?'

ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চোখে ও আমার মুখের দিকে তাকায়।

বললাম, 'ফুল, পাখি, তোমার মখমলের মত সুন্দর চুল, কি সবুজ বা কমলা রঙ রিবন নিয়ে যদি কেউ কবিতা লেখে সেই কবিতা আমার রাতদিন পড়তে ইচ্ছে করে।'

রত্না হঠাৎ অবিশ্বাস্য রকম গম্ভীর হয়ে গেল।

ঠাট্টা করছি না ভাবে ও, ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমি এই দেড় কাউন্টারের ছোট্ট ডাকঘরের মাস্টার, রাতদিন কাজ করছি দেখতে পাচ্ছ, কখন আর কবিতা লিখি, পড়ারও বিশেষ সময় হয় না।'

নোখ দিয়ে ও আমার টেবিলের একটা কাগজ খুঁটছিল। ওর হাতটা আস্তে আমার হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, 'চ্যাটার্জি সাহেবের মেয়ে, মস্ত বড় অফিসে কাজ করেন তোমার বাবা, নিশ্চয় রোজ তোমায় পেটভরে রসগোল্লা খাওয়ান, এই এত এত চকলেট এনে দেন, আঙুর, আপেল, গল্পের বই, কেমন?'

হাত সরিয়ে নিলে ও।

'তা এনে দেন বটে, কিন্তু স্ট্যাম্প তো আর দেন না। বাবাকে বলিও না।'

ওর দ্বীপের দেশের মত সুন্দর দু'টি চোখে আশ্চর্য দু'টো স্ট্যাম্প ফুটে উঠতে দেখলাম।

'সেই জন্যেই তো আপনার কাছে আসা, আপনাকে এত ক'রে বলা।' বলে রত্না ওর অভিযোগ শেষ করল।

'যাকগে, আমি তোমার স্ট্যাম্প জোগাড় করে দেবো।' উৎসাহের সুরে বললাম, 'ঠিক বলেছ, আজ তোমরা ছোট আছ, কাল বড় হয়ে দেশকে আরো বড় ক'রে গড়বে। তোমাদের ভাল জিনিস জানবার, শিখবার ও সংগ্রহ করবার ইচ্ছাকে আমরা বড়রা যদি বাড়িয়ে না তুলি তাতে আমাদেব পাপ হবে এবং এর ফলে আমাদের দেশ অর্থাৎ ইণ্ডিয়া, আবার পরাধীন হবে।'

'ইস্ তা আর হয় না,' উত্তেজিত হয়ে রত্না বলল, 'ইণ্ডিয়া অনেক এগিয়ে গেছে। আপনি কোন কাগজ পড়েন? প্রহ্লাদ বাবু রোজ সঙ্গে ক'রে একটা ' স্টেটস্‌ম্যান' আনতেন দেখতাম।'

গলা খাটো ক'রে বললাম, 'ছোটখাটো একখানা বাংলা কাগজ পড়ি আমি। তাতেও অবশ্য অনেক খবর থাকে। তোমার বাবা কোন্ কাগজ পড়েন?'

'কিছুই না, কাগজ পড়ার সময় নেই বাবার। সকালে তাড়াহুড়ো ক'রে অফিসে বেরোন ফেরেন সেই রাত্রে। কোনদিন একটু সকাল করে বাড়ি ফিরলেন তো এসেই তক্ষুণি আবার ছুটলেন ক্লাবে। সেখানে তো শুনি কেবল খেলাধূলা আর গল্প চলে। ঐ খেতে বসে মাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতে শুনি আজ কাগজের খবর কি।'

'অ, তোমার মা তা হলে রেগুলারলি কাগজ পড়েন.' খুশি গলায় বললাম, 'কি কাগজ পড়েন তিনি?'

'তার ঠিক কিছু নেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মা এক এক দিন এক এক রকম কাগজ পড়ে।'

'বাঃ, তুমিও নিশ্চয় একটু আধটু রোজই পড়ছ?'

'নিশ্চয়।' বেণী দুলিয়ে রত্না বলল, 'যারা কাগজ পড়ে না তারা আধুনিক নয়. মা রোজ আমায় বলে। জানেন. আমাব মা ভয়ানক প্র্যাকটিক্যাল মানুয. আব কত নলেজ রাখে!'

বললাম, 'কত সুখী তুমি। মার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারছ। আমার মা অনেক কাল মারা গেছেন। সত্যি, মা না থাকলে মন ভীষণ খারাপ লাগে।'

কিছু বলল না।

ওর সুন্দর চোখের স্ট্যাম্প দু'টো আমি আবার মনোযোগ দিয়ে দেখলাম।

'একটা একটা ক'রে আপনি আমাদেব সব খবর জেনে নিচ্ছেন.তা নিন, কিন্তু টিকিট আমার চাই. না হলে মার কাছে ভীষণ লজ্জা পেতে হবে।'

লজ্জার কথায় হঠাৎ চমকে উঠলাম।

'কি রকম?'

'ও, আপনাকে বলাই হয়নি।' রত্না ত্রুটি স্বীকারের ভঙ্গিতে বলল, 'আসলে স্ট্যাম্পের অ্যাল্‌বামটা মা'র। বিয়ের সময় মাকে তার এক বন্ধু প্রেজেন্ট করেছিল। দেখুন, কত আগে থেকে আমাদের দেশেও স্ট্যাম্প কালেক্ট করা হচ্ছে।'

'তাই তো দেখছি।'

'তা মার নামে যদিও অ্যাল্‌বাম', পাকা গৃহিণীর মত বলল ও. 'ফর্টি-ওয়ানের পর থেকে প্রায় সবগুলো স্ট্যাম্পই আমি জোগাড় করেছি। অবশ্য খাতা থেকে টিকিট তুলতে বা সেখানে

নতুন একটা আঁটতে প্রত্যেকবার আমি মা-কে বলি। আজ সকালেও বলেছি আপনার কাছ থেকে ভাল ভাল স্ট্যাম্প পাওয়া যাচ্ছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' হেসে বললাম, 'মা-র কাছে তোমাকে যাতে লজ্জা পেতে না হয় তার ব্যবস্থা আমি করব।'

'খুব বেশি দেরি করলে চলবে না কিন্তু।'

ওর হাতের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, 'না। এখন যাও। আমায় কাজ করতে দাও।'

বুদ্ধিমতী আর বাক্যব্যয় না ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কপাল ভাল, একটু খোঁজাখুঁজি করতে জানতে পারলাম মেসের রুম-মেট্ সনাতন বাবুর ফার্স্ট-ইয়ারে পড়ুয়া শ্যালক পুরোনো স্ট্যাম্পের ভাণ্ডারী।

ব'লে কয়ে তার কাছ থেকে একটা মিশরের স্ট্যাম্প জোগাড় করলাম।

পরদিন সকালে স্ট্যাম্প পেয়ে রত্না আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

'ইস্ কতকাল মা মিশর মিশর করছিল। আমিও খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছিলাম।'

বললাম, 'টিকিটটা দেখতেও ভারি সুন্দর। তোমার মা খুব খুশি হবেন।'

'খুশি মানে! আজও স্ট্যাম্প পেলে মার যা আনন্দ হয়, সারাদিন অ্যাল্‌বামটা হয়ত হাত ছাড়াই করবে না।'

রত্না নিবিষ্ট হয়ে পিরামিড আর নীল নদীর ছাপ মারা ডাকটিকিট দেখছিল।

বললাম, 'নিশ্চয় তোমাকেও মা আদর করবেন সেই সঙ্গে।'

কথা বলল না ও।

কিন্তু আমার বুকের মধ্যে কথা ভিড় করছিল। হাতের ওপর মৃদু চাপ দিতে রত্না চমকে উঠল।

মৃদু হেসে বললাম, 'কে তোমায় বেশি ভালবাসেন, মা? না, বাবা?'

'দু'জনই সমান।' গম্ভীর হয়ে রত্না বলল, 'বাবারটা বোঝা যায়, মার আদর বোঝা যায় না।'

'কি রকম?'

'বাবা খুব হৈ-চৈ করেন আদর করার সময়। মা নীরব। অথচ মা বটাই বেশি দরকারী। আজ আমার একটু সর্দি হোক মা তক্ষুণি ডাক্তার ডেকে ওষুধের ব্যবস্থা করে দেবে। বাবা সাতদিনেও কিছু করবেন না। অবশ্য ---' রত্না থামল।

'কি, বলো?'

'মা যদি জোর দিয়ে বলে, বাবা তক্ষুণি ছুটে গিয়ে ডাক্তার ব'লে ডাক্তার, কোলকাতার সেরা ফিজিসিয়ানকেই হয়ত ডেকে নিয়ে আসবেন বাড়িতে। খুব হুজুগে লোক বাবা, তবে খেয়াল রাখেন কম।'

বললাম, 'তাই।'

'কিন্তু এটা তো খারাপ কি বলেন?' রত্না আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'মা প্র্যাক্‌টিকাল, ভয়ানক পারফেক্ট সবাই বলে, বাবা পর্যন্ত স্বীকার করেন।'

'স্বীকার না করবেন কেন।' রত্নাকে কাছে টেনে আর একটু আদর করে কি যেন প্রশ্ন করছিলাম, তার আগেই ও ফিক্ করে হাসল।

'কি?'

'মা রাতদিন বাবাকে ব'লে ব'লে হয়রান, কেবল বড় চাকরি আর টাকা রোজগার করলেই হয় না, পুরুষের কতকগুলো সদগুণ থাকা চাই।'

কিন্তু কি সেই গুণগুলি চ্যাটার্জির মধ্যে যেগুলোর অভাব ছিল, রত্নাকে জিজ্ঞেস করার বয়স এটা ওর নয় বলে চুপ ক'রে ছিলাম।

'চলি?'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'যাও।'

পরদিন রোববার।

তাই রত্নাকে পেলাম না।

কিন্তু এদিকে লাভ হ'ল। ছুটি পেয়ে একটু বেশি ঘোরাঘুরি করার ফলে একটা 'ইরাণ' ও দু'টো 'সিলোন' আমার জোগাড় হয়ে গেল।

আশ্চর্য, একটু অবাক হলাম দেখে।

সোমবার স্ট্যাম্প পেয়ে রত্না খুব খুশি হ'ল না।

'তোমাদের এগুলো আছে কি?' প্রশ্ন করলাম।

মাথা নাড়ল ও। 'নেই।'

'তবে?'

ওর চোখের তাজা নতুন স্ট্যাম্প দু'টো আমি মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম।

'কি ব্যাপার, তোমায় এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?' ওকে খুব বেশি গম্ভীর থাকতে দেখে আমি আবার প্রশ্ন করলাম। 'মা বকেছেন? কিছু অন্যায় করেছিলে বুঝি?'

'মা আমায় কখনো বকে না।'

'তা কেনই বা বকবেন। তুমি ভাল মেয়ে।' আমি নিজেকে সংশোধন করলাম।

খুশি হয়ে রত্না আমার হাতের মধ্যে হাত ছেড়ে দিলে। 'আমাদের সব অশান্তি বাবাকে নিয়ে।'

'কেন কি করেছেন বাবা?' একটু দুর্ভাবনা হওয়া সত্ত্বেও আমি তা' হাসি দিয়ে ঢেকে রেখে বললাম, 'তোমরা মা মেয়ে দু'জনেই আজ বাবার ওপর চটে আছ দেখছি? সিনেমায় যেতে চেয়েছিলে বুঝি, চিড়িয়াখানা দেখতে? তুমি আজো চিড়িয়াখানা দ্যাখো নি?'

রত্না এ সব কথার জবাব না দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'বাবা বড্ড ছেলেমানুষ। কেবল টাকা রোজগার করলে হবে কি। বড় অফিসার হলে হবে কি। যতটা মাজা ঘসা সুন্দর হওয়া দরকার বাবা তা মোটেই নন।'

বুকের মধ্যে ডিপডিপ করছিল।

এমন সময় ও আমার হাতে একটা দু'আনি দিলে।

'কি ব্যাপার, পয়সা কেন?'

'একটা স্ট্যাম্প। কাউন্টারে ভিড় আপনি এনে দিন।'

'তাই বল।' আমার ক্যাশ বাক্স থেকে একটা স্ট্যাম্প ছিঁড়ে ওর হাতে দিয়ে বললাম, 'বিদেশী স্ট্যাম্প ছেড়ে স্বদেশী স্ট্যাম্প হঠাৎ দরকার হ'ল? কোথাও চিঠি লিখছ বুঝি, তোমার বাইরের কোনো বন্ধুর কাছে, কি নাম তোমার বন্ধুর?'

'ও আপনি মাস্টারবাবু হয়ে বুঝি লুকিয়ে সেই চিঠি পড়বেন আর হাসবেন। পড়া শেষ হয়ে গেলে আবার খামটা জুড়ে ঠিকঠাক ক'রে আমার বন্ধুর কাছে সেটা পাঠিয়ে দেবেন?' রত্না চোখ বড় ক'রে বলল, 'আমি বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখে কক্খনো আপনাদের এসব ছোট ডাকঘরে ফেলি না। বাবার অফিসের দারোয়ানকে দিয়ে সোজা জি পি ও'তে পাঠিয়ে দিই। সেখানে চিঠি চুরি ক'রে পড়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।'

জি পি ও-র ওপর রত্নার অগাধ আস্থা আছে দেখে আমি তবু আশ্বস্ত হলুম। বললাম, 'যাকগে, দরকার নেই নাম ব'লে তোমার বন্ধুর। তবু তুমি দয়া ক'রে এই ছোট ডাকঘরে চিঠি ফেলো। এটাও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছে দেখলে সরকার বাহাদুর খুশি হবেন।'

হিউমারটা রত্না বেশ উপভোগ করতে পারল। ওর চোখের উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছে দেখেই বুঝতে পারলাম। অল্প হেসে বলল ও, 'আমি না, মা চিঠি লিখছেন। যাই, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

ওর হাতে অল্প চাপ দিলাম।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবে। তোমার সঙ্গে গল্প করলে আমারও চলবে না। এক্ষুণি ডাক এসে যাবে। আজ সকালে কি দিয়ে খেলে শুনি?'

'ফুলকপি আর গলদা চিংড়ি। উঃ কী হাইক্লাশ হয়েছিল মার রান্না।'

'আমাদের মেসের রান্না বড্ড খারাপ হয়, খাওয়াই যায় না।'

'বাবাঃ! আপনি পারছেন, প্রহ্লাদ বাবু পারতেন না। সেবার ভদ্রলোকের স্ত্রী দিন পনেরোর জন্যে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে এক জানাশোনা বন্ধুর মেসে দিনকতক খেতে হয়েছিল। খেয়ে এসে এই চেয়ারে ব'সে আমাদের কাছে ভয়ানক কান্নাকাটি করতেন যে এবার আর তিনি বাঁচবেন না।'

আমি বললাম, 'সত্যি তাই।'

'চলি'।

'এক্ষুণি কি না গেলে নয়?'

'মা আবার ব'সে আছে, স্ট্যাম্প নিয়ে গেলে তা খামে এঁটে পোস্ট করা হবে।'

'তবে যাও। মার কাজে দেরি করা ঠিক নয়।'

বিকেলে একটু অবসর। বারান্দায় পায়চারী করছিলাম। রত্না চিঠি ডাকে ফেলতে এল। ওর রামধনু-রঙ সুন্দর রিবনের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মার অনেক কাজ ক'রে দাও। সেই জন্যেই ত মা-ই তোমাকে বেশি ভালবাসেন, বলছিলে না কাল? না কি বাবা?'

'বাবা আমাকে একটুও ভালবাসেন না।'

'ও, বাবা আজ অফিসে যাবার সময় তোমায় বেশ একটু গালমন্দ করেছেন। পড়ছিলে না বুঝি? স্ট্যাম্প-এর এ্যাল্‌বাম নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলে শুধু।'

চুপ করে রইল ও।

'তখন বকেছেন। এইবেলা অফিস থেকে যখন বাড়ি ফিরবেন, দেখবে তুমি যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি ভালবাস হাতে ক'রে তোমার জন্যে তাই নিয়ে এসেছেন?'

'কি আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি বলুন ত?' রত্না আকস্মিকভাবে আমায় প্রশ্ন করল। একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে উত্তর করলাম, 'কেন, ইয়ে, তোমার এই ত সবে প্রথম শরতে কোলকাতায় নতুন নীল ইরাণী আঙ্গুর চালান এসে গেছে। বাবা এক গোছা তোমার জন্যে নিয়ে আসবেন।

হাসল ও আমার কথায়। কিন্তু শরতের মত সে হাসি স্বচ্ছ ছিল না। বলল, 'বাবা কোলকাতায় নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'ঝাড়গ্রাম।'

'ছুটি নিয়েছেন বুঝি অফিসে? কি দরকার সেখানে?'

'সেখানে আমাদের একটা বাড়ি তৈরী হচ্ছে।'

' ও, বাবা বাড়ি তৈরীর তদারক করতে সেখানে গেছেন বুঝি?'

'বাবা মোটেই বাড়ি তৈরী দেখছেন না। শুধু নাম ক'রে সেখানে যাওয়া।' রত্না অম্লানবদনে বলল। চুপ ক'রে রইলাম।

'তাও মা-র আপত্তি ছিল না। কাজের চাপ থাকে সারা বছর। মাঝে মাঝে বাবা যদি দু'একদিনের জন্য বাইরে যান মা খুসি হয়।'

মনে মনে প্রশ্ন করলাম, 'এ যাত্রা অখুসি হবার কারণ কি?'

রত্না বলল, 'যতবার বাবা ঝাড়গ্রাম যাচ্ছেন সঙ্গে যাচ্ছে পাজী মেয়েটা।'

'কে?' সভয়ে প্রশ্ন করলাম।

রত্না মোটেই ভয় পেলো না, বরং ওর লাল টুকটুকে নধর কচি ঠোঁট ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল। 'ডলি, ডলি সেন। বাবার অফিসের টাইপিস্ট। উঃ কী ভয়ানক কালো কদাকার কুৎসিৎ দেখতে, যদি দেখতেন।'

'কাজ নেই আমার দেখে।' আমিও ঘৃণার ভাব প্রকাশ করলাম।

'এবার মা খুব কড়া ক'রে বাবাকে চিঠি লিখেছে।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

'চলি'।

আর ওকে বাধা দিলাম না।

তারপর পাঁচ বছরের দীর্ঘ ছেদ।

একবার চিন্তা ক'রে দেখুন।

গল্পটা হারিয়ে গিয়েছিল। যেমন অনেকগুলো স্ট্যাম্প আমার টেবিলের ড্রয়ারে জমতে জমতে পুরোনো হয়ে পরে একদিন হারিয়ে যায়, হারিয়ে গেছে।

কিন্তু সংসারে কী-ই বা হারায়, কে বা হারায়!

আশ্চর্য হয়ে গেলাম, সেই দেশ ভাগ হবার পর থেকে এক ধাক্কায় পরপর বেনারস বৃন্দাবন অযোধ্যা কানপুর এমন কি ওধারে শিলং পর্যন্ত বদলী হয়ে হয়ে শেষে ঝুপ্ ক'রে এক ফাল্গুনের বিকেলে ঝাড়গ্রামের ডাকঘরের টেবিল জুড়ে বসলাম।

আমার রগের চুল একটা দু'টো ক'রে পাকতে সুরু করেছিল। কিন্তু তা হলেও সেদিন ঝাড়গ্রামের সেই মনোরম বিকেল ভারি রোমান্টিক ক'রে তুলেছিল মেজাজটাকে।

ডাকঘরের সামনেই লাল কাঁকরের পথের ওপর বিশাল পলাশ গাছ। রাস্তাটা জুড়ে ছিল লাল ফুলের পুরু বিছানা। পাখিগুলো অসম্ভব কিচিরমিচির করছিল।

শনিবারের বিকেল। তাই অন্য সবগুলো কাউন্টার বন্ধ ক'রে দিয়ে কেবল টেলিগ্রামের দরজা খোলা রেখে চেয়ারে ব'সে নিবিষ্টমনে রবি ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' পড়ছিলাম। এমন সময় পা টিপে টিপে ও আমার ইজিচেয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে চমকে উঠলাম।

বেণী নেই, ভ্রমরকৃষ্ণ খোঁপা।

আর কজ্জলি আলিম্পিত আয়ত বিশাল চক্ষু। যেন দু'টো পলাশ ফুলের পাপড়ি আমার চোখের সামনে স্থির হয়ে আছে। দুই চোখের পালক মনে হলো নীল প্রজাপতির ডানা।

'বিভূতি বাবু!'

বললাম, 'হ্যাঁ, রত্না তুমি?'

রত্না দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে আমায় নমস্কার জানাল। বললাম, 'ভাল আছ?'

'হ্যাঁ,' ঘাড় নেড়ে বলল ও, 'আপনি?'

বললাম, 'একরকম কেটে যাচ্ছে।' ওর চোখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সেই স্ট্যাম্প। পলাশের পরাগ মাখা যৌবনের ছাপ মারা ঝকঝকে দু'টো স্ট্যাম্প চোখের এ্যালবামে আরো সুন্দরভাবে বাঁধানো হয়েছে দেখে বুকের ভিতরটা ভরে উঠল। তাই একটুপরে প্রায় চিৎকার ক'রে বললাম,' ইস্ কত বড়টি হয়েছ।'

আপনিও যে বুড়ো হয়ে গেছেন, রোগা। এখনো মেসে খাচ্ছেন নাকি।'

ঘাড় নাড়লাম।

রত্না তা ভ্রুক্ষেপ না ক'রে বলল, 'আমি বিয়ে ক'রে ফেলেছি, মিঃ নাগ, এই আশ্বিনে।'

হেসে বললাম, 'করবেই তো, বেশ বড়টি হয়েছ।'

সমুদ্র শঙ্খের মত শাদা সুন্দর ঝকঝকে দন্তরাজি বিকশিত ক'রে ও এবার হাসল। নাকি একমুঠো চামেলী ফুলের কলরব শুনলাম।

টেলিগ্রাম করা সেরে ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার ক'রে ও আমার হাতে দিলে।

'ওর এই ভিজিটিং কার্ডে আমাদের বাড়ির ঠিকানা লেখা আছে দেখুন। কাল রোববার। সকালের দিকে আসুন। চা খাবেন আমার ওখানে।'

'নিশ্চয়ই যাব, কেন যাব না।' সরস গলায় বললাম, 'স্বামীটি জবরদস্ত রকম চাকরি করেন দেখছি, ভারি আনন্দ হ'ল। হঠাৎ কোলকাতায়?'

'শনিবারের বিকেল তা-ও কি আপনি ভুলে গেছেন।'

রত্নার গলার স্বর শুনে কেমন অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই। ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে বলল ও, 'সঙ্গে এনাক্ষীও গেছে।'

'কে এনাক্ষী?' সভয়ে প্রশ্ন করলাম।

'ওর পি-এ, স্টেনো। ডিস্‌পেপটিক চেহারার এনাক্ষী গাঙ্গুলীকে দেখেন নি আপনি, উঃ ঘেন্নায় মরে যাবেন।'

'না, সবে তো পরশু এখানে জয়েন করেছি। হয়ত কিছুদিন থাকলে দেখা হবে।'

'কাল আসুন। ভাল ক'রে গল্প করব। আমাকে এক্ষুনি একজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হচ্ছে, চলি।'

'যাও, কাল নিশ্চয় তোমার হাতের চা খেতে যাব।' এবং আগের দিনের মত হেসে ঘাড় নেড়ে পরে বললাম, 'এখন আমার হাতে কাজ ছিল না, তুমি থাকলে ক্ষতি ছিল না।'

যাবার সময় ও বলে গেল ওর বাবা পরলোকগত হয়েছেন।

পরদিন চা খেতে খেতে গল্প করল রত্না।

'সেদিনই বিকেলে অফিসের বড় সাহেবের কাছে মা রিঙ করতে বাবাকে ওরা বদলি ক'রে দেয় দিল্লী।'

'ডলি আর তদ্দুর যেতে পারেনি?' খুশি গলায় বললাম।

'দিল্লীতে থাকতে বাবা প্রায়ই বলতেন ওটা ভয়ানক ছোটলোক। একবার ঝাড়গ্রাম থেকে কোলকাতায় ফেরার পথে ও-ই নাকি বাবার অত দামের রিস্টওয়াচটা চুরি করেছিল। চুরি ক'রে নাকি বাজারে বিক্রি ক'রে দেয়। ক'টাকা আর মাইনে পেত শাকচুন্নী।'

বললাম, 'শুনে তোমার মা খুব খুশি হয়েছিলেন?'

'উঃ বড় একটা গ্রাহ্য করত কিনা মা অফিসের এই শাকচুন্নী পেত্নীগুলোকে! মা জানতো হাজারটা ডলি এসেও বাবাকে মা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বাবা আবার মা-র কাছে ফিরে আসবেনই।'

একটু চুপ থেকে পরে বললাম, 'দিল্লীর ইস্কুলেই বুঝি তুমি পড়েছ, সেখানেই বড় হয়েছ।'

লবঙ্গ আর এলাচদানা ভর্তি রেকাবীটা রত্না আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। 'না এলাহাবাদেও ছিলাম বেশ কিছু দিন।'

'তোমাদের এখানকার বাড়িটা?'

'হ্যাঁ, বাবা হঠাৎ দূরে সরে যাওয়াতে শেষ করা হচ্ছিল না এ্যাদ্দিন। গেলবার ছুটি নিয়ে এসে বাবা তাড়াহুড়ো ক'রে শেষ করলেন। কিন্তু বাস করতে পারলেন না।'

দ্বিতীয়বার দুঃখ প্রকাশ ক'রে বললাম, হ্যাঁ, একটু সকাল সকাল লোকান্তর হলেন চ্যাটার্জি সাহেব। তোমার মা এখানে আছেন?'

'মা মামাবাবুর সঙ্গে উটকামণ্ড আছেন, সেখানেই থাকবেন।'

'তোমার বিয়ের পর কে-ইবা আর রইল তাঁর কাছে থাকবার।'

'আমি কাল চলে এসেছি আসানসোল থেকে এখানে। এখানেই থাকব।' রত্নার গলার স্বর পরিবর্তিত হ'ল। 'উনি গেছেন এনাক্ষীকে নিয়ে কোলকাতায়।'

একটু সময়ের স্তব্ধতা।

ওর পলাশ ফুলের পাপড়ি চোখ দু'টো আবার দেখব সে সুযোগ ছিল না, অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল রত্না।

একটু পর চমকে উঠলাম।

ফুলের পাপড়ি বেয়ে শিশির বিন্দু নয় বড় দু'টো বৃষ্টির ফোঁটা টেবিলের ওপর ঝরে পড়ল।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছল রত্না।

আমি বললাম, 'তুমি যখন টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছ ঠিক চলে আসবেন। মৈনাক বাবু আজ রাত্রের মেলেই ফিরবেন, দ্যাখো।

কিছু বলল না ও। হাই তুলল। মোছা চোখে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'আসুক না আসুক মাথা ব্যথা নেই আমারও আর। এই শেষ টেলিগ্রাম। কাল ওর কাছে দু'আনার স্ট্যাম্প খরচ ক'রে একটা চিঠি ছাড়বারও আর ইচ্ছে থাকবে না আমার।'

ব'লে ও ওর ঘরের জানালার কাছে পায়চারী করল একটু সময়।

বাইরে প্রথম ফাল্গুনের রৌদ্র, একটা চিকন সবুজ আমের শাখায় উঁকি দিয়ে থাকা জানালা গলিয়ে আসা মলয় হিল্লোলে ওর বেণীর কাঁপুনি আর সিল্কের মর্মর আমাকে মন্ত্র পড়ানোর মত স্তব্ধ ক'রে রেখেছিল।

রত্নার হাসির মর্মর অধিকতর সুন্দর ছিল।

অমন একটা দু'টো স্ট্যাম্প এ্যালবাম থেকে খসে পড়লে কিছু যায় আসে না, কি বলেন?'

যেন বুঝি না বুঝি না ক'রে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'এখনো স্ট্যাম্প কুড়োচ্ছো বুঝি?'

'হ্যাঁ, জীবনের খাতায় যত্ন ক'রে সেগুলো তুলে রাখছি', রত্না এবার গম্ভীরভাবে বলল, 'আর এ-ও আপনাকে বলে দিচ্ছি বিয়ের লাল ক্রাউন ছাপ মারা একটা স্ট্যাম্পের চেয়ে ভালবাসার সোনালী লতা আঁকা একটা স্ট্যাম্পের দাম অনেক বেশি। মা মুখ কালো ক'রে বাবার জন্য অপেক্ষা করত কিন্তু আমি তা করছি না। কেন করব?'

আমি চুপ।

'আই হ্যাভ অলরেডি ডিসাইডেড।' বলতে বলতে জানালার কাছ থেকে সরে এসে ও আমার সামনে দাঁড়ায়।

'না কি বিয়ের চেয়ে প্রেম বড় নয়, আপনি অস্বীকার করেন বিভূতি বাবু? আপনি কি যথেষ্ট আধুনিক নন?'

'দরকার হ'লে বড় ক'রে তা দেখতে হয় বৈকি।' স্বীকার না ক'রে পারলাম না, তারপর আবহাওয়াটা বড় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠছিল বলে স্বচ্ছ হেসে বললাম, 'কে সে, কোথায় থাকে?'

'মলয়। এই ঝাড়গ্রামের ছেলে। কী অদ্ভুত বেহালা বাজায় যদি শোনেন।'

রত্নার দুই চোখে আবার উদ্ধত পলাশের গরিমা জাগছিল। জানালার বাইরে আকাশের নীল দেখতে দেখতে বললাম, 'তোমার নতুন স্ট্যাম্পটিকে দেখিও।'

[প্রকাশকাল: বর্ষ ১৪/সংখ্যা ৩: ১৩৪৯]

ছাদ

বিমল কর

[জন্ম ১৯২১ সালে টাকীতে। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: পূর্ণ অপূর্ণ, খড়কুটো, অসময়, বরফ সাহেবের মেয়ে, ইত্যাদি। একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত।]

মিছিমিছি আর কেন কাঠি জ্বালা! ক'বারই তো জ্বালাতে চাইলে! ছাদে এখন বিশ্রী উলটোপালটা হাওয়া। দেশলাইয়ের পুরো বাক্সটাই পুড়বে, তুমি যা খুঁজছ, খুঁজে পাবে না।

শোনো অরুণ, এই ছাদ খুব ছোট নয়। এখানে জঞ্জালও কিছু কম জমেনি। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের আবর্জনা শুধু তোমরাই জমিয়েছ, তার আগে আরো কত বছরের জঞ্জাল আমরা জমিয়েছি—তার হিসেব নেই। সব মিলেমিশে এই ছাদ এখন আমাদের তিন চার পুরুষের।

উত্তর দিকের আলসে ধরে, ওই যে টিনের কুঠরি ঘর, যার না-দরজা না-জানলা, শুধু গা-গলানোর মতন একটা ফোকর—ওই ঘরে না আছে কি! আমার বাবা যে-পালংকে শুয়ে চোখ বুজেছিলেন, সেই পালংকের খান দুই ভারী পায়া আজও পড়ে আছে। আমার মা-র পাখি-তোলা হাতবাক্সর ডালা, ছেঁড়া খোঁড়া ঝাঁপি, তোমার পিসির বিয়ের পোকাধরা পিঁড়ি, আমার ছেলেবেলার দুটো কাঠের মুগুর, তোমার মার গঙ্গাজলের গলা ভাঙা তোবড়ানো ফুটো পেতলের ঘড়া, তোমাদের বাচ্চা বয়সের ট্রাইসাইকেলের ভাঙা হাতল, চাকা, কচ্ছপ-পিঠ ক্যারাম বোর্ড, বিনুর সেই চীনে-ভূত কাঠের পুতুল, ময়নার খাঁচা ..সবই আছে ও-ঘরে। আর আছে দাদুর উইয়ে ধরা মস্ত বড় রঙিন ছবি; কতক তেলাপোকা খাওয়া ফটো, রাজ্যের ভাঙা কাঠ, কলংক ধরা কালো ভাঙা বাসন; জলের ড্রাম, দড়ি, শন, নারকোলের ছোবড়া ওঠা গদী, দু-চারখানা তোশক — যা দেখলে মনে হয় শ্মশান থেকে বুঝি কুড়িয়ে এনে রেখেছে।

অরুণ, এই জাদুঘরের মধ্যে দুটি জিনিস এখনো বেশ টিকে আছে। ছেলেবেলায় যে-দোলনায় বিনু দোল খেতে খেতে মুখে আঙুল পুরে ঘুমিয়ে পড়ত তাই দোলনাটা এখনো প্রায় অটুট। তোমার সেই কাঠের দোলনা-ঘোড়াটাও। রঙ চঙ করে মুছে গেছে, ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে চলকা উঠেছে, চাল ভেঙেছে -- তবু ওটা আছে।

আজ, এই ভরা রাতে, উলটো-পালটা হাওয়ায় একটা ষাট কাঠির দেশলাই পকেটে নিয়ে তুমি কি ওই দোলনা বা ঘোড়াটার খোঁজ করতে এসেছ! তা নয়, অরুণ। এ-দুটোর কোনোটাতেই তোমার প্রয়োজন নেই, বিনুরও নয়, আমি জানি।

আমি জানি অরুণ, কিসের খোঁজে তুমি অন্যমনস্ক, ক্লান্ত, শিথিল পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে অন্ধকারে একলা এখানে এসে দাঁড়িয়েছ।

যে-জাদুঘরের কথা আমি বললাম--সে-ঘরের গুমোট, মাথা ঝিমঝিম, উগ্র, কেমন এক

ভ্যাপসা -- কটু গন্ধ তোমার অসহ্য, তুমি ওখানে যাবে না।....তবে এই বাকি ছাদটুকুতে কি আছে, কিসের জন্যে তুমি এসেছ, কেন দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালছ?

এই ছাদ খোলা মেলা, অনেকটা জায়গা। একটা তক্তপোশ পড়ে আছে এক পাশে, ক্যাম্বিসের হেলানো আরাম-চেয়ারও একটা, কয়েকটা ফুলের খালি টব। দু তিনটি অ্যানামেলের ভাঙা গামলায় মাটি ভরে বেলফুল ফুটিয়েছিল সুষমা; শুকনো কটি শাখা দু-চারটি পাতা নিয়ে তারা এক পাশে পড়ে আছে। গোটা দুই ভাঙা টিন, চুনকাম করার সময় ভারা বাঁধার এক গন্ডা বাঁশ, আর...আর কতকালের একটা ডালিম গাছ এক কোণে। ইট গেঁথে চৌবাচ্চার মতন করে কে যে মাটি ঢেলেছিল, ডালিম গাছটা পুঁতেছিল আজ আর আমার মনে নেই।

তুমি কি এই তক্তপোশ, ফুলের টব বা ডালিম গাছটার তলায় কিছু খুঁজতে এসেছ? অথবা এই গোটা ছাদের ধুলোয় ময়লায় অন্ধকারে আলসের ফাঁকে ফাঁকে কিছু দেখতে এসেছ?

ওই তক্তপোশটায় তুমি দু দন্ড গা এলিয়ে শুয়ে পড় অরুণ; না হয় ক্যাম্বিসের চেয়ারটায় আরাম করে বসে থাক একটু। আজ তোমার সারাটা দিন বড় ধকল গেছে। কাল মাঝ রাত থেকেই। ডাক্তারের বাড়ি ছুটোছুটিই তো কবার করলে -- তারপর আবার মাঠকুড়িয়ার শ্মশান যাওয়া। সে কি আর কাছে -- প্রায় মাইল পাঁচেকের পথ। শ্মশান থেকে ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল। চৈত্রের এই ঝাঁঝাল রোদে অনেক পুড়েছ; চিতার আগুন নদীর জল তোমার শরীর থেকে অনেকখানি নিয়েছে। তুমি যে কত শ্রান্ত ক্লান্ত উদাস অন্যমনস্ক বিহ্বল এবং বিমূঢ় -- আমি জানি অরুণ।

কাল মাঝরাতে যখন সুষমার ওই রকম অবস্থা, সারা বাড়িতে হুটোপাটি, ছুটোছুটি তখন সকলেই ভেবেছিল তুমি বিছানা ছেড়ে উঠবে না, ডাক্তার বাড়ি ছুটবে না। ওরা বলাইকেই পাঠাতে যাচ্ছিল। আমি বারণ করলাম।...ঠিকই করেছিলাম। দেখলাম তো ওদের ছুটোছুটি চেঁচামেচিতে তুমি জেগে উঠেই সুষমার ঘরে এসে দাঁড়ালে। ....কাউকে কিছু বলতে হল না, সাইকেলটা নামিয়ে নিয়ে নিজেই তুমি ডাক্তারবাড়ি ছুটলে। আমি জানতাম, তুমি নিজেই ঘুম থেকে জেগে উঠবে, তুমি নিজেই ডাক্তারবাড়ি যাবে। কারণ সুষমা তোমার স্ত্রী।

শ্মশানে যাবার সময়ও বাড়ির লোকে ভেবেছিল, তুমি কিন্তু কিন্তু করবে, এড়িয়ে যেতে চাইবে। তুমি, অরুণ, তোমার কর্তব্য ও দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করনি। সুষমা মারা যাবার পর শান্তভাবেই থানায় গেছ। দারোগাকে নিয়ে এসেছ। পুলিসের লোক যা দেখতে চেয়েছে যা করতে চেয়েছে -- কোথাও বিন্দুমাত্র বাধা দাওনি, অধৈর্য হওনি।

আমি নিজেই অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। বিষ খেয়ে মরেছে সুষমা, তাড়াতাড়িই মরেছে, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি মৃত্যু-যন্ত্রণাকে সে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছে -- তত তাড়াতাড়ি তার দেহটা পালাতে পারবে না। চেতনা কত সহজে, কত দ্রুত এক পার থেকে আরেক পারে চলে যেতে পারে, দেহ পারে না।

সুষমার ঠান্ডা, ঈষৎ অনম্র, নির্ঘাম, অ-শ্বসন দেহটা আরো কঠিন কাঠ নিছক বস্তুভারের মতন হাড়-মাংসের তাল হয়ে এক কি দুদিন পর তোমাদের কাঁধে চাপুক -- এ আমি কিছুতেই কল্পনা করতে পারছিলাম না। মানুষ, অন্তত আমার পুত্রবধূ, দর্জির দোকানে ফেলে দিয়ে আসা

কাপড় নয় যে তাকে মাপে মাপে ছাঁটকাট করতে হবে। সুষমা সুষমার মতন থাকতে থাকতেই তার দেহটাকে তোমরা এই ভূমন্ডল জোড়া বাতাসে মিশিয়ে দাও।

অধৈর্য হয়েছিলাম বলেই আমায় একবার মুখুজ্যে মশাইয়ের গাড়ি করে সরকারী হাসপাতালের সার্জন সাহেবের কাছে এবং পরে নতুন হাকিমের কাছে যেতে হল। বেলা দশটা নাগাদ পুলিসের ছাড়পত্র নিয়ে ফিরলাম।

তুমি এ-সব করতে না অরুণ। আইনের কাছে করজোড় হতে না, সামান্য সুবিধেও চাইতে না। সুষমাকে যদি ওরা মাছ কোটার মতন করেও কুটত, যদি তার বিকৃত অবয়বের স্থূল রেখাগুলো জুড়েও আমাদের সুষমাকে তৈরি করা না যেত --- তবুও তুমি দ্বিধা করতে না শ্মশান যাত্রার সময়। আজ যেভাবে যেমন করে সংযত ভদ্র শান্ত স্থিতধী মানুষ হয়ে আর পাঁচজন যাত্রীর সঙ্গে শ্মশান যাত্রায় পা বাড়ালে অবিকল তেমন করেই পা বাড়াতে যদি মর্গ ফেরত সুষমার লাস আগামী কাল বিকেলেও আসত পচা গন্ধে বাতাস বিষাক্ত করে।

আমি প্রথমে দোতলার কোণা-বারান্দা দিয়ে, পরে সদরের কাছে হরিতকী তলায় দাঁড়িয়ে তোমার যাওয়া দেখছিলুম। জামাটা তোমার চটকানো ময়লা ময়লা, ধুতি কখন মালকোঁচা মেরে নিয়েছ, মাথার চুল উসকো খুসকো, ঘামে সমস্ত মুখ আঠা আঠা, চশমাটা প্রায় নাকের ডগায় নেমেছে। অত তাত, পা রাখা যায় না-তবু সদরের বাইরে এসে কি ভেবে বলাই সন্তুদের দেখে পায়ের চটিটা খুলে ফেলে দিলে। (আমি ভাবছিলাম, খালি পায়ে দুপুর রোদে তুমি কি করে পথ হাঁটবে!)...সদরের বাইরে ওরা সুষমার খাট কাঁধে তুলল, তুমি পিছনে এক পাশে দাঁড়িয়ে। অন্তঃপুর থেকে ঝিমানো কান্নাটা তখন সদরে এসে শেষবারের মতন জোর হয়ে উঠেছে। ছোট বড় গলায় হরিধবনি উঠল। তুমি আকাশের দিকে তাকালে, মাথার চুলে একবার আঙুলের চিরুনি টানলে। ...শবযাত্রা এগিয়ে চলল, চৈত্রের খর রোদ, ধুলো-ওড়া দমকা বাতাসে ক্লান্ত কান্নার রেশ বুঝি মাখামাখি হয়ে এখানে কিসের এক দুর্বোধ্য শোক ছড়িয়ে দিল। তুমি বিচলিত হলে না, হরিধবনি দিলে না, পিছু ফিরে তবু একবার তাকালে। বাঘা কুকুরটা আকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে ঘেউ ঘেউ করছিল। দেখলাম সে তোমার পাশে পাশে যাচ্ছে।

শ্মশানে আমি যাইনি। না গিয়েও জানি তুমি একবারও অস্থির হওনি। চিতা সাজানো হয়েছে, চিতা জ্বলেছে, সুষমার দেহটা শেষ বিকেলের রোদে নদীপারের ঈষৎ ঠান্ডা বাতাসে মিলিয়ে গেছে। তুমি সারাক্ষণ কোনো ছায়ার তলায় বসে অথবা চিত হয়ে শুয়ে ভেবেছ, সুষমা কেন বিষ খেল? কেন?

শোনো অরুণ, প্রতিদিন নকল অমৃত খাওয়ার চেয়ে একদিন বিষ খাওয়া ভাল।..সুষমা গত চার বছর ধরে প্রত্যহ এই নকল অমৃত খাচ্ছিল, কাল রাতে সে বিষ খেয়েছে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তুমি যদি তারা গুনতে চাও গোনো। কিন্তু ভেব না, সুষমা ওই শূন্য থেকে আজ তোমার দুটি ছোট্ট প্রশ্নের জবাব দেবে।

আমি তোমায় একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। তুমি মনে মনে ভেবে দেখ, সত্য বলেছি কিনা।

চার বছর ধরে তোমরা -- তুমি আর সুষমা -- স্বামী-স্ত্রীতে রেষারেষি করলে। এমন রেষারেষি আর আমি দেখিনি। অথচ এই রেষারেষি কেন, কিসের?

অরুণ, আমি আজও বুঝতে পারলাম না বিয়ের পর সেই যে কদিন মাত্র তোমরা এক সাথে ছিলে -- তারপর এমন কী হল যার জের টেনে চলেছিলে এতকাল, পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত থেকে!

আমার মনস্তাপ দুঃখ তোমায় বোঝানো যাবে না, কেউ নেই এ-সংসারে যাকে কাছে ডেকে বলি। তোমার মা বেঁচে থাকলে -- তাকে বলতাম; সে শুনত বুঝত অনুভব করতে পারত। ...বলতে পার অরুণ, কোন অন্যায় আমি করেছিলুম তোমার বিয়ে দিয়ে? সুষমাকে আমি পছন্দ করেছিলুম এতে কি সর্বনাশটা বাস্তবিকই তোমার হয়েছে?.. ডানা কাটা পরী নিশ্চয় ছিল না সুষমা, কিন্তু সে অরূপা ছিল না। আমাদের মতন সাধারণ বাঙালী ঘরে কে উর্বশী খুঁজে বেড়ায়, অরুণ। সুষমা যদি কুরূপা হত, যদি তার আচার আচরণ জ্ঞান বুদ্ধি স্বভাব মন্দ হত, আমি বুঝতে পারতাম তোমার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণ ঘটেছে। আমি না, এ-বাড়ির কেউ না, এমন কি তুমি পর্যন্ত সুষমার রূপের শান্ত সৌন্দর্য লাবণ্য, তার স্বভাবের শুদ্ধতা ও নমনীয়তা, তার বুদ্ধি বিবেচনার ঐশ্বর্যের বিপক্ষে কিছু বলতে পারবে না। কোনোদিন কেউ বলেনি তো।..কাজে কাজেই তোমাদের স্বামী স্ত্রীর বিরোধ স্বাভাবিক পাঁচটা কারণে বাধেনি।

তবে ? তবে যে কোন কারণে আমি জানি না।

অনেকদিন আগে - বছর খানেকেরও বেশি হল -- আমি সুষমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, -- তোমার এত পরিশ্রমের কি আছে, বউমা?

বাস্তবিকই কি ছিল সকাল থেকে ঘানি ঘুরোনো শুরু করে মাঝ রাত পর্যন্ত সমানে টেনে যাওয়া। ভোর থাকতে থাকতে সেই যে উঠত মেয়েটা, বেলা দশটা পর্যন্ত সংসারের দায় সামলাত চা জলখাবার রান্না ভাঁড়ার, তাঁতের মাকুর মতনই দণ্ডে দণ্ডে ওর জায়গা বদল হচ্ছে, এই যদি নীচের উঠোনে মাছ ধুয়ে কাক তাড়িয়ে উঠল, পর মুহূর্তেই দেখ দোতলার বারান্দায় কাচা কাপড় মেলে দিচ্ছে -- আর ঠিক পাঁচ মিনিট পরে খোঁজ করলে দেখবে, পুতুলের ইংরিজি পড়াটা বলে দিচ্ছে, বা শেফালির স্কুলে যাওয়ার শাড়ির ছেঁড়াটুকু সেলাই করতে বসেছে। ওরই মধ্যে এক ফাঁকে দু ঘটি জল ঢেলে স্নান করে নিল -- ভিজে চুল এলিয়ে আরো পাঁচটা কাজ সারল। দশটা বাজল কি পুতুল শেফালিকে সঙ্গে করে সুষমাও বেরুল। সাধারণ একটা শাড়ি পরনে, ভিজে চুল কোনো রকমে ঘাড়ের কাছে ন্যাতার মতন জমানো, গাটাপার্চারের কাঁটা বেরিয়ে রয়েছে। মাথায় মেয়ে-ছাতা, পায়ে চটি -- দুপাশে দুই ভাগ্নি নিয়ে ও চলল স্কুল।...স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে সুষমার কোনো কোনোদিন পাঁচটাও বেজে যায়। নয়তো সাড়ে চারটের মধ্যেই সে ফেরে। ফিরে বুঝি একটু বিশ্রাম, তারপর আবার সংসার। উনুনে ধোঁয়া উঠিয়ে, লণ্ঠনে শিস জ্বালিয়ে সেই যে রাতের সংসার শুরু হল - সে সংসার শান্ত নীরব হতে হতে দশটা এগারোটা। এগারোটা রাত -- বাড়ির আর সবাই ঘুমিয়ে কাঠ শুধু সুষমার ঘরে তখনও জানলা খোলা লণ্ঠন জ্বলছে। আর জ্বলছে তোমার ঘরে, অরুণ। তোমাদের দু-জনের ঘর পাশাপাশি হলেও বারান্দার ঠিক জোড়ের

মুখটায়, কোণাকুণি -- এক ঘর থেকে আরেক ঘরের দরজা জানলা দেখা যায়। ...সুষমার ঘরের বাতি নিভতে কোনোদিন রাত দুটো বেজে যেত।

-- তোমার এত পরিশ্রমের কি দরকার, বউমা? আমি একদিন ওকে শুধিয়েছিলাম।

জবাব দিতে অনেকটা সময় লেগেছিল ওর;তাও স্পষ্ট জবাব নয়, কোনোগতিকে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া। 'স্কুলে পরীক্ষা হয়ে গেছে, ছুটি হয়ে যাবে শীঘ্রি, খাতাগুলো দেখতে হচ্ছে।

-- সারা বছর ধরে তোমাদের স্কুলে পরীক্ষা হয় নাকি।

সুষমা নিরুত্তর।

-- তোমার ঘরে রোজই একটা দুটো পর্যন্ত বাতি জ্বলে বউমা। অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকার --

-- সারাদিনে সময় পাই না, বাবা ...রাত্তিরে একটু পড়ি —। সুষমা আমায় কথা শেষ করতে না দিয়ে (হয়ত শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন কোন পথ ধরে সেই ভয়ে) দ্রুত গলায় বলেছিল, ওর কণ্ঠস্বর মৃদু, অস্বস্তিভরা।

খবরটা আমার কাছে নতুন নয়। আমি জানতাম। এ-ধরনের দায় এড়ানো সহজ জবাবের জন্যে প্রশ্নটা তুলি নি। আমি আরো গভীর, সত্য জবাব জানতে চাইছিলাম। বুঝতে পারলাম, সুষমা সে-জবাব দেবে না।

-- স্কুলের চাকরি, রাত জেগে জেগে বই মুখস্ত.....মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না এ-সবের কি দরকার ছিল, বউমা।

সুষমাকে আর কখনও আমি ঠিক এ-ভাবে কিছু শুধোই নি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম সত্য কথাটা সে কোনোদিনই আমায় বলবে না। শুধু যে সংকোচ তা নয়, বুড়ো শ্বশুরকে সে আঘাত দিতেও চায় না।

আমার মনে হয় অরুণ, তোমার মা বেঁচে থাকলে সুষমা তার মনের খানিকটা অন্তত জানাতে পারত। আমায় সে কোন মুখে বিবাহিত জীবনের সব চেয়ে বড় বেদনার কথা বলবে। কেন যে তাতে আর তোমাতে এই সমান্তরাল রেখার মত ব্যবধান ও সমানে পাল্লা দিয়ে ছুটে যাওয়া আমায় তা বুঝিয়ে দেবে।

একদিন তোমার কাছেও কথাটা তুলেছিলাম। মনে পড়ে তোমার?

- বউমার শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে, অরুণ।

-- অসুখ —? তুমি নির্বোধের মতন তাকালে। কথা বললে ঠান্ডা গলায়।

-- এখনও কিছু হয় নি, তবে যে-ভাবে শরীর ভাঙছে হতে আর কতক্ষণ -- । আমি অপ্রসন্ন গলায় জবাব দিয়েছি। তোমার ওপর আমি ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলাম তখন। মন তিক্ত হয়ে উঠেছিল। ছেলেমানুষের মতো কথা বলার বয়স নিশ্চয় তোমার নেই।

-- ডাক্তারবাবুকে একদিন দেখিয়ে এলেই হয় -। তুমি বললে।

- দেখিয়ে এলে

-- ডেকে পাঠালেও হয়।

-- সুষমা নিজে গিয়েই খবর দিয়ে আসবে তবে।

-- ....না, মানে---বলাই টলাই কেউ --;আচ্ছা আমিই বলে আসব।

আমার অসহ্য বিরক্তি বীতরাগ তুমি যতই বুঝতে পারছিলে ততই পারিবারিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলে। কিন্তু ও সব ফুকো কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যে আমি তোমায় ডাকি নি। আগাগোড়াই আমি চাইছিলাম, চেষ্টা করছিলাম গভীরতর এক ইঙ্গিত দিতে।....সম্ভবত, আমি যা বলতে চাই তুমি পরে বুঝতে পেরেছিলে। কিন্তু সুষমার মতনই জেনেশুনে পাশ কাটাবার চেষ্টা করতে লাগলে। অন্ধ হবার ভাণ করে তুমি যদি কিছুই না জানা না দেখার ভাব দেখাও, আমি আর কত তোমায় দেখাব!

-- স্কুলে চাকরি করবার কি দরকার বউমার?

-- কি আর -- সাহায্য।

-- আমার পেনসনের টাকা আছে, তোমার মাইনে আছে -- তাতে সংসার চলে না?

-- কি জানি, সংসারটা তো বড়ই;হয়তো আরও টাকার দরকার হয়।

-- আমায় তো তোমরা কোনোদিন সে-কথা জানাও নি।

তুমি বিব্রত বোধ করছিলে। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল এ-সব প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ক্রমশই তুমি ফাঁদে পা ফেলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছ ভেবে উৎকণ্ঠায় চঞ্চল।

-- সন্ধ্যের দিকে একটা টিউশানি করছে বউমা আজকাল --

-- হ্যাঁ, ওই বিকেলের দিকে, স্কুল-ফেরত -- .

-- পোস্ট অফিসে এখানো আমার কিছু টাকা আছে, অরুণ।.. ..টাকাটা তোমরা নাও....আমি মরে যাই, তারপর -- তারপর তোমাদের যা খুশি করো;চাকরি, টিউশানি, ঠোঙা বিক্রি --

আমি সেদিন কত বেদনায় কী কষ্টে চুপ করে গিয়েছিলাম অরুণ, তুমি হয়ত বোঝেনি। ভেবেছিলে, আমার মর্যাদায় ঘা খেয়ে আমি ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছি। মর্যাদার প্রশ্ন নিশ্চয় ছিল, এ-সংসারের সম্মানও যে জড়িত ছিল না তাও নয়, বুড়ো বয়সের সংস্কারও খানিকটা, কিন্তু তাই কি স-ব--সমস্ত! ওই বেচারী মেয়েটার আত্মক্ষয় কি আমায় যন্ত্রণা দিত না।

খানিক চুপচাপ থাকার পর তুমি উঠে দাঁড়ালে। তোমার বলার কিছু ছিল না। যাবার সময় আমায় যেন সান্ত্বনা দিচ্ছ এমনভাবে বললে, মৃদু, ভাঙা ভাঙা অনিশ্চিত গলায়,-- 'সব সময় অভাবের জন্যেই মানুষ কাজ করে না --;ভালো লাগে, ইচ্ছে করে। আনন্দ পায় কাজ ক'রে।

শোনো অরুণ, কাজ করে আনন্দ পাওয়ার কথাটা হযত অন্য কোথাও সাজে, এখানে সাজে না। সুষমা আনন্দ পেত না। যদি এই সংসার তার নিজের মনের সঙ্গে মিশত, তার মজ্জার হত আনন্দ সে পেত। যেমন তোমার মা ঠাকুমা পেয়েছে। তারা তাদের স্বামীকে পেয়েছিল, স্বামীকে সেতু করেই সংসার পেয়েছিল, সন্তান পেয়েছিল। সুষমা কি পেয়েছে? স্বামী তার কাছে একই বাড়ির ভাড়াটের মতন, এই সংসার তার কাছে নিছক দায়, সন্তান আকাশকুসুম।

আমায় তুমি অন্তত সংসারের সুখ আনন্দ তৃপ্তির পথ চেনাতে এস না। তোমার জন্মের

বহু আগে আমি এসেছি, তোমার অনেক আগেই আমি যাব। যখন এসেছিলাম তখন মানুষ তোমাদের মতন হয় নি, যখন যাব তখন তোমাদের মতনই হয়ে গেছে সব।

যদি তোমার বোধ বুদ্ধি এতটুকুও থাকে, তবে বলব, সুষমা সুখ আনন্দ তৃপ্তির আশায় কাজের সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় নি। একটা বোঝার পর আর-একটা বোঝা সে মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে তোমার সঙ্গে রেষারেষি করে মরতে। কে কতটা পারে, কে কতখানি সইতে ক্ষমতা রাখে, কার দক্ষতা কত বেশি -- তোমাদের স্বামী স্ত্রীর এই প্রতিযোগিতা আমি চার বছর ধরে দেখেছি।

আমার মনে পড়ছে, অঘ্রাণ মাসের এক পড়ন্ত বিকেলে বিয়ের কনে সুষমার এ-বাড়ির চৌকাঠে এসে দাঁড়াবার ছবিটি। লাল বেনারসী পরা ফরসা ছিপছিপে একটি মেয়ে; কপালে চুলের ধার ছুঁয়ে ছুঁয়ে লাজুক একটু ঘোমটা, শোলার মুকুটটা সামান্য হেলে গেছে, বাঁ-হাতের মুঠোয় কাজললতা, গাঁটছড়া ঝুলে ঝুলে পড়ছে। শাঁখ বাজল, উলুতে আকাশ ভরল। ভীরু, ধীর, লক্ষ্মী পায়ে পায়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল এ বাড়ির আরেক বউ। ছবিটি আমি ভুলব না, অরুণ। তোমার মা-র কথা বারবার মনে পড়ছিল আমার। সে নেই। থাকলে আজকের দিনে আমার মতনই ওই শান্ত মমতাভরা মুখটির দিকে চেয়ে, দুটি কালো নিরীহ অসহায় চোখের দিকে তাকিয়ে মায়ায় গলে পড়ত। তোমার মা খুশী হত, আমায় তারিফ করত; বলত: চমৎকার বউটি এনেছ বাপু তুমি, লক্ষ্মীশ্রী আছে।...তোমার মাকে সেদিন পাশে না পেয়ে বুক আমার খাঁ খাঁ করছিল, আবার সেই সঙ্গে অসহ্য আনন্দ হচ্ছিল এই ভেবে, তোমার মাকে আমি খুশী করতে পারতাম আজ। আমার এই দুঃখ এবং সুখে আত্মহারা হয়ে গিয়ে আমি একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলেছি। জল ভরা চোখে দেখেছি, আমার ছেলে, ছেলের বউ....উঠোন ভরে পরিজন....হাসি ভরা মুখ...কলস্বর...দুধ পোড়া গন্ধ ..।

এই মধুর ছবি কত তাড়াতাড়ি কেমন আশ্চর্যভাবে বদলাতে লাগল। সুষমার উজ্জ্বল মুখ ধীরে ধীরে অনুজ্জ্বল হয়ে এল; তার ভীরুতা ভাঙল, পরিবর্তে দেখলাম কিসের অদ্ভুত দৃঢ়তা, প্রত্যাশায় ও স্বপ্নে যে-মুখ লাজুক নম্র ছিল সেই মুখ প্রাণহীন পাথর হয়ে এল।

তোমরা যে কী মারাত্মক রেষারেষি শুরু করলে অরুণ! দু-ঘরে দুজন, দু জনেই সমান নীরব, জিভ সেলাই করে বসে আছ। কেউ কাউকে জোর গলায় একটা কথা বলবে না, শত প্রয়োজনেও নিজের থেকে ডাকবে না, তোমাদের অভাব অভিযোগ জানাবে না ভুলেও। তোমাদের স্বামী স্ত্রীর কারও একের প্রতি অন্যের দাবী দাওয়া নেই। এমন ঘটনাও যদি একদিন ঘটত যে, তোমরা দু জনে কলহ করছ, তবু বা বুঝতাম। কথা কাটাকাটি কলহ স্পষ্ট বিরোধেও কোনোদিন চোখে পড়ল না। তোমরা প্রয়োজনে মাপ করে কথা বলেছ, ওপর ওপর কর্তব্যটুকু পালন করেছ, সম্পর্কের নিছক দায়টুকু সয়েছ।

শেষ পর্যন্ত দুটি মানুষ পাশাপাশি দুঘরের ভাড়াটে হয়ে গেলে। দুজনেই সমান কঠিন, সমান আত্মকেন্দ্রিক; তোমাদের আত্মমর্যাদা অহংকার ব্যক্তিত্ব দাঁড়িপাল্লায় ঝুলিয়ে ওজন করলে কারও ওজন এক চুল কম হত না।

তবে বলি অরুণ, এক সময় বেদনা ভুলাতে, দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখতে সুষমা হাত বাড়িয়ে

কিছু কাজের বোঝা টেনে নিয়েছিল। সেই কাজ শেষে নেশা হল কিছুদিন। পরে আর নেশা থাকল না, প্রতিযোগিতার বস্তু হয়ে উঠল।....আমি দেখেছি, মাঝে মাঝে রাত্তিরে -- হয়ত তখন বারোটা কি একটা -- সুষমা তার জানলায় দাঁড়িয়ে আছে, কোনো কোনো দিন বারান্দায় এসেও একটু দাঁড়াত, তোমার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকত, দেখত তোমার ঘরে তখনও বাতি জ্বলছে। আবার সে নিজের ঘরে ফিরে যেত, সারাদিনের ক্লান্তি ক্ষয় অবসাদে তার শরীর টলছে, মুখ বসে গেছে, ঘুম টানছে -- তবু সে বিছানা নেবে না, বাতি নিভিয়ে দেবে না। তোমাকেও আমি দেখেছি অরুণ, সুষমার ঘরের বাতির সঙ্গে রেষারেষি করে বাতি জ্বালিয়ে রাখতে। এক এক সময় আমার মনে হত, কার আলো কতক্ষণ জ্বলে, কে আগে নেভে কে পরে তোমরা তার প্রতিযোগিতা করছ।

সুষমা সেই প্রতিযোগিতায় তোমার কাছে হেরে গেছে। হেরে গেছে বলেই বিষ খেয়েছে। চার বছর ধরে প্রতিটি দিন সে নকল অমৃত খেয়েছিল, সে স্ত্রী না হয়েও স্ত্রীর সাজসজ্জা দায় অদায় নিয়ে কাটিয়েছে; এ-সংসারে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ তার ছিল না, তবু সংসারের আগুনে নিজেকে তিল তিল করে ক্ষয় করেছে; স্কুলের টিচারী, ছাত্রী পড়ানো, রাত জেগে জেগে পড়া শোনা-এ-সব তার আনন্দের কাজ ছিল না, নিজেকে বেঁধে রাখার খুঁটি ছিল -- এই খুঁটিতে সে বেঁধেও রেখেছিল নিজেকে।

শেষ পর্যন্ত আর পারল না। পারল না বলেই কাল মাঝরাতে এই ছাদে উঠে এসেছিল। কাল বড় গরম গেছে। রাতে হাওয়া দিতে শুরু করেছিল, তক্তপোশে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। মনে হল, কে যেন এসেছে ছাদে! কে! স্বপ্ন দেখছি হয়ত। ছাদের ওই জাদুঘরে কে যেন গেল, দাঁড়াল, খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর এ-পাশে এল, ডালিমগাছের দুটি পাতা ছিঁড়ল, বেলফুলের গামলাটা পায়ে করে একটু ঠেলল, আলসে ধরে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ, শেষে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে আমার পায়ের দিকে সরে গেল। আমি শুয়ে রয়েছি বলে পায়ে হাত দিতে পারছিল না। তক্তপোশে -- আমার ঠিক পায়ের কাছটিতে ও মাথা নুইয়ে হাত বুলিয়ে প্রণাম করছিল। ওর হাত আমার পায়ে ছুঁয়ে গেল আচমকা।...আমি চমকে উঠলাম। এ তো স্বপ্ন নয়। উঠে বসলাম। কে, বউমা--!

সুষমা ধরা পড়ে কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। -- এত রাতে ছাদে উঠে এসেছ?

-- বড় গরম --। দুর্বল জড়ানো ভয় ভয় গলায় সুষমা বলল, -- ঘরে হাঁপিয়ে উঠছিলাম, তাই একটু ছাদে এলাম।

ঘরে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল অরুণ; আমারই মতন তাই সে ছাদে এসে উঠেছিল।

-- রাত অনেক হয়েছে; এবার শুয়ে পড়গে যাও।

-- যাই।

সুষমা অস্ফুট দুরদুর গলায় বলল।

কখন দেখি সে চলে গেছে।

বোধ হয় ঘন্টা খানেক পরে নীচে থেকে ডাকাডাকি চিৎকার ছুটোছুটি শুনলাম। নেমে

দেখি, সুষমা তখনও বমি করছে। যন্ত্রণায় তার সারা শরীর কুঁকড়ে গেছে, গাল দুটো সাদা, কপালে ঘাম।

অরুণ, যাবার আগে সুষমা মাঝরাতে একবার ছাদে এসেছিল, এই ফাঁকায় হাওয়ায়; একবার সে আমাদের ওই টিন-কোঠার জাদুঘরের ঘ্রাণ নিয়েছিল। কেন নিয়েছিল? অকাজের অপ্রয়োজনের, অতীতের কিছু টুকরো ভাঙাচোরা ধুলো ভরা ভালবাসার স্মৃতি ছাড়া ওখানে তো কিছুই নেই! হয়ত স্মৃতি হলেও ওরা সত্য, কোনো এক ধরনের কাল-নিরপেক্ষ পুঁজি নিয়ে বেঁচে আছে, কিঞ্চিৎ প্রাণ-ঐশ্বর্য নিয়ে।

সুষমা কাল রাতে এসেছিল, সে মারা যাবার পর আজ রাতে তুমি এসেছ, অরুণ। কেন?

দেশলাইয়েব কাঠি জ্বেলে এই উলটো-পালটা হাওয়ায় তুমি কি খুঁজছ আমি জানি না। কিন্তু অনুমান করতে পারি । খুব সম্ভব, তুমি সুষমার আলমারির চাবিটা খুঁজতে এসেছ। চাবিটা পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি শুনেছ, কাল রাতে সুষমা ছাদে ছিল। তুমি জান তার আঁচলে চাবি বাঁধা থাকত। হয়ত তুমি ভাবছ, কাল রাতে যখন সে ছাদে এসেছিল কোনো রকমে আলগা আঁচল থেকে চাবিটা গিঁট খুলে পড়ে গেছে।

সুষমা তার নিজের ঘরে তার সাধের আলমারির মধ্যে কি যে শেষ পর্যন্ত রেখে গেছে তা জানবার জন্যে তোমার মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একটা ছোট চিঠি, কিংবা তোমাব জন্যে একটু-বা অন্য কিছু....

কী ভীষণ নির্বোধ তুমি, অরুণ! সুষমার সাধের আলমারির পাল্লা খুললেই কি জানতে পারবে সে-বেচারী তোমার জন্যে কি রেখে গেছে? যে-মানুষটা রাতেব পব রাত জানলা খুলে আলো জ্বালিয়ে বসে থাকল--তুমি দু পা এগিয়ে এসে তার দরজাটা পর্যন্ত ঠেলে দেখলে না দরজাটা খোলা না বন্ধ, কী সে রেখেছে ঘর ভরে, কোন আলোব তলায় কী বস্তু-সেখানে সামান্য আলমারিব কাঠের ফাঁকে তুমি আর কী পাবে, কতটুকু!

চাবিটা সুষমা ওই জাদুঘরের ভিড়েই হয়ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে, অরুণ। তুমি তা খুঁজে পাবে না। কোনোদিনই নয়। তবে আর কেন বৃথা দেশলাইয়েব কাঠি জ্বালা!

[প্রকাশকাল: বর্ষ ২০/সংখ্যা ৪: ১৩৬৫]

একটি বিচিত্র রজনী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

[ফরিদপুরের সদরদি গ্রামে ১৯১৭ সালে জন্ম। চেনামহলের লেখক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: তিনদিনের তিন রাত্রি, সূর্যসাক্ষী, দূরভাষিণী, বিলম্বিত লয় ইত্যাদি। মৃত্যু: ১৯৭৫ সালে।]

মাসখানেক ধরে বান্ডিলটা আমার কাছে পড়ে ছিল। রেলকর্মী রিক্রিয়েশন ক্লাবের সম্পাদক মাঝে মাঝে ফোন করেন, মাঝে মাঝে পোস্টকার্ডে পত্রাঘাত; 'লেখাগুলি কি দেখছেন? ফাংশনের দিন ঠিক হয়ে গেছে। এবার কম্পিটিশনের রেজাল্টটা জানতে না পারলে আমাদের বড় অসুবিধেয় পড়তে হবে।'

অসুবিধা আমারও কম নয়। ছোট বড় খান পঁচিশেক খাতা ভদ্রলোক আমাকে গছিয়ে দিয়ে গেছেন। পঁচিশজনের এই সাহিত্যপ্রয়াসের ভিতর থেকে তিনটি রচনা আমাকে বেছে বের করতে হবে। স্থির করতে হবে কে প্রথম, কে দ্বিতীয়, কারই বা তৃতীয় স্থান।

শুরুতেই আমি সেক্রেটারীকে হাত জোড় করে বলেছিলাম, 'আমাকে রেহাই দিন। বাছাই করবার ক্ষমতা যদি থাকবে তাহলে কাগজেব সম্পাদক হতাম; দুরু দুরু বুক নিয়ে পাঠক আব সমালোচকদের মুখেব দিকে তাকিয়ে থাকতাম না।'

কিন্তু সেক্রেটারী রেহাই দেননি। বলেছেন, 'দিন না একটু কষ্ট করে দেখে। সবাই খুশি হবে।' তাবপর গলা নামিয়ে বলেছেন, 'সব লেখা আপনার আগাগোড়া না পড়লেও চলবে। প্রথম দুটি একটি পাতা, এমন কি দু একটা প্যারাগ্রাফ পড়লেই তো বুঝতে পাববেন--।'

'রাঁধুনীরা যেমন দু একটা ভাত টিপে এক হাঁড়ি ভাতের কথা বলে দেয়। কিন্তু আমি তো তেমন রাঁধুনী নই।' অনুনয় বিনয়ে কোন কাজই হয়নি। মোটা সুতো দিয়ে বাঁধা এক রাশ খাতা ভদ্রলোক আমার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বিদায় নিয়েছেন।

তারপর ফোন আর চিঠি। শেষ পর্যন্ত বাইশ তেইশ বছরেব এক যুবক এসে বলল, 'কাল আমাদের ফাংশন। লেখাগুলি নেতে এসেছি।'

আমি একটু মাথা চুলকে বললাম, 'তাই তো কাজকর্মেব এত চাপ --। আমি যে কিছুই করে উঠতে পারিনি।' ভেবেছিলাম রাগ করে ছেলেটি খাতাগুলি নিয়ে যাবে। কিন্তু তা করল না। বললে, 'বেশ তাহলে আজ দেখে রাখুন, কাল সকালে এসে নিয়ে যাব।'

আমি অসহায়েব মত বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি কি করে হবে।' ছেলেটি কিন্তু চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা সকালে না হোক ফাংশনের ঘন্টা দুই আগে পেলেই আমাদের চলবে। না হয় আর একটু সময় আপনি নেবেন। আপনি না যাওয়া পর্যন্ত তো সভা আরম্ভ হবে না।' আমি অবাক হয়ে বললাম, সে কি আমি আবার কোথায় যাব।'

ছেলেটি চোখ বড় করে বলল, 'কেন আমাদের ক্লাবে। না না, তা হয় না, এখন আর আপনি না করতে পারেন না। আমরা অ্যানাউন্স করে দিয়েছি। না গেলে আমাদের মান মর্যাদা কিছু থাকবে না। আপনি তো অনেকদিন আগেই আমাদের সেক্রেটারীকে কথা দিয়েছিলেন।'

মনে মনে ভাবলাম কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও কম করিনি। ভেবেছিলাম রচনাগুলি তাড়াতাড়ি দেখে দিলে সভায় উপস্থিত থাকবার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাব। কিন্তু সব ব্যাপারেই বড় দেরি হয়ে গেছে। তাছাড়া যেখানে ক্লাবের মান মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন --। ছেলেটির উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর অন্য কোন কথা বলতে সাহস পেলাম না।

তাকে বিদায় দিয়ে ভালো ছেলের মত পেনসিল হাতে প্রতিযোগিতার খাতাগুলি নিয়ে বসলাম।

রচনার বিষয় 'একটি বিনিদ্র রজনী'।

প্রত্যেকেই নিজের জীবনের একটি করে রাত জাগার কাহিনী লিখেছেন। সবই উত্তম পুরুষে। বেশির ভাগই দেখলাম আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর প্রসঙ্গ। কারো বাপ মা। কারো বা বন্ধু। মৃত্যুশয্যায় উদ্বেগ ভয় আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় রাত্রিযাপনের কাহিনী। একজন লিখেছেন বাল্যস্মৃতির কথা, সবান্ধবে গ্রামান্তরে গিয়ে যাত্রার আসরে নেমে রাত ভোর করে বাড়িতে ফিরে এসে অভিভাবকের হাতে কানমলা খাওয়ার বিবরণ। কাল সেই লাঞ্ছনার উপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়েছে, যাত্রার আসরে দুজন যোদ্ধার দুখানি শাণিত তরবারিই লেখকের মনে বেশি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে বলে বোধ হল। আর একজন লিখেছেন জীবিকার দায়ে রাত্রি জাগরণের বিবরণ। এক সহকর্মীর সঙ্গে ইঞ্জিনে কয়লা জোগাতে জোগাতে এক স্টেশনে থেকে আর এক স্টেশন পৌঁছবার কাহিনী। শেষে লেখক মন্তব্য করেছেন শুধু একটি নয় এমন শত শত বিনিদ্র রাতই তাঁর কাটাতে হয়েছে, কাটাতে হবে, কিন্তু সবগুলি রাত্রির বিবরণ তো আর লেখা যায় না।

ভাবলাম তাতো ঠিকই। অত কাগজ কোথায়, অত সময় কোথায়। তাছাড়া যারা রোজ সারারাত জাগে তারা কি দিনে লিখবে না ঘুমোবে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে লেখাটি নতুন ধরনের। কিন্তু ভাষা কাঁচা, পদে পদে বর্ণাশুদ্ধি এবং ব্যাকরণবিচ্যুতি। আমি দ্বিধায় দুলতে লাগলাম একে প্রধান গৌরবের আসন দেব কি দেব না।

তারপর আরো কয়েকটি রচনা চোখে পড়ল। একজন লিখেছেন তাঁর ফুলশয্যার রাতের কথা। প্রথম রাত্রিতে কিশোরী নববধূর লজ্জা ভাঙাতে পারেননি। একেবারে শেষ রাত্রে ছিল লগ্ন। আলাপের সুযোগই হয়নি। তাছাড়া চারদিকে আড়ি পেতে ছিলেন কনের দিদি বউদি ঠানদিদের দল। বাসি বিয়েতে দিন আছে কিন্তু রাত নেই। রাত্রে দেখাসাক্ষাত নিষেধ। তৃতীয় দিন ভোর হতে না হতেই লেখকের আসন্ন রাত্রির কথা মনে পড়ছে। কিন্তু ভোরের পরেই তো আর রাত আসে না। একটি বিরহ রজনী কাটাবার পরেও রোদ আস্তে আস্তে ওঠে, বেলা ধীরে ধীরে বাড়ে যেন কোন গরজ নেই। ফুলশয্যার যে ফুল তারও একটি দীর্ঘ বোঁটা আছে। আষাঢ়ের বেলা যাই যাই করেও যায় না। আকাশের মেঘ মাঝে মাঝে আসন্ন সন্ধ্যার আভাস

দেয় কিন্তু খানিক পরেই সরে গেলে দেখা যায় রোদ চিকচিক করছে। পরিহাস রসিকা বউদির দু চোখের কৌতুকের মত। তারপর আষাঢ়ের সেই দীর্ঘদিনও শেষ পর্যন্ত কাটল। সন্ধ্যা হল। বউভাতের ঝামেলা। মিষ্টান্নলোভী আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ছাদের ওপর পাত পাতলেন। গুনতিতে অসংখ্য। লেখকের বাবা আর দাদারা তাঁদের আদর আপ্যায়নে পঞ্চমুখ। কিন্তু লেখকের মুখ ভার। আজও রাত বারোটা পার হল। যৌতুকে পাওয়া নতুন ঘড়িটির দিকে তিনি বারবার তাকান আর ভাবেন ফুলশয্যাতেও এত কাঁটা।

রাত প্রায় একটার সময় শোবার ঘরে ডাক এল । তখনো ঘরে বোন আর বউদিদের ভিড়। আচারে স্ত্রীলোকের শ্রান্তি নেই। শেষ পর্যন্ত ভিড় ভাঙল, দয়া হল ওঁদের। ঘরে এখন শুধু লেখক আর তাঁর জীবন সঙ্গিনী। কিন্তু শয্যার দিকে এগোতে তাঁর অসীম লজ্জা। লেখকই আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন, বিদ্যুতবাতি নিবিয়ে দিলেন। সাধাসাধি করে নববধূকে তার নিজের জায়গায় নিয়েও এলেন। কিন্তু তার বেশি এগোতে সাহস পেলেন না। এত শিক্ষা, এত প্রতীক্ষা সবই বৃথা হতে চলল। বিবাহিত অভিজ্ঞ বন্ধুবান্ধবের এত পরামর্শ কিছুই কাজে এল না। একটু এগোতে গিয়ে মনে হয় মেয়েটির সঙ্গে আলাপ নেই পরিচয় নেই যদি সে তাঁকে অভদ্র ভাবে কি অতিমাত্রায় অভিজ্ঞ বলে মনে করে। ছি ছি ছি তাহলে বড় লজ্জার কথা হবে। কিন্তু পিছিয়ে থেকেও স্বস্তি নেই। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা মেয়েটি তাঁকে নিতান্ত আনাড়ি মনে করছে। প্রথম রাত্রেই স্ত্রীর কাছে যদি এমন বোকা বনে যান তাহলে জীবনের বাকি রাতগুলির দশা কি হবে। রাত বাড়তে লাগল, শেষ হতে চলল। লেখক আকুল হয়ে উঠলেন। কোন বিদ্যাই কাজে লাগছে না। পরীক্ষা দিতে এসে ছাত্র যেন দেখতে পেয়েছে প্রশ্নগুলি চেনা জায়গা থেকেই এসেছে। কিন্তু বড় ঘোরান জড়ানো ভাষা। নোট মুখস্থ উত্তরগুলি বসাতে ছাত্র ভরসা পায় না যদি ঠিক ঠিক না লাগে। আবার দুকলম যে বানিয়ে লিখবে সে সাহসও নেই, যদি গ্রামার ঠিক না হয়।

সেই মূঢ় ছাত্রের মত লেখক সারারাত জেগে একখানি ব্লাঙ্ক পেপার সাবমিট করলেন। খাতার কোথাও একটি কলমের আঁচড় দিতে পারলেন না।

শেষ রাত্রে চাঁদ উঠল। চাঁদের আলো বিছানার ফুলের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। পড়ল আরো একজনের মুখে যে সোনার অলঙ্কারে সেজেছে, ফুলের অলঙ্কারেও সেজেছে। ফুলশয্যায় বউ এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। লেখক চেষ্টা করলেন তার ঘুম ভাঙাতে। কিন্তু কিছুতেই পারলেন না, যে জেগে ঘুমোয় তার ঘুম কি ভাঙানো যায়। তাই একজনের ছদ্ম নিদ্রা দেখতে দেখতে আর একজনের বিনিদ্র রজনী ভোর হয়ে গেল।

কাহিনী শেষ করে আমি একটু হাসলাম। বিষয় মামুলী, ভাষা আর ভঙ্গি দুইই হালকা। তবু লেখার মধ্যে মুন্সীয়ানা আছে। এই প্রতিযোগীকেই বোধ হয় প্রথম আসনে বসাতে হবে।

আরো কয়েকটি কাঁচা রচনা সরিয়ে রাখবার পর আর একটি দাম্পত্য গল্প চোখে পড়ল। ফুলশয্যার রাত নয়। তারপর অনেক দিন অনেক রাত্রি চলে গেছে। লেখক লিখেছেন তাঁর মধ্য বয়সের গল্প। মধ্য বয়সের এক দাম্পত্য রজনী। তার আগের কয়েক রাত ধরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া। কারণ দারিদ্র্য, অনটন। মাসের শেষ সপ্তাহে বাজার করবার টাকা নেই, বাড়িওয়ালা বাকি ভাড়ার জন্যে দুদিন বাদে বাদেই এসে অপমান করে যাচ্ছে, মেজো মেয়েটার টাইফয়েড, এমন সময় স্ত্রী যদি বলে ঘরে চাল বাড়ন্ত তাহলে পুরুষের কি খুন করতে ইচ্ছা হয় না?

লেখকেরও সেই সাধ হয়েছিল। চেয়েচিন্তে চালের জোগাড়টা তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত করলেন, কিন্তু ঝগড়া মিটল না। শুধু চাল পেয়েই স্ত্রী সন্তুষ্ট নন। তাঁর আরো চাই। তেল, নুন, ডাল, তরকারি চাই। রোগা মেয়ের জন্যে ওষুধ পথ্য দরকার। কোনটা বাদ দিলেই চলে না। লেখক বলেন, 'তোমার অত খাঁই আমি মেটাতে পারব না।' স্ত্রী তাঁর চোয়ালজাগা মুখখানা বিকৃত করে বললেন, 'আমার খাঁই, না তোমার ছেলেমেয়েদের? কেন বিয়ে করবার সময় মনে ছিল না! ছটি সন্তানের বাপ হওয়ার সময় মনে ছিল না যে তাদের খাওয়াতে হবে, পরাতে হবে, অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসা করাতে হবে?'

স্বামী বললেন, 'সবই মনে ছিল। কিন্তু তোমার মুখ নাড়া খেতে খেতে নিজের বাপের নাম পর্যন্ত ভুলেছি, যা দজ্জাল মেয়ে তুমি।'

স্ত্রী বললেন, 'তুমি আবার পুরুষ নাকি। পুরুষ হলে নিজের স্ত্রীকে অমন দুর্নাম দিতে না।'

দিন নেই রাত নেই রোজ ঝগড়ার ঝড় বয়ে যায়। স্বামী বলেন, 'তোমার মত অলক্ষ্মীকে ঘরে এনেই আমার এই দশা।'

স্ত্রী বলেন, 'তোমার মত অক্ষম পুরুষেব হাতে পড়ে আমাব জীবনে কোন সুখও হল না শান্তিও হল না।'

ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা বড় তারা ঝগড়ার সময় বাইরে চলে যায় যারা। যাবা ছোট তারা অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। অপেক্ষা করে কখন এই ঝড়ের ঝাপটা থামবে।

একদিন অফিস বেরোবাব সময় স্বামী ঝগড়ার মুখে চরম অভিসম্পাত দিয়ে গেলেন 'মব মর মর। বিষ খেয়ে হোক, গলায় দড়ি দিয়ে হোক, জলে ডুবে হোক যে ভাবে পাব আমায় নিষ্কৃতি দিয়ে যাও।'

'মরব?'

'হ্যাঁ।'

'মরব?'

'হ্যাঁ।'

'মরব?'

স্বামী এবাবও বিনা দ্বিধায় বললেন 'হ্যাঁ।'

স্ত্রী বললেন, 'তিন সত্যি করলে। ফিরে এসে আমার মুখ আর তুমি দেখতে পাবে না।'

অফিসে এসে টিফিনের আগে পর্যন্ত ভালোই কাটল, রাগটা তখনো মেটেনি। স্বামী মনে মনে ভাবলেন যদি মরে বেশ হয়। আমার হাড় জুড়োয়। কিন্তু টিফিনের সময় কৌটোটি খুলে মন বড় খাবাপ হয়ে গেল। অন্যদিনের মতই সেই কখানা আলুর কুচি আর দুখানা রুটি দেখে শাঁখা পরা এক জোড়া শীর্ণহাতের কথা তাঁর মনে পড়ল।

ইচ্ছা হল তখনই চলে আসেন কিন্তু পারলেন না। কাজের চাপ অনেক বেশি। টেবিলে গাদা গাদা এরিয়ার ফাইল পড়ে রয়েছে। শেষ করতে করতে সন্ধ্যা। সহকর্মীর কাছ থেকে দুটি টাকা ধার করে তিনি বেরিয়ে এলেন। বৈঠকখানার বাজার থেকে মাছ কিনলেন, মনোহারী দোকানটাব সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কি মনে হল এক শিশি আলতাও নিলেন সস্তা দেখে। স্ত্রী একদিন বলেছিলেন, 'জলে জলে পা দুটো খেয়ে গেছে। পচে গন্ধ হয়েছে। এক শিশি আলতা

এনো তো।'

বাজার নিয়ে স্বামী হাসিমুখে ঘরে এলেন। কিন্তু ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালাবার কেউ নেই না কি ?

ছোট মেয়েটাকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুঁটি তোর মা কোথায় রে?'

আট বছরের মেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'বাবা, মা নেই।'

পুঁটির বাবার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, 'নেই কিরে--হতভাগা মেয়ে। কোথায় গেছে তাই বল।'

পুঁটি কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল,'মা বলল আমি মরতে চললুম।'

আমি বললাম,'আমরা কার কাছে থাকব'। মা বলল, 'তোদের বাপের কাছে থাকিস। আমি মরে গেলে সেই তোদের বাপও হবে, মাও হবে। তোদের আলাদা মার আর দরকার নেই।'

ছেলেরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু কেউ এখনো ফেরেনি। ভদ্রলোক মাছ আর আলতার শিশি নামিয়ে রেখে স্ত্রীকে খুঁজতে বেরোলেন। ঝগড়ার কথা তো বাইরের লোককে বলা যায় না, তবু পাড়াপড়শীর বাড়িতে বাড়িতে গেলেন। কৌশলে পলাতকা স্ত্রীর সন্ধান নিলেন। কিন্তু কারো বাড়িতে তিনি যান নি। গঙ্গার ধারে গেলেন। সেখানেও কোন চিহ্ন নেই। জন দুই লোক বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে আর খোসগল্প করছে। তাদের জিজ্ঞেস করলেন কোন স্ত্রীলোককে তাঁরা জলের ধারে যেতে দেখেছেন কিনা। একজন কোন জবাব দিল না আর একজন হেসে বলল, 'আরে দাদা ওই মতলব নিয়ে যদি কেউ এসেই থাকে তাহলে কি সে আর লোক দেখিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছে? যেতে হলে চুপি সারেই চলে গেছে।'

ভদ্রলোক শূন্যবুকে ভরা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন, 'মা গঙ্গা যদি তাকে নিয়েই থাকেন, কোন চিহ্ন রেখে দেবেন কেন?'

পা যেন পাথরের মত ভারি, নড়তে আর চায় না। মন যেন পাহাড়ের মত স্থবির, চলতে আর পারে না। হয় তো মিনিট পাঁচেকের বেশি তিনি সেখানে দাঁড়ান নি। কিন্তু মনে হল যেন যুগের পর যুগ চলে গেছে। একজন আর একজনকে ছেড়ে ওপারে চলে গেছেন। যিনি পড়ে রইলেন তাঁর আর স্বেচ্ছায় পার হবার সাধ্য নেই। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক একটি করে ঢেউ গোনা ছাড়া আর কিছু করবার নেই তাঁর।

এই অবস্থায় থানায় একবার যাওয়া দরকার, আর হাসপাতালে। যদি জলে ঝাঁপ দেওয়ার পর কেউ তাকে তুলে থাকে, কি গাড়ি চাপা পড়বার পর কেউ যদি কুড়িয়ে নেয়। কিন্তু তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল কি হবে আর চেষ্টা করে। যে গেছে তাকে আর পাওয়া যাবে না। থানা কি হাসপাতালে একা যেতে ভরসা হল না। ভাবলেন বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবেন কি কোন প্রতিবেশী বন্ধুকে।

এগলি ওগলি ঘুরে পাথরে গড়া পা দুখানি টেনে টেনে তিনি কোন রকমে বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। এখনো কোনো সাড়াশব্দ নেই। সময় বুঝে রাস্তার সব আলো নিভে গেছে। পাড়াসুদ্ধ অন্ধকার।

ভদ্রলোক হাতড়ে হাতড়ে কোন রকমে কড়াটা নাড়লেন। বুঝতে পারলেন না শব্দ হল কিনা। নিজের বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দই বেশি করে কানে আসতে লাগল।

যে কোন শব্দেই হোক দরজাটা খুলে গেল। তিনি দেখলেন এক টুকরো জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে ছায়ার মত একটি নারী। আঁধারের মধ্যে এক ক্ষীণ দীপশিখা।

তিনি অপলকে সেই শিখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কতক্ষণ যে গেল তার আর ঠিক নেই।

অমন করে তাকালে কোন মেয়ে কি চোখ না নামিয়ে নিয়ে পারে? তা তার রূপ থাকুক আর না থাকুক, যৌবন যত আগেই বিদায় নিয়ে চলে যাক।

একটু বাদে ফের চোখ তুলে স্ত্রী বললেন, 'সারারাত দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি? ভিতরে এসো।'

ভদ্রলোক এবার হেসে বললেন, 'বড় বউ, তবে যে বলেছিলে মরবে!'

তাঁর স্ত্রী বললেন, 'চেষ্টা কি আর করি নি ভেবেছ? পারলাম না। কাচ্চা বাচ্চার বেড়ি দিয়ে আমাকে যমের হাত থেকেও কেড়ে রেখেছ। তুমি আমার এত বড় শত্তুর।'

সেই রাত্রে তাঁরা ভোর না হওয়া পর্যন্ত জেগে ছিলেন। স্বামীও শ্রান্ত, স্ত্রীও শ্রান্ত। কিন্তু আশ্চর্য, তবু কারো চোখে ঘুম আসে নি।'

একটু ভেবে এই গল্পটিকেই আমি সবচেয়ে বেশি নম্বর দিলাম। যদিও বর্ণনায় অতিরঞ্জন আছে, ঘটনার বিন্যাসে কিছু কিছু শৈথিল্য, তবু যতগুলি রচনা পেয়েছি তাদের মধ্যে এই লেখাটিই সবচেয়ে ভালো।

কিন্তু শুধু বিচারপর্বেই কর্তব্য শেষ হল না। পরদিন বিকালে সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে আমাকে তাঁদের অফিসেও যেতে হল। সভাপতিকে নিজের মুখে ফল ঘোষণা করতে হবে, স্বহস্তে পুরস্কার প্রদান।

হলঘরের অর্ধেক জুড়ে প্রতিযোগীরা বসেছেন। সবাই রেলওয়ের নানা বিভাগে কাজ করেন। বেশির ভাগই কেরানী। কিন্তু আজ তাঁদের অন্য ভূমিকা। আজ তাঁরা কেউ জীবিকার জন্যে কলম ধরেন নি। নিজের জীবনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। সামনের সারিতে কয়েকটি মহিলা এবং পদস্থ অফিসারকেও দেখা গেল। তাঁরা বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত।

ক্লাবের সম্পাদক মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করলেন। এর আগে তাঁরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী করেছেন আর একবার তরুণ কবিদের সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্লাবেরই একজন সদস্যের লেখা একখানি নাটক অভিনয় করবার ইচ্ছাও তাঁদের আছে।

এবার আমাকেও কিছু বলতে হল। বললাম, প্রতিযোগিতায় যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁরা আসলে সহযোগী। এই অনুষ্ঠান তাঁদের সকলের চেষ্টায় সার্থক হবে। তাঁদের প্রত্যেকের রচনাই অনন্য। এক লেখকের সঙ্গে আর এক লেখকের তুলনা সঙ্গত নয়। এমনকি একই লেখকের এক গল্পের সঙ্গে আর এক গল্পের তুলনা চলে না, কারণ এক-একটি লেখা তাঁর স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর, যত লেখা তত লেখক।

আমি মুখবন্ধ শেষ করবার পর ক্ষীণকায় সেক্রেটারী ফাইল হাতে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'সভাপতির বিচারে প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বন্ধু রামাপদ দাশ। তাঁকে ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা একটি রৌপ্যপদক উপহার দিচ্ছি।'

বেঁটেমত এক ভদ্রলোক হাসিমুখে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এলেন। বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে

গেছে। মাথার চুল বেশির ভাগই পাকা। সামনের সারির গুটি তিনেক দাঁত নেই। তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার সহকর্মীরা আমাকে যে গৌরবে আজ ভূষিত করলেন তা আমি জীবনে আর কোনদিনই পাই নি। কোনদিন স্কুলে কলেজের পরীক্ষায় আমি পুরস্কার পাই নি, কোন কাজের জন্যে প্রশংসা শুনি নি, এমন গৌরব আমার এই প্রথম। এই বুড়ো বয়সে প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি লেখকও নই। জীবনের একটি সত্য ঘটনাকে কোন রকমে আপনাদের সামনে ধরে দিয়েছি মাত্র। তরুণ সেক্রেটারী আমাকে না জানিয়ে লেখাটিকে প্রতিযোগিতার ফাইলে বেঁধে ফেলেছেন।'

এরপর তিনি তাঁর লেখাটি পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু দুপাতা এগোতে না এগোতেই আবেগে তাঁর গলা রুদ্ধ হয়ে এল, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। তিনি বারবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই লেখাটি শেষ করতে পারলেন না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেই বললেন, 'আর কেউ দয়া করে লেখাটি পড়ে দিন।'

সেক্রেটারীর ইঙ্গিতে একজন সুদর্শন যুবক রচনার বাকি অংশ পড়ে শোনালেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ভালো, উচ্চারণ বিশুদ্ধ।

কিন্তু পাঠক গল্পের শেষে এসে পৌঁছতে না পৌঁছতে লেখক ফের কান্নার সুরে বলে উঠলেন, 'আমি তাকে বাঁচাতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

আমি একটুকাল অবাক হয়ে থেকে বললাম, 'কি ব্যাপার। তবে কি আপনার স্ত্রী সেই রাত্রেই-

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, না স্যার, তা নয়। আমি এক বর্ণও মিথ্যে লিখি নি। সেদিন সে সতিাই ফিরে এসেছিল। কিন্তু গত বছর দুদিনের জ্বরে সে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কী যে হল ডাক্তার মোটে ধরতেই পারল না।'

ভদ্রলোক ফের বসে পড়ে মুখ নিচু করে রইলেন। চোখে কিছু না দেখা গেলেও সবাই বুঝতে পারল তিনি কাঁদছেন।

নীরব অস্বস্তির মধ্যে কয়েকটি মুহূর্ত কাটল।

একটু বাদে সহকারী সম্পাদক তাঁকে সাহিত্য সভা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ফেলে যাওয়া মেডালের বাক্সটিও তিনি তুলে নিলেন।

সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার মনে হল ভদ্রলোকের আর একটি বিনিদ্র রজনীর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তিনি কি আর দ্বিতীয় গল্প লিখতে পারবেন?

হঠাৎ আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে ক্লাবের সেক্রেটারী মাইকের সামনে মুখ নিয়ে ঘোষণা করলেন, 'এবার গল্প পড়বেন শ্রীবীরেন্দ্রকুমার তালুকদার। তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আমরা তাঁকে একটি কলম উপহার দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন তাঁর ফুলশয্যার রাতের গোপন কথা।'

সামনের সারিতে যে কয়েকটি সাশ্রুনয়না মহিলা বসেছিলেন তাঁদের মুখে এবার হাসি ফুটল।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ২১/সংখ্যা ১ : ১৩৬৬]

নিত্য-নিঠুর দ্বন্দ্ব

মনীশ ঘটক

[জন্ম ১৯০২ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। কল্লোল যুগের অন্যতম কবি ও সাহিত্যিক। 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে লিখতেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: কনখল, পটলডাঙ্গার পাঁচালী, মান্ধাতার বাবার আমল। 'বর্তিকা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যু: ১৯৭৯ সালে।]

প্রাচীন কাহিনী আর উপকথার দেশ তিব্বত। পৌরাণিক গল্প বিস্তর, হাল আমলের কাহিনীও কম নয়। এই ধর বুড়ো তেকন আর বুড়ো দেবদারু গাছের উপাখ্যান। সংশয়ীরা জেরা করবে, নাক সিঁটকোবে। কিন্তু হে সত্যসন্ধী, বুদ্ধের বাণী স্মরণ কর। বিশ্বাসে মিলায়ে স্বর্গ। ঈশ্বরের আশীর্বাদ শুধু বিশ্বাসীর শিরেই বর্ষিত হয়।

তেকন সোরবুর বয়সের গাছপাথর নেই, কত যে বুড়ো কেউ জানে না। সাধুসন্ত লোক। বাড়ী তার হিমালয় শীর্ষে, ছককাটা বাঁধা রাস্তায় জীবনযাপন। প্রত্যূষে প্রার্থনার পর দু'খানা যবের রুটি খেয়ে সে পাহাড় থেকে নামে, এসে বসে তাতা-হো নদীর অতলস্পর্শ ঘূর্ণীর ধারে তার উপাসনা বেদীতে। গগনচুম্বী এক প্রাচীন দেবদারু গাছতলায় সেই আস্তানা। গাছ বেশী বুড়ো, না মানুষ, এ নিয়ে লোকের জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। খুনখুনে বুড়োর নোয়ানো ঘাড় আর শুকনো কুলের খোসার মতো বলীজর্জর চামড়ার ভেতরে অফুরন্ত জীবনরস। জাববাজোববার ঘেরাটোপ থেকে স্বপ্নালু চোখে তাকায়, যেন সব দেখেও কিছু দেখছে না, গভীর অন্তর্মুখী দৃষ্টি, শান্তসমাহিত মুখ।

এমনি চলে আসছিল চীনে লড়াইবাজেরা দেশ আক্রমণ করার আগভাগ পর্যন্ত।

চিন্তাশীর্ণ, চঞ্চল দেখাচ্ছে ওকে আজ সকালে। সূর্যের তাপে পাহাড়ের চূড়ায় বরফ গলছে। ঘন কুয়াশার মতো ধোঁয়াটে হয়ে আছে চারিদিক গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে। দেবদারুর ঘন পাতার আচ্ছাদন বাঁচাচ্ছে তাকে, যেমন বাঁচিয়ে এসেছে এমনি আরো কত দিন, কত যুগ। ওই গাছের বিশাল গুঁড়ি মত্ত ঝড়ের আক্রোশ থেকে কতোবার আড়াল করে রেখেছে ওকে। ওতো গাছ নয়, প্রাণের বন্ধু যেন। সোরবু আদর করে, খসখসে বাকলে সস্নেহে হাত বুলোয়।

কোলের ওপর ভিক্ষাপাত্র, তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে মালা জপ করে সোরবু। গুণে গুণে একশো আটবার করে নাম জপ করে। প্রার্থনা পতাকা সোজা করে দেয়, ধর্মচক্র বাঁয়ে থেকে ডাইনে ঘুরিয়ে দেয়। নির্দন্ত দাঁড়ি ঢাকা শিথিল ঠোঁটদুটো থর থর করে কাঁপে। আবেগকম্পিত সুরে উচ্চারণ করে, ওঁ মণিপদ্মে হুঁ। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব। করুণাঘন ধরণীতল কর মধুনিস্যন্দ।

ঘূর্ণাবর্তের নীচে পাহাড়ে রাস্তা থেকে দূরাগত গরুর গলার ঘন্টার রুণঠুণ শোনা যায়। বেদীর রাস্তায় আজকাল লোকের গতিবিধি কমে গেছে। বিশেষ করে কয়েক মাস হল দেশে

অশান্তি শুরু হবার পর থেকে। কিন্তু এ আওয়াজটি রোজকার। প্রতিদিন ভোরবেলা একজন আসে গাঁয়ের পথ বেয়ে, আবার সন্ধেবেলা ওপরকার পাহাড়ের গোচারণ-এর মাঠ থেকে নেমে সমতলে ফিরে যায়। খাড়াইয়ের সঙ্কীর্ণ পথে দেখা দেয় তিনটে ইয়াক, পেছনে ভারী মেঠোবুট পায়ে বর্ষাতিমোড়া এক মূর্তি। তেকনের আশ্রমের সামনে এসে টুংটাং শব্দ থামে, পাথরের ঢিবির ওপর একটি নুড়ি রাখে আগন্তুক।

পুরুষ নয়, তরুণী মেয়ে। পথের শ্রমে তাজা রক্তের গোলাপী আভায় গালদুটো টুক্‌টুক্ করছে। কালোচুলের গুচ্ছের আড়ালে ঘাম টস্‌টস্ করছে। ইয়াক পালিকার নাম কায়া। গতযৌবন তেকনের চোখেও কায়া এলে দিনের আলোকপ্রভা যেন উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

তেকন বলে,-- ভগবান বুদ্ধ তোর ভালো করুন। তাঁর আশীর্বাদ তোর চিরসাথী হোক।

আঙরাখার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একতাল জমাট মাখন বার করে ভিক্ষাপাত্রে রাখে কায়া। পায়ের নখের দিকে মাথা নীচু করে তাকিয়ে অস্পষ্ট সুরে বলে,-- আশীর্বাদ মাথা পেতে নিলাম, প্রভু।

তাকে কেউ সাধু, কি সন্ন্যাসী বললে লজ্জিত হয় তেকন। সে ভেকধারী লামা নয়। তবুও গাঁয়ের লোক তাকে দেবাংশ বলে শ্রদ্ধা করে। তেকন বলে,-- মেয়ের দেবার হাত কি! কালকেই ত এতো চা নিয়ে এলি, আবাব আজ --

-- শরীর থাকলেই তার যত্ন আছে। ধ্যান ধারণা ভগবানের চিন্তা সবই শরীর ভালো থাকার ওপর।

--ঠিক কথা। ভগবান সহায় থাকুন তোর।

এবারে কি বলবে কায়া, অপেক্ষা করে তেকন। মেয়েটা আর কথা কয়না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ওকে দেখে বিষাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস ঠেলে ওঠে তেকনের বুকে। যেন রাত্তিরের অনর্গল কান্নায় চোখমুখ ফুলো ফুলো হয়ে আছে। কি হল ওর?

এ জীবনে যৌবনের দিনকটা কত তপস্যাব ফল। দেশের দুর্দিনে সে যৌবন অসহায় ভাবে শুধু অন্ধকারে মাথা কুটে মরে। তেকন বলে,-- কিন্তু সুস্থ দেহের আর এক প্রকাশ মন খুলে হাসতে পারাতে। তোর মুখে হাসি নেই কেন মা?

ঠোঁট কাঁপে কায়ার। বুঝি উদগত কান্না থামায়।

-- গাঁয়ের খবব ভালো নয়। নতুন সাঁকোর ধারে আরো অনেক ফৌজ এসে পৌঁছেছে।

-- তারা কি তোকে --

-- না বাবা, তা নয়। তবুও তোমার সাহায্য চাই আমি।

-- এই অশক্ত বুড়ো মানুষ যতদূর যা করতে পারে, ধরে নে সে সব করা হয়েছে।

-- তুমি জ্ঞানবান, তোমার দযার অন্ত নেই।

-- বয়েসের সাথেই কি জ্ঞান বাড়ে? সে সব যাক। তোর প্রেমিকটির কথা বল।

-- তুমি দোরজির কথা শুনেছ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে কায়া।

ঘাড় নেড়ে তেকন বলে যে সে জানে। দোরজি গোজে হল গাঁয়ের কামার। চীনে শয়তানরা

এই দোস্‌রাবার ডবল ফৌজ নিয়ে গাঁয়ে আসবার আগে পর্যন্ত কামারের কাজ করত। এইবার লাগল তুমুল মারামারি কাটাকাটি। পুরোন সেতুটা ধ্বসে চুরমার হয়ে গেল লড়াইয়ে। সেই লড়াইয়ে মাতব্বর হোলো দোরজি, গেরিলা সেনাবাহিনীর নায়ক। এখন পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দোরজি কথা শুনেছ তেকন, অল্পবয়স, রক্তগরম, কিন্তু এ দুনিয়াতে সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ। কায়ার দিকে তাকিয়ে স্নেহের হাসি মুখে আনে তেকন।

কথা বলতে গলা কাঁপে কায়ার। -- কাল রাত্তিরে এসেছিল। কোনো মতে চীনে পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে রাতদুপুরে এসে হাজির।

রুদ্ধশ্বাসে শোনে তেকন। যা টহলদারি ফৌজের বহর, তাদের নজর এড়িয়ে চলাফেরা করা ত প্রায় অসম্ভবের কোঠায়। ধরা পড়লে নির্ঘাৎ প্রাণ যাবে। এত বিপদ মুখে করে দোরজি এসেছে কায়ার বাড়ীতে!

-- তোকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে, না রে? সাধ্য কি না বেসে! এখন কোথায় আছে সে?

-- ছাদে লুকিয়ে আছে। আমি বললুম, চলো আমরা পালাই। দু'জনায় পাহাড়ের ওপরদিকে উঠতে পারলে, ব্যস্, নিশ্চিন্তি। কিন্তু ষাঁড়ের মতো গোঁয়ার। একটা মতলব ওর মাথায় ঘুরছে বুঝলাম, তাতে ঝুঁকিও খুব --

-- মতলব?

-- কিচ্ছু ভেঙে বলে না যে। কিন্তু এ গোঁয়ার্তুমি ছাড়তে হবে ওকে। ধরা পড়বেই আর নির্ঘাৎ প্রাণটাও যাবে। তুমি কথা কয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে থামাও প্রভু, তোমার কথা ঠেলতে পারবে না। খুব মান্যি করে তোমাকে।

-- তুই কি চাস্ যে আমি ওর ওখানে যাই?

দুহাতে মুখ ঢেকে ঘাড় নাড়ায় কায়া।

চোখ বুজে ভাবে তেকন। চোখের পাতা ত নয়, প্রাচীন পুঁথির মড়মড়ে কাগজ যেন। এই সব যুদ্ধ, আর হিংসা আর জয়োল্লাস, তার মনকে আর দোলা দেয় না। শিরায় রক্ত বরফ গলা জল হয়ে গেছে। আজ কতোদিন হলো সে পৃথিবীর সব ভাবনা ছেড়ে দিয়েছে -- যা কিছু চিন্তা, পরলোক নিয়ে। তবুও, নিজেরই অতীতের ক্ষীণ এক স্মৃতি মনের মধ্যে উঁকি দেয়।

-- আচ্ছা, তুইও ত ওকে খুব ভালোবাসিস্?

কায়ার রুদ্ধচিত্ত যেন মুক্তবায়ুতে এসে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে। বলে,-- হ্যাঁ বাবা, ওই আমার জীবনমরণ।

-- আচ্ছা। চোখের জল মুছে গোঠে যা, ধর্মের জীবগুলোকে চরানরা করগে যা। আবার কথা হবে'খন রাত্তিরে।

কায়া চলে গেলে গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠেস দিয়ে বসে তেকন। দেবদারু পাতার ছুঁচালো ডগা বেয়ে জল ঝরছে, নীচে বেগবতী তাতা-হো র স্রোত গিরিসঙ্কটের মধ্যে দিয়ে সগর্জনে বয়ে চলেছে। নদীর মনমেজাজ ওর জানা, কখনও শান্ত মেয়েটি আর কখনও দজ্জাল কুঁদুলী। জীবন ভোর শুনে আসছে। আজকে নদী আসন্নপ্রসবা মেয়ের মতো যন্ত্রণায় ছটফট করছে,

প্রসবান্তে পরমশান্তিতে সমুদ্রগভীরে গিয়ে মিশবার জন্যে। বাঁধন ভাঙতে দেরী নেই আর।

-- আমারো সময় হয়ে এলো, বন্ধু! গাছের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে তেকন বলে।

শিজিল করে আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে অষ্টাবক্র লাঠিতে ভর দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরে তেকন। রাস্তার পাথরকুচিগুলো ভিজে আর পেছল, হাজার হাজার বছরের পথচল্‌তি পায়ের দাবে পালিশ হয়ে গেছে। গাঁ কুয়াশায় ঢাকা। এর আগে কবে যে গাঁয়ে এসেছে, মনেই পড়ে না তেকনের। পূজাবেদী তদারক ছেড়ে বহুদিন নড়ে নি সে।

বোমা ফাটিয়ে রাস্তা চওড়া করে নিয়েছে চীনেরা, যাতে চারচাকার গাড়ী আর ভারী ট্রাকগুলো সহজে যাওয়া আসা করতে পারে। নিজেদের নীচু দেশ থেকে অনেক নতুনত্ব এই পাহাড়ে দেশে নিয়ে এসেছে তারা। এক জীপ ভর্তি টহলদার ফৌজ আস্তে আস্তে যাচ্ছে, গাড়ীর তেলের দুর্গন্ধে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে, কাশি পায়। পাশের পাহাড়ে দেয়ালে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ও দেখ্‌তে পায় সৈন্যদের হাসিমুখ, তাদের হাতের মারণাস্ত্র। সৈন্যরা ওকে চেনে -- হেঁকে শস্তা রসিকতার বুলি ঝাড়ে, কিন্তু তাদের শত্রু বলে মনে হয় না তেকনের। তারই মতো মাটির মানুষ ওরাও, তবে স্বতন্ত্র মত, ভিন্ন পথ। কিম্বা, নিজস্ব মত ও পথ কিছুই নেই ওদের।

অনেকবার থেমে, জিরিয়ে, তেকন শেষপর্যন্ত নদীর নাবালে গাঁযের ধারে গিয়ে পৌঁছল। এখানটায়, খাড়া গিরিসঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যেখানে নদী ক্ষুরধার বয়ে চলেছে, নতুন সেতু বানাচ্ছে চীনেরা। পুরোনো ঝোলা সাঁকো ত কবে সাবাড় হয়ে গেছে।

লোহার খিলেন আর ইস্পাতের পাত দিয়ে এই যে ময়দানবের কান্ডকারখানা করছে চীনেরা, দেখে তাজ্জব বনে যায় তেকন। ওরা শুধু করিৎকর্মা নয়, সত্যিই কুশলী। আর অনলস। আধা তৈয়ারী সেতুর ওপর পিঁপড়ের পালের মতো অগুণ্‌তি মজুর কাজ করে চলেছে অক্লান্ত ভাবে।

গ্রামের একেবারে ওধারে কায়ার ছোট্ট বাড়ীখানি। সেইখানেই ছাদের ওপর গা ঢাকা দিয়ে আছে দোরজি গোজে, দেখা করতে হবে তার সাথে। সোজা সেখানে যাবার চেষ্টা করলে সন্দেহ করতে পারে শত্রুরা। বাব্বাঃ, এদিকে ওদিকে গিজ্‌গিজ করছে সৈন্য আর সিপাই, কাঁধে চকচকে কিরীচ আঁটা বন্দুক। একটিই রাস্তা, তাতে তিববতি পথিক নেই বললেই চলে, কেবল দু'একটি স্ত্রীলোক, আর বাচ্চা। জোয়ান মরদ, যারা লড়তে পারত, হয় গেছে নির্বাসনে, না হয়ত পালিয়ে বেড়াচ্ছে গিরি গহ্বরে। ভিক্ষেপাত্র সামনে ধরে এগোতে থাকে তেকন।

কয়েক পা যেতে না যেতেই দু'জন সেপাই ধরে ফেলে তাকে। গা-তাল্লাসিতে বাধা দেওয়া নিষ্ফল। ধাক্কা মারতে মারতে ওকে নিয়ে যায় এক বাড়ীতে, সেখানে লালতারা মার্কা নিশেন উড়ছে। মাথা নীচু করে নির্বাক থাকে তেকন। ওকে ঘিরে জটলা পাকায় একপাল হলদে ফৌজ। শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায় ওকে ছোট্ট একটা কুঠরিতে, সেখানে একটি টেবিল আর একখানিই চেয়ার। চেয়ারে বসে মিলিটারি উর্দি আঁটা চাঁদবদন এক ছোক্‌রা অফিসার মাথা গুঁজে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করে, ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। হাতের কাজ শেষ হলে ধীরে সুস্থিরে মুখ তুলে তাকায়।

-- কি ফকিব বাবাজি, মৎলব কি? কি চাও এখানে?

অবিচলিত সুরে তেকন জবাব দেয়,-- কিচ্ছু না।

-- কিচ্ছু না? তবে বুঝি আমাদের নতুন সাঁকো দেখতে এসেছো?

-- আশ্চর্য সুন্দর সাঁকো।

-- ভালো লেগেছে তাহলে। তুমিই সেই উঁচু পাহাড়ের ফকির ত? আমার পরিচয় দিই। আমি ইঞ্জিনিয়ার কোরের কর্ণেল চেন। আমার নিজের নক্সা মাফিক আমিই বানাচ্ছি এই সাঁকো, যা দেখে তারিফ করলে তুমি।

-- আপনার সামনে কথা বলা আমার বেআদপি হুজুর।

জানালা দিয়ে দূরে কায়ার বাড়ীর ছাদ বোধ হয় দেখা যায়। ওইখানে লুকিয়ে আছে দোরজি, কায়ার প্রণয়ী। এই হাসিমুখ, মিষ্টভাষী কর্ণেলকে দেখে তাদের জন্য দুর্ভাবনা হয় তেকনের। ভাবে, না এলেও হত।

কর্ণেল বলে, -- তোমার কথা অনেক শুনেছি, আজ দেখা হয়ে গেল। শুনেছি তুমি নাকি অনেক তুকতাক জানো?

-- তুকতাক? না হুজুর, প্রার্থনা ছাড়া আর কিছু করবার শক্তি নেই আমার।

-- নিরাশ করলে তবে। কিন্তু সবাই যে বলে তুমি অনেক কিছু জানো -- এই মন্ত্র তন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, এই সব? ভূতে পেলে ছাড়াতে পারো! আবার কেউ বলে যে আমার সাঁকোর ওপর তুমি শনির দৃষ্টি দিয়েছো!

-- ওরা সব গাধার পাল, হুজুর, এই আমি যেমন। বোকা, হদ্দ বোকা।

-- ওসব কথার মার প্যাঁচ রাখো ফকির বাবাজী, খেল্ একটা কিছু দেখাও। কথা দিচ্ছি গুমোর ফাঁস করব না আমি।

ঢোক গিলে চুপ করে থাকে তেকন। অনেকদিন পব আজ আবাব নতুন করে মনে জ্বালা ধরে। কবেকার নিভে যাওয়া রাগের আগুন চিড়বিড় করতে থাকে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠবার জন্যে। লজ্জার কথা -- লজ্জার কথা।

কর্ণেল হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে, ধরণ ধারণ পালটে যায়, কর্কশ কণ্ঠে বলে, -- তবে তোকেই কিছু দেখাই, দ্যাখ্, ভিক্ষুক কোথাকার। ওই জানালা দিয়ে কি দেখতে পাচ্ছিস্?

রাগ, না ভয়, না অবসাদ -- বুঝতে পারে না তেকন, কিন্তু থরথব করে পা কাঁপে। বাইবে গিরিমাটির রং নদীর জল টগবগ করে ফুটছে, কেশর ফোলানো সিংহের মত ভীম বেগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নির্মূল গাছপালা ইট পাথর কিন্তু বাগ মানছে গিয়ে নতুন সেতুর তলায়। তামাম তিব্বতে তাহা-হো কে রুখতে পারে এমন সাঁকো কেউ বানায় নি।

-- দেখছি পুলটা।

-- আম্বানের বাস্তাও দেখতে পাচ্ছিস, পিকিন থেকে লাসা পর্যন্ত। তোর আমার জন্মাবাব আগে তৈরী ও বাস্তা। এই ক'দিনেই সাঁকোব কাজ শেষ হবে, আবার ও রাস্তার পরমায়ু হবে হাজার বছর -

-- ভগবানের দয়া থাকলে। আমার বয়সে তিনটে সাঁকো ভাঙতে দেখেছি আমি।

উন্মাদের চোখের মতো ধক্ করে জ্বলে ওঠে কর্ণেলের চোখ।

-- এ সাঁকো সে জাতের নয়। এ ভাঙতে পারে না, কেউ পারবে না একে ভাঙতে।

-- মানুষ কোন ছার, ভাঙবে নদী নিজেই।

মন দিয়ে শোন। নয়া চীনের পাশ করা ইঞ্জিনীয়ার আমি। এমন সাঁকো আমি বানাই না যা নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। থুতু ফেলি তোমাদের শাপমন্যিব মুখে। তোকে এখনো জ্যান্ত রেখেছি কেন জানিস্?

তেকন কথা কয় না। এই দাম্ভিক ছোকরা হয়ত জানে ঢের, বোঝে না কিছু।

-- তুই তোর পাথরের ঢিবিতে বসে কুঁড়োজালি জপ্‌গে যা। সেখানে বসে দেখিস আমার কারিগরদের কাজ, আব বলিস্ তোদের গেরিলা শয়তানদের --

বাধা দিতে তেকন হাত ওঠায়, কিন্তু কর্ণেলি থামিয়ে দেয়।

-- বলিস্ যে আমি চাই ওরা আমার সাঁকোয় হাম্‌লা করুক। আসুক ওরা, নেমন্তন্ন রইল। গুষ্টিশুদ্ধ মরুক এসে। যা, এখন পালা -- নিজেব দাঁড়ে গিয়ে বস্‌গে যা। ফের যদি এদিকে পা বাড়াবি তো কুকুরের মতো গুলি করে মারব।

আশাহত তেকন জরাজর্জর দেহ নিয়ে ফিরতি পথ ধবে। পেছন ফিবে কায়ার বাড়ীব দিকে তাকাতে সাহস হয় না। কোনো উপকারে এলো না সে, হয়ত এতক্ষণ দোরজিকে পাকড়াও করেছে ওবা। তা হলে কী সান্ত্বনা দেবে কাযাকে?

গোধূলি বেলায বেদীতে ফিবে পাথবেব আসনে বসে পড়লো। বৃষ্টি থেমে গেছে, কুয়াশা কেটে গিবিশৃঙ্গের ওপর অস্তগামী সূর্যের আলোব ঝলকানি চোখে পড়ছে। ঊষব প্রকৃতিব বুকে তার দেবদারুই একমাত্র গাছ -- সেই দিকে তাকিয়ে নতুন করে বল বাঁধে বুকে, প্রেরণা খোঁজে। সন্ধ্যাব আর্বিভাব সচকিত করে জাগে দাঁড়কাকের কর্কশ ডাক, পাহাড়ি খরগোসেব কিচ্‌কিচ্ আব তাতা-হো-র বুকে অবিবাম স্রোতের কলধবনি।

গোচাবণ ফিরতি ঘন্টার আওয়াজ কানে যেতে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে তেকন। কাঠ্ কাঠালি জুটিয়ে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালে। কায়া পৌঁছতে না পৌঁছতে মাখন নুন দিয়ে চা তৈরী করে ফেলে। কাযাব হাতে এক বাটি ধরে দিয়ে ওব দুশ্চিন্তাজীর্ণ মুখের দিকে তাকায়।

কায়া প্রায় কেঁদে ওঠে,- আমাব মন বলছে ওব কোনো বিপদ হযেছে। আমি ওব কাছে যাই।

কায়ার হাত ধরে তেকন বলে,-স্থিব হ', এখনো নয়। তোর বাড়ীতে যদি চীনেরা ওকে খুঁজে পেযে থাকে, তবে তোর ঘোর বিপদ! বোস্ এখন দ্যাখ্ কি হয়।

চুপচাপ বসে থাকে দু'জনাতে। কখন গোধূলির নরম আলো গভীর রাত্রের ঘন অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। ঘরে ঘীয়ের প্রদীপ জ্বাললো তেকন। খটাখট বুটেব আওয়াজ তুলে পাথুরে রাস্তা দিয়ে টহলদারী ফৌজ খালি হাতে ফিরে গেল।

পশ্চিমে মেঘ করেছে। টাঁড় খেয়ে খেয়ে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। হাড় কাঁপানো শীত, গরম চায়েও হাড় ঠক্‌ঠকানি থামে না।

বেশ অনেক পরে ঠক করে কুঁড়ের দেওয়ালে ঢিল পড়ার শব্দ হয়। লম্বা চওড়া দশাসই এক জোয়ান লাফিয়ে পড়ে। কায়ার উল্লাস ধরে না। পিঠের ভারী থলি সন্তর্পণে নামিয়ে দোরজি কায়াকে কোমর ধরে শূন্যে তোলে শিশুটির মতো, বলে, লক্ষ্মী মাণিক আমাব। এত রাত পর্যন্ত এখানে --

তেকন দেখে আর ভাবে, হাঁ, যে কোনো মেয়ের হৃদয় জয় করতে পারে বটে। দৈত্য বিশেষ, কিন্তু কি হাসিখুশী! কায়ার মুখভাব কিন্তু পাকা গিন্নীর মতো ভারিক্কি, সেই চালে বলে,-- ছাড়ো, গাধা কোথাকার! এদিকে আমি হাজার মরণে মরছি , বলি ছিলে কোথায় সমস্তটা দিন?

ঘাড় পেছনে ছুঁড়ে হো হো করে হেসে ওঠে দোরজি।

-- বাববাঃ,এর মধ্যেই সাতপাকের বউ! গাঁয়ের মধ্যেই ছিলাম, কাজ ছিলো। রাতের অন্ধকারে যেমন সুরুৎ করে এখানে এসে গেলাম, তেমনি গাঁ থেকেও সরে পড়েছি। ভাগ্যিস লালবাঁদরগুলো 'শোনে না মন্দ, দেখে না মন্দ'-- তথাগতের তিন বাঁদরের দুটোর মতো।

তেকনকে উদ্দেশ্য করে কায়া বলে,-- শোনো এবার, কি কি জেনে এসেছেন উনি।

দোরজি তেকনকে বলে,-- আমায় বকাবকি করবে না ত ঠাকুরদা!

হেসে তেকন বলে,-- আরে না না। উলটে তোর সাহসকে বলিহারি যাই নাতি। আচ্ছা, কাজে আটকে পড়ার সাথে কি তাতা-হো-র নতুন সাঁকোর কোনো সম্পর্ক আছে?

-- আছে।

বলে গম্ভীর হয়ে যায় দোরজি। কাঁধের সেই থলেটাতে পায়ের ঠোকর দিয়ে বলে, এখন যাচ্ছি আমি দলের আব সবাইকে খুঁজতে। কাল রাত্তিরে শ'খানেক গেরিলা আমরা গিয়ে গুঁড়ো করে উড়িয়ে দেব ওদের পুল।

নাভিশ্বাস ওঠে কায়ার। কষ্টে বলে,-- খুন করে ফেলবে তোমাদের সব কটাকে।

-- সে আশঙ্কা ত আছেই। লড়াইয়ে নামলে থাকবেও।

তেকন একটু ভেবে চিন্তে বলে,-- কায়ার কথা ফেলনা নয়। আব এটা চীনেদের প্যাঁচও হতে পারে--তোমাদের মারলো, আবার নতুন করে পুল বাঁধতে লেগে গেল।

-- লাগুক না। আমরা না থাকি, অন্য ছেলেবা আবার উড়িয়ে দেবে। এমনি বার বাব। যতদিন না শয়তানেরা ঝাড়েবংশে ভাগে এখান থেকে।

-- তাই বলে তুমি কেন? তুমি না আমায় ভালোবাসো, আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না?

-- ও কথা বলতে নেই লক্ষ্মীটি। আমাব মন ত তুমি জানো। তাই বলে যুদ্ধের সময় শত্রুর মুখোমুখি না হয়ে তোমার পেছনে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাব, এই কি তুমি চাও?

দোরজিব গলার স্বর বিষণ্ণ,ধীর,মৃদু। কিন্তু প্রেমে ভরা। চোয়াল দুটো দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কঠিন যদিও।

দীর্ঘঃনিঃশ্বাস ফেলে কায়াব মুখের দিকে তাকায় তেকন। সে মুখ থেকে প্রাণের শেষ রক্তবিন্দুও যেন মুছে গেছে, এমনি ফ্যাকাসে। তেকন ভাবে, বুড়োকে ভুলে আছে ওরা, দেখা

যাক এই বুড়োই কোনো কাজে লাগে কিনা। দেখা যাক্ দোরজির বরফজমা বুকে প্রাণপ্রবাহ বওয়ানো যায় কি না।

কায়া বলে, - এখুনি যাবে তুমি?

দোরজি দোরের দিকে এগোয়। -- আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে দলের আর সবাই।

তেকন বলে,-- দাঁড়াও। তার মাথায় মৎলবটা দানা বেঁধেছে, সে জানে আবেদন নিবেদন বৃথা। দোরজির সাথে চীনে কর্ণেলের যেন মিল আছে কোথাও। দু'জনারই বয়স অল্প, দু'জনাই নিজের নিজের কাজে প্রাণমন ঢেলে দিয়েছে। আহা, এরা করুণার পাত্র। কিন্তু ঐ যে কায়া, এক কোণে বসে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছে, ওর জন্য সমবেদনায় বুক ভরে ওঠে তেকনের।

-- ঝড় বাদলে বাইরে যাচ্ছ, একটু গরম কিছু খেয়ে যাও।

খুঁজেপেতে ঘরের কোণা থেকে আর একটা বাটি যোগাড় করে নিয়ে এসে তাতে চা ঢালে তেকন -- গরম চা। দোরজি আঙুল ডুবিয়ে একটু নেড়ে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে চায়ের পাত্র।

-- ওহে দোরজি শোন, শোন। একটা গল্প শুনে যাও।

-- চট্ করে বলে ফেল ঠাকুরদা, ভোরের আগেই লম্বা পাড়ি দিতে হবে।

ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে তেকনের। বুকে হাত ঘসে ঠান্ডা নিবারণ করে। তারপর বেশ স্পষ্ট গলায় শুরু করে--

-- ঢের দিন আগেকার কথা। এক যে ছিল, এই তোমার মতো, যুবক। যেমন পন্ডিত, তেমনি অহঙ্কারী। ভারী মাতব্বর মনে করত সে নিজেকে। কিন্তু সেও প্রেমে পড়ল, ভারী সুন্দরী এক মেয়ের সাথে, যে আবার ছেলেটাকে সমান ভালোবাসত। দেখে শুনে অন্তত তাই মনে হত।

বাধা দিয়ে কায়া বলে,-- চিনতেন সে মেয়েকে, ঠাকুরদা?

-- আরে হ্যাঁ -- সে যেন তুই। অন্তত তোর মতোই সুন্দরী। তোকে দেখলেই আমার তার কথা মনে হয়। ওরা দুটিতে ফিস্‌ফাস্ গুজ্‌গাজ করে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে। কবে বিয়ে হবে, কেমন মোটাসোটা বাচ্চা হবে, এইসব। তারপর একদিন হল কি, কোথাকার কে এক বণিকপুত্র, তারই সাথে পালাল মেয়েটা। তার প্রণয়ী হতাশায় আর রাগে মাথা কুট্‌তে লাগল। ক্রমে মন বাঁধল সে প্রতিহিংসার আগুনে। কোথায় গেল ভালোবাসা, আর কোথায় গেল স্বপ্ন। শোধ নেবার জেদ তুষানলের মতো ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল তার বুকে।

দোরজি বলে,-- ভারী ত গল্প ঝট্‌পট্ শেষ কর ঠাকুরদা --

প্রণয়ীটি বেরুল পলাতকদের খোঁজে। ধরে ফেলল এক মাঠের মধ্যে তাঁবুর ভেতর। তারপর আর কি -- মেয়েটার চোখের সামনেই কচুকাটা করল সে ছোঁড়াকে, রাগে আর হিংসায় সে তখন জ্ঞানশূন্য --।

কায়া শিউরে উঠে সুধোয়, -- আর মেয়েটা? আগের প্রণয়ীর সাথে ফিরে গেল সে?

কড় কড় করে বাজ পড়ল একটা। ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ। শুক্‌নো

চোখের পাতা ঘসে তেকন বললে,— না, মেয়েটা আবার পালাল। ভূত দেখলে মানুষ যেমন ভয়ে পালায়, তেমনি করে। আগের প্রণয়ী তাকে আর জ্যান্ত দেখতেই পায় নি -- পালিয়ে গিয়ে মেয়েটা শোকে দুঃখে মরে গেল।

-- যুবকটাও মরল?

— না সে কেমন উদাস পারা হয়ে লোকসমাজের বার হয়ে গেল। কেউ দেখতে পারত না তাকে। কিন্তু সে যে মরে বেঁচে যাবে তাও তার কপালে ঘট্‌ল না। বেঁচে থেকেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হল তাকে, জীবনের বিনিময়ে জীবন জিইয়ে রাখতে হবে, তিয়েন শানের তপোবনে গিয়ে সাধনায় মেতে গেল সে। সে তপস্যা সংশয়ের অন্ধকারের পারে আলোকরেখা দেখতে পাবার তপস্যা। কৃচ্ছ্রসাধন একদিন শেষ হল তার। তপোবন থেকে ফেরবার সময় সাথে নিয়ে এল একটি চারাগাছ, যে গাঁয়ে মেয়েটির বাড়ী ছিল, শেষ পর্যন্ত সেইখানে ফিরে এসে চারাগাছটি পুঁতে দিল। তারপর থেকে চোখের জলে ভিজিয়ে সর্বশরীরের উত্তাপ দিয়ে ঘিরে, মা যেমন শিশুটিকে পরিচর্যা করেন তেমনি করে বড়ো করে তুলল গাছটি। একদিন সেই শিশুগাছ বিরাট মহীরুহ হয়ে দাঁড়াল। সেই সুবিশাল দেবদারু হল তার তপস্যার ফল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কায়া বলল, -- এই দেবদারু, মানে আপনি -- মানে আপনার সেই গাছ এইটে?

ঘোঁৎ করে নিঃশ্বাস ফেলে দোরজি বলল, - যত্তো সব গাঁজাখুরি গল্প! বলি আমাকে এসব কথা কওয়ার মানে কি?

তেকন বলে চলল,-- সেই যে যুবক -- প্রেমের প্রকৃতি সে আদপেই জানতে পারে নি। তার মন বিষিয়ে ছিলো বিরাগে আর বিদ্বেষে। নিজের মনকে নিজেই মেরে ফেলেছিল সে। দোরজি গোজে — সেই এক ভুল তুমি করতে যাচ্ছ। বুকের কপাট বন্ধ করে রেখে ভালোবাসাকে বাইরে থেকে ফিরিয়ে দিয়ো না।

দোরজি উদ্ধত ভাবে বলে, -- উল্‌টে যুবকটিকেই তারিফ করি আমি। সে ঠিক করেছিল। আমি হলে আমিও তাই করতুম।

কায়া ঘেঁসে এসে দোরজির দেহসংলগ্ন হয়। বলে, আমাকে ফেলে যেতে পারে না তুমি। সাথে নাও আমাকে।

দৃঢ় হাতে কায়াকে সরিয়ে দেয় দোরজি। ডিনামাইটের থলেটা কাঁধে ফেলে চলতে চলতে বলে,- আমি যাই। ঠাকুরদা, কায়াকে দেখো, আমার হয়ে।

-- তোর হয়ে কেন রে, আমার বলেই না হয় দেখলুম।

কৌতূহলী চোখে দোরজির নিষ্ক্রমণ দেখে তেকন। দোরজির মুখভরা বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখের মণি নিষ্প্রভ, বিড়বিড় করে বক্‌তে বক্‌তে দরজা পর্যন্ত গিয়েই ঠাস্ করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল, কাঁধের থলে ছট্‌কে গিয়ে পড়ল দূরে। এক গড়ান দিয়ে উপুড় হয়েই অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

এক ছুটে কায়া তার পাশে গিয়ে হাঁটু পেতে বসল। চোখ বন্ধ,গভীর ঘুমে অচেতন। দোরজির গালে চিমটি কেটে পাগলিনীর মতো তাকে ঝাঁকাতে লাগল কায়া।

-- ওর অসুখ করেছে, মরে যাবে ও --

-- মরবে নারে, অসুখও করে নি। ঘুমিয়ে পড়েছে। লম্বা ঘুম ঘুমোবে এখন ঘন্টা কতক ধরে। তোর ভয় নেই, কোনো ক্ষতি হবে না।

আয়ত বিস্ময়ে কায়ার চোখ ড্যাব্‌ডেবে হয়ে ওঠে। - আপনি? আপনিই করেছেন এইরকম?

--হ্যাঁরে পাগ্‌লি। চায়ে একটুখানি ঘুমের গুঁড়ো গুলে দিয়েছি।

--কিন্তু কেন?

--ভরসা রাখ্ আমার ওপর। ভুল বুঝিস্ নি। দেখ্‌লি ত সদুপদেশ ওর কানেই গেল না। এখন তোরই জিম্মায় ওকে সরাতে হবে এখান থেকে, গোপন করে রাখতে হবে একটা রাত। পাহাড়ে ওর বন্ধুরা আছে, সেইখানে যাবি, তদারক তারাই করবে। পারবি নিয়ে যেতে।

-- কিন্তু জ্ঞান ফিরলে মারমুখী হয়ে উঠবে যে!

--তা উঠুক, কিন্তু চৈতন্য, মানে সুবুদ্ধি ফিরতেও ত পারে। নে এখন, দেরী করিস্ নে, হাত লাগা।

বিহ্বলের মতো কায়া ওঠে। দু'জনা ধরাধরি করে সংজ্ঞাহীন দেহটা রাস্তায় টেনে বার করে। ওই বিরাট লাস মণ্ডামার্কা বড়ো ইয়াকটার পিঠে চাপাতে সে কি কম খিদ্‌মৎ। দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত বাঁধনে বাঁধে।

ঝোড়ো হাওয়া আচমকা দেবদারুর মাথায় নাড়া দিয়ে যায়, দূরে কড়্ কড়্ করে বাজ পড়ে। কায়া শিউরে ওঠে।

রওনা হবার আগে কায়া শান্ত গলায় সুধোয়,--গল্পটা আপনি ওকে দেরী করিয়ে দেবার জন্যেই বলছিলেন, না? সব গল্পটাই কি বানানো?

তেকন কাঁধ ঝাড়া দিয়ে বলে,-- অতশত জানিনে কিছু- সত্যি হলেও হতে পারে। এখন রওনা দে ত। তথাগতের কৃপায় যেন নিরাপদে পৌঁছে যাস্ তোরা। তোর ভালোবাসা ওকে ভালোবাসতে শেখাক, ভগবান যেন এই আশীর্বাদ করেন।

--আপনি যাবেন না আমাদের সাথে?

- আমাকে যে থাকতে হবে। অসুর দলনের তপস্যায় বসতে হবে আমাকে।

ইয়াকের পিঠে হাত বুলিয়ে রওনা করে দেয় তাদের। উচুনীচু পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় আস্তে আস্তে দোরজি কায়া ইয়াকের দল। ওৎ পেতে বসে থাকা পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার সহসা আত্মপ্রকাশ করে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় দিগন্ত।

তেকন ঠায় দাঁড়িয়ে সার্থবাহের ঘন্টাধ্বনির শেষ টুংটাংটি শোনে, তারপর ফিরে আসে বেদীমূলে। গাছের চূড়ায় ডালেদের সে কি দাপাদাপি, শান্ত হয়ে উঠেছে ওরা। বাজ পড়ছে অনবরত, গিরিসঙ্কট মুহুর্মুহু কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। সজোরে বৃষ্টির চড়বড়ে ফোঁটা এসে আঘাত করে তেকনের কপালে।

ডিনামাইটের থলে খুলে ফেলে কাজে লেগে যায় তেকন। সে অনেকবার দেখেছে চীনেদের

এ কাজ করতে। তবে বয়স হয়েছে ঢের, হাত কাঁপে, আঙুল স্বচ্ছন্দে চলে না।

কাজ শেষ হয়ে গেল যখন, তখন ভোর হতে আর দেরী নেই। এইবার দিয়ে দু'বার চক্‌মকি ঠুকে ধুনি জ্বালালো তেকন। হাঁটু ভাঁজ করে প্রশান্ত মনে প্রার্থনায় বসল।

প্রার্থনা শেষে, মহাদ্রুম দেবদারুর কাছে নতশিরে নিবেদন করলো,-- ক্ষমা কোরো বন্ধু, আমাদের দু'জনকেই ক্ষমা কোরো।

ভোর হয়ে গেছে। একখানা যবের রুটি চিবিয়ে নিলো তেকন। খিদে পায়নি, তবুও। কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে বেদীতে জোড়াসন হয়ে বসল। সম্মুখে আরো একটি দীর্ঘ দিন। কাট্‌বে কেমন করে যেন তাই ভাবতে লাগল।

বৃষ্টির জলে ভিজে উঠলো দেহ, ভ্রূক্ষেপ নেই। মুদিত চোখ, অবনত মাথা। কানে আসতে লাগলো-হো-র অশ্রান্ত জলকল্লোল। আজকে কি বলছে নদী, ভাবতে চেষ্টা করে তেকন। নদীপথ, গিরিকন্দর কুয়াশার আস্তরণে নিশ্ছিদ্র হয়ে ঢাকা, কিন্তু জলরাশির ক্ষুব্ধ গর্জন দিক্‌ প্রকম্পিত করে জাগছে। নদী যেন ক্ষিপ্তা ক্রুদ্ধা, বেদনা অধীরা। প্রকৃতির আদরের দুলালী যেন দুঃসহ প্রসবব্যথায় রোরুদ্যমানা।

মুদিত চোখে অপেক্ষা করে থাকে তেকন। ঘুম নেই, বুড়োমানুষের আবার ঘুম।

খানিক বাদে চীনেদের একখানা টহলদার জীপ এসে থামে কাছাকাছি। লাফ দিয়ে নেমে আসে পলটনের একজনা।

সেই বিরাট দেবদারুর চিহ্নমাত্র নেই আর। যেখানে গাছ ছিলো, সেখানে অতল গহ্বর। কঠিন পাথরে শেকড়ের ছেঁড়া টুক্‌রো তখনো লেগে। পোড়া কাঠের গন্ধ নাকে আসে।

-- এই বুড়ো -- গাছ কি হল?

আকাশের দিকে আঙুল তুলে তেকন বলে,-- অভিশাপ। আগুনবাজ পড়েছিল রাত্রে। আওয়াজ পাওনি?

ভীত চোখে মুখে কপালে হাত বুলোয় চীনেটা। উপুড় হয়ে দেখে গিরিসঙ্কটের নীচে পর্যন্ত, যতদূর চোখ চলে। সঙ্গীদের ডেকে বলে, -- দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌, দেখে যা। সেই রাক্ষুসে গাছটা বাজে পুড়ে নদীর মধ্যে পড়ে গেছে রাতে। জলের টানে ভেসে গিয়ে দিয়েছে সাঁকোটাকে গুঁড়িয়ে।

তেকন নিঃশব্দে মালা জপ করে। সৈন্যটা আবিষ্কারের উল্লাসে মুখর। বলে,- আরে ও বুড়ো শুনছো? তোমার গাছটা শুধু নিজেই ভেঙে পড়েনি, নদী বেয়ে গিয়ে নতুন পুলটার খিলেন পাটাতন সব গুঁড়িয়ে দিয়েছে। যেখানে কাল দেখেছিলে সাঁকো, আজ দেখ গে সব খাঁ খাঁ করছে। লোপাট। বেমালুম।

পরম প্রশান্তিতে ভরে ওঠে তেকনের দু'চোখ। কোন অপার্থিব স্বর্গের আলোর অঞ্জন লেগেছে দৃষ্টিতে, চীনে ফৌজি সইতে পারে না, ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তেকন বলে,-- শুনছি -- শুনলুম। কর্নেলকে আমার আদাব দিয়ো, দৈবদুর্ঘটনায় মানুষের হাত কোথা, বোলো তাকে।

ওরা চলে গেলে পোড়াগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে তেকন। বৃষ্টি পড়ার অবধি

নেই, তাতা-হো-র প্রমত্ততায় মিষ্টিগানের সুরের মতো কানে লাগে, বুড়োহাড়ে যৌবন সঞ্চার হয় সে গানের মাদকতায়।

কায়ার সাথে সুদূর অতীতের পট থেকে আরো একজনার প্রণয়ভীরু অথচ আকুল চোখ দুটি মনে পড়ে।*

|প্রকাশকাল: বর্ষ ২৫/ সংখ্যা: ১৩৭০|

Hal G Evens এর Thundergorge গল্পের ছায়া আছে।

নাথিং ডুইং

অমিয়ভূষণ মজুমদার

[জন্ম ১৯১৮ সালে কোচবিহারে। 'পূর্বাশা' পত্রিকায় 'প্রমীলার বিয়ে' 'প্রমীলার বিয়ে' গল্প প্রকাশের মাধ্যমে লেখক জীবনের শুরু। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: গড় শ্রীখন্ড, চাঁদ বেণে, মহিষ কুড়ার উপকথা, রাজনগর, ইত্যাদি। ছোটগল্প ও উপন্যাসে সমান কৃতিত্ব। বঙ্কিম পুরস্কার ও সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত।]

মার্চের মাঝামাঝি হ'তে দু'চারদিন বাকি আছে। অর্থাৎ যা হ'লে ঠিক পুরোটা হয় তার চাইতে কিছু কম। সিজন ফ্লাওয়ারের হিসাবে কিন্তু পুরোপুরিটা পার হ'য়ে কিছু ঢলে পড়া। সিজন ফ্লাওয়ার এখনও ফুটছে অজস্র, অথচ বড় বড় দলগুলোকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সেগুলোর প্রান্তগুলো গরমে ঝলসে যাচ্ছে। দুপুরে একটা রুক্ষ গরম সকাল আর বিকালের শীত শীত ভাবটার মাঝখানে ঢুকে পড়ে। ধূলো বেড়েছে। পথের ধারের গাছগুলোর পাতায় লক্ষ্য করলেই তা ধরা পড়ে। সেই ধূলো উড়িয়ে কখনও কখনও বাতাসের ছোটখাট ঝাপটা লাগে। ক্যাসিয়ার গোড়ায় ঝরা ফুলও কিছু কিছু ওড়ে ধূলোর সঙ্গে। সব মিলিয়ে রংটার মোট ফল লোহিতাভ মনে হয়। কিম্বা এদিকে বসন্তকাল এরকমটাই হ'য়ে থাকে।

পথটা খুবই লম্বা। জাতীয় সড়ক নামে এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশে যাওয়ার বাঁকে এ জেলার ও জেলার সদর এবং একটু ঘুরে বেঁকে দু একটা মহকুমা শহরকে ছুঁয়ে যায়। সব জায়গায় সমান নয়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই জেলা সদরের কাছাকাছি এসে বেশী চওড়া, বেশী দুরন্ত, বেশী হট্টগোলে ভরা। কিন্তু যখন রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে, এমন কি ছোটখাট পাহাড়ী ঢেউগুলোর উপর দিয়ে এ চাবাগান থেকে ও চাবাগানের দিকে এগোয় তখন কোথাও পাখির ডাক শোনা যায়, কোথাও শীত শীত ক'রে ওঠে পথের দুপারের বনের ছায়ায়, আধ ঘন্টা ধ'রে সামনে পিছনে কোন সহযাত্রী নেই, অন্য কোন গাড়ির সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই। কোথাও পথের ধারে ন্যাড়া মাঠ তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে হাঁপাতে থাকে। পথ থেকে নেমে গিয়ে দূরে দূরে গ্রামের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। কখনও গ্রামের কোন দলছুট ঘর পথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। গ্রাম আধুনিকতার দিকে এগিয়েছে মনে হবে। কিম্বা এর চাইতেও বড় নমুনা পাওয়া যায়: পাশাপাশি গুটি চারপাঁচ আধময়লা দোকান, একটি ছোট চালের কল, পুরনো টায়ার ছড়ানো জংধরা গাড়ির কঙ্কাল সমেত একটা গ্যারাজ, কিম্বা বেশ নির্জন জায়গায় একটা পেট্রোল পাম্প। সেটা যদি একটা গ্রামও হয়, সড়ক বরাবর তার দৈর্ঘ্য যদি দু চারশ' মিটারও হয়, বিস্তার সড়ক থেকে কোথাও পঞ্চাশ গজের বেশী হবে ব'লে মনে হয় না।

সাদা প্লিমাউথ গাড়িটা বেশ বেগেই চলেছে। অজ্ঞাতসারে তার অবস্থিতি এরকম একটা গ্রামের কাছাকাছি। গাড়িটা বেশ লম্বাটেও বটে। অবশ্য একেবারে নতুন নয়। তা বোঝা যায় থামলে রিমগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে, এখনও অবশ্য আপহোলস্ট্যারির দিকে নজর দিলে।

ব্যবহার করা। খানিকটা অভিজ্ঞ। প্রকৃতপক্ষে সেকেন্ডহ্যান্ডই কেনা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ যত্নে রাখা। যার ফলে সরু চিক্কন স্টিয়ারিং হুইলটা স্পর্শসাধ্য, ড্যাশবোর্ডে সাজানো গ্যাজেটগুলো কর্তব্যরত। স্পীডোমিটার থেকে সেজন্য বেশ বোঝা যাচ্ছে গাড়িটা বেশ ফাস্ট চলেছে। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার বটেই।

হ্যাঁ সেকেন্ডহ্যান্ডই। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে এটা কি এক রকমের কার্পণ্য যে সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কেনা হয়েছে? মিসেস ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট চট ক'রে মন্তব্য করে না, কারণ এ বিষয়ে অনেক কিছু ভাবার আছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বয়স এবার একচল্লিশ হ'লো। নিউ আলিপুরে জমি কেনা হয়েছে। বাড়ি তুলবার তোড়জোর করতে হয়। একটি ছেলে মানুষ করতে হবে, মেয়ে দুটি বড় হ'লে তাদের বিয়েতে কম করেও বিশ পঁচিশ হাজার ক'রে বেরিয়ে যাবে। তা ছাড়া গাড়িটা যে অবশ্য প্রয়োজনের তাও বলা যায় না। জেলার মধ্যে ঘোরাফেরার জন্য ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের একের বেশী সরকারি গাড়ি আছে। সেগুলো মিসেস ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও ব্যবহার করতে পারে। আর ব্যবহারের খুব বেশী দরকারই বা কি হবে? অবস্থিতিটাই এমন যে বিনা কারণে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ানো চলে না। গাম্ভীর্য রেখে চলতে হয়। গুরুত্ব বজায় রেখে যেটুকু দোকানে যাওয়া, কটাই বা দোকান থাকে জেলার সদরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহিনীর উপযুক্ত, অথবা কোন ডেপুটির বাড়িতে যাওয়া, কজন ডেপুটিই বা থাকে একটা জেলার সদরে, তার জন্য নিজের গাড়ি কেনা দরকার করে না। নিজের গাড়ি রাখার অসুবিধাও আছে। পেট্রোল খরচ না হয় কমিয়ে রাখা গেলো ব্যবহার কম ক'রে। কিন্তু একজন সোফার এবং ক্লিনার রাখতে হবে। গাড়ির ব্যবহার নাই করো, তাদের মাইনা ত্রিশ দিনের জন্যই দিতে হবে। কাজেই গাড়ি কেনার ঝোঁকটা যখন এসে গেলো তখন সেকেন্ডহ্যান্ডই কেনা হয়েছে। আর সোফার ড্রাইভার রাখা হয়নি। রামলগন ম্যাজিস্ট্রেটের খাস আর্দালি। বছর খানেকের মধ্যে রিটায়ার করবে। তার ছেলে রামভকত। মিসেস তাকেই বহাল করেছে ক্লিনার হিসাবে পঞ্চাশ টাকায়। ছেলে যদি এইভাবে মেমসাহেবকে খুশী করতে পারে ভবিষ্যতে আর্দালির চাকরিতে তাকে কে রুখবে। আঠারো উনিশ বছরের ছেলেটা বাজার করে, ফাইফরমাস খাটে, গাড়ি ধোয়ামোছা করে, এমনকি কিছু ড্রাইভ করাও শিখে নিয়েছে।

আর নিজে গাড়ি চালানোই বরং আজকাল প্রথাসিদ্ধ। যেমন এখন সে নিজেই চালাচ্ছে। রামভকত উর্দি পরে পিছনের সিটে। উর্দিটা অবশ্য জাল। তার বাবার কাছে ধার নেয়া। অন্যদিকে পিতলের বোতাম বসানো সাদা পাগড়ি সমেত এই সাদা জিনের লিভারিতেই ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ির ড্রাইভারকে মানায়।

অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেটের জেলার বাইরে অন্য জেলার মহকুমা সদরের পাশে বড় রেলওয়ে জংসনে যেখানে রামভকত গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো সেখানে মিসেস ম্যাজিস্ট্রেট পরিচিত নয়।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের কথাই ভাবছিলো সে। তিনটি। বার, আট আর চার বছর বয়স হ'লো। আর নিউ আলিপুরে জমি কিনে রাখা হয়েছে। গত বছর বাড়ি শুরু করার কথা উঠে আবার প'ড়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাড়িতে বাস করার সুযোগ কবে হবে তাদের?

ব্রিজগুলোকে আর একটু চওড়া করা উচিত। স্টিয়ারিং-এ মন একাগ্র করলো মিসেস।

বারো বছরের ছেলে দেখে বলা যায় না কি হবে। আর তা ছাড়া আজকাল ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরির চাইতে প্রাইভেট ফার্মের চাকরিগুলো বরং ভালো। কিন্তু দেখো এরই মধ্যে ছেলেটা বারো বছরের হ'য়ে গেলো।

আর তারপর দুই মেয়ে। লক্ষ্য করো প্রায় আধ ঘন্টার উপর হ'য়ে গেলো আর একটি গাড়িও তার সামনে পিছনে দু'শ মিটারের মধ্যে দেখা যায়নি। গাড়িটা এখন পঁয়ত্রিশ কে. এম্ যাচ্ছে। তার মানে এই নয় সব গাড়িকে সে চিরকালের জন্য পিছনে ফেলে এসেছে। আর তাই যদি হয় যে গতি সকলকে পিছনে ফেলতে পারে তা কাউকে কাউকে ওভারটেক করবে। এটা বরং এই সড়কটারই বৈশিষ্ট্য। কোথাও কোথাও এমন নির্জন যে গা ছম্ ছম্ করে। তাই ব'লে ভয়ের কিছু নেই। প্রায় নিজের ঘরের মেঝের মতোই। ঠিকানায় পৌঁছে যেতে কারোই অসুবিধা হয় না।

বড় মেয়েটা কলকাতার স্কুলে পড়ছে, তাকে দেখতে কলকাতায় যাওয়া। ছোট মেয়েটাকে বাপের কাছে রেখে গিয়েছিলো।

কোন কোন অনুভূতি শরীরেও বুঝতে পারা যায়। ছোট মেয়েটার কথা মনে হ'তেই এখন যেমন হ'লো। কোলের কাছে বুকের নিচে খালি মনে হ'লো।

নাঃ, ওই তো একটি গাড়ি। কিম্বা গাড়ি নয় ঠিক, একটা জিপ। তা হ'লে বন থেকে বা দূরের চা-বাগান থেকে যে ছোট ছোট পথ এই সড়কটাতে এসে মিশেছে মাঝে মাঝেই তারই কোন একটা দিয়ে জিপটা হঠাৎ এসে পড়েছে। কেমন লাফাতে লাফাতে চলছে না জিপটা? তার নিজের প্লিমাউথ সেকেন্ডহ্যান্ড হ'লেও, আদৌ লাফাচ্ছে না। তা থেকে বোঝা যায় পথের তারতম্য নয়, জিপটারই বরং কিছু স্প্রিং অকেজো। মৃদু নিঃশব্দ হাসি ফুটলো মিসেসের মুখে।

এখন বিকেল হ'য়ে আসছে। কিছুদূরে পথের ধারে ক্যাসিয়ার হলুদ ফুলের স্তবকে বিকেলের আলো পড়েছে। মৌমাছি আছে নাকি এই ফুলেও? কিন্তু বিকেল হ'য়ে আসছে আর জেলার সদর এখনও প্রায় ষাট মাইল। অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলো তার পা। পঁয়তাল্লিশ কে. এম. এমনকি কাঁটাটা পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশের মধ্যে কাঁপছে।

লোকে বলে গাড়িগুলোর একরকম নেশা ধরে। সামনে গাড়ি দেখলে পিছনেরটির গতি বেড়ে যায়। মিসেসের হাল্কা গোলাপী রংকরা পাতলা ঠোঁট দুটো একটু চাপা দেখালো। নেশাটা নাকি ধ্বংসমুখী। পঞ্চাশে কাঁটাটা থর্ থর্ করছে। তার পক্ষেও এটা খাটে নাকি? জিপটা খুব লাফাচ্ছে বটে, ধোঁয়া ছাড়ছে, কিন্তু পিছিয়েও পড়ছে। দূরত্ব কমছে তা হ'লে। অবশ্য এর অন্য বর্ণনাও আছে: যৌবনসুলভ নির্দয়তা।

চার বছর বয়সে তার সব ছেলেমেয়েই কোল থেকে নেমে যায়। ছোটটাও তা গিয়েছে। বার বার তিনবার। প্রবাদের মানে কিছু নেই। নতুবা ধরতে হয় তিনবার যা হয়েছে প্রতিবারেই তা হবে। সাইকেল যদি বলো চার বছরের। কারো কারো দু বছরের হয়। অর্থাৎ চার বছর পর পর তার নিজের সাইকেল।

জিপ্‌টা এবার হার মানছে। একটা চওড়া নিঃশব্দ হাসি দেখা দিলো মিসেসের মুখে। জিপটা পুরনো, হুডটা জীর্ণ, ধূলায় ধূসর। খানিকটা বুনো। এটা কি নেশা যে জিপ্‌টাকে পিছনে ফেলবার চেষ্টা করছে সে? নাকি যৌবন বিবশতা? এমন নেশা কি তাকেও ধরতে পারে?

জিপটা খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লো। আহা বেচারা, ক্লান্তই দেখাচ্ছে। জিপের ভিতরটা চোখে পড়ছে এখন। হোলড্‌অল, টিফিন কেরিয়ার, বন্দুক, একটা চওড়া পিঠ, মরচে রংয়ের চেক শার্ট, ধূলোয় ভরা চুল। হুডের উপরে পাতা পল্লবও রয়েছে যে। একটা বুনো হাতি যেন বন ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু তা হ'লেও -- হর্ন দিলো মিসেস ম্যাজিস্ট্রেট --। পিছিয়ে তো পড়ছেই। এখন পথ না পেয়ে গতি আবার ত্রিশে নেমে এসেছে প্লিমাউথের। যদি বলো যৌবনসুলভ – মিসেসের হাসিটা বিস্তারে কমে বরং গভীর হ'য়ে ঠোঁট দুটোতে ফুর ফুর করছে। নতুবা রেলে চেপেও তো সদরে নামা যেত। কলকাতা থেকে জেলার সদরে ফেরার পক্ষে এই সড়কটা অপরিহার্য নয়। প্লিমাউথটাকে ব্যবহারের সুযোগ?

সামনের আয়নাটায় চোখ পড়লো তার। ছোট সাদা কপালের উপরে কয়েকটি কাটা চুল উড়ছে। পাড়ছাড়া নীল সিফনের শাড়িতে জড়ানো আটসাঁট শরীর। ফ্যাকাসে গোলাপীতে রঙানো পাতলা ঠোঁট দুটো সানগ্লাসের নিচে, হুইলের উপরে রাখা প্রবাল রঙের সূচলো নখ সমেত মসৃণ হাত দুখানা।

হর্ন দিলো সে। উপায় কি? যতই ক্লান্ত দেখাক জিপটাকে, ঘন্টায় পঁচিশ কে এম্. চ'লে যদি সে পথ বন্ধ ক'রে রাখে তাকে পাশ কাটিয়ে যেতেই হবে। জিপটাও বুঝতে পেরে পথ ছেড়ে দিলো।

যৌবন যদি বলো --। লেডি মেডিক্যাল অফিসার কথাটা বলেছিলো।

বেশ লাল হ'য়ে ওঠে তার মুখ এখনো, যদিও সে এত ফর্সা এবং বরং দীঘল গড়নের যে তাকে দেখে এত সুস্থ রক্তের অধিকারিণী ব'লে মনে হয় না।

কথাটা উঠেছিলো আজকাল যেমন প্রায়ই ওঠে সেকেলে ফ্রয়েড্ এবং সেক্‌সের বদলে পরিকল্পনা নিয়ে। কিন্তু তখন লেডি মেডিক্যাল অফিসার যে ইঙ্গিত করেছিলো তাতে এই বোঝা যায় তার এখনও সাবধান হওয়া উচিত যদিও তার কোলের মেয়েটির বয়স চার বছর। আর সাবধান হওয়া মানে পরিকল্পনার যান্ত্রিক ও ভৈষজ্য দিকগুলোই নয়, মনও বটে। সাইকেল শুধু শরীরকে নয় মনকেও নিজের অজ্ঞাতেই প্রস্তুত করে। যার ফলে কোন পরিকল্পনার কথাই মনে থাকে না। মেডিক্যাল অফিসাররা যা বলে তা সারাৎসার না হ'তে পারে, কিন্তু --। কিছুদিন থেকে সে কোলটাকে খালি অনুভব করছে বটে। এটা মানে এই বোধটাই কি কোন আকাঙ্ক্ষার সূচনা হ'তে পারে?

সামনের আয়নাটায় আবার খানিকটা লাল দেখালো মিসেসের মুখ। না, জিপ্-আরোহীর মুখটাও একবার দেখা গেলো। কপালের উপর থেকে চুলটা অনেকটা উঠে গিয়েছে। রোদে পোড়া --। জিপ্‌টা গতি বাড়িয়েছে নাকি? তা ক'রেই বা কতদূর? দেখতে দেখতে সেটা পিছিয়ে পড়লো। বন্য এবং সহিষ্ণু চেহারা নিশ্চয়ই স্ট্রিমলাইন্ড গতির সমকক্ষ নয়।

অন্য অনেকে যতই আস্থা রাখুক যন্ত্রের অক্লান্ততার উপরে আমার তেমন আস্থা নেই। পঁয়ত্রিশ কে. এমে যেতে যেতে হঠাৎ প্লিমাউথের এঞ্জিনটায় বিদঘুটে রকমের দু-একটা শব্দ শোনা গেলো, তারপর হঠাৎ চুক্ চুক্ গর্ গর্ শব্দ ক'রে উঠে ভুস্ ক'রে থেমে গেলো।

হন্তদন্ত ভাবে গাড়ি থেকে নামলো রামভকত। গাড়ি থেকে নামলো মিসেস ম্যাজিস্ট্রেট। এটা আর ব'লে দেয়া দরকার হবে না প্লিমাউথ অন্তত বেশ কিছুক্ষণের জন্য অচল হয়েছে। সেকেন্ডহ্যান্ড ব'লে? নতুন হ'লেই বা কি? যন্ত্র তো। রামভকত যা জানে তা সবই করলো। কিন্তু গাড়ি চালানো আর গাড়ি সম্বন্ধে জানা এককথা নয়। উপায় এখন? জেলার সদর এখনও পঞ্চাশ কিলোমিটার। প্রকৃতপক্ষে এ জায়গাটা ভিন্ন জেলা, ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ারের বাইরে। এখন অন্য কারো সাহায্য দরকার। কিন্তু ধারে কাছে কে আছে? সড়কের এ অংশটা একেবারেই গ্রাম্য। সামনে পিছনে পথের দুপারে ন্যাড়া ন্যাড়া উঁচুনিচু মাঠ। এ অবস্থায় সাহায্য দিতে পারে এমন কেউ যদি আসে সে আসবে অন্য কোন গাড়িতে। কিন্তু তেমন গাড়িই বা কোথায়।

রামভকত পরিস্থিতিটাকে এরকম ভাবেই বিশ্লেষণ করলো এবং মিসেস ম্যাজিস্ট্রেট মনে মনে স্বীকার করলো এটাই প্রকৃত বিশ্লেষণ। তা করতে গিয়ে মনের মধ্যে কিছু একটা শির শির ক'রে উঠলো। একমুহূর্তের জন্য হ'লেও তার মনের মধ্যে এরকম একটা কথা উঠলো -- রামভকতের মতো এরকম এক আনাড়ি ড্রাইভারকে নিয়ে, যে প্রকৃতপক্ষে ড্রাইভারই নয়, এরকম লম্বা পথে পাড়ি দিতে চেষ্টা করা যথেষ্ট বেহিসেবী ব্যাপাব। গাড়িতে উঠে ব'সে মিসেস আশঙ্কার কারণই দেখতে পেলো। যদি সাহায্য না আসে, যদি বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, তারপরে রাত হ'য়ে যায়। দিন পড়ে আসছে। বিউটি প্রোভোকেথ থিপ্ সুনাব দ্যান গোলড্।

পথের উপরে দাঁড়িয়ে রামভকত গাড়ি আসছে কিনা লক্ষ্য কবতে লাগলো। জিপ্টাই সব চাইতে কাছের গাড়ি এই পথের উপরে, যদি ইতিমধ্যে সেটা কোন গেঁয়ো পথে ঢুকে না গিয়ে থাকে।

শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বটে একটা গাড়িব। ওই তো জিপ্টাই। বেশ দ্রুতই আসছে। আগেব মতোই লাফাতে লাফাতে। এখন থেমে যাওয়া প্লিমাউথের তুলনায় বেশ সজীবই।

রামভকত হাত তুললো। চিৎকার ক'রে কিছু বললো। কিন্তু গোঁয়াবেব মতো খানিকটা ধূলোবালি উড়িয়ে দিয়ে জিপ্টা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলো। কি অভদ্র! ভাবলো মিসেস ম্যাজিস্ট্রেট।

নিপ-টে অভদ্র হওয়াও আজকাল কঠিন। দ্বিতীয়বার চিন্তা ক'বে আজকাল অনেক সময়েই প্রথম ঝোঁকটাকে শুধরে নেয়া হ'য়ে থাকে। অথবা জিপ্টার ব্রেকটাতে কিছু দোষ ছিলো। এগিয়ে গেলেও একশ' মিটারের মধ্যে জিপ্টা থেমেছে দেখা গেলো। এমনকি জিপের আরোহী পথে নেমেছে, পিছন দিকেই দেখছে। রামভকতই দেখতে পেলো।

রামভকত তার দিকে খানিকটা এগোতেই সেও বামভকতেব দিকে এগিয়ে এলো। শিস্ দিতে দিতে, কিছুই হয়নি, যেন এই সড়কটা তার বৈঠকখানা। প্লিমাউথের গায়ের কাছে এলো লোকটি। পকেট থেকে চামড়ার থলে বার ক'রে তামাক নিয়ে সিগারেট পাকাতে সুরু করলো। রামভকত বোনেট খুলে কি বোঝাতে গেলো। লোকটি ঔৎসুক্য দেখালো না। বরং ধীরে সুস্থে

সিগারেটটা পাকিয়ে নিয়ে ধরালো। খানিকটা ধোঁয়া টেনে নিয়ে সেটাকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে বললো, — ওসব আমি কমই বুঝি। দু'তিন শ' মিটারের মধ্যে একটা পেট্রোলপাম্প আছে, সেখানে ঠুক্ঠাক্ মেরামতের কাজও করে। গাড়িটাকে ঠেলেঠুলে পারো যদি —

গাড়ি থেকে নামলো মিসেস। লোকটির দিকে একটু এগোলো, গাল দুটোয় এক ঝলক লাল উঠে পড়লো, কথা গুলিয়ে গেলো যেন। রামভকত মাঝখানে এলো। সে বললো — ভারি গাড়ি, একা ঠেলা যায় না। লোকটি রামভকতকে দেখলো, মিসেসকে দেখলো, সাদা গাড়িটাকে দেখলো। চোখের ভারি চেহারার গগল্স্ খুললো। আবার রামভকতকে দেখলো, সাদা গাড়িটাকে দেখলো, মিসেসকে দেখলো। যেন রামভকতের সাদা উর্দির বোতামের চকমকানি, প্লিমাউথের শ্বেতত্বের অকৃত্রিমতা, মিসেসের গায়ের রঙের কিম্বা তার পরনের সিফনের প্রকৃত সেড্টা যাচাই করা চাই। তারপর আবার গগ্লস্টা আঁটলো। একটু বিব্রত যেন দেখালো তাকে। কিছুই করা যাবে না এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো। কিছু না ব'লেই জিপের দিকে চ'লে গেলো।

রামভকত হতাশ হ'য়ে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। মিসেস বিপন্নমুখে স্বগতোক্তি করলো ঃ আশ্চর্য! কিংবা আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? এক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তাই হচ্ছে। রামভকতকে গোপন ক'রে হাতঘড়িটাকে দেখলো সে।

আধমিনিট পরে মিসেস বললো -- রাম --

— জি?

— কি করবে?

রামভকত পথের ধারে থেকে একটা ঘাসের ডাঁট তুলে নিয়ে কামড়াতে সুরু করলো।

মিনিটটাক পরে সে বললো, -- জিপ্টা ব্রেক্ করতে আছে, দেখি।

জিপ্টা ব্যাক্ ক'রে এলো। প্লিমাউথের সামনে এসে থামলো। খানিকটা মোটা দড়ি বার ক'রে দিয়ে লোকটি রামভকতকে বললো প্লিমাউথকে জিপের পিছনে বেঁধে দিতে।

অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারা যায় - এই সড়কে পেট্রোল, ডিজেল বা মবিলের যেমন হঠাৎ দরকার হতে পারে বেহিসেবী চালকের, হিসেবী চালকেরও তেমন হঠাৎ ছোটখাটো মেরামত দরকার হ'তে পারে। সুতরাং সড়কের ধারে পেট্রোল পাম্প আছে। এটা থেকেই আমরা গোড়াতে এদিকের বসন্তকালের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রে থাকবো। সাদা দেয়ালের দোতলা বাড়ি। পেট্রোল ব্লক আর বাড়িটার মাঝখানে কালো রাস্তা। গাড়ি যাওয়া আসার এই পথ ছেড়ে সামনে খানিকটা সিজন ফ্লাওয়ারের বেড্। ক্রিসান্থিমাম, ডালিয়া, হেলিওট্রোপ, বেশ বড় জাতের, বেশ রংদার, কিন্তু পাপড়ির ধারগুলো রোদে শুকনো তা আগেও বলা হয়েছে। বাড়িটা সাদা দোতলা, সামনে সরু ধরনের একটা বারান্দা, মেঝে লাল, আর সরু সরু থামগুলো সবুজ-কালোয় মোজেক করা। বারান্দায় খানকয়েক বেতের চেয়ার দরজাগুলোর এপারে ওপারে। একটা কাঠের ইজিচেয়ার। অফিসঘরের মধ্যে যেখানে মবিলের টিনগুলো সাজানো তারই কাছে কাছে কিছু স্পেয়ার পার্টস্।

জিপ্ থেকে নেমে লোকটি অফিসে গিয়ে কিছু বললো। তেলকালি মাখা হাফপ্যান্ট

গেঞ্জিপরা এক ছোকরা স্প্যানার নিয়ে বেরিয়ে এলো। লোকটি রামভকতকে বললো -- তোমার মেমসাহেবকে বারান্দায় উঠে বসতে বলো। গাড়িটাকে ওরা গ্যারাজে নিয়ে যাক।

বারান্দার মাঝামাঝির চাইতে বরং বাঁ ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসলো মিসেস। জিপের আরোহী অফিসে ঢুকলো, অফিস থেকে বেরিয়ে এলো, পিছনে গ্যারাজে গেলো, ফিরে এসে অফিসে ঢুকে কিছু বললো তারপর কিছু করার না থাকায় বারান্দায় এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। তামাকের থলে বার করে সিগারেট পাকাতে সুরু করলো।

এখন একটা দরজার খোলা পাল্লার দুপাশে দুখানা চেয়ারে দুজন, মিসেস আর জিপের লোকটি। এখানে যেমন চেয়ার হ'তে পারে। একেবারেই সাধারণ। একখানা কাঠের, একখানা বেতের। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার নেই।

মিসেস মনে মনে বললো, যে রকম লাফাচ্ছিলো তা থেকে বোঝা যায় জিপ্‌টারও মেরামত দরকার।

জিপের লোকটি অন্যমনস্কভাবে সামনের দিকে চেয়ে সিগারেটের কাগজ ঠোঁটে ঘষে সিগারেট পাকানো শেষ করলো।

ফুলের বেড্‌গুলোর উপরে দিনের আলোর প্রখরতা কমেছে এখন। ফুলগুলো বেশ বড় বড়, পরিপূর্ণ, হয়তো একটু বেশী ফোটা কিন্তু আকর্ষণীয়।

একটা মৃদু শব্দ গোড়া থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় ছিলো। লোকটি সিগারেট ধরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে কারণটা বুঝতে পারলো। মিসেস যেদিকে বসেছে, তার চার পাঁচ হাতের মধ্যেই কমলা রঙের ফুল সমেত একটা লতা দেয়াল বেয়ে উঠেছে। তার কাছাকাছি মৌমাছি উড়ছে। কিন্তু সংখ্যায় যেন অনেক। তারপরই বেশ একটু চমকে উঠলো লোকটি। লতাটির কাছাকাছি বারান্দার কংক্রিটের বরগা থেকে একটা মৌচাক ঝুলছে। বেশ বড়ই, অনেক ব্যস্তসমস্ত মৌমাছি বিজ্‌বিজ্‌ করছে।

দু-তিনটি মৃদু অস্পষ্ট খাঁকাড়িতে গলা সাফ ক'রে লোকটি বললো -- ওদিক থেকে উঠে আসা ভালো। মাথার উপরে মৌচাক দেখছি।

মিসেস চমকে উঠলো। তার মুখ থেকে সব রক্ত স'রে গেলো। এদিক ওদিক চাইলো, মৌচাকটাকে দেখতে পেলো। উঠে দাঁড়ালো। দরজাটা পার হ'য়ে লোকটি যেদিকে বসেছিলো সেদিকেই স'রে এলো। এদিকের একটা চেয়ারের সামনে দাঁড়ালো। চেয়ারটার পিঠে হাত রেখে যেন অবলম্বন নিলো।

লোকটি বললো, -- মেরামতের দেরি হবে। বসা যেতে পারে।

মিসেস পাশের চেয়ারেই বসলো। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলো। এ কিছুই নয় এরকম এক ভঙ্গিতে তার পাতলা ঠোঁটদুটো একটু ছড়িয়ে গেলো।

দু তিন মিনিট -- এর মধ্যে একটা মৌমাছি লতা থেকে অফিসের দরজা পর্যন্ত ভোঁ ক'রে উড়ে গিয়ে খোলা দরজার পাল্লায় ঠক্‌ ক'রে গুঁতো খেলো।

লোকটি বললো,-- বিশেষ ক'রে যদি স্পেয়ার পার্টস দরকার হয়, এদের কাছে সব গাড়ির উপযুক্ত পার্টস থাকে না, অনেক দেরি হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু এই দীর্ঘ পথে একা কেন?

সঙ্গের ওটা যে গাড়ি সম্বন্ধে কিছুই জানে না তা দু'কথাতেই বুঝতে পেরেছি।

কিন্তু কথাটা কি ভালো হ'লো। বরং একটু অপ্রতিভই হ'ল লোকটি।

মিসেস ইতস্তত করলো। কোলের উপরে হাত ব্যাগটার গায়ে হাত বুলালো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো। তার কানের কাছাকাছি কিছু হাল্কা আরক্ততা দেখা দিলো। মুখ ফিরালো। লোকটির বরং কাঁধের কাছাকাছি দৃষ্টি রেখে বললো -- ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করা হয় নাকি আজকাল?

-- না।

যে মেরামতের কাজ করছিলো সে অফিসঘরের দিকে এলো।

জিপের লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, -- কি রকম লাগছে?

-- সুবিধার নয়, সাব, কিছু অদলবদল দরকার হ'লেও হ'তে পারে। রাত হয়ে যাবে।

মিসেস বললো, -- তা হ'লে?

মেকানিক ছোকরা অফিস থেকে একটা মবিলক্যান নিয়ে ফিরে গেলো। জিপের লোকটি বললো--, এখানে ধারে কাছে এমন রেস্টুরেন্ট নেই যে চা খাওয়া যায়। অথচ একজনের ক্লান্তি হওয়া স্বাভাবিক।

অনেক সময়ে প্রথমপুরুষে কথা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। ক্রিয়াপদগুলোর জন্য চিন্তাভাবনা করতে হয়।

মিসেস বললো, - এখান থেকে জেলার সদর কতদূর কেউ জানে? কোন রকমে রাত আটটাতেও পৌঁছানো যায় না? সেটাই ডিনার টাইম।

- মেরামত যদি সময় না নেয়, অর্থাৎ যদি এক ঘন্টায় হয়। অবশ্য চায়ের একরকম ব্যবস্থা করা যায় না এমন নয়।

জিপের চেহারা, পোশাক, বন্দুক, এসব দেখে ধারণাটা হয়েছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কেউ হ'তে পারে।

মিসেস সানগ্লাসের বাঁয়ের কাচটিকে স্পর্শ ক'রে সেটাকে লাগসই ক'রে নিলো।

-- সাতদিনের ছুটি ভোগ করা। দোতালাটা কি জন্য করেছিলো জানা যায় না। হয়তো মালিকরা থাকতো। কিন্তু ওখানে এখন খানিকটা রেস্টরুমের মতো। বাথরুম আছে। গড়ানোর মতো ইজিচেয়ার, এমন কি দরকারে একটা ঘুম দেবার মতো খাট। আমার সঙ্গে চায়ের বন্দোবস্ত আছে।

মিসেস কথা বলার আগে ভাবলো। খুব মৃদু খাঁকড়ি দিয়ে গলা সাফ ক'রে নিলো। বললো,- - কিন্তু সদরে যাওয়ার কি উপায়? তারপর গলা আর একটু নামিয়ে বললো, - তুমি নিজে একটু দেখবে কি হয়েছে গাড়িটার।

আবার তার মুখ থেকে বেশ খানিকটা রক্ত স'রে গেলো।

লোকটির রোদে পোড়া মুখ লালচেই দেখায়। সে বললো, গাড়ি সম্বন্ধে আমি খুব কমই জানি। রেস্টরুমের চাবি আনবো?

-- কি হবে?

-- স্নান করবে। শাড়ি পাল্টাবে। চা করবে।

মিসেস চুপ ক'রে ব'সে রইলো। দিককানা একটা মৌমাছি চাকের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে ভোঁ ক'রে উড়ে গেলো। বেশ শুকনো খটখটে কবোষ্ণ দিন-শেষ।

লোকটি উঠলো। অফিস ঘরে গেলো। রেস্টরুমের চাবি এনে মিসেসের কোলের উপরে আলতো ক'রে ছেড়ে দিলো। গ্যারেজের দিকে চ'লে গেলো তামাকের থলে থেকে হাতের তেলোর উপরে তামাক মাপতে মাপতে।

দুহাতে একটা বড়সড়ো বেতের চ্যাঙারি নিয়ে সে ফিরে এলো। রামভকত এলো তার আগে আগে। লোকটি বেতের চ্যাঙারি রাখলো। রামভকত দাঁড়ালো ভক্তের মতো।

— দেরি হবে। অনেক অনেক দেরি হোবে।

— কি হয়েছে। বললো মিসেস।

— হাইড্রলিকের ডারাম চোট খেয়ে টোল ভি খেয়েছে।

কিছু ভাবলো মিসেস।

-- আচ্ছা, রাম, এদিকে কোথাও বড় গ্যারাজ নেই? মানে এটাব চাইতে বড়। কোথাও না কোথাও থাকবেই দেখো। বড় না থাকলেও এমন থাকতে পারে যেখানে এরা যা পাবছে না তা পারতে পারে।

রামভকত চ'লে গেলো।

অনেক সময়ে একটা সাধারণ কথা অনেকগুলো বাক্যে বিশদ ক'রে বলতে গেলে কথাটা শেষ ক'রে মৃদু মৃদু হাঁপাতে হয়। নিঃশব্দে হ'লেও একটু জোরে জোরেই নিঃশ্বাস নিচ্ছে মিসেস।

কিছুক্ষণের মধ্যে জিপ তার পিছনে বাঁধা প্লিমাউথ নিয়ে রামভকত আর তার মতোই ছোক্‌রা মেকানিক বারান্দার কিছু দূরে দাঁড করালো। দুটো থেকেই নিজেরা বুদ্ধি ক'রে ভাবি মালগুলো নামিয়ে রাখলো। এ অবস্থায় এই তো স্বাভাবিক। যেমন স্বাভাবিক অচল প্লিমাউথকে টেনে জিপটারও যাওয়া, যেমন স্বাভাবিক দুটো স্টিয়ারিং ধরার জন্য দুজন লোক।

জিপের আরোহী নিঃশব্দে হাসলো। এ রকম অবস্থায় তো না হেসেও পারা যায় না। বললো — ওরা কি বুঝে নিয়েছে কে জানে।

মিসেস বললো, -- না, না। মানে হাইড্রলিকের ড্রাম কি বলছিলো।

— মনে হচ্ছে সেটা উপসর্গ। তাতে ব্রেকের অসুবিধা হ'তে পারে। এখানকার মেকানিক আর রামভকত আমার মতোই পটু। আসল রোগ ধরতে পারে নি, তাতে সন্দেহই নেই।

মিসেস উঠে দাঁড়ালো। একটু ইতস্তত করলো। পাশের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরের দিকে চাইলো। একটা সিঁড়ি দেখা যায় বটে, আর সেটা হয়তো দোতলার সিঁড়ি। ঘরের চাবি খুললো মিসেস।

জিপের আরোহী উঠলো। দরজা দিয়ে সেই আগে ভিতরে গেলো। দোতালার সিঁড়িতে

পথ দেখালো। জিপের আরোহী বললো — তুমি ব'সো। ব্যবস্থা ক'রে আসি।

লোকটি নেমে এলো। ভারি মালগুলোকে অফিসের জিম্মায় রেখে, মিসেসের সুটকেস্, নিজের ঝোলা ব্যাগ, আর চায়ের চ্যাঙারি নিয়ে রেস্টরুমে ফিরে গেলো।

-- বাথরুমের দরজা পেয়েছো? নাকি আগে চা করবে?

গলাটাকে শান্ত ক'রে আনলো মিসেস, — বসো। কথা বলি বরং।

-- বেশ কথা। চায়ের জল ফুটতে ফুটতে কথা বলা যাবে।

লোকটি চ্যাঙারির পেট থেকে নানা আকারের কৌটা বার ক'রে টেবলে রাখলো। একটা মাঝারি চেহারার স্পিরিটল্যাম্প বার ক'রে ধরিয়ে দিলো। বাথরুমের ট্যাপ থেকে ছোট একটা কেটলি ভ'রে এনে স্টোভে চাপালো। চেয়ারে ব'সে তামাকের থলে বার করলো সিগারেট পাকাতে।

মিসেস বললো -- সাতদিনের ছুটি ভোগ করছো মানে? শিকার?

লোকটি হাসলো। বললো, — এ পর্যন্ত আমার বন্দুকে, এই পাঁচ সাত বছরে একটা ফেঞ্জ্যান্ট ছাড়া কিছু মরে নি। আর তখন আমি চব্বিশ ঘন্টার অনাহারী ছিলাম।

মিসেস টেবলে হাতের ভর রেখে দাঁড়ালো।

কেট্লিতে মৃদু শব্দ হচ্ছে।

মিসেস বললো, -- দু এক কথার উত্তর দিলে কথা চালিয়ে যাওয়া শক্ত। অনাহারী ছিলে কেন?

— জঙ্গলে পথ হারিয়ে। তখনও জিপ্‌টা যোগাড় হয় নি। বনের অলিগলি ধ'রে পায়ে পায়ে চলতাম। এদিক দিয়ে জিপ্ রক্ষা-কবচ। একটু বড় পথ ছাড়া চলে না। আর বনের বড় পথ মানেই তার কোথাও না কোথাও বনবিভাগের বাংলো না হ'ক, চালাঘর থাকবেই। সারা দিন ফুর্তিতে হেঁটে সন্ধ্যায় বুঝলাম পথ গুলিয়ে ফেলেছি। রাতটা মশা আর পোকামাকড়ের জ্বালায় ঘুমের ঝোঁকে পশুদের ডাকাডাকি শুনে সহজেই কেটে গেলো। পরের দিন দুপুর নাগাদ চন্‌চনে ক্ষিধের মুখে দেখি ফেজ্যান্ট। ভাবি নি পড়বে। তা পড়লো। বড্ড সহজে ওরা মরে কেন যে --

-- কিন্তু বন --

-- এদিকের সব বনই এমন যে পথ যতই হারাক ক্রমাগত মাইল তিনেক চললেই কোন না কোন বড় পথের উপরে গিয়ে পড়বে। অবশ্য পথের আড়াআড়ি যদি বড় নদী না দেখা দেয়। তা হ'লে সময় বেশীই লাগবে, ঘুরে গিয়ে নদীটাকে এড়াতে হবে ব'লে।

মৃদু মৃদু হাসলো জিপারোহী।

-- এইসব ক'রে বেড়াও নাকি আজকাল?

-- না, বর্ষাকাল বাদ দিয়ে বছরে দুতিনবার ছুটি নেই। অন্য সময়ে চাকরিই করি।

-- জানতাম শিকারীরাই বনবাদাড়ে ঘোরে; নতুবা তারা ফরেস্টের লোক।

-- ঠিক নয়। আরও আছে। চায়ের জল ফুটবে? ছেলেমেয়ে ক'টি?

-- এক ছেলে, দুই মেয়ে। বললো মিসেস -- মুখময় ধুলো। হাতে মুখে জল দাও। বনে তো বাঘও থাকে।

— বেশ কথা। তাদের আমি মারতে গেলাম কেন? বাঘ খাওয়া যায় না।

বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে এলো লোকটি।

স্টোভে জল ফুটে উঠলো।

মিসেস বললো, -- বিয়ে করো নি?

— আলবৎ।

কিন্তু কথাটা কি রুক্ষ আর জোরে বলা হ'লো! মিসেসের মুখের দিকে তাকালো লোকটি। মিসেসের হাতের পিঠে আলগোছে হাত রাখলো। বললো, -- কিছু মনে করো না।

জল দেখে নিয়ে কেটলিতেই চা ভিজালো মিসেস। সে স্নানঘরে গেলো হাতমুখ ধুতে। সে ফিরে এলে নিজের হাতের তোয়ালে মিসেসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, — আমার হাতে তৈরী স্যান্ডুইচ্ আছে। বুনো বুনো লাগবে, মন্দ নয়।

চা করলো মিসেস। চ্যাঙারি হাতড়ে কাপ প্লেট বার করলো মিসেস। লোকটির সামনে চায়ের কাপ দিয়ে পাশের চেয়ারটায় বসলো।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মিসেস বললো -- এক রাত এই রেস্টরুমে -

— বিচিত্র নয়।

-- সারা রাত না হ'ক, মাঝ রাত অবধি।

— খুবই সম্ভব। একমুখ স্যাড়ুইচ্ কামড়ে লোকটি বললো, -- গাড়ি কিভাবে সারানো হ'য়ে থাকে তা আমার জানা নেই। সানগ্লাসটাকে খুলছো না কেন?

একটু পরে লোকটি বললো,-- স্নানও করবে? নাকি, শাড়িটা পালটে নাও বরং। ঝরঝরে লাগবে। তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না তোমার ছেলেমেয়ে বড়সড়ো হয়েছে।

-- আর একটু বসি। এই ব'লে মিসেস জানালার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। গ্রিলের খানিকটা লোহাকে চেপে ধরলো হাত বাড়িয়ে।

আবার একটা সিগারেট পাকালো লোকটি। চেয়ার ছেড়ে মিসেসের দিকে এগিয়ে গেলো। মিসেস ফিরে দাঁড়ালো। লোকটির কাঁধের নিচে বুকের একটা পাশে হাত রাখলো একখানা।

-- আচ্ছা সত্যি রাত হ'তে পারে নাকি, অন্তত মাঝ রাত অবধি, কিন্তু তা হ'লে লোকে কি বলবে? মিসেস থেমে থেমে প্রশ্ন করলো।

লোকটি হেসে বললো, - এখানে কেউই নেই জিজ্ঞাসা করার মতো। এদের ক্যাশিয়ার আছে। তাকে পরে এক সময়ে বলে দেবো আমার ওয়াইফ্। আর সেটা এদের সকলের কাছে অ্যাবস্যেলুটলি বিশ্বাসযোগ্য হবে। জিপ আর প্লিমাথ যেমন গাঁট ছড়ায় বাঁধা। আমি দেখেছি সাধারণ লোকে এসব প্রতীকত্বকে সত্যের প্রমাণ ব'লে মনে করে।

জানালার গ্রিলে বাহু রেখে তার উপরে কপাল রাখলো মিসেস। কিছুক্ষণ বাইরে চেয়ে রইলো। বললো,-- শাড়িটা পাল্টাবো ভাবছি।

-- হ্যাঁ। ঝরঝরে লাগবে। ক্লান্তিটাও কমবে।

স্নান-ঘরের দরজা একটু ফাঁক ক'রে মিসেস বললো, -- সাবানটা দাও তো, আনতে ভুলে গেলাম।

নিজের ঝোলা-ব্যাগ থেকে লোকটি সাবান বার ক'রে দিলো।

লোকটি ইজিচেয়ারে টান হ'য়ে ইতিমধ্যে আর একবার তামাকের পাউচ বার করেছে।

এ শাড়িটা হাল্কা কমলা রঙের কিংবা সাদা চৌখুপী হওয়ায় ফলেই তেমন হাল্কা দেখায়। অথবা আলোটাই তেমন।

মিসেস ইজিচেয়ারটার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললো, -- গাড়িটা সেকেন্ডহ্যান্ড বলেই --

-- টাট্‌, টাট্‌, একেবারে নতুন গাড়িতেও ব্রেকডাউন হ'তে পারে। কিন্তু সেকেন্ডহ্যান্ড কেন?

-- আবার সেই কথা? দুহাজার টাকা এমন কিছু বেশী উপার্জন নাকি? তোমার ছেলেমেয়ে কটি?

-- দুটি ছেলে। আচ্ছা! একেই, মানে এই আলোকেই বলে নাকি?

-- কি?

-- ক'নে দেখা আলো?

একটু দূরে রাখা চেয়ারটায় বসলো মিসেস। বললো, -- আলোটা জ্বালবো? আচ্ছা এদের ক্যাশিয়ারকে যে বলবে -- অবশ্য আমি এ ব্যবস্থা করতে পারবো যে কোনদিনই ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এই পেট্রোল পাম্পে আসতে হবে না, অথবা ম্যাজিস্ট্রেট একাও আসবে না। সেটা করা আদৌ শক্ত নয় বুঝেছো। আর, দু'বছর পরে ম্যাজিস্ট্রেট বদলি হ'য়ে মিদনাপুর কিম্বা পুরুলিয়া যেতে পারে। অর্থাৎ পরে কোনদিনই --

নিটোল ক'রে সিগারেটটাকে পাকিয়ে নিলো লোকটি।

-- কিছুদিন আগে পিসিমা বলেছিলেন তাঁর বাড়ির কাছেই নিউ আলিপুরে জমি রেখেছো তোমরা।

-- বাড়ি হয়নি। আমি মনে করি কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংএ এখনি গিয়ে বসতে পারবে না ম্যাজিস্ট্রেট। এখনও অনেক জেলার সদরে ঘুরতে হবে তাকে। এদিকেও মুস্কিল, বাড়ির কায়দা অবিরত বদলাচ্ছে, পাঁচ বছরেই ডাহা সেকেলে হ'য়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের কলকাতায় বসবার সময় হ'তে হ'তে এখনকার তোলা বাড়ি অসহ্য রকমে আউট অব ডেট হবে না? মিসেস হাসলো। বললো, -- আলোটা জ্বালি? তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের মানুষ করার কথাও ভাবতে হবে। বারো বছরের ছেলে দেখে বলা যায় না কি হবে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে কবে ম্যাজিস্ট্রেট হয়? আর তা ছাড়া আজকাল ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরির চাইতে প্রাইভেট ফার্মের চাকরিগুলো ভালো।

গলার কাছে কি একটা জমে উঠেছিলো। সেখানে হাত রাখলো মিসেস।

লোকটি বললো, -- কিন্তু ওটা তো সান গ্লাস। আলো জ্বালাবার আগে খুলবে না।

মিসেস উঠে দাঁড়ালো। পায়ে পায়ে গিয়ে গোল টেবলটার পাশে দাঁড়ালো সে। টেবলের উপরে পিতলের বড় একটা টেবলল্যাম্প।

লোকটি উঠলো। বললো, -- বসো, আমি জ্বেলে দি।

· টেবল ল্যাম্পটাকে জ্বালালো লোকটি। ফিরে এসে ইজিচেয়ারে টান হ'লো আবার। উঠে বসলো। একটু ঝুঁকে প'ড়ে মিসেসের একখানা হাত নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিলো। ইজিচেয়ারটাকে বরং মিসেসের আসনের দিকে ঠেলে নিলো।

একটু ফিস্ ফিস্ ক'রে মিসেস বললো, -- রামভকত কি গাড়ি মেরামত করিয়ে এখনই ফিরতে পারবে?

আমি জানি না এদিকে অন্য কোন ভালো গ্যারাজ আছে কিনা; থাকলেও সেটা কোথায় এবং কতদূরে, অথবা তারা প্লিমাথ মেরামতের----

-- রামকে পাঠিয়ে দেয়া তা হ'লে বিনা কারণে হয়েছে?

-- অবাক লেগেছিলো। পরে ভেবে দেখলাম তুমি তো চিরদিনই সাহসী ছিলে।

-- আচ্ছা--

-- কি?

আলগোছে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো মিসেস। উঠে দাঁড়ালো। কিছু ভাবলো। এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মুখের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এলো। সানগ্লাসটাকে খুলে রাখলো টেবলের উপরে। চোখ নিচু ক'রে হেঁটে গিয়ে জানালার গোড়ায় দাঁড়ালো।

ইজিচেয়ার থেকে উঠলো লোকটি। পায়ে পায়ে গিয়ে মিসেসের পাশে পৌছালো। ফিরে দাঁড়ালো মিসেস। দুই হাত উঁচু ক'রে লোকটির ঘাড়ের পিছনে জড়ো করলো। লোকটির মাথাটা নুয়ে এলো। মিসেসের চোখে টেবলল্যাম্পের আলো পড়লো যেন ঝিক্‌মিক্ ক'রে। একপলক পরে হাতদুটি নামিয়ে নিলো সে।

অবান্তরভাবে বললো, - মৌচাকটা বোধ হয় এই জানালাটারই ঠিক নিচে। আর এই অবান্তর কথা বলার জন্যেই যেন অপ্রতিভ হ'য়ে হাসলো।

ঘরের মেঝেটা পার হ'লো মিসেস। ধূসর বেডকভারে ঢাকা খাটের একপাশে বসলো সে।

লোকটি জানালা থেকে স'রে এলো। পায়ে পায়ে সেও ঘরের মেঝেটা পার হ'লো। মিসেসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দুনিমেষ পরে ফিরে গিয়ে ইজিচেয়ারটাতেই বরং বসলো সামনের দিকে ঝুঁকে।

মিসেস বললো,--আচ্ছা--

-- কিছু বললে?

-- তোমার ছেলে দুটি কি ঠিক তোমারই মতো দেখতে?

লোকটি ভাবতে লাগলো।

মিসেস বললো, -- আমি কিছু দিতে চাই। যা অনেকদিন ধ'রে থাকে তোমার ছেলেদের সঙ্গে। আমার দেয়া এমন কিছু যা জড়িয়ে থাকে। একটা এনডাওমেন্ট। একটা প্রেজেন্ট।

লোকটা ইজিচেয়ার থেকে সামনের দেয়াল, দেয়াল থেকে ইজিচেয়ার অবধি চ'লে বেড়ালো। থেমে দাঁড়িয়ে কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলো।

-- রাত আটটা হ'লো। এই বললো।

মিসেস বললো, -- কি ক'রে সময় কাটে তা বোঝাই যায় না। তা ছাড়া এর আর কোন প্রতিকারই নেই, না? নাথিং ডুইং।

— যদিও এমন সুযোগ আর কখনই আসবে না।

-- বোধ হয় তাই। তোমার ছেলেরা ঠিক তোমার মতো হবে এমন কথা নেই।

ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলেরাও -- একটু থেমে আবার বললো মিসেস, — কিন্তু, আচ্ছা, আমি যদি আমার কোন মেয়ের নাম তোমার নামে মিলিয়ে রাখি?

-- রাখবে? একটু পরে লোকটি বললো আবার, — কিন্তু তাতেই বা কি লাভ?

-- লোভ হচ্ছিল। কিন্তু ছেলেমেয়েরা এক সময়ে নিজেদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের মধ্যে অন্য দুজনের যুক্ত-সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আঙুলের ডগায় সরু ক'রে আঁচল জড়ালো মিসেস। গালে হাত রাখলো যেন ভব রাখতে। আঁচল জড়ানো আঙুলটা চোখের পাশে ছুঁয়ে গেলো। মৃদু হেসে বললো, — নাথিং ডুইং কথাটা বেশ, নয়?

লোকটি বললো, -- কতদিন পরে বলো তো? প্রায় দশ বছর। ভাবা গিয়েছিলো? কিন্তু ওটা কি গাড়ির শব্দ না মৌমাছির?

লোকটি জানালার কাছে স'রে গেলো। তার অসংখ্য সিগারেটগুলোর আর একটাকে পাকাতে সুরু করলো। বললো, -- গাড়িই যে দেখছি। আগে প্রিমাউথ পিছনে জিপ্‌টা।

-- কেন? মিসেস বললো।

লোকটি ফিরে দাঁড়ালো। বললো, — এগারোটার মধ্যে সদরে পৌঁছে যেতে পারবে।

মিসেস জানালার কাছে স'রে এলো, পাশে দাঁড়ালো, বললো ,-- রামভকত আসবার আগেই কি নেমে যাওয়া দরকার?

-- তাই চলো।

পাশাপাশি চ'লে ঘরের মাঝখানে পৌঁছে তারা মুখোমুখী দাঁড়ালো। লোকটি হাত বাড়িয়ে মিসেসের কোমর বেষ্টন করলো। মিসেস মুখ তুললো, হাসলো অপ্রতিভের মতো, তার ঠোঁট দুটো ফুরফুর্ করলো।

ফিস্‌ফিস্ ক'রে মিসেস বললো, -- আর একটুও দেরি করা যায় না বোধ হয়, তাই নয়?

— তুমি আগে চলো, আমি তোমার সুটকেশ নিয়ে নামছি। টেবলের উপরে তোমার সানগ্লাসটা--

-- এর আর কোন প্রতিকারই নেই, তাই নয়?

লোকটি বললো, -- নাথিং ডুইং কথাটা তোমার একবার পছন্দ হয়েছিলো।

ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক ক'রে একটু হাঁপালো মিসেস। কিছু একটা বলতে গিয়ে সেটাকে গিলে ফেললো। তার গলার উপরে একটা ছোট ঢেউ খেলে গেলো।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মিসেস বললো, -- জানো নিউ আলিপুরে জমি কেনা আছে বটে, বাড়ি হ'য়ে উঠছে না।

লোকটি বললো ,-- ও তাই নাকি? ও তাই তো। তোমাদের সকলের শরীর ভালো যাচ্ছে তো? পিসিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো নাকি এর মধ্যে?

মিসেস বললো, -- তোমার সাতদিনের ছুটি কবে ফুরাবে? পিসিমা ভালো আছেন। এটা একটা রেলওয়ে ওয়েটিং রুমও হ'তে পারতো।

নিচে নামতেই প্লিমাউথও ঢুকলো পেট্রোল পাম্পে।

মিসেস বললো, -- গাড়িতো চলছেই দেখছি। তারপর একটু হেসে বললো, - এবার তোকে একটু মেকানিকের কাজ শিখে নিতে হবে রামভকত।

-- জি হুজুর।

প্রথমে প্লিমাউথ বেরুলো। বেশ মসৃণ দ্রুতগতিতেই। তখন একটা ম্যাটমেটে আলো দেখা দিচ্ছে। অন্ধকারটা হাল্কা হচ্ছে।

জিপটা অনুসরণ করলো। সেটা এখনও লাফাচ্ছে। কোন কোন গতি খাপছাড়া হ'য়ে থাকে। মেরামতে শোধরায় না। সব কিছুরই প্রতিকার থাকে না।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ২৮/ সংখ্যা ৪ : ১৩৭৩]

দুর্ঘটনা

মতি নন্দী

[জন্ম কলকাতায় ১৯৩২ সালে। নক্ষত্রের রাত, উপন্যাসের জন্য মানিক পুরস্কারে প্রথম হয়ে সাহিত্যের অংগনে প্রবেশ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: গল্প সংগ্রহ, দ্বাদশ ব্যক্তি, সাদা খাম, কোণি, ইত্যাদি।]

রাস্তা পার হয়েই সুকুমারের সঙ্গে দেখা। প্রায় ছ'বছর পর। অশোকও অবাক হল। হেসে এগিয়ে গিয়ে বলল — কেমন আছ।

ওদের দেখা চৌরঙ্গীর বাসস্টপে। সুকুমারের হাতে পোর্টফোলিও। পোশাকে সাহেব। চালচলন ভারিক্কি। মোটা গলায় সে উত্তর দিল, ভাল, করছ কি এখন?

— মাস্টারি. বলেই অশোক একটু অস্বস্তি বোধ করল। সুকুমার ঠিক কত মাইনে পাচ্ছে তা সে জানে না। ছ'বছর আগে ছিল সাড়ে তিনশো। এখন নিশ্চয় অনেক হয়েছে।

-- কেন, আর কিছু করবার মত পেলে না?

প্রশ্নটা শুকনো হাসিতে এড়িয়ে গিয়ে অশোক বলল, -- এখন বাসা কোথায় করেছ? বহুদিন পরে দেখা, না?

-- পাইকপাড়া। একটা ভাল ফ্ল্যাট দেখে দিতে পার?

— কেন? জায়গাটাতো ভাল।

— ভাল তো, কিন্তু বর্ষায় অসহ্য। দুশো পর্যন্তও দিতে পারি, সাউথে কিংবা তোমাদের ওদিকে যদি পাও তো --

-- একটা পরশু পর্যন্তও ছিল. আলিপুরে আমার পিসতুতো ভাইয়ের বাড়ী। দুশো পঁচিশে ভাড়া হয়ে গেল।

— দিন তিন-চার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হত।

সুকুমার হেসে উঠল।

-- ঠিকানাটা রেখে দাও, পেলেই খবর দিও। কুলোয় না আর, ছেলে দুটো যা দুরন্ত হয়েছে। একটু বড়ো জায়গা না হলে আর থাকা যাচ্ছে না।

সুকুমার ব্যাগ খুলে কার্ড এগিয়ে দিল। না দেখেই অশোক পকেটে রাখল। অন্যমনস্কের মত দুজনেই বাসের আনাগোনা, লোকেদের ওঠানামার দিকে তাকিয়ে থেকে এক সঙ্গেই পরস্পরকে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। অশোক বলতে যাচ্ছিল, আচ্ছা চলি এখন, একদিন যাব। আর সুকুমার বলতে যাচ্ছিল, সময় করে একদিন এস। না বলতে পারার অপ্রতিভতা এড়াতে সুকুমার বলল, — চল, বহুদিন পরে দেখা, কোথাও বসা যাক।

সঙ্গে সঙ্গে অশোক রাজী হয়ে গেল।

তারা চৌরঙ্গীর পূব ফুটপাথ ধরে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে সুরু করল। অশোক লক্ষ্য করল সুকুমার একটু মোটা হয়েছে, ফলে চলনটা যেন পরিশ্রান্ত মানুষের। সে ভাবল, ও নিশ্চয় খুব যত্নে রয়েছে। অতসী ভাল মেয়ে, স্বামীর সম্পর্কে উদাসীন হতেই পারে না। ভাল মেয়ে বললে সব বলা হয় না, রূপে গুণে, স্বভাবে --। অশোক হাতড়াতে শুরু করল কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

সুকুমার একটা বইয়ের দোকানের সামনে থেমে পড়ল। বেছে বেছে একটা কিনল। দামে সস্তা, মলাটে পুরুষদের উস্কানী দেওয়া ছবি।

-- আজকাল এইগুলোই পড়ি, বেশ লাগে। পোর্টফোলিওর মধ্যে বইটা ভরে নিল। চলতে চলতে সুকুমার বলল, -- কলেজে ঢুকে এই ধরনের বই পড়তাম। তখন বেশ লাগত, মাঝে লাগত না, এখন লাগে। ওই মাঝামাঝি সময়টাতেই অতসীর সঙ্গে আলাপ। আগে বা পরে হলে হত না, সিরিয়াস মানুষদের তখন সহ্যই করতে পারতুম না।

-- তুমি কি এখনো আগের মতই সিরিয়াস রয়ে গেছ?

-- জবাব দিতে গিয়ে অশোক থ হয়ে গেল। সুকুমার এ কোথায় তাকে নিয়ে ঢুকেছে! এতটুকু হয়ে সুকুমারকে অনুসরণ করে একটা চেয়ারে বসল। পাশের টেবিলে তিনটি মেয়ে। অশোক প্রাণপণে সিধে তাকিয়ে ভাবল, সুকুমার অধঃপাতে গেছে।

-- তুমি কি খাবে?

-- কিছু না।

-- অন্ততঃ দু ঢোঁক।

অশোক মাথা নাড়ল না, সেলাম দিয়ে বেয়ারা হাসল। সুকুমারও হাসল।

-- ও জানে আমি কি খাই। প্রায়ই আসি। তবে অন্য কিছু ভেব না, শুধু খেতেই আসি। মেয়েদের সম্পর্কে আমি এখনো সিরিয়াস, ওঃ তখন তো তুমি কথাটার জবাব দিলে না।

-- কি আর দোব, আমি আগের মতই রয়ে গেছি। রোজগার তো আর বাড়েনি যে বদলে যাব।

-- প্লিজ, প্লিজ, রাগ কোর না, ও ধরনের কিছু বলতে চাইনি। আমিও সিরিয়াস হতে চাই। রোজগার বাড়লেই মানুষ বদলায় এসব তোমার মাথায় কে ঢোকাল, কমলেও তো বদলায়। তার মানে তুমি এক জায়গাতেই রয়ে গেছ?

অশোক কথা বলল না। বেয়ারা গ্লাস বোতল নিয়ে হাজির হয়েছে।

-- কিছু একটা খাও অন্তত, বাবুর জন্য ভিমটো লাও।

বেয়ারা মাথা নোয়ালো। অশোক ভাবল কথাটা। এক জায়গায় সে নিশ্চয় নেই। কিছু একটার সঙ্গে তুলনা করলে টের পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কার সঙ্গে করবে? সুকুমার ত বদলেছে, সুতরাং তুলনা করে বোঝা যাবে না। অতসী, সেও কি? যদি আগের মতই রয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ওর পাশে নিজেকে দাঁড় করিয়ে বোঝা যেতে পারে। বাড়ীর কেউ, মা, বোনেরা -- এদের লক্ষ্য করেও তো টের পাওয়া যেতে পারে। নাকি ওরাও বদলেছে। কিন্তু আমি তো টের পাই না।

-- ভাবছ কি, খাও। মাস্টারি করে চলছে কেমন? বিয়ে-থাতো করনি নিশ্চয়।

অশোক মাথা নাড়ল, না।

— করবে নিশ্চয়। রোজগারপাতি বাড়াও।

অশোক গ্লাসের কানায় আঙুল বোলাতে বোলাতে চিন্তিত সুরে বলল — ভাবছি একটা কোচিং খুলব। চেষ্টাচরিত্তির করলে শ' পাঁচেক টাকা আয় বাড়ানো যেতে পারে।

— গ্র্যান্ড! সুরু করে দাও। তারপর বিয়ে করে ফেল। টাকা লাগলে বল, হাজার খানেক পর্যন্ত ধার দিতে পারি। চাকরি বড় বিশ্রী জিনিস, স্বাধীন কিছু একটা রোজগারের ব্যবস্থা থাকা অনেক ভাল। পারি না আর।

অশোকের কষ্ট হল সুকুমারের জন্য। এ লোকটাও সুখী নয়।

— বুঝলে অশোক, আমি বৌকে ভালবাসি। অতসীকে তুমি তো জানই, ভালবাসার মত মেয়ে নয়? বল তাই নয়?

মাতাল হচ্ছে বোধ হয়। অশোক অসুবিধা বোধ করতে শুরু করল। তবে পথে-ঘাটের মাতালদের মত নয়। কথাগুলোই যা অস্বাভাবিক। তা নয়ত বৌকে ভালবাসার মধ্যে নতুনত্বের কি আছে!

-- ওকে সুখে রাখার জন্য কি না করেছি, মুখের রক্ত তুলে খেটে চলেছি। অথচ জান, ও কিন্তু আমায় ভালবাসে না।

সুকুমার এক চুমুকে গ্লাস শেষ করল।

-- আর নয় আমাব কাজ আছে। হঠাৎ যেন সুকুমার বদলে গেল। মাতাল বোঝবার মত একফোঁটা চিহ্নও চোখেমুখে নেই। অশোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। প্রতিদিন বাড়িতে ঢোকার সময় সে এ জাতীয় কষ্টে ভোগে। ভীতু চোখে সবাই তাকায়, সংসারের একমাত্র রোজগেরে, সবাই তাকে তুষ্ট করতে ব্যস্ত। ওরা যত ব্যস্ত হয় ততই অশোকের কষ্টটা বাড়ে। ভয়ও হয়, এদের ভবিষ্যতকে জীইয়ে রাখার সামর্থ্য তার কতটুকুই বা। বর্তমানেই বা কতটুকু পারছে।

বেয়াবার লম্বা সেলাম পেছনে ফেলে ওরা বেরোল। সন্ধ্যা নেমেছে প্রায়। কলকাতার এই অংশটি ফুরফুরে হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

-- আমি চলি। দেখা করতে হবে একজনের সঙ্গে। ভাল কথা, ইন্সিওর করেছ?

-- পাগল, প্রিমিয়াম দেবার টাকা কোথায়।

-- তা বটে, তবু করে বাখা ভাল, এ শহরকে তো বিশ্বাস নেই। আর করলে আমায় খবর দিও কিন্তু।

লম্বা পা ফেলে সুকুমার এগিয়ে গেল। টলছে না। ক্লান্তও দেখাচ্ছে না। অশোক নিজের হাঁটাটাই ক্লান্তিকর বোধ করল। এবার টিউশনী তারপর বাড়ি, দুটো বোন আর মা। আধময়লা জামাকাপড়ের গন্ধ, আরশোলা ওড়ার শব্দ। ওরা কেউ এমন কথা বলবে না যাতে একটু হাসা যায়, বা দুটো হাসির কথা বলা যায়। এমন কোন পরিস্থিতি তৈরী হবে না যাতে মনে হবে আমি সকলের ভালবাসার পাত্র। ফিসফিস করে ওরা ঝগড়া করবে কিংবা নিজেদের মধ্যেই হাসাহাসি

করবে। তবু ওদের কথাই দিনরাত ভাবতে হয়। অশোক ভাবল ওরা আমার থেকেও অসহায় তাই ওদের ভালবাসি হয়তো। সুকুমার বিয়ে করেই বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে গেল। আমিও পারি একটা বিয়ে করে আলাদা হতে। অশোক বোধ হয় বিয়ের কথা ভাবল বছর পাঁচেক পরে। পাঁচ বছর আগে মা একবার বিয়ের কথাটা তুলেছিল। দূর সম্পর্কের এক অফিসার দাদা তখন বলেছিল, চেষ্টা করব। উচিত ছিল বড় মেয়ের বিয়ের কথা বলা, তা না বলে ছেলের বিয়ের কথা তুলেছিল। অশোকের কাছে তখন আশ্চর্যের ঠেকেছিল।

চৌরঙ্গীতে পৌঁছেই একটা দমকা বাতাসের ঝাপটা খেল অশোক। ভাল লাগল। অন্ধকার ময়দানের দিকে তাকাল। তাকিয়ে ইচ্ছে করল মাঠে ঘুরে আসতে। রাস্তা পার হবার জন্য ডানদিকে তাকাতেই দেখল দূরে কি যেন একটা হয়েছে। ছুটে ছুটে মানুষ জড়ো হচ্ছে রাস্তার মধ্যে। একটা ডবল ডেকার বাস দাঁড়িয়ে।

অশোক কৌতূহলী হল। একটু জোরে হেঁটে ভীড়ের কাছে পৌঁছল। যা প্রথমে ভেবেছিলো, তাই-ই ঘটেছে। একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, -- কি করে চাপা পড়ল?

-- যা করে পড়ে। চলন্ত বাসে উঠতে যাচ্ছিল. পিছলে পডল। পেছনেব বাসটা ব্রেক কষার সময়ও পেলে না।

একজন বলল, -- আহা এই বাজারে একটা লোকের মরা মানে যে কি সর্বনাশ হয়ে যাওয়া।

শুনে বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে গেল অশোকের। যদি সে নিজে বাসের তলায় যেত। বাড়ির তিনটি প্রাণীর অবস্থা তা হলে কি হত।

-- একদম মরে গেছে কি?

-- একদম সঙ্গে সঙ্গে।

অশোকের ইচ্ছে করল একটুখানি দেখে। ভীড় ঠেলে গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁকি দিল। একি! থরথর করে কাঁপল সে। সন্দেহ নেই কোন। ব্যাগটা পুলিসের জিম্মায, দেখেই সে চিনল। ভয় তাকে কোণঠাসা করে ফুটপাথের কিনারে হাজির করল। কাঁপুনি থামেনি। এখন সে কি করবে? ইচ্ছে করছে ছুটে পালাতে, কিন্তু তা নয় কিছু একটা করা উচিত। যে চাপা পড়েছে এ তার বন্ধু একথা বললে কোন লাভ নেই। সুকুমারকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে। কিন্তু সেও অনর্থক, কারণ ও তো মরেই গেছে। তবু কিছু একটা কবা দরকার। একটা লোককে দেখে অশোকের মনে হল অনেকগুলি সন্তানের পিতা, স্বল্প আয় করে কিন্তু টাকা জমায়। লোকটিকে সে জিজ্ঞাসা করল, -- যে চাপা পড়ল তার সঙ্গী কেউ ছিল না?

-- কি জানি মশাই, থাকলে তো দেখতেই পাওয়া যাবে।

-- তা বটে তবে থেকেই বা আর কি করত, করার মত কিছু তো নেই।

-- তবু বাড়িতে তাড়াতাড়ি খবরটা পৌঁছত।

বাড়িতে খবর দেওয়া। অতসীকে খবর দেওয়া। তাড়াতাড়ি কার্ডটা বার করে অশোক ঠিকানা পড়ল। ছুটলো বাস স্টপের দিকে। ২বি বাস ছেড়ে যাচ্ছে। বেপরোয়ার মত লাফিয়ে উঠে পড়ল।

বাসে উঠেই মনে হল এভাবে লাফিয়ে ওঠাটা তার উচিত হয়নি। বহু লোক এই ভাবেই

মারা গেছে। মৃত্যুর কথা ভেবে অশোক প্রাণপণে হ্যান্ডেল আঁকড়ে রইল। ফলে দোতলায় উঠতে অসুবিধা হওয়ায় দু'চারজন বিরক্তি প্রকাশ করল। রেগে উঠল অশোক। ঠেলেঠুলে দোতলায় উঠল। বসার জায়গাটাও কিছুটা অভদ্রের মতই জোগাড় করে নিল।

বসার পরই সে ভাবল খবরটা কি ভাবে অতসীকে দেওয়া যায়। শোনা আছে, আনন্দের খবর, লটারিতে বহু টাকা পাওয়া বা চাকরি পাওয়ার মত খবরগুলো গ্রহণের প্রস্তুতি হিসাবে মনকে প্রথমে দুঃখিত করে দিতে হয়। ধাক্কা সামলাবার জন্যই এর দরকার, নয়তো আনন্দে কেউ কেউ মারাও গেছে নাকি। অতসীও মরে যেতে পারে। সুতরাং ওকে প্রথমে আনন্দিত করে তারপর দুঃখের খবরটা দিতে হবে। কী বীভৎস কাজ। অসম্ভব! প্রায় ছ'বছর পরে এই রকম এক খবর নিয়ে কারো সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে না।

নেমে যাবার কথা অশোক ভাবল। কিন্তু মাঝ পথে নেমে কি লাভ! বহুদিন পরে বাসে বসবার জায়গা পাওয়া গেছে, এক্ষুণি ছেড়ে উঠতে তাই আলসেমি ধরল। বাড়ির কাছাকাছি এলে বরং নামা যাবে। অশোক যা ভাবল তা করল না। পাইকপাড়া পর্যন্তই টিকিট কাটল। এতদিন পরে অতসী কেমন দেখতে হয়েছে, তাই জানবার লোভটুকু ইতিমধ্যে প্রবল হতে শুরু করেছে।

বাস থেকে নেমে ঠিকানা অনুযায়ী বাড়ি খুঁজে নিতে অশোকের দেরী হল না। তিনতলা বাড়ি। দোতলা থেকে বিনিয়ে কান্নার শব্দ আসছে। কড়া না নেড়ে অশোক রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে থাকল। খবর পেয়ে গেছে তাহলে। নিশ্চয় অতসীই কাঁদছে। অপ্রিয় দায়িত্বের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে ভেবে অশোক খানিকটা নিজেকে হালকা বোধ করল। এখন তো চলেও যাওয়া যায়। কিন্তু এতটা পথ এসে এবং ছ'বছর পরে এসে চলে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। তাছাড়া অনেক কিছু করবার মত কাজও রয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেওয়া, হাসপাতালে যাওয়া, সেখান থেকে শ্মশানে। তারপরের দায় অবশ্য অতসীর ভাইয়েদের। বিধবা বোনকে নিশ্চয় তারা ফেলে দেবে না। শ্বশুর-বাড়ির অবস্থা ভাল নয়, সম্পর্কও ভাল নয়। আলাদা হওয়াতে সুকুমারের মা বা ভাইয়েরা খুশী হয়নি।

বাড়ির মধ্য থেকে এক বিধবা বুড়ি বেরিয়ে এল। অশোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল,— কাকে খুঁজছেন।

মুখে আসছিল সুকুমারের নাম, সামলে নিয়ে অশোক ফিসফিস করে বলল, — অতসী কি ওপরে?

-- ওপরে কেন, ওরা তো নিচের ভাড়াটে।

— তবে কাঁদছে কে?

-- সে তো বাড়িওলা গিন্নী, ও হপ্তায় খবর এসেছে মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে জলে ডুবে মরেছে।

— অতসী কোথায়?

— ছেলেদের নিয়ে পার্কে বেড়াতে বেরিয়েছে।

অশোকের পায়ের নিচে মাটি কেঁপে উঠল। ইচ্ছে করছে ছুটে পালাতে। কিন্তু ছুটতে গেলেই পড়ে যাবে, পা ভীষণ ভাবে কাঁপছে। খবরটা তা হলে তাকেই দিতে হবে। হায়

ভগবান এই বিনিয়ে কান্নাটা কেন অতসীর হল না। কেন তার সঙ্গেই আজ সুকুমারের দেখা হল, কেন দুর্ঘটনা দেখতে সে এগিয়ে গেল। অমন তো রোজই কতকগুলি মানুষ বাস-চাপা যাচ্ছে, কই তাদের বাড়িতে খবর দেবার জন্য তো তার মাথা ব্যথা হয় না।

অশোক একটু একটু করে নিজের উপর রেগে উঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নিচের মাটিও শান্ত হয়ে গেল। এসেছে যখন খবরটা দিয়েই যাবে। রাস্তার লোকের মতই নিরাসক্ত ভাবে খবরটা দেবে। সুকুমার যে বাসে চাপা পড়েছে, সেটা যখন অন্য লোকেই চালাচ্ছিল, তখন ভয় পাবার কি আছে। সুকুমার নিজের দোষেই মরেছে। মদ খেয়ে চলন্ত বাসে উঠতে গেছ্‌ল, কেউ তাকে অমন করে উঠতে বলে নি, কাজেই নির্ভয়ে খবরটা দেওয়া যায়।

ভাবতে ভাবতে অশোক একটু জোরে হেঁটেই পার্কে পৌছল। খুব ছোট পার্ক নয়, মাঝে মস্ত পুকুর। অনেক লোকের ভীড়। খেলাধূলোর পাট সাঙ্গ করে দামালরা ঘরে ফিরে গেছে। শান্তিপ্রিয় বয়স্করা এখন জিরোতে এসেছে। এ পার্কে অশোক অনেকবার এসেছে। বহুদিন আগে অতসীর সঙ্গেই একবার এসেছিল।

খুঁজে বার করতে হবে। কোন দিক থেকে শুরু করবে ভাববার জন্য অশোক দাঁড়াল। ঘাসের উপর বসা দুটি কিশোর আই.এ.এস. পরীক্ষার দুরূহ বিষয় নিয়ে আলোচনায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, বেঞ্চে বসা বৃদ্ধদের মধ্যে কেউ হেসে উঠল, ঝালমুড়িওয়ালার কাছ থেকে এক যুবতী কাঁচা লঙ্কা নিল, ওপর থেকে পিঠে কি যেন পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে অশোক জামাটা টেনে তুলে দেখল। বিরক্তিতে কিশ্‌কিশ্‌ করে উঠল দাঁত। আর তো তিনদিন জামাটা পরার কথা। একটা কাঠির জন্য নিচু হয়ে খুঁজতে খুঁজতে মনে পড়ল পকেটে দেশলাই আছে।

ঝেড়ে ফেলেও দাগটা রয়ে গেল। বিরক্তিতে মন বিষিয়ে গেল। এখন অতসীকে খুঁজে বার করতে হবে। দুপাশে চোখ রেখে সে পুকুর ধার দিয়ে এগোল। সামান্য যেতেই মনে হল দুটি ছেলে নিয়ে যে মহিলাটি চিনেবাদাম খাচ্ছে, সেই অতসী। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য লক্ষ্য করতে লাগল। শরীরটা ভারী হয়েছে মাত্র, নয় তো মাথা নোয়ালে ঘাড়ের কাছে শিরদাঁড়াটা আগের মতই ঠেলে ওঠে, চিবোবার সময় রগের কাছটা সেইরকমই দপদপ করে, ঝুরো চুল তুলে নেবার জন্য সেই ভাবেই আঙুলগুলো বেঁকে যায়।

প্রথম কথা অতসীই বলল।

— তাই বলি কে এমন ভাবে এতক্ষণ ধরে তাকাচ্ছে!

-- চিনতে পেরেছিলে?

-- একটু একটু ;খুব বেশি বদলাওনি দেখছি।

-- চিনেছিলে যদি ডাকলে না কেন?

— ছ'বছরেও যে মানুষের টিকি দেখা গেল না, তাকে কেন যেচে ডাকতে যাব?

-- না ডাকতে পার কিন্তু বসতে বলতেও তো পার।

-- অনুমতির দরকার আছে নাকি, এটা তো পার্ক।

— বিনা অনুমতিতে বসা যায়, কিন্তু কারুর সঙ্গে তো বসা যায় না।

অশোক গুছিয়ে বসল। অতসীর ছেলে দুটি অবাক হয়ে দেখছে। বড়টি মার কানে কানে কথা বলল। অতসী তাকে বোঝাল -- মামা হয়, বুড়ো মামা, নাড়ু মামা যেমন আছে না,

তেমনি অশোক মামা হয়।

বাদাম ভাঙতে ভাঙতে অশোক বলল, রোজই আস নাকি।

-- নাঃ, তবে মাঝে মাঝে আসি। বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারছি না, বাড়িওয়ালার মেয়ে মরেছে জলে ডুবে, আজ দশদিন ধরে কান্নার বিরাম নেই। উঠতে বসতে খেতে শুতে একটা স্বর খালি তাড়া করে চলেছে। এমন একঘেঁয়ে লাগে না --

একঘেঁয়ে শব্দটাকে অতসী একটু বেশি টেনে ধরেছিল। অশোক ওর মুখের দিকে তাকাতে বাধ্য হল।

-- এই ভাবে মরাটা ভারী বিশ্রী, অবশ্য সব মরাই বিশ্রী তবু এমনি মরা আর অপঘাতে মরার তফাৎ আছে। আছে না?

মরা কথাটা অশোককে বার বার আঘাত করল।

দাঁতের ফাঁকে চিবুনো বাদাম আটকে গেছে। জিব দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে বলল,

-- সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

-- কবে, আজ?

-- বাসা বদলাতে চায়, কেন এ জায়গাটা তো ভালই।

-- আমি দরকার মনে করি না, এটা ওর বাতিক, এই নিয়ে তিনবার বদলানো হয়েছে। বাসায় ফেরার পথে ওর এখানে ফেরবার কথা আছে, আমরা একসঙ্গে ফিরব। কটা বাজে?

-- ঘড়ি নেই।

-- ছিল তো।

-- গ্যাছে।

অতসী যেন আহত হল। একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, -- সেই বাসাতেই আছ?

-- হ্যাঁ।

-- বোনেদের বিয়ে হয়েছে?

-- না।

-- করছ কি?

-- মাস্টারী।

-- বিয়ে করবে না?

-- একটা চাকুরে কাউকে বিয়ে কর, সুবিধে হবে। আমার মত লেখাপড়া জানা অকর্মাকে কোর না।

-- কেন তুমি খারাপ হলে কিসে?

-- নয়? শুধু তো খরচ করছি, নিজে রোজগার তো করতে পারি না।

-- সুকুমার বলছিল ও তোমায় ভীষণ ভালবাসে।

-- ও আমার জন্য খুব খাটে। অমন করে আর কাউকে কিন্তু খাটতে দেখলাম না।

-- কজনকে তুমি দেখেছ?

-- অতসী তাকিয়ে রইল। গলার স্বরটা মোচড়ান, তেতো। অশোক বুঝতে পেরে লজ্জা

পেল। ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, -- ভাল না বাসলে খাটা যায় না, সে মানুষ বা কাজ যাকেই হোক না কেন।

-- অতসী চুপ রইল। অশোক ভাবল, এ সব কথা সে কেন বলতে গেল, যে কথাটা বলার, তাই তো বলার উপায় থাকছে না। একটা আনন্দিত পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

— যাকগে ওসব কথা, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আর দেখা হয়?

অতসী গম্ভীর হয়ে থাকল।

— মিনতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মেদিনীপুরে ওর স্বামী বদলি হয়েছে। তোমার মতই মোটা হয়েছে। বিয়ে করলে কি মোটা হয়? সুকুমার পর্যন্ত হয়েছে।

অতসী মুখ ফিরিয়ে জলের দিকে তাকাল। ছেলেদুটি ভীষণ লক্ষ্মী, ছোটাছুটি না করে ঢিল ছোঁড়ার খেলায় ব্যস্ত। বেড়ানো মানুষগুলি আলগোছে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। অতসীর ভারী-চেহারা দুটি ছেলে সঙ্গে থাকার জন্য অশোক স্বস্তিবোধ করল। ওরা কেউ তাদের প্রেমিক-প্রেমিকা ভাবছে না, স্বামী-স্ত্রী ভাবতে পারে তা ভাবুক। অশোক কনুয়ে ভর দিয়ে ঘাসে শরীর বিছিয়ে হাল্কা সুরে বলল, — এত ভাবছ কি? গম্ভীর হয়ে থেকে যদি আমার অস্বস্তির কারণ হও তাহলে বরং আমার চলে যাওয়াই উচিত।

ছেলেদুটি পুকুরের কাছাকাছি চলে গেছে। অতসী ডাকল। বাধ্যের মত ওরা কাছে এল। জলের দিকে না গিয়ে ওদের খেলতে বলল অতসী।

— সুকুমার বলছিল ওরা খুব দুষ্টু।

— সুকুমার ওদের খুব ভালবাসে।

তোমাকেও।

অতসী হাসল। অশোক মন দিয়ে লক্ষ্য করল। হাসলে আগের মত টোল পড়ে না, মাংস জমেছে।

— সুকুমারের কিন্তু একটা বদ অভ্যাস হয়েছে দেখলুম।

— হ্যাঁ, তবে মাত্রা ছাড়ায় না। আমিও কিছু বলি না। কি হবে বলে, ওইতে আনন্দ পায়, তা থেকে কেন বঞ্চিত করব।

— তোমার ভয় করে না?

— কিসের?

অশোক চুপ করে রইল। একটা ঝোপকে মাঝে রেখে ছেলে দুটি লুকোচুরি খেলছে। তাই দেখতে সে ব্যস্ত হল।

-- কিসের ভয়?

-- যদি মাত্রা ছাড়ায়?

— নাঃ, তাতে ভয় পাবার কি আছে। ওসব ভয়েটয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

— যদি কাজের ক্ষতি হয়, চাকরী চলে যায়?

— যদি তাই হয়, তাহলে আমাকেও কাজ খুঁজতে হবে। বিয়ের আগে স্বামী পুত্র সংসার ইত্যাদির চমৎকার একটা ধারণা করেছিলাম, বিয়ের পরও কিছুদিন ছিল। এখন আর ওসব

ভাল লাগে না। কেমন যেন নীচু নীচু বোধ করি সব সময়। কিছু একটা না করা ভীষণ লজ্জার ব্যাপার।

-- এতে সুকুমার আপত্তি করবে না?

-- করবে। ওইত আমার কাজের প্রধান বাধা, নয়ত এই পাড়াতেই মেয়েদের স্কুলে একটা কাজ পেয়েছিলাম।

-- সুকুমার যদি বাধা না দেয়, ধর সে হয়ত নিরুদ্দেশ হয়ে গেল বা পাগল হয়ে গেল--

উঠে বসল অশোক। ছেলে দুটির আর খেলাও ভাল লাগছে না। মায়ের কোলে আর পিঠে দুটিতে ঠাঁই নিয়েছে। অতসী ঝুঁকে পড়ল। কোলেরটির চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলল -- তুমি কি বলছ বুঝছি না। সুকুমার পাগল বা নিরুদ্দেশ হতে যাবে কেন?

-- সঠিক তা নয়, মানে ধর ওর অস্তিত্ব তুমি ভুলে যেতেও ত পার।

-- পাগল, তাই হয় কখনো। অত সহজেই ভোলা যায় নাকি?

ছেলেদুটি বায়না ধরেছে বাড়ি যাবার। অতসী উঠে দাঁড়াল। অশোক উঠল না।

-- আমার এবার বাড়ি যেতে হবে, তুমিও চলো।

-- আর একটু থাক। কি হবে এখনি গিয়ে, বসে বসে তো কান্না শুনবে।

-- এদের বসতে ভাল লাগছে না, বরং একটা চক্কোর দি।

পুকুব ধাবেব রাস্তা দিয়ে ওরা হাঁটতে শুরু করল। আলো কম রাস্তা অসমান। অশোক একটি ছেলের হাত ধরল। অন্যটিকে অতসী কোলে তুলে নিল। দূরে কোথায় কালী-কীর্তন হচ্ছে। পার্কের পাশ দিয়ে ঝড়ের মত বাস ছুটে চলেছে। অন্ধকার বেঞ্চে বসা একজোড়া ছেলেমেয়ের পাশ দিয়ে ওরা হেঁটে গেল। বাতাসে জলাঘাসের গন্ধ। পুকুরের মধ্যে একটা দ্বীপ, সেখানে কিছু গাছপালা। দ্বীপটায় অন্ধকার ঝোপ হয়ে রয়েছে। পার্কের বাতিগুলোর রশ্মি জলেব উপব বিছানো আঙুলের মত অন্ধকার ধরার জন্য পাতা। উত্তেজনায় মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। হোঁচট খেয়ে অতসী টলে পড়ছিল, কোন রকমে সামলে নিল। ছেলেটিকে কোল থেকে নামাতে চাইল। ছেলে গলা জড়িয়ে গোঁ ধরল, নামবে না।

-- না নামলে, যদি পড়ি তো, দুজনেই পুকুরে গিয়ে পড়ব, নামো লক্ষ্মী ছেলে, নামো।

কেঁদে উঠল ছেলে, অশোক তাকে কোলে নেবার জন্য হাত বাড়াতেই অতসী বেঁকে দাঁড়াল।

-- থাক।

ওরা আবার হাঁটতে সুরু করল। সাবধানে আস্তে আস্তে। অতসীর গলায় মুখ গুঁজে ছেলেটি কাঁদছে। জলা গন্ধ। আর একজোড়া নারী পুরুষ ঘাসেব উপর। অশোকের হাতটা প্রাণপণে আঁকড়ে বড় ছেলেটি হাঁটছে। মাঝে মাঝে গায়ে লেপটে আসছে। অশোক ওর চুলে হাত দিল।

- পুকুরটা বেশ বড় তো! অনেকক্ষণ হাঁটছি।

- কোলে বোঝা নিয়ে হাঁটতে বিশ্রী লাগছে।

অশোক হাসিটা বোঝাবার জন্য মুখে শব্দ করল। তারপর বলল, -- একা হাঁটতে সব

সময়েই ভাল লাগে, বোঝা নয় এমন কাউকে নিয়ে হাঁটতে আরো ভাল লাগে যেমন তোমার সঙ্গে এখন ভাল লাগছে।

— সুকুমার আমায় নিয়ে বেরোতে চায় না। আগে বেরোত।

— কেন চায় না?

— জানি না।

মনে হয় সামনেটা যেন ঢালু। অশোক ছেলেটির হাত শক্ত করে ধরল।

-- সুকুমারকে খুব ক্লান্ত মনে হয়েছিল। অতসী চুপ রইল।

-- তোমারও কি ক্লান্ত লাগে? অতসী চুপ।

— কথা বল, অশোক চাপা সুরে প্রায় ধমকে উঠল।

— ভাল লাগছে না কথা বলতে।

— তখন থেকে শুনছি ভাল লাগে না, আর ভাল লাগে না। কি ভাল লাগে তবে?

— তা যদি জানতুম? অদ্ভুত একঘেঁয়েমির মধ্যে পড়ে গেছি যেন। যা হোক একটা কিছু এসে যদি নাড়া দিয়ে যায়, প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

অশোক এতক্ষণে অতসীর চোখ দেখতে পেল। আলোর মধ্যে ওরা এসে পড়েছে। রাস্তাটা সমান। ছেলেটি হাত ছেড়ে হাঁটতে শুরু করল। আলোর নীচে তাস খেলছে বৃদ্ধরা, যুবকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করছে। অতসীর চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। ছেলেকে অনেকক্ষণ কোলে নিয়ে আছে, নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে।

— ওকে নামিয়ে দাও বরং।

শোনা মাত্রই ছেলেটি গলা আঁকড়ে ধরল। অতসী টলে উঠল একবার। কোন রকমে ঘাড়টাকে ঘুরিয়ে অশোকের দিকে তাকাল, হাসলও করুণভাবে। ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল অশোকের মাথা। অতটুকু ছেলের এত জেদ কেন? দুহাতে ছেলেটির কাঁধ ধরে সে টানল।

-- থাক অশোক। ওকে জান না, ও কিছুতেই ছাড়বে না।

অশোক এবার রীতিমত জোর দিল। ছেলের হাতের চাপে লাল হয়ে উঠল অতসীর মুখ। দম আটকে গেছে। প্রাণপণে মাথা ঝাঁকালো। হাত দিয়ে নিজের গলা ছাড়াতে গিয়ে সে হঠাৎ অশোককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

পিছিয়ে এল অশোক। অতসী হাঁপাচ্ছে। ছেলেটি বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে চলেছে। বাতাসে জলাগন্ধ। বৃদ্ধরা তাস খেলছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অতসী স্বাভাবিক হয়ে উঠল। আবার চলতে শুরু করল। অশোক নিজেকে বিস্বাদ বোধ করল। ক্লান্ত লাগছে।

-- অতসী একটু আস্তে হাঁটো, একটা খবর আছে।

অতসী গতি কমাল না। অশোক যেন আরও পিছিয়ে পড়েছে।

-- অতসী আস্তে হাঁটো, একটা ভাল খবর আছে। তোমাকে সেই কথাটা বলার জন্যই এসেছি, আমি শিগ্গিরই বিয়ে করছি।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ২৯/ সংখ্যা ১: ১৩৭৪]

জন্ম বেজন্ম

অসীম রায়

[জন্ম ১৯২৭ সালে। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। বিষয় নির্বাচন ও প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতা তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ফুটপাথের গল্প, একালের কথা, দ্বিতীয় জন্ম, রক্তের হাওয়া, ইত্যাদি। মৃত্যু: ১৯৮৬ সালে।]

মর্গ আর প্রসূতিসদন পাশাপাশি এ হাসপাতালে। ঠিক পাশাপাশি নয়, মাঝখানে একটা লন যেখানে এই শীতের সন্ধ্যে শুরু হতেই নিয়ম আলো জ্বালানো। আর সে আলোয় ঝকমকে ফুলন্ত ডালিয়ার এক হৃদয়হীন রাক্ষুসে সৌন্দর্য। এ সৌন্দর্যের চুম্বক-আকর্ষণ এমন তীব্র যে এমার্জেন্সি ও দুরারোগ্য পীড়াবিভাগ থেকে আনীত স্ট্রেচারে ঢাকা শবের পাশাপাশি ওয়ার্ডবয়দের অভ্যস্ত চোখও সেই নৈর্ব্যক্তিক শোভার দিকে এক নজর চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয়;আর সদ্যোজাত শিশুদের কান্না শোনবার জন্যে পিপাসু কান নিয়ে যাঁরা সমাগত তাঁরাও সেদিকে চেয়ে চেয়ে তাঁদের ভাঙা জীবনের নৈরাশ্যের মাঝখানে কোন আদি-ভৌতিক আয়েসঘরের স্বপ্ন দেখেন।

বিকেল থেকেই যে লোকটা জন্তুর মতো ভ্রূক্ষেপহীন মমতায় তাঁর পাট-জোয়ান স্থূলাঙ্গী স্ত্রীর হাতখানা জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন তিনি হঠাৎ সরব হয়ে ওঠেন, 'মনু, আমাকে একটা কিছু দাও, একটা কিছু। আমি ছেলেই চাচ্ছি না, মেয়ে হলেও চলবে।'

ভদ্রলোক এককালে নিশ্চয় বিকচ ছিলেন কিন্তু এখন সামনের দিকে দুতিনগাছা কচা অবশিষ্ট মাত্র। মস্ত বড় টাকে, টাই-হীন গায়ের সঙ্গে লেবড়ে থাকা নীল সার্জের স্যুটে, সিল্কের শার্ট আর সোনার বোতামে, চিবুকের মোটা ভাঁজে, ভাবগম্ভীর গলায় যে আত্মপ্রতিষ্ঠার নিরেট আস্তর তা এই আকস্মিক কাতরতাব ছুরিতে ফালা ফালা হয়ে যায়।

-- এখনও নড়ছে, এইখানে, এইখানে হাত দাও। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর হাতখানা চাদরের মাঝখান দিয়ে তাঁর তলপেটে রাখেন।

উৎসুক বালক যেমন চকোলেটের লোভে উদগ্রীব তেমনি এক গভীর আকাঙক্ষায় স্ত্রীর তলপেটে হাত রাখেন। গরম চামড়ার মৃদু লোমশ স্পর্শে ভদ্রলোকের উৎসাহ বাড়ে না, বরং এক ক্লান্ত রুটিনের অনিবর্তনীয় নির্দেশে তাঁর মোটা আঙুলগুলো সমস্ত পেটখানা বেড় দিয়ে ঘুরে আসে। তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাসে কথা উঠে আসে, --- কি জানি! গতবারও তো ঠিক এইরকম!

-- না না, গতবার তো এর অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল। এবার এখনও আছে। এবার মনে হচ্ছে থাকবে।

ভদ্রমহিলার গলা আশ্চর্য মদালসা। এ যেন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের

নায়িকার গলা, এমন কাটা কাটা ছোট ছোট কথা বলবার জন্যে নয়, দীর্ঘ পয়ারে বাঁধা নিটোল গলায় স্বামীকে প্রবোধ দেন, — তুমি অতো ভেবো না, ভগবান তো আছেন।

ভদ্রলোক কেমন মুষড়ে পড়েন। তাঁর রাশভারী গলায় ঘ্যান ঘ্যান করেন তাঁর ভাগ্যের কাহিনী অবলম্বন করে। — ব্যাটা বললে, মঙ্গলটা বাধ সেধেছে। কিন্তু বেস্পতি আমার বরাবরের অ্যাসেট। কি গাড্ডায় পড়েছিলাম। ইনকাম ট্যাক্সের ওকালতি একটা গোল্ড মাইন্। আমার ভাগ্যে সেখানেও টুঁ টুঁ। তারপর এই লরির ব্যবসা করে, কেউ ভেবেছিল? আট দশ বছর আগে তুমি ভেবেছিলে?

— ভগবান যা করেন ....

— মঙ্গলের জন্যে, বলছো তো? কিন্তু এবারেও যদি ......

— অতো ভেবো না, অতো ভেবো না। পয়ারমন্থর গলা বাতাস ভারাক্রান্ত করে।

— দ্যাখো, আমি এই শেষ বারের মতো বললাম। এবার যদি কিছু না আমি পাগল হয়ে যাব।

ভদ্রমহিলা স্বামীর হাতখানা আবার টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর রাখেন। আস্তে আস্তে হাত বুলান।

— এত রোজগারপাতি কেন? কিসের জন্যে? বাড়ি তো দেখেছো, সব বেস্ট মেটিরিয়াল। স্প্রে পেন্টিং, টাইল ফ্লোরিং, কোন হেঁজিপেঁজি ব্যাপার না। আমি কোয়ালিটি চাই, মিস্ত্রিদের বলেছি আমি!

— কাকে বলছো মণি?

— কাকে বলব? রাস্তার লোককে ডেকে ডেকে বলব? ..... দাদার ছেলেদের ভালবাসি, তুমি তো জানো, কিন্তু নিজের, নিজের বলতে কেউ থাকবে না?

বড় হলঘরখানা দুদিকে দুটো ঢাকনি-দেওয়া আলোর দরুন প্রায় অন্ধকার। এক মোলায়েম হলদে আভায় ঘরের সামনে প্যাসেজটা ঝিকমিক করে। স্ট্রেচার আসে অপারেশান থিয়েটার থেকে। দুজন নার্স এসে আধঘুমন্ত তরুণীটিকে নামিয়ে পাশের খালি বেডে শুইয়ে দেয়। মৃদু নিঃশ্বাস ওঠে রোগিণীর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। মহিলাটি সুন্দরী, প্রায় অবাস্তব মার্বেলের মতো ফর্সা, গ্যাস ওষুধ ও যন্ত্রণায় মুখখানা নীলচে, বিশেষ করে চোখের নীচে সরু সরু নীল শিরাগুলো এত প্রকট যে তা এই নীলাভ সৌন্দর্য বিকাশে তৎপর। তরুণীটি প্রথমে হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয়। তারপর নিঃশ্বাস ক্রমশঃ সংযত হয়ে আসে।

— প্রথম বোধহয়? সেই শ্বেতকমলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন।

— আই ডি কেস্।

— অ্যাঁ?

— ইনকমপ্লিট ডেলিভারি।

— আহা বেচারি! একই অবস্থা!

আবার তাঁর রাশভারী গলায় সন্তান কামনার আকুতি প্রকাশ করতে থাকেন এবং গত দশ

বছর ধরে প্রত্যেকবার সন্তান নষ্ট হবার আগে যে ভাবে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছেন তেমনি-ভাবে মদালস গলায় স্ত্রী সান্ত্বনা দেন স্বামীকে, মাঝে মাঝে হাত টেনে নিয়ে হাত বোলান।

এক কোণে ঠান্ডা মেঝেতে বসে বসে হাবুর মা কমলার আধখানা নিজে খায় আর আধখানা হাবুকে খাওয়ায়। হাবুর চোখে পিচুটি কিন্তু মোটা মোটা খড়ি-ওঠা কালো হাত-পায়ে চাপা স্বাস্থ্যের দীপ্তি। এক কোয়া কমলা মুখে তুলতে গিয়েই সে থেমে গিয়ে মাকে দেখে। মায়ের চেহারার রূপান্তরে তার ভাবান্তর হয় না, মায়ের প্রায় প্রতি শীতেই পেট উঁচু হয়। কিন্তু খুব কিছু এসে যায় না তাতে। তাই নিয়েই মা হাসপাতালের কাজ করে, তিন-চারদিন শোয়ার পরেই আবার যে-কে সেই।

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হবার প্রথম ঘন্টি পড়ে। হাবুর মা উঠে পা টানতে টানতে সুমিতার বেডের কাছে দাঁড়ায়। গায়ের ওপর পাতলা লাল কম্বলখানা টেনে দেয়। পিকদানি সরিয়ে যথাস্থানে রাখে।

-- এই নাও। একটা টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিয়ে নীল সার্জের স্যুট পরা ভদ্রলোক হুকুমের স্বরে বললেন, -- বাথরুমে খুব ধীরে ধীরে নিয়ে যাবে। ঠিকমতো হলে আবার পাবে।

হাবুর মা অনেকটা লম্বা, ভদ্রলোকের চেয়েও। নীচু হয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে। সেটা বিদ্রূপ না তার প্রসন্ন স্নিগ্ধতা বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক তাঁর স্বাভাবিক নিস্পৃহ ক্লান্তির খোলসে ঢুকে পড়েন। একবার বেজারভাবে হাবুর মা-র দিকে, স্ত্রীর দিকে, নিয়ন আলো সজ্জিত ডালিয়া বেডের দিকে, এক কথায় সমস্ত জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আর সেই বেজার দৃষ্টি নিয়ে হঠাৎ প্রবল শব্দে নস্যি নেন। রুমাল দিয়ে নাক মুছতে মুছতে নাসারন্ধ্রে সুড়সুড়ির আরামে বোঁজা গলায় হাবুর মা-কে বলেন, -- মনে থাকে যেন।

ইতিমধ্যে একটানা ঘন্টির আওয়াজে সুমিতার ঘুম ভাঙে, আস্তে আস্তে, যেন অনেকগুলো হাল্কা হলদে রেশমি তুলোর মতো মেঘের মধ্যে থেকে তার মাথাটা বেরিয়ে আসছে। তারপর নিজের নাকের পাশে ওষুধের চ্যাড়চেড়ে অস্তিত্ব, গন্ধ আর ঘরের মধ্যে হাল্কা অপরিচিত অন্ধকারে তার মাথাটা ঘুরে ওঠে। চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে ডাকে, 'প্রতুল'। কিন্তু সাড়া আসে না। দ্বিতীয়বার চোখ খুলেও তার দৃষ্টি শয্যার পাশে রাখা শূন্য টুলের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে থাকে। তারপর বাড়িতে বাবলু আর টুটুলের কথা মনে পড়ে যায়। এতক্ষণে নিশ্চয় বাবলুটা তার ছোট বোনকে অসম্ভব জ্বালাচ্ছে। সুমিতার চোখে জল উছলে ওঠে। জল পড়ে চোখের কোণাতেই শুকিয়ে যায়। হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় হাসিতে তার শীতে ফাটা ঠোঁটদুখানা বেঁকে বেঁকে করুণ দেখায়। তার পাঁচ বছরের মেয়ের সুরেলা ধমক তার কানে বাজতে থাকে, -- মা, তুমি অতো কড়া কেন বল তো? ঠিক যেন স্টেনলেস্ স্টিল্। ঠোঁট চ্যাটালো হতেই ঠোঁটের পাতলা পর্দা কেটে রক্ত পড়ার উপক্রম হয়।

দ্বিতীয়বার ঘন্টি পড়বার আগেই প্রতুলকে হন্তদন্তভাবে লন পার হতে দেখা যায়। বম্বে থেকে আমদানি পুরো হাতা ডবল নিটিং-এ বোনা কমলা রঙের সোয়েটারে তার রোগাটে চেহারা বেশ মানানসই দেখায়। নিওন আলোর নীচে সেই আজগুবি সৌন্দর্যের দিক থেকে চোখ ফেরাতেই থমকে দাঁড়ায় মুহূর্তের জন্যে স্ট্রেচারে শববাহী ওয়ার্ডারদের ঘাসের ওপর

মৃদু পদধবনিতে। স্ট্রেচার বওয়ার মধ্যে যে নিরাসক্তি ও ত্বরিত গতি যার ফলে চাদরে মোড়া মাথাটা ঝুলতে ঝুলতে দুলতে থাকে তাতে একনজরেই আন্দাজ করা যায় রোগীর প্রাণ নেই। সেদিকে চেয়ে একান্ত যুক্তিবাদী প্রতুলের মনও ছ্যাঁৎ করে ওঠে। অজানা আশঙ্কা মানেই মিথ্যে আশঙ্কা এইরকম একটা ধরতাই যুক্তির চাদরে তার কমলালেবু রঙের সোয়েটার আর টেরিলিনের প্যান্টে মোড়া সর্বাঙ্গ ঢেকে সে আলো-অন্ধকারে ভরা হলঘরের প্যাসেজে পা দেয়। অনেকগুলো রোগিণীর মধ্যে হলেও ধবধবে সাদা ফ্যাকাশে মুখখানা খুঁজে নিতে দেরি হয় না। ধপ করে টুলটার ওপর বসেই হাঁফাতে হাঁফাতে প্রতুল বলে, -- মনু, কেমন আছো?

সুমিতা উত্তর দেয় না। কি উত্তর দেবে? শুধু গতকাল সন্ধ্যেবেলা বে-আইনী ক্লিনিকে তার গর্ভনষ্ট করার হাতুড়ে চেষ্টা, তাই নিয়ে টানাহেঁচড়া, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ফিরে আসা, তারপর মাঝরাত্রে থান থান রক্তের মাঝখানে ঘুমভাঙা, ভোরে ছোটাছুটি, হাসপাতাল, হাসপাতালে গ্যাস দেবার সময় চৈতন্য বিলুপ্তির মধ্যেও ডাক্তারদের নিজেদের আলাপ, -- একেবারে ক্রিমিনাল ব্যাপার! এরা শিক্ষিত বলে নিজেদের! যাই বলুন স্বামীটিরও বলিহারি যাই, এরকম স্টেজে -- অর্থাৎ গত চব্বিশটা ঘন্টা তার মনের মধ্যে এসে ভিড় করে একসাথে। এবং নিজের অজান্তেই তার হাতখানা টেনে নেয় প্রতুলের হাত থেকে।

— অতো ঘাবড়াচ্ছো কেন মনু? অতো ঘাবড়াচ্ছো কেন? আমি ডক্টর সেনের সঙ্গে কথা বলে এলাম। কালকেই নিয়ে যেতে বলেছে। ...... অবশ্য এরকম একটা ব্যাপার হবে ঠিক বুঝতে পারি নি। কালকে যদি আমাদের অফিসে সেল্‌স প্রমোশনের মিটিংটা না থাকতো তাহলে আমি তোমার সঙ্গেই যেতে পারতাম। কি করে বুঝব বল? আমাদেরই কলিগ্‌, বীরেন, তারও স্ত্রীর করালে সেদিন। কোন ঝামেলা হয়নি।

বছর চৌত্রিশ বছরের ছোকরাটি আত্মপক্ষ সমর্থনে তড়বড় করে। -- সমস্ত ব্যাপারটা ইমোশানালি ভাবলে চলে না সুমি। নিজেই দেখতে পারছো ছেলেমেয়ে মানুষ করার কি অবস্থা, বাবলু-র তো এবারও সেন্ট লুনিতে হল না। এখন কি হবে বল? বাংলা স্কুল মানেই তো গোয়াল। বল? এক-একটা ছেলেমেয়ে মানে থার্টি টু ফর্টি থাউজেন্ড, বীরেন বলছিল সেদিন। আর বীরেন কিছু ভুল বলেনি।

সুমিতা নিস্তব্ধ, আরও সাদা, আরও পাথরের মতো অপার্থিব দেখায় তাকে। দ্বিতীয়বার ঘন্টি বাজে। --- টুটুল বাবলু কেমন আছে? প্রতুলের দিকে চোখ তুলে চায় সুমিতা।

আবার তড়বড় করে প্রতুল, -- তোমার কিছু ভাবতে হবে না। ...... আজকে আর মাছ আনিনি। মাংস করতে বলেছি আঝালা। ঐ সবাই মিলে খাচ্ছি।

-- সরলা ঠিকমতো কাজ করছে?

- সব ঠিক আছে। সব ঠিক আছে। ...... তুমি শুধু বিপদে পড়ো নি মনু। আমি যে কি কষ্টে আছি! প্রতুল বললে বটে কিন্তু তার রঙীন সোয়েটারে স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে সে ঝকমক করে। সুমিতার কলেজে পড়তে ততো মনে হয়নি। কিন্তু এখন মনে হতে থাকে নারী-পুরুষের ব্যবধান। ছেলেরা সবসময় এক নিরাসক্ত দীপ্তিতে ঝকমক করবে আর তার চোট পড়বে মেয়েদের ওপর এরকম একটা যুক্তি তার সহপাঠিনীরা কেউ কেউ বললেও সে রাজী হয়নি।

হঠাৎ প্রতুলের হাতখানা খপ করে ধরে সুমিতা বললে, -- প্রতুল তুমি আমাকে ভালবাসো? সত্যি করে বল তো, আমি কিচ্ছু ভাবব না।

প্রবল অসোয়াস্তিতে আঁকপাঁক করে প্রতুল। এসব ব্যাপারে কোন যুক্তি নেই। কি বলবে সুমিতাকে, তাকে ভালবাসি? তার কোন মানে আছে? অথবা বলবে, না, ভালবাসে না? তারও বা কোন মানে আছে? এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে ইংরেজীতে আশ্রয় নেয়, — ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল সুমি!

আস্তে আস্তে পা টেনে টেনে হাবুর মা কাছে আসে। আই-ডি কেসের ব্যাপারটা সে জানে। এসব ব্যাপার জেনে জেনে তার মুখস্থ। তার লম্বা গড়নের দীঘলতা এখনও সবটা যায় নি। ছোপানো বাসন্তী রঙের শাড়িটা তার আবার দুধে টনটন বুকখানার ওপর টেনে সে প্রতীক্ষা করে কখন ঘরখালি হবে, কখন আবার দুধের বাটি আর বিস্কুটের প্লেট নিয়ে আসতে হবে রোগিণীদের কাছে।

আবার প্রবোধের বন্যা উপচাতে থাকে প্রতুলের মুখ দিয়ে। আমাদের সামনে নানারকম সমস্যা আসবে সুমি। সেগুলো আমরা কিভাবে ট্যাকল্ করতে পারছি — হঠাৎ অপ্রস্তুতভাবে কথার মাঝখানে থেমে যায় সে। মনে হতে থাকে আজকে মারকেটিং প্রমোশনের মিটিং-এ সে এইভাবেই বলেছিল। এবং তাতে তারিফও পেয়েছিল। শেষ ঘন্টি বাজে। প্রতুল লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। — আর একটা তো দিন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার বাড়িতে ছেলেরা ......

আস্তে আস্তে ভিজিটাররা বিদায় হন। হঠাৎ খুব ফাঁকা লাগে চারপাশে। — প্রথম বুঝি? পাশেব শয্যা থেকে পয়ারমন্থর মদালস গলা ভেসে আসে।

-- না তৃতীয়। তৃতীয় বলবার আগে সুমিতা-র গলা কাঁপে তাব অজাত শিশুর জন্যে।

-- বাঃ, আমার পেটে থাকে না, আব আপনাব .. ... ব্রহ্মান্ড কি প্রকান্ড, বাবা বলতেন।

-- হ্যাঁ।

লন দিয়ে কয়েকটা দুধের বাটি আর বিস্কুটের প্লেট নিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়ায় হাবুর মা। নিয়ন আলোয় ঝকমকে ডালিয়ার ঝাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে সে টের পায়। তার লম্বা পোড়খাওয়া শরীরখানা জুড়ে নবজাতকের পদধবনি কয়েক মুহূর্ত উঠেই মিলিয়ে যায়। ট্রে-খানা থেকে একটার পর একটা বাটি নামিয়ে শেষ বাটি নামায় সুমিতার সামনে এসে। তার মুখে প্রশান্ত হাসি খেলা করে, তা বিদ্রূপের না তার স্বাভাবিক আত্মমগ্নতার ঠিক বোঝা যায় না।

খালি বাটিটা হাবুর মা নিতে নিতে বললে, -- যে চলে গেছে সে আবার আসবে দিদিমণি, আমি বলে দিচ্ছি। আপনার চারপাশে ঘুরঘুর করবে। সুযোগ পেলেই চলে আসবে।

সুমিতা উঠে বসে। জানলার বাইরে লনে সেই অপার্থিব হৃদয়হীন সৌন্দর্যের দিকে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নেয়। তেমনি একটা অপার্থিব কোকিল হাসপাতালের ধুলোয় ভরা আমগাছ থেকে ডেকে ওঠে।

পরদিন তখনও তার ঘুম ভাঙেনি। ডাক্তারের পায়ের শব্দে ঘুম ভাঙে। আর ঘুম ভাঙতেই একজনের একটা কথাই মনে পড়ে। হাবুর মার কথা। তার চোখ খোঁজে চারিদিক। কিন্তু

কাছেপিঠে কোথাও হাবুর মা-র দেখা পায় না।

ডাক্তার সেন আসেন। খুব ভাবগম্ভীর সুপুরুষ। অনেকক্ষণ ধরে ধরে যত্নের সঙ্গে রোগিণীদের দেখেন। পাশের শয্যায় উৎসুক মহিলাটি তাঁর মদালস গলায় ডেকে ওঠেন, দেখুন তো ডাক্তারবাবু, এখনও নড়ছে কিনা।

ডাক্তারবাবু টুল পেতে বসেন। তারপর চাদরের মাঝখান দিয়ে তলপেটে হাত রাখেন। চোখ বোঁজেন। তিনি যেন গানের আওয়াজ শুনতে চাইছেন বারে বারে। বারে বারে তাঁর আঙুল এদিক সেদিক ঘোরে। কিন্তু বারে বারেই তাঁর মনস্কামনা অপূর্ণ থাকে। গম্ভীরভাবে চাদরটা যথাস্থানে রাখেন।

— নড়ছে? ভদ্রমহিলার আকুল গলায় সুমিতা চমকে তাকায়।

— নাঃ! রাখতে পারলাম না।

— আমার স্বামী এবার পাগল হয়ে যাবে!

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ান। মহিলাটিকে এখনই অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে। উঠে দাঁড়িয়েই চাপা ভারীগলায় হাঁক দেন, 'হাবুর মা'! তারপর তাঁর মনে পড়ে যায়। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকান। নিজের মনে আবার বিড়বিড় করেন। 'মাগীটা ফের বিইয়েছে'।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৩০/ সংখ্যা ৩: ১৩৭৫]

কালো কোট

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৯৩৪ সালে ঢাকা জেলার রাইনাদি গ্রামে জন্ম। বড়দের ও ছোটদের জন্য লিখে থাকেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, অলৌকিক, ঈশ্বরের বাগান, মানুষের সত্যাসত্য ইত্যাদি]

হাওয়ায় জানলা খুলে গেল। কিছু বৃষ্টির ছাঁট এসে ঘর ভিজিয়ে দিল। কে যেন এখন ও-বাড়ির উঠোনে কলতলায় যাচ্ছে। হাওয়ায় কিছু পাতা উড়ে উড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। পাতাবাহারের গাছগুলো বৃষ্টির জলে ভিজছে। এই বৃষ্টিতে কিছু পাখী ভিজছিল, উড়ে উড়ে ইতস্ততঃ পাখীরা ডাল থেকে ডালে এবং পাতায় আশ্রয় নিচ্ছিল। টিপটাপ বৃষ্টির শব্দ। এক হলুদ রঙের পাখী ডাকছে। পাতাবাহারের গাছটার বড় ডালটাতে পাখীটা বসে ডাকছে। হাবুল জানলা দিয়ে চুপি দিল। পাখীটাকে হাত বাড়িয়ে ধরার ইচ্ছা। বৃষ্টির ছাঁটে হাত পা মুখ ভিজে যাচ্ছে। তবু কি যেন আছে এই পাখীর ডাকে, নিঃশব্দ দ্রুত এক নির্জনতা এই ঘরে, জানলায়, মায়ের শীর্ণ শরীরে আকাশের মতো ছায়া ফেলছে।

হাওয়াটা ক্রমে অন্য মোড় নিল। জানলা তেমনি খোলা। বৃষ্টির ছাঁট আর আসছে না। হাবুল জানলা পর্যন্ত এগোতে পারল। ভালো করে সে পাখীটা দেখতে পাচ্ছে। পাখীর এই ডাক কেন, মা কেন চুপচাপ বিছানায় বসে, মা কেন রোদ উঠলে পিঠে রোদ দিয়ে বসে থাকে, মা ক্রমে কেন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ; মার চোখে এমন দুঃখ ঝুলে আছে কেন — হাবুল পাখীটা দেখতে দেখতে ভাবলো। পাখীটা বুঝি টের পেয়েছে হাবুল এসে জানলায় দাঁড়িয়েছে, সে বুঝি ভয় পেয়ে উড়ে যেতে চাইল -- কিন্তু কতদূরে যাবে -- এই তো সামনে পদ্মফুলের গাছ, স্থলপদ্মের ফুলে এখন গোলাপী রঙ, পাখীটার হলুদ রঙ গোলাপী রঙের ভিতর ডুবে গেলে মনে হল — কোথায় যেন সে একবার জলসত্র দেখেছে। কোন মেলায় যেতে যেতে সে দেখেছে গাছতলায় ব্যাজ পরে কারা যেন ক্লান্ত মানুষকে জলদান করছে। ওর যখন মন ভালো থাকে না, যখন মা ঘর থেকে বের হতে দেন না, সদর দরজা বন্ধ করে রাখেন — এখন হাবুল কোথাও যাবে না, রাস্তায় বের হবে না -- এই যে রাস্তা দেখছ, কত মোটর গাড়ী, ট্রাম গাড়ী দেখছ — ওরা কেবল কোথাও না কোথাও চলে যাচ্ছে। তুমি একা বের হলে ওদের মতো তুমি কোথাও না কোথাও চলে যাবে, ঘর চিনে ফিরে আসতে পারবে না — তখন কেবল হাবুলের মনে হয় মা তাকে এই ঘরে সারাদিন বন্দী করে রাখতে চান। সামান্য এই গাছের পাখী, বৃষ্টি এবং যেসব পাতা ঝড়ে উড়ে নিরুদ্দেশে চলে গেল তাদের মত ওর কোথাও না কোথাও কেবল চলে যেতে ইচ্ছা হয় -- গেলেই বুঝি সেই মেলা, মেলার পথে জলসত্র, সে একটা পাত্র দিয়ে কাকে যেন জলদান করার মত হাত বাড়াল।

মা দেখলেন হাবুল জানলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। বৃষ্টির জল হাবুলের হাতে পড়ছে। সে জল হাতের অঞ্জলিতে জমা করে রাখতে পারছে না। মা ডাকলেন, হাবুল, বাবা লক্ষ্মী, তুমি বৃষ্টির জল ধরবে না। তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।

মা এই বড় শহরে এসে যেন কেমন হয়ে গেলেন। এমন বৃষ্টির দিনে হাবুলের মনে হয় ওর মা বড় দুঃখী মানুষ -- সেই কবে কোথায় যেন কে একবার কার হাত ধরে বড় মাঠে গিয়েছিল। মাঠের ভিতর প্রকাণ্ড একটা বটগাছ, গাছ পার হলে ছোট্ট নদী। নদী থেকে কিছু পাখী উড়ে যেত। বিকেল হলেই পাখীরা উড়ে উড়ে সেই বড় বটগাছটার উদ্দেশে চলে যেত। রেল-লাইন পার হলে হাবুলের মনে হত একটা খয়েরী রঙের বাড়ি, সামনে বারান্দা, মা বাবা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে রয়েছেন। সে পাখী দেখার জন্য কার হাত ধরে রোজ চলে যেতে যেতে একদিন একা চলে গিয়েছিল। তারপর সন্ধ্যা হলে মনে হল -- কোথায় কোন দিকে গেছে সেই রেল-লাইন, সে একা একা হাঁটতে হাঁটতে কাঁদতে কাঁদতে যখন ক্লান্ত তখন কি যেন এক জাদুর খেলাতে মা বাবা, সে মা-বাবাকে দেখে তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে দিয়েছিল। মা বলেছিলেন, হাবুল, তুমি এই মাঠে?

বাবা বলেছিলেন, হাবুল, কে তোমাকে এত বড় মাঠে নিয়ে আসে?

হাবুল ঠিক কিছু বলতে পারত না। কে সেই মানুষ যে তাকে বিকেল হলেই ডাকে। সড়ক পার হয়ে বিদ্যালয়ের কোয়ার্টার। হাবুল মা-বাবার সঙ্গে সেই কোয়ার্টারে থাকে। বিকেল হলে বারান্দায় মা বাবা বসে গল্প করতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা চলে যেত। হাবুল একা একা বিদ্যালয়ের মাঠে খেলা করতে নেমে গেলেই মনে হত -- সামনের রেল-লাইন পার হলে কি এক বিস্ময়ের জগৎ রয়েছে -- সে একা একা কার হাত ধরে যেত মনে করতে পারছে না।

মা বলেছিলেন, হাবুল, তুমি দেখবে একদিন ঠিক হারিয়ে যাবে।

বাবা বলেছিলেন, হাবুল, বলো আর কোনদিন একা এত বড় মাঠে নেমে আসবে না?

-- আসব না বাবা।

-- এলে তুমি আর কোনদিন আমাদের খুঁজে পাবে না।

-- কেন বাবা?

-- আমরা হারিয়ে যাব।

সেই থেকে কি এক ভয় হাবুলের। যেন সামনের গাছ ফুল পাখী সবই রহস্যময়। সবই হাত বাড়িয়ে হাবুলকে বলছে, এস। তুমি আসবে না? গাছ ফুল পাখীর জগতে হাবুলের কেবল হারিয়ে যাবার ইচ্ছা।

এই বৃষ্টির দিনেই কেন যেন হাবুলের সব মনে পড়ছিল। ওর মনের ভিতর গ্রাম্য এক ছবি ভাসছিল। সামনে ছোট পুকুর, পার হলে রেল-লাইন, তারপর সেই বড় মাঠ। মাঠে যেতে বড় পদ্মদীঘি। কত পদ্মফুল ফুটে থাকত। বিল থেকে বালিহাঁস উড়ে আসত। নদীর ওপার থেকে খাঁচা ঝুলিয়ে আসত মজিদ। ওর দু খাঁচায় বালিহাঁস থাকত, জলপিপি থাকত। কিছু স্নাইপ-জাতীয় পাখী। বাবা গলা টিপে পেট টিপে পাখী কিনতেন। পাখীর মাংস রান্না হলে রহমান দপ্তরী একটা ছোট বাটি নিয়ে আসত, দিদিমণি একটু মাংস। সে বারান্দায় বসে বসে

কোনদিন ঝিমোত। পাখীর মাংস একবার কেন যেন সেদ্ধ হল না -- সব দোষ মজিদের উপর, মজিদ তুমি কি পাখী দিলে -- পাখীর মাংস সিদ্ধ না হলে কার দায়। বাবা নিরীহ মানুষ, তবু কেন যেন সেদিন কে দায়ী এ-প্রশ্ন মজিদকে করেছিলেন।

হাবুল একবার দুটো বালিহাঁসের পেট থেকে তাজা শক্ত ডিম পেয়েছিল। মাকে না জানিয়ে বাবাকে না বলে ডিম দুটো তুলো দিয়ে গরম করার চেষ্টা -- যেমন মুরগীগুলো ডিমের উপর বসে থাকত, সে খড়কুটোর ভিতর সেই ডিম লুকিয়ে মুরগীর পেটের নিচে রেখে দিয়ে বসে থাকত। মুরগীটা কিছুতেই বসতে চাইত না, সে সন্তর্পণে মুরগীর ঘরে ঢুকে নিজে মুরগীটার উপর চেপে বসে থাকত এবং একদিন বাবা দেখলেন -- হাবুল কোথাও নেই -- খোঁজ খোঁজ, মুরগীর ঘরে হাবুল, মুরগীটা মরে গেছে। সে মুরগীর উপর চেপে ডিমে তা দিচ্ছিল। বাবা, এমন নিরীহ বাবা পর্যন্ত সেদিন মেরেছিলেন হাবুলকে।

এখন এই বড় শহরে না আছে মুরগীর ঘর, না আছে সেই বড় মাঠ, পদ্মদীঘি। মজিদ মিঞা আর এখানে আসবে না -- কি গো বাবু, পাখী চাই? কি পাখী লাগবে। একবার দুটো বনমুরগী দিয়ে গিয়েছিল। হাবুল মুরগী দুটোকে খাওয়াত। পায়ে বাঁধা থাকত। যেদিন মুরগী দুটোকে কাটা হবে -- সেদিন হাবুল মুখ ভার করে থাকল সারাদিন। সন্ধ্যার ট্রেনে বাবার এক উকিল বন্ধু আসবে। কালো কোট গায়ে দেখলেই কেমন রাগ হত হাবুলের। বাবা না থাকলে কতদিন দেখেছে মা খুব হেসে হেসে কথা বলেছেন। মা-র কপালে বড় ফোটা থাকত সিঁদুরের। সে বুঝতে পারত না কালো রঙের-কোট-পরা মানুষটা বাবার বন্ধু না মা-র বন্ধু। সেদিন মুরগীর পা দুটো দড়ি থেকে খুলে দিয়েছিল। কেউ টের পায় নি। উকিল মানুষটা পেটে হাত রেখে বলেছিল, একটা কেস ঠুকে দাও হে।

-- কার নামে!

-- মজিদের নামে।

খেতে বসে কি আফশোস। সারাক্ষণ বনমুরগীর কলিজা অথবা বাঁ দিকের ঠ্যাঙ খেতে কি সুস্বাদু, এইসব বলাবলি করতে করতে চোখ গোল গোল করে হাবুলকে দেখছিল। যেন টের পেয়ে গেছে -- এই নচ্ছার শিশু এমন কাজ করেছে হে অজিত। মজিদের নামে না হয়, ছেলের নামেই এক নম্বর ঠুকে দিয়ে এস। হাবুল ভয়ে তাকাতে পারছিল না। লোকটা খুনী আসামীকে গলা বাঁচিয়ে দিয়েছে, কি এক জাদুর মতো ওব মন্ত্রশক্তি জানা আছে। বস্তুত হাবুলের যখনই ভয় হয় তখনই সে দেখতে পায় এক কালো-কোট-পরা মানুষ তার হাত ধরে মাঠে নিয়ে যাচ্ছে অথবা নদীর পারে এবং ঠেলা দিয়ে জলে ফেলে দিচ্ছে।

বৃষ্টির দিনে সেই কুৎসিত লোকটার মুখও জলের ভিতব ভেসে উঠল। সে দেখল এখন জল ভেঙে কারা পথ ধরে চলে যাচ্ছে। বৃষ্টির জন্য পথে জল জমছিল। মেয়েরা হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে হাঁটছে। একটা বুড়ো মানুষের ছাতা উল্টে গেছে। ঝড়ো হাওয়া ছাতাটা অনেক দূরে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। মানুষটা ছাতা ধরতে গিয়ে জলের ভিতর পড়ে গেল। হাবুলের কেন যেন হাসি পাচ্ছিল। বাবাও ছাতা মাথায় আসবেন। জল ভাঙতে হবে বলে এখন কাপড় পরে অফিসে যান। এই বড় শহরে এখন মনে হয় বাবা সেই কালো-কোট-পরা মানুষটার

ভয়ে গোপনে চলে এসেছেন। কারণ সে দেখেছে সেই মানুষটা আর এ-বাড়ি আসে না। খোঁজ পায় নি হয়ত। খোঁজ পেলে বুঝি মানুষটা ঝড় জল ভেঙে ছুটে আসত। আর কেন যেন সেই থেকে মা বড় একা নিঃসঙ্গ। মা ওকে যেন তেমন ভালবাসে না। মা ক্রমে ক্ষীণাকার হয়ে গেল। বিষণ্ণ হয়ে গেল। ওর বলতে ইচ্ছা, মা তুমি ভালো করে হাসো না কেন। মান্টুর মা কি জোরে জোরে হাসতে পারে। মান্টুর মা আমাকে পিঠে পায়েস দেবার সময় কি জোরে গম গম করে কথা বলছিল। প্রাণপ্রাচুর্যের অভাবে তার মা যে কি হয়ে গেল। মনে হয় বাবা মা-কে এক মরুভূমির ভিতর টেনে এনেছে। জল নেই, গাছপালা বৃক্ষ নেই, সেই রহমানের গল্প যেন, এক রক্তশোষক দৈত্য তার মায়ের জীবনের সব প্রাণপ্রাচুর্য হরণ করে নিচ্ছে। সে জানলার ধারে বসে বলতে পারত, মা আমি কোথাও চলে যাব, সেই জাদুকরের পালিত পুত্রের মত চাঁপাফুল গাছটির সন্ধানে চলে যাব। ওর গল্প মনে হত রহমান দপ্তরীর, মা, আমি সেই জাদুকরের পালিত পুত্রের সন্ধানে আছি। কি চাই খোকা, চাঁপা ফুল চাই। পাহাড়ে পর্বতে এক ঝরনা, জলে জলে মাঠ নদী বন ভেসে যাচ্ছে। দূরে অনেক দূরে, মাগো, শস্য নেই, গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে, পত্রপুষ্পহীন মাঠ ঘাট সব। মানুষেরা গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পালিত পুত্র, মাগো, জাদুকরকে বলল, কি হবে? তিনি বললেন, মাগো তুমি যাও, মাঠ বন নদী পার হয়ে চলে যাও, পাহাড়ে পর্বতে সোনার চাঁপাগাছটি আছে, চলে যাও, ফুল নিয়ে এস, সেই ঝরনার জল নিয়ে এস। ফুলের জল মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে দাও। সব আবার ফুলে ফুলে ভরে যাবে। মানুষেরা আবার গ্রামে ফিরে আসবে।

মাগো, রহমান দপ্তরী বলত, জাদুকরের পালিত পুত্র তার প্রিয় পোষা ময়না পাখী নিয়ে বের হয়ে গেল। পাখী যেদিকে উড়ে যায় পালিত পুত্র সেদিকে যায়। নাম ওর মা, জয়নাল। জয়নাল এক পাখীয়ালা মা। সে তার প্রিয় পোষা পাখীটারে নিয়ে উড়ে গেল। কতদূরে কত বন মাঠ পেরিয়ে, কত দিন যায় রাত্রি যায় মা। জয়নাল আর পৌঁছাতে পারে না। হাত পা স্থবির হয়ে আসছে। চোখে ঘুম। যেখানে সে বসে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তে চায়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় মনে হয় সে আজ হোক কাল হোক মরে যাবে। কিন্তু জয়নালের মনে, মা, এক কি যেন স্বপ্ন। রহমান দপ্তরী বলত, মানুষের ভালোর জন্য, শস্য ফলানোর জন্য, ফুল ফোটানোর জন্য সে চলে যাচ্ছে। আমিও বড় হলে চলে যাব। সেই জাদুকরের পালিত পুত্রের মত মা আমি চলে যাব। তোমার জন্য, তুমি মা কি যে চাও বুঝি না, আমি বুঝি সেই চাঁপাফুলের সেই জল নিয়ে আসতে পারলে, মা, তুমি ভালো হয়ে যাবে।

মাগো, রহমান দপ্তরী বলত, ঝরনার পাশে গিয়ে দেখল জয়নাল— কি উঁচু জমি, খাড়া পাহাড়, ওঠা দায়, প্রাণ হাতে করে উঠতে হয় মা, পালিত পুত্র মা প্রাণ হাতে করে উঠে গেল। পাহাড়ের মাথায় একটা চাঁপা ফুল গাছ, গাছে একটা ফুল ফুটছে মা আর ঝরনার জলে ঝরে পড়ছে। কোন ফুল ফুটে গাছের ডালে থাকছে না। ফুটছে আর ঝরে যাচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর স্রোত মা জলে। রহমান দপ্তরী বলত মা, জলে পড়ে দুপারের গাছপালা তীরবেগে ছুটছে। কার সাধ্য সেই জলে নেমে যায়। ময়না পাখী জয়নালের মাথায় উড়ছে। জয়নাল হাত তুলে বলল, পাখী আমি কি করি? পাখী বলল, ওপরে উঠে যাও, ডালে উঠে যাও। ফুল নিয়ে জল নিয়ে এস। যেখানে যা কিছু মরুভূমি — জল ছিটিয়ে উর্বরা করে দাও।

জয়নাল গাছের গোড়ার পৌঁছে দেখল, ডালে এক পাখীর মত ফ্রক-পরা মেয়ে। সে গাছের ডালে ফুল তুলতে উঠে গেছে। পড়ে যাবে বুঝি। আর একটু গেলেই ডাল ভেঙে মেয়েটা জলে পড়ে যাবে। কি করে পাখী? ময়না মাথাব উপব উড়ছে। তুমি গাছে উঠে যাও জয়নাল। জয়নাল গাছে উঠে গেল। প্রাণ হাতে নিয়ে উঠে গেল। মেয়েটির ফ্রক টেনে ধরল। পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেল। নীচে নেমে সেই মেয়ে বড় হয়ে গেল। বনদেবী হয়ে গেল। হাতে চাঁপাফুল। ফুল নাও, জল নাও — যেখানে যা কিছু দুঃখ আছে এই জল নিয়ে ছিটিয়ে দাও। সব দুঃখ উবে যাবে। ভিতরের ময়না পাখীটা কথা বলতে থাকবে। মা, রহমান বলত, এই ভিতরের ময়না পাখী কখন যে কার কোথায় উড়ে যায় বলা দায়। খোকাবাবু, ময়না পাখী উড়ে গেলে আর ফেরে না। খোলা আকাশে উড়ে যাবার লোভ সব পাখীর। মাগো আমি তোমার জন্য চাঁপা ফুল নিয়ে আসব। আজ হোক কাল হোক মাগো তোমার জন্য ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসব।

বস্তুত হাবুলের এই ঘর ভাল লাগত না। বড় শহরে আসাব পর থেকেই সে বন্দী হয়ে গেল। স্কুলে নিয়ে যাবার জন্য ঝি মঙ্গলা আসে। সে স্কুল থেকে নিয়ে আসে। চারটে বাজলে মা ওকে মাথা আঁচড়ে দেবেন। ফুল-ফল-আঁকা জামা গায়ে দিয়ে দেবেন। তখন দাওয়ায় চুপচাপ সে বসে থাকে। কিছুদূর গেলে পার্ক। সে এখান থেকে সেইসব পার্কের গাছ-গাছালী দেখতে পায় না। মনে হয় বুঝি পার্কে গেলেই কালো-কোট-পরা মানুষটার সাক্ষাৎ পাবে। সাক্ষাৎ পেলেই বলবে, যাবে একবার আমাদের বাড়ি। আমার বড় দুঃখী মা কেন যেন আর হাসে না। তুমি গেলে মা আমার নিশ্চয়ই হাসবে।

অথবা এও মনে হয় রেল-লাইন পার হলে বড় মাঠ এবং মাঠ পার হলে দীঘির মত পদ্মপুকুব। কত পদ্ম ফুল ফুটে থাকে সেখানে। তাবা আব সেখানে যেতে পারবে না। তারা এখন এই বড শহরের ছোট গলির অপরিসর এক বাড়িব ভিতর। দিনের বেলাতে পর্যন্ত বোদ ও ঠেলা। মার শরীরে যেন ঠান্ডা লেগেই থাকে। সাবাদিন মা চাদব গায়ে শুয়ে থাকেন। মা রুগ্ন। বাবা সারাদিন বাইরে। একটু পথে চুপি চুপি বেব হয়ে গেলেই, বাবার কাছে মার নালিশ, খোকা একা একা আবার পথে বের হয়ে যায়।

মা রুগ্ন। বাবা সাবাদিন বাইরে, সন্ধ্যায় বাবা আসেন — তখন বাবাকে দেখলে খুব কষ্ট হয়। বাবা যেন কেবল কি খুঁজছেন। এই সংসারেব সব কিছুতে সেই ঝবনাব জল ঝবে পড়ুক, বাবা বুঝি মনে মনে এমন চাইছেন। সে একদিন বলেছিল, বাবা তুমি সারাদিন কোথায় থাকো। আমরা এখানে কেন? সেই বড় মাঠ কোথায়? পদ্মবন কোথায়?

বাবা বলতেন, হাবুল, আমরা আর সেখানে যাব না।

- কেন যাবো না বাবা?

বাবা বলতেন, আমরা নতুন বাসা নিয়ে এখানে চলে এসেছি। বাবা বাকিটুকু বলতেন না।

পাখীটা জলে ভিজছিলো। স্থলপদ্ম গাছটা থেকে পাখীটা ফের উড়ে এসে পাতাবাহারের গাছটায় বসেছে। এই পাখী, হলুদ রঙের পাখীর মতো এক পাখী বুঝি জয়নালের — নাম তার ময়না। সে একবার এই পাখী নিয়ে কোন এক রাজাব দেশে চলে গিয়েছিল — রহমান এমন

সব গল্প তার কাছে করেছে। এখানে রহমান নেই, স্কুল ছুটি হলে অথবা সন্ধ্যায় যখন গ্রাম মাঠ ডুবে যেত, বাবা যখন হারিকেনের আলোতে পরীক্ষার খাতা দেখতে বসতেন, মার ছাত্রীরা যখন পড়াশোনা করে গ্রামের পথে নেমে যেত তখন রহমান গল্প করে বলত, হাবুল বাবু এবারে খেতে যান, কাল আবার হবে। রহমান যেন তার কাছে সেই জাদুকর, এবং সে নিজে মাঝে মাঝে জয়নাল হয়ে যেত — এবং পাখী দেখলেই পোষ মানানোর ইচ্ছা, সে কতবার রহমানকে বলেছে, আমাকে একটা পাখী দেবে, টিয়াপাখী। আমি পাখী নিয়ে বনে ঢুকে যাব। এখন এই বৃষ্টির দিনে হলুদ রঙের পাখীটা তার কাছে কোন শুভ বার্তার মত। পাখীটা এত কাছে, আর একটু কাছে এলেই হাতের কাছে এসে যায়, সে চুপি চুপি যেন বৃষ্টির জল ধরছে, এমন অভিনয় করতে থাকল। সে পাখী দেখছে না, পাতা দেখছে না, ডালপালা এত যে জানলার কাছে — সে-সব কিছুই যেন দেখছে না — কেবল বৃষ্টির জল পড়তে দেখছে। তার দৃষ্টি বৃষ্টির জলের ভিতর। সে পাখীটাকে খপ করে ধরার জন্য প্রায় একটা পুতুল সেজে জানলায় বসে থাকল। কত ছোট পাখী — কি নাম তার, হলুদ রঙ কেন গায়ে -- এমন ছোট পাখী টুনটুনি হবে হয়ত, কিন্তু টুনটুনি পাখীর তো হলুদ রঙ হয় না — কেমন ছাই ছাই রঙের। সে একবার দুটো ডিম লাল নীল রঙের, সংগ্রহ করেছিল। ওরা চড়ুইয়ের ডিম কি টুনটুনি পাখীর ডিম সে জানত না। মা ডিম দুটো দেখে চিৎকার করে উঠেছিল, দ্যাখো দ্যাখো হাবুলের কান্ড দ্যাখো — কোত্থেকে সাপের ডিম হাতে করে এনেছে। সে সেদিন কিছুতেই মাকে বোঝাতে পাবল না, মা সাপের ডিম নয়, পাখীর ডিম। আমি বেগুন গাছের পাতার ভিতরে খুঁজে পেয়েছি। কে কার কথা শোনে, মা তেড়ে এসে হাত ঝাড়লে ডিম দুটো হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। বালতি বালতি জল ঢেলে সব পরিষ্কার হলে মার কি কান্না। আমার কি হবে! হাবুলের মনে হল মার কেমন সেই থেকে ভয় প্রাণে -- মা সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করতেন। তবু হাবুলের মনে হয় সে একা একা বেশীদূর না যেতে পারলেও সড়ক পর্যন্ত একা যেতে পারত। সে সেখানে দাঁড়িয়ে মালগাড়ীর শব্দ শুনত — টংলিং টংলিং। সেই শব্দই হাবুলকে কোন্ এক সুদূরের স্বপ্ন দেখাত। সে কোথাও আজ হোক কাল হোক চলে যাবে এমন ভাবত।

পাখীরা জলে ভিজছিল। হাবুলের ইচ্ছা হল পাখীটার মত জলে ভিজতে। সে দুবার চেষ্টা করেছে খপ করে ধরার জন্য, কিন্তু সে ধরতে পারেনি। পাখীটা উড়ে গিয়ে এমন ডালে বসেছে যে হাতের নাগালে আর তা কিছুতে আসে না। ওর মনে হল বরং দুটো পাট খুলে দিলে, কিছু খুদকুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে খাবার লোভে পাখী ভিতরে চলে আসবে। সে বিছানার দিকে চোখ তুলে তাকাল, মা চাদর দিয়ে চোখমুখ ঢেকে রেখেছেন। সে তাড়াতাড়ি সামান্য চাল এনে ছড়িয়ে দিল, তারপর হাত তুলে যেমন পোষা ময়নাকে জয়নাল হাতে তালি বাজালে পাখী উড়ে এসে মাথায় বসত, বুঝি এই পাখী হাতে তালি বাজালে মাথায় এসে উড়ে না বসুক, অন্তত চাল খেতে ঢুকে পড়বে। ঢুকে পড়লেই জানলা বন্ধ করে দেবে, আলো জ্বেলে দেবে এবং আলো জ্বাললেই চোখে ধাঁধা দেখবে পাখীটা।

কিন্তু হলুদ রঙের পাখীটা গাছের ডালেই নাচতে থাকল। বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে গান গাইতে থাকলো। চিরিপ চিরিপ। চড়ুই পাখীর মত ডাকছে। ওর হাতের তালি অথবা খাদ্যবস্তু

কিছুই দেখল না। এখন একমাত্র পথ দরজা খুলে বাইরে বের হওয়া। তারপর সামনে থেকে তাড়া করলে পিছনের জানলা দিয়ে পালানোর জন্য ফুড়ুৎ করে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু দরজা খোলা যাবে না। মা দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। ভয়ে, কারণ হাবুল দরজা খোলা পেলেই পালিয়ে সেই পার্কটার উদ্দেশে যাবার জন্য -- অথবা তার সেই ফুল ফলের দেশ এখন কোথায় -- কতদূরে গেলে সেই টংলিং টংলিং শব্দ শুনতে পাবে -- তার জন্য হাবুল চুপি চুপি ঘর থেকে পালাতে চায়। দরজা খোলা থাকলে হয়ত হাবুল হেঁটে হেঁটে বড় রাস্তায় চলে যাবে। মোড় পার হলেই বড় রাস্তা -- তারপর, ট্রামগাড়ী, বাসগাড়ী। হাবুল খুব ছোট, সে শহরের বড় রাস্তা একা পার হতে পারে না। মা বুঝি তাই কেবল দরজা বন্ধ করে রাখেন। হাবুল জানালায় বসে থাকে। তখন হাবুলকে বড় দুঃখী হাবুল মনে হয়।

সেই পাখীটা উড়ে চলে গেল -- হাবুল মাকে উদ্দেশ করে চেঁচাল, মা বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে।

মা চাদর থেকে মুখ বার করে বললেন, জানলায় বসো না হাবুল। বৃষ্টির ছাঁট এসে তোমায় ভিজিয়ে দেবে।

হাবুল বলল, জানো মা, মোড়ের ওদিকটায় একটা শিবমন্দির আছে। তার পাশে বড় একটা শিমুল গাছ আছে। সেখানে হেঁটে গেলে -- জানো মা, একটা বড় পুকুর আছে।

মা বললেন, -- তাই বুঝি!

-- হ্যাঁ মা। কাল আমি আর সান্টু গিয়েছিলাম।

মা এবার ধমক দিলেন, -- হাবুল তোমাকে কতবার বলেছি তুমি সান্টুর সঙ্গে যাবে না। জলে নামবে না।

-- কেন মা? জলে গেলে কি হবে? সান্টু জল থেকে বড় দুটো কাঁকড়া ধরেছিল।

হাবুলের ফের সেই বড় পদ্মবনেব কথা মনে পড়ছিল। মা দুপুরে ঘুমোচ্ছেন, বাবা স্কুল ছুটি বলে ট্রেনে চড়ে ছোট শহরে গেছেন। হাবুল চুপি চুপি দরজা খুলে বারান্দায় নেমে যেত। তাবপর উঁকি দিত চারপাশে — না কেউ নেই, হাবুলকে কেউ দেখছে না। সে পাশের বাড়ির বড় বিনুকে নিয়ে মাঠ পার হয়ে ছুটত। পথে নগেন মাঝি দেখে বলত, ও বাবা তোমরা। এ-পথে! নগেন মাঝি ওদের ধরে নিয়ে আসত। বলত, দিদিমণি, দ্যাখো তোমাদের ছেলেরা এই ভরদুপুরে লাইন পার হয়ে কোথায় যাচ্ছিল।

মা বলতেন, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে হাবুল?

-- মা আমবা পদ্মপুকুরে যাব ভাবছিলাম।

-- সেখানে কি আছে?

-- বিনু বলেছে, মা সেখানে পদ্মফুল আছে, ফুলে মধু আছে।

-- কিন্তু বিনু বলেনি, জলে বড় একটা শেকল আছে?

-- কিসের শেকল মা?

-- এক দৈত্যের শেকল। বড় এক দৈত্য, তার দুই শিঙ। জলের নিচে স্ফটিকের স্তম্ভ। সে তার ঘরে বড় শেকল নিয়ে বসে থাকে। জলে নামলে ধরে নেয়।

— দৈত্য কি মা! রহমান দৈত্যের কথা বলেছে। কিন্তু সে কি বস্তু রাক্ষসের মত, না ভূতের মত! রাক্ষস অথবা ভূত সে যেন চিনতে পারে, দৈত্য চিনতে ওর কষ্ট হয়।

-- দৈত্য দেখতে রাক্ষসের মত। রাক্ষসের শিঙ থাকে না। দৈত্যের দুই শিঙ থাকে। বড়ো বড়ো দাঁত। মানুষ পেলে ধরে খায়।

— বাবাকে দৈত্যরা ভয় পাবে না, মা?

— তোমার বাবাকে পায়। কিন্তু তোমাকে পাবে কেন হাবুল। তুমি কোনদিন একা বিনুর সঙ্গে পদ্মপুকুরে যাবে না। সেখানে পদ্মবনের দৈত্য এক শেকল ছেড়ে দিয়েছে। জলের ভিতর শেকলটা চুপচাপ লুকিয়ে থাকে। কচিকাঁচা কেউ জলে নেমে গেলে, চুপি চুপি শেকলের মুখটা পারের দিকে উঠে আসে। তারপর ধরে নিয়ে যায় তাকে। জলের তলায় ওদের ঘর আছে।

— আমি সাঁতরে চলে আসব মা।

মা-র মুখে কেমন বিষণ্ণ করুণ হাসি ফুটে উঠল। হাবুল মাকে দেখছিল -- মা, তার মা রুগ্ন এবং দিন দিন কি এক ভাবনা যেন মাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সেই লোকটাকে খবর দিলে হয়, সে চলে এলে মা আবার হা হা করে হাসতে পাববে। কালো-কোট-পবা মানুষটার হাতে পায়ে অথবা মুখে কি এক জাদুর খেলা -- সে এলেই বুঝি নিরাপদ এ-সংসার — সে মাকে বলল, মা আমাকে সান্টু বলেছে, দীঘির পাড়ে বড় এক হরতকী গাছ আছে, গাছের নিচে হরতকী পড়ে থাকে, সান্টু রোজ দীঘির জল সাঁতবে পাব হয়ে যায়, ওব পিসিমা হরতকী খায়। হরতকী খেলে কোন রোগ হয় না, বোগ থাকলে তা সেরে যায়।

মা এবারে হাসলেন। সেই এক বিষণ্ণ হাসি। এটা হাসি কি কান্না মাঝে মাঝে হাবুল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মা এবার চাদরে মুখ ঢেকে দেবার সময বললেন, আগে সাঁতার শেখো। সাঁতার না শিখলে দীঘির জল পার হওয়া যায় না।

হাবুল কতদিন ভেবেছিলো সাঁতাব শিখবে। ওর জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটার ইচ্ছা কতদিনের। কতদিন সে বাবাকে বলেছে, বাবা আমাকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে যাবে? বাবার মুখ তখন বড় বিব্রত দেখাতো। হাবুলের মনে হয় এখন, বাবা নিজেই সাঁতার শেখেনি। সাঁতার শিখলে বুঝি নিরাপদ সংসারে সাপ বাঘের মুখ উঁকি দেয় না। এখন তো বাবা সারাদিনই বাইরে থাকেন। ঝি মঙ্গলা কাজ করে দিয়ে চলে যায়। মা সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকেন। রাত্রে মাস্টারমশাই এসে হাবুলকে পড়িয়ে যান। ভোরে, হাবুল মা-র কাছে বসে থাকে, মা তাকে অঙ্ক দেন, হাবুল অঙ্ক শেষ করে ফের এসে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের পাতাবাহারের গাছ পার হলে স্থলপদ্মের গাছ, রাজ্যের পাখীরা খেলা করতে আসে, বন্দী হাবুল এই জানলায় দাঁড়িয়ে সংসারের যাবতীয় অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখতে দেখতে --- এই যেমন রোদ ওঠা, সূর্য ডুবে যাওয়া, পাখ-পাখালির শব্দ শোনা এবং আকাশ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাওয়া ; বাবা কিছু কিছু নক্ষত্রের নাম জানত, বাড়ি ফিরে হাবুলকে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে বলত, এস হাবুল, আমি তোমাকে আজ ধ্রুবতারা দেখাব। সংসারে বিচ্ছিন্ন ঘটনা সব ঘটে যাচ্ছে, তবু বাবা হাবুলের হাত ধরে জানলায় দাঁড়িয়ে বলতেন, দ্যাখো

ঐ হচ্ছে আমাদের ধ্রুবতারা। অথবা হাবুলের বইয়ে যে কালপুরুষ রয়েছে সেই ছবি আবিষ্কার করার সময় আকাশের সারা গায়ে নক্ষত্র খুঁজে খুঁজে বাবা যেন সময় কাটিয়ে দিতেন। হাবুলের বড় কষ্ট হত তখন, বাবা, মা ভাল হয়ে উঠছে না কেন, মা-র কি হয়েছে প্রশ্ন করার ইচ্ছা জাগত।

বিকেলে ছুটির দিনে বাবা হাবুলকে গড়ের মাঠে নিয়ে যান। অন্যদিন এই বিকেলে, জানলায় শুধু সামনের পাতাবাহারের গাছটায় একটা হলুদ রঙের পাখী দেখতে দেখতে কেমন সে শুধু তন্ময় হয়ে যায়। তার সেই ছোট্ট গ্রাম মাঠের কথা মনে হয়। ফুল ফলের কথা মনে হয়। আর জল দেখলে মা-র সেই ভয়ের শেকলটার কথা মনে হয়। যেন মা সব সময় তার চোখের ওপর একটা কালো কোটের ছবি ঝুলিয়ে রাখতে চান। একবার নদীতে নৌকায় সে মা-র সঙ্গে অনেকদূর গিয়েছিল, সেখানেও মা হাবুল জলে উঁকি দিলে বলতেন তুমি হাবুল জলে পড়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো রঙের শেকলটা তোমাকে টেনে নেবে। হাবুলেরও সেই ঘন কালো রঙের জলের গভীরে মনে হয়েছিল -- বুঝি পাতালে ডুব দিলেই সেই দৈত্যপুরী চোখে ভেসে উঠবে। সে ভয়ে জলে আর হাত ডোবায়নি। কেবল মনে হচ্ছিল পাতালের দৈত্যপুরীতে শেকলটা শুয়ে আছে, যেন দেখছে জলের ধারে কোন কচিকাঁচা কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে কিনা।

রাত হলে সে বাবাকে বলেছিল, বাবা আমাদের স্কুলের পুকুরটাতে শেকল ছিল?

বাবা বলেছিলেন, শেকল কি আবার?

-- মা যে বলে, জলের নিচে দৈত্য থাকে, তার এক পোষা শেকল আছে।

বাবা বুঝেছিলেন, হাবুলকে মা ভয় দেখাচ্ছে। হাবুল সাঁতার জানে না। একা একা হাবুল কেবল নিরুদ্দেশ হতে চায়। একা একা হাবুল যেন পুকুরে চলে না যায় -- তাই বাবা গম্ভীর সুরে বললেন, হ্যাঁ হাবুল, তুমি একা একা যাবে না। পুকুরে মস্ত বড় শেকল থাকে।

আর কিনা সে এই বড় শহরে এসে পর্যন্ত একটা পুকুর আবিষ্কার করে ফেলেছে। সান্টু একদিন শিবমন্দিরের পথ ধরে বড়ো এক পুকুরের পাড়ে এনে হাজির করেছিল। কি কারণে সেদিন সকাল সকাল ছুটি। সান্টু দারোয়ানকে বলে হাবুলকে বের করে এনেছিল। পুকুরটায় যেতে হলে প্রথম এক রাজবাড়ির দেউড়ি পড়ে। তারপর পুরোনো ভাঙা দেয়াল, ভিজে মাটি, কিছু বিদেশী ফুলের গাছ এবং লতাপাতা -- যেন ওরা ইচ্ছা করলে এখন এক বনঝোপের ভিতর ঢুকে লুকোচুরি খেলতে পারে। হাবুল এই বড় শহরে এমন একটা জায়গার সন্ধান পেয়ে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিকেল হলেই সে ছটফট করত। মা আমি যাব, এখন আর বৃষ্টি নেই। মা, সান্টু বলেছে, সে আমাকে একদিন দূরের পার্কটায়ও নিয়ে যাবে।

-- না, তুমি যাবে না হাবুল। সান্টুর সঙ্গে গেলে বাবা রাগ করবেন।

-- মা, সান্টুরা কতদিন ধরে এই শহরে থাকে। সান্টু পথ চিনে হাঁটতে পারে। সান্টু আমাকে অনেক জায়গায় নিয়ে গেছে।

-- তোমার বাবা এলে বলে দেব হাবুল। তিনি খুব রাগ করবেন।

বৃষ্টি ধরে এসেছিল। হলুদ রঙের পাখীটা উড়ে গেছে। এখন ভাদ্র মাস। কখনও বৃষ্টি, কখনও মেঘ। কখনও আকাশে এতটুকু মেঘ থাকে না। আবার কোথা থেকে সব মেঘেরা

উড়ে আসে। আকাশ ঢেকে দেয়। ঘন বৃষ্টি হয়। গাছগুলো বৃষ্টির জলে স্নান করে বড় তকতকে হয়ে ওঠে। তখন পথ-ঘাট বড় পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সারা শহরময় রোদ। মনেই হয় না-- কিছুক্ষণ আগে জল পড়ে এই শহর ডুবে ছিল। তখন বাইরের পৃথিবীতে ছুটতে পারে না বলে হাবুলের বড় অভিমান হয়, মা-র ওপর অভিমানে ওর চোখে জল আসে। যেন মা-র এই অসুখ— যা কিছুতেই সারছেনা, যা সেরে গেলে মা তাকে নিয়ে যেতে পারত সামনের পার্কটায় অথবা সেই রাজবাড়ির দেউড়ি পার হয়ে -- কত যে বনঝোপ আছে, সেখানে -- যেন অসুখ সেরে গেলেই সে আর এই ঘরে বন্দী থাকবে না, মা-র মনে হবে -- সব সময়ই কোথাও না কোথাও ফুল ফুটছে সুতরাং হাবুল এবার ঘর ছেড়ে রোদ্দুরে বের হয়ে পড়ুক। মাকে সে আজ হোক কাল হোক নিরাময় করে তুলবে। এই যে হলুদ পাখীটা এসে পাতাবাহারের গাছটায় বসে থেকে মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় -- যেন এই পাখীটা ইচ্ছা করলেই জয়নালের সেই জাদুর পাখী হয়ে যেতে পারে এবং চাঁপাফুল নিয়ে আসতে পারে. চাঁপাফুলের গন্ধে মা তার এই সৌরভময় সংসারে হাসিমুখটি তুলে ধরলে বুঝি বাবার আর কোন কষ্ট থাকত না। সে মনে মনে বলল, পাখী, তোমাকে আজ হোক কাল হোক নিয়ে চলে যাব। সেই রাজবাড়ির দেউড়ি পার হলেই চাঁপাফুলের গাছটি আছে। আমি সেখান থেকে মায়ের জন্য ফুল তুলে আনব। মা-কে নিরাময় করে তুলব।

মা বিছানায় শুয়ে দেখতে পেলেন, হাবুল বড় একা, নিঃসঙ্গ। সে জানলা দিয়ে শুধু এখন আকাশ দেখছে। চারিদিকে আনন্দ, চারিদিকে ফুল ফল পাখীর মেলা, মানুষের মিছিল। শুধু হাবুল চুপচাপ ঘরের ভিতর বসে আছে। মা-র ভিতরে ভিতরে বড় কষ্ট হতে থাকল। তিনি বললেন, যাও হাবুল, দ্যাখো আমার শিয়রে চাবি আছে, দবজা খুলে চলে যাও। কিন্তু সান্টুকে বলবে, তোমাকে যেন সে সাবধানে পথ পার করে দেয়। তোমরা কিন্তু সেই পুকুরে যাবে না।

— না মা, আমি পুকুরে যাব না। বলে, দরজা খুলে ছুট। ঠিক রাস্তার মোড়ে মৃত এক দেবদারু গাছ, গাছের নিচে সান্টু দাঁড়িয়ে আছে। সে দূর থেকেই চিৎকার করে বলল, সান্টু আমি এসে গেছি।

সান্টু বলল, যাবি? সেই রাজবাড়িতে, সদর দেউড়ি পার হলে ভিতরে পুরানো দেয়াল, ভাঙা পাঁচিল, ফাঁকে ফোঁকরে ইঁদুরের গর্ত — যাবি? ঝোপজঙ্গলে আমরা হারিয়ে যাব। অথবা যেন বলার ইচ্ছা সান্টুর সেই চাঁপাফুলের গাছটা সদর দেউড়ি পার হলে অনেক ভিতরে বড় এক দীঘির মত জলাশয়, জলাশয় পার হলে চাঁপাফুলের গাছ, গাছ থেকে নিরন্তর এক দুই করে চাঁপাফুল ঝরে পড়ছে।

হাবুল বলল, মা জলে যেতে বারণ করেছে। জলে শেকল আছে। জলে নামলেই শেকল এসে আমার পা জড়িয়ে ধরবে।

— শেকল! সে আবার কিরে?

হাবুল প্রায় বিস্মিত হল। এত বড় একটা সত্য ঘটনা সান্টুর জানা নেই, সে এতবড় শহরের সব জায়গায় চলে যেতে পারে -- আর এমন খবর সে রাখে না— ভাবতে অবাক, হাবুল সুতরাং সবটা খুলে বলল, জলের নিচে স্ফটিকস্তম্ভ, ভিতরে ভ্রমর, তার অন্তরে এক পাখীর মত প্রাণ বাস করে। আরো কি সব বলতে সান্টু এক ধমক, দূর বোকা, তোর মা তোকে

অযথা ভয় দেখিয়েছে। চল যাবি। আমি জলে নেমে দেখাবো, জলে শেকল থাকে না, দৈত্য থাকে না। দেখবি দীঘির অন্য পাড়ে কত রকমের গাছ আছে, ফুলের গাছ, ফলের গাছ। আমি পিসিমার জন্য হরতকী ফল নিয়ে আসি।

-- হরতকী আনবি?

-- হরতকী খেলে শরীর ভাল থাকে। আমার পিসিমা রোজ খেয়ে উঠে হরতকী খান। ওঁর কোন অসুখ নেই।

-- আমাকে একটা দিবি? মাকে আমি একটা হরতকী দেব। তবে আমার মা-ও হরতকী খেলে ভাল হয়ে উঠবে।

ওরা রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে প্রায় লাফাতে লাফাতে চলে এল, দেউড়িতে দারোয়ান। সান্টু দারোয়ানকে বলল, আমরা ভিতরে যাব।

দারোয়ান বলল, ভিতরে কি আছে?

-- ভিতরে একটা হরতকী গাছ আছে। আমরা দুজনে দুটো হরতকী নেব। ওর মা-র অসুখ, হরতকী খেলে ওর মা ভাল হয়ে যাবে।

হাবুল ভয়ে বলতে পারল না, সেই চাঁপাফুল গাছটা আছে না, আমরা সেখানেও যাব। চাঁপাফুল তুলে আনব।

চাঁপা ফুল নেবে -- এ-কথা জানতে পারলেই আর দারোয়ান ঢুকতে দেবে না -- ওরা শুধু হরতকীর কথাই বলল।

দারোয়ান লোহার দরজা খুলে দিল। চোখে কালো চশমা, উর্দিপরা দারোয়ান, মাথায় লাল পালকের টুপি, হাতে গাদা বন্দুক, কোমরের পাশে তরবারি ঝুলছে।

হাবুল বলল, সান্টু, আমার ভয় করছে।

-- ভয় কি রে? এখানে কেউ এখন থাকে না। রাজা মোকদ্দমা করতে সেই যে বিলাতে গেছে আর ফিরে আসেনি।

-- আর আসবে না?

-- মোকদ্দমা শেষ না হলে আসে কি করে?

ওরা ভেতরে ঢুকে দেখল সেই সব পুরানো ভাঙা দেয়ালের মাথায় বড় বড় সব অশ্বত্থ গাছ, গাছে রাজ্যের সব পাখী এসে জড়ো হয়েছে। বাড়ির ইঁট কাঠ সব ভেঙে পড়ছে। শার্সি দিয়ে প্রাসাদের ভিতরটা দেখা যায়। বড় বড় আয়নায় সূর্যের আলো এসে পড়ছে আর সব বাড়িটা যেন আগুনে জ্বলছিল। ওরা ছুটে ছুটে পিছনের দিকে যাচ্ছিল। যাবার সময় দেখল -- বাড়ির পিছন দিকটাতে একটা ঈগল পাখী বসে রয়েছে।

সান্টু বলল, বুঝলি হাবুল, এই পাখী উড়ে গেলেই রাজার মোকদ্দমা শেষ হয়ে যাবে।

-- কি যে আজগুবি বলিস না তুই।

-- তোকে সেই সাপের ডিম, বাঘের ডিম এসব গল্প কে বলে রে?

-- কে বলবে আবার, আমার মা বলে।

-- পাখী উড়ে গেলে মোকদ্দমা শেষ -- আমার পিসিমা বলে।

হাবুল ঠোঁট ওল্টাল। ওর মন্দ লাগছিল না। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের পাশে ছোট ছোট ঘর। ঘরের ভিতর এখনও দু'একজন প্রবাসী পুরুষের মুখ, লম্বা দাড়ি। ওরা কিছু হলঘর পার হয়ে এল। কোন মানুষ নেই। তারপর সেই ঝোপের মত জায়গাটা, পাশে বড় দীঘি। দীঘির উত্তর পাড়ে শুধু একটা কাঠের বেড়া। বেড়ার ফোকবে একটা কালো-কোট-পরা হাত। মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা হাত। হাতে বঁড়শি। যেন বেড়ার ও-পাশ থেকে চুরি করে মাছ ধরছে।

হাবুল এবার চেঁচিয়ে উঠল, আমি বলে দেব। তুমি চুরি করে মাছ ধরছ, আমি বুঝি মনে কর কিছু বুঝি না।

আর কি অবাক সে হাতের আঙুলগুলো নড়তে চড়তে দেখল এবং হাতটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সান্টু বলল, — কিরে তুই চিৎকার করছিস কেন?

-- একটা হাত দেখলি কেমন পালিয়ে গেল।

সান্টু বলল, -- কোথায়?

-- ঐ যে ও দিকটায়।

-- ওমা ওটা একটা কালো বেড়াল। লাফ দিয়ে বাইরে চলে গেল।

হাবুলের বুকটা দূর দূর করে কাঁপছে। কে যেন আবার ওকে বড় মাঠে নিয়ে যেতে চায়। হাবুল কিছুতেই আর পুকুরের পাড়ে পাড়ে হাঁটছে না। এই কালো জলের ভিতর থেকে একটা শিকল ঠিক সাপের মত উঠে আসবে এবং পায়ে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু অবাক, সান্টু প্যান্ট খুলে জলে নেমে গেছে। সে কেমন চিৎ হয়ে উপুড় হয়ে সাঁতার কাটছে। কোথায় সেই শেকল, কালো বেড়ালের মুখ অথবা ... অথবা— এই কি হচ্ছে, কি রে তুই, কি করছিস? সান্টু জল থেকেই চিৎকার করতে লাগল।

তুমি বড় বাহাদুরি নিচ্ছ সান্টু। আমিও জানি। তুমি পানকৌড়ির মত ডুবে ডুবে বাহবা দেখাবে আর আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখব। হাবুল ডাকল, আমিও সাঁতার কাটতে জানি। ওপারে গেলেই আমি হরতকী পাব। চাঁপাফুলের গাছ পাব। হাবুল সেই কবিতার কথা মনে করতে পারল। 'জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার।' সব এতদিন তাকে ভয় দেখিয়ে ঘরে বেঁধে রেখেছিল। জলের ভয়, কালো কোটের ভয় এবং দূরে এক মাঠ আছে, মাঠ পার হলে ফেরা যায় না এমন ভয় দেখিয়ে ঘরের বার হতে দেয়নি। হাবুল এবার ভয়ের কথা ভুলে গেল, ঘরে ফেরার কথা ভুলে গেল। সে জলে নেমে গেল ওপারে ওঠার জন্য। ওপারে গিয়ে উঠতে পারলেই সেই অমৃতফল। ফল নিয়ে যেতে পারলে মা-র আর কষ্ট থাকবে না। মা-র জন্য জলের ভিতরে সে হরতকী ফলটা ধরতে গেল। ফলটা ফুল হয়ে গেল, চাঁপা ফুল, তারপর কালো বেড়ালের মুখ হয়ে গেল এবং মনে হল অবশেষে একটা কালো-কোট-পরা হাত ওর দুপায়ে জড়িয়ে ধরেছে। ওকে জলের নিচে ক্রমে সকলে মিলে টেনে নিচ্ছে। সে ক্রমশ কিছু আর দেখতে পাচ্ছিল না। কেবল বিকেলের হলুদ পাখীটা ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে -- সে বিকেলের হলুদ পাখীটাকে জলের নিচে ধরার জন্য ছটফট করতে লাগল।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৩০/ সংখ্যা ৩: ১৩৭৫]

পাহাড়প্রমাণ

দিব্যেন্দু পালিত

[জন্ম ১৯৩৯ সালে ভাগলপুরে। গল্প, উপন্যাস ও কবিতা লেখায় সমান দক্ষ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: অনুভব, ঘরবাড়ি, চিলেকোঠা, ঢেউ, ইত্যাদি।]

অরুণা ঘরে ঢুকে চলে যাচ্ছিল; বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে সুধাকর ওর শাড়ির আঁচল চেপে ধরল।

অরুণা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। পাঁচ-সাত মিনিট আগেও সে এ-ঘরে এসেছিল – সুধাকর তখনো শুয়ে, পাশবালিশটা বুকের কাছে জড়ানো। মাথার দিকে জানালাটা খুলে দেবার সময় অরুণা ওর মৃদু নাকডাকার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। এখন সুধাকরের আকস্মিক ব্যবহারে ও বিব্রত হল।

সুধাকর হাসছিল। অরুণার আঁচল তখনো ওর হাতের মুঠোয়, বুকের ওপর কাপড় নেই, ক'পাক ঘুরে অরুণা তখন কিছুটা দূরে। সেই অবস্থায় ক'পলক তাকিয়ে সুধাকর ওর শরীর দেখল। অরুণার চোয়াল ও চিবুক ভারি, মাঝারি কপাল, ঘাড়ে বেশি মাংস থাকার দরুন গ্রীবায় টান-টান ভাবটুকু অদৃশ্য, স্থূল কোমর সমতা হারিয়ে নিতম্বের উচ্চতায় এক হয়ে গেছে।

একটু তাকিয়ে থেকে মুঠো শক্ত করে অরুণাকে কাছে টানার চেষ্টা করল সুধাকর। অরুণা বিরক্ত হল, আঁচলটা সুধাকরের মুঠো-মুক্ত করার চেষ্টা করে বলল, – ছাড়ো।

সুধাকর ছাড়ল না। সকালের আলস্য তার চোখে, বেলা পর্যন্ত ঘুমনোর ফলে চোখ মুখ ফুলেছে। অল্প হেসে বলল, – দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের গল্পটা জানো?

– কেন!

– ইন্টারেস্টিং! সেই দৃশ্য যারা দেখেছিল তারা কতো ভাগ্যবান!

– আমি দ্রৌপদী নই।

আঁচলটা এবার শক্ত হাতে কেড়ে নিল অরুণা। বিছানার ওপরেই খানিকটা গড়িয়ে এসে হাল ছেড়ে দিল সুধাকর।

– সাত সকালে কি অসভ্যতা শুরু করেছো! কাপড় গুছিয়ে তিরস্কারের চোখে অরুণা স্বামীর দিকে তাকাল,– খুকু আছে, মা আছে। দিন দিন তোমার আক্কেল যেন বাড়ছে। বয়স আছে নাকি!

– কার? তোমার, না আমার?

বিছানার ওপর বাবু হয়ে উঠে বসে বালিশটা কোলে টেনে নিল সুধাকর। স্ত্রীকে

চুপচাপ দেখে বলল, – চল্লিশে আমাদের দ্বিতীয় যৌবন শুরু হয়। শুনলে না, খুকু কাল কি বলছিল?

– কি বলছিল–

অরুণা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। ঘরের কোণে দেয়াল ঘেঁষে তাদের মালপত্তর সাজানো। বড় ট্রাঙ্কের ওপর দুটো বড় স্যুটকেশ, তার ওপর আবার ছোট দুটো। কথাটা আলগোছে স্বামীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ছোট স্যুটকেশ দুটো নামিয়ে ওপরের বড় স্যুটকেশটার দিকে হাত বাড়ালো অরুণা।

সুধাকর ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছিল। একমুখ ধোঁয়া টেনে বলল, – ঐ যে গো, জামাইবাবু, দিদির পাশে আজকাল আপনাকে কেমন বাচ্চা বাচ্চা লাগে!

– আদিখ্যেতা রাখো। তোমার সঙ্গে রসিকতার সময় নেই।

স্যুটকেশ থেকে একটা ফর্সা, পুরনো শাড়ি বের করে দু আঙুলের চাপে ফর ফর করে ছিঁড়ে ফেলল অরুণা। অল্প পরিশ্রমেই ও হাঁফিয়ে উঠেছিল। দূর থেকে সুধাকর ওর কপালে ঘামের বিন্দু দেখল, বুকের ওঠা-নামা লক্ষ করল।

– বড় বেরসিক তুমি হে। হালকা গলায় বলল সুধাকর, – এই সকালে রাগ করে শাড়িটা ছিঁড়ে ফেললে!

স্বামীর উপহাস গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না অরুণা। চোখ মুখ তখনো কোঁচকানো, বলল, – খুকুর হঠাৎ শরীর খারাপ হয়েছে। ধিঙ্গি মেয়ে, এখনো নিজে কিছু শিখল না! আমার হয়েছে ঝামেলা–

– ওঃ, এই! সে তো সুখবর, ঋতুমতী রমণীরে করহ যতন। উধর্ববাহু হয়ে আড়মোড়া ভাঙল সুধাকর, – তা কাপড় কেন?

– ওসব নেই। কবে কার কি হবে আমি কি হাত গুনব!

– কি আর করা! স্ত্রীকে বিরক্ত দেখে শব্দ করে হাসল সুধাকর,– এ ব্যাপারে তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না। আমাদের সাবজেক্ট হলে–

– তোমাদের সাবজেক্টে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই। দেখি, সরো –

হ্যাঁচকা টানে সুধাকরের কোল থেকে বালিশটা কেড়ে নিল অরুণা, ব্যস্ত হাতে মশারির দড়ি খুলে ফেলল। সুধাকর ততক্ষণে বিছানা থেকে নেমে পড়েছে। রবারের চটিটা পায়ে গলিয়ে, পাজামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে জানালার কাছে গেল। রৌদ্ররেখায় ধুলোর রেণু উড়ছে। পাঠকবাবু ঠিকই লিখেছিল, জায়গাটা স্বাস্থ্যকর। হাওয়া আছে অফুরন্ত, প্রচুর আলো আর রোদ্দুর; ছুটিছাটায় বেড়ানোর পক্ষে আদর্শ। সুধাকর খানিক রোদ দেখল, খানিক অরুণাকে।

মশারি, বালিশ ঠিকঠাক রেখে, বেডকভার বিছিয়ে, কাপড়ের টুকরোটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে অরুণা বলল, – তোমার সঙ্গে এখানে আসাই আমার ভুল হয়েছিল।

স্ত্রীর যাবার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সুধাকর। যেন সে জানত অরুণা এই কথা বা

এইরকমই কোন কথা বলবে। সে তৈরী ছিল। কোন্ কথায় অরুণার কি প্রতিক্রিয়া হয়, অরুণা কোথায় নরম, কোথায় তার জ্বালা, অরুণার প্রতি মুহূর্তের প্রত্যেক আচরণ, এমনকি তার নিঃশ্বাস পড়ার সূক্ষ্মতম শব্দটি পর্যন্ত সে অনায়াসে বিশ্লেষণ করতে পারে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে হাতের সিগারেটটা শেষ করল সুধাকর।

জায়গাটা ভালই। সত্যি বলতে, চিঠিতে যা লিখেছিল, ভাল লাগার ব্যাপারে সে তার চেয়ে কিছু বেশিই পেয়েছে। যে-ধরনের চাকরি, তাতে ছুটি সে বড় একটা পায় না। বড় ছুটির মধ্যে পূজোর ক'টা দিন; শুয়ে বসে, বাজার করে, কিংবা বই পড়ে, হাই তুলতে তুলতে কেটে যায়। তার ওপর আছে টুলটুলের ভাবনা। বছরে দুবার কার্সিয়াংয়ের স্কুল থেকে তাকে নিয়ে আসতে হয়, ছুটির শেষে রাখতে যেতে হয় আবার। ওর ঝক্কি পোহাতেই অস্থির। অরুণা ঘরকুনো, অল্পেই খুশি, অভ্যাস সম্পর্কে ভয়ঙ্কর সেনসিটিভ। সহজে নড়তে চায় না।

এবার সুযোগ জুটে গেল। টুলটুল গেল, তারপরেই বরুণারা এল। মা ও মেয়ে। সঙ্গ গুণে অরুণাও বদলে গেল রাতারাতি। চল, বেরিয়ে পড়া যাক। একানুবর্তিতার বাইরে ক'টা দিন ঘুরে আসা সুধাকরের মন্দ লাগছিল না। আঃ, কতোদিন পরে সে এই মুক্ত প্রকৃতির, পরিচ্ছন্ন রোদ্দুর, সু-বাতাস ও অপরিমেয়তার সান্নিধ্য পেল!

সামনে করিডোরের মতো ফালি জায়গা, তারপর বারান্দা, কোমর-উঁচু রেলিং, রেলিংয়ের দুধারে বাগানের মধ্যে দিয়ে অপরিসর সুরকির পথ গেট পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে সুধাকর নিরাকার শালবন, পাহাড়ী রাস্তা, ঝকঝকে আকাশ, সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। ছিমছাম হাওয়ায় নতুন পাতার গন্ধ ভেসে আসছে। রাতে হয়তো বৃষ্টি হয়েছে; রোদ উঠলেও সুরকির পথ এখনো ভিজে। ওপরে তাকিয়ে সুধাকর সেই ভিজে, ঈষৎ বনজ ঘ্রাণ নিল।

অরুণা সেই যে গেছে তারপর আর দেখা দেয় নি। বারান্দার একদিকে বেতের গোল টেবিল ঘিরে চেয়ারগুলো এলোমেলো ছড়ানো। এত নিঃশব্দ চতুর্দিক যে মনে হবে এই মুহূর্তে সুধাকর ভিন্ন বাড়িতে দ্বিতীয় কেউ নেই। অরুণা গেল কোথায়!

বুঝতে না পেরে সুধাকর ঘরের দিকে যাচ্ছিল, দেখল কেয়ারির পাশ দিয়ে হেঁটে বরুণা আসছে। সুধাকর ভিতরে গেল না। তীব্র বনজ গন্ধ ওকে বার বার অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল।

-- গুডমর্নিং, জামাইবাবু।

-- গুডমর্নিং। এসো খুকু --

বরুণার পায়ের পাতা অদ্ভুত সাদা। ছোট ও নিটোল, পায়রার মাথার মতোন গোড়ালি, হালকা পা ফেলে এগিয়ে আসার সময় ও যেন সুরকির ওপর ছোট ছোট টোকা দিয়ে আসছে। সিল্কের শাড়ি পরার দরুন বরুণার অস্ফুট স্তন, নাভির ওপর ঈষৎ উঁচু গোল পেট, উরু, হাঁটুর হাড় ইত্যাদি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

-- কোথায় গিয়েছিলে, খুকু?

-- ঐ তো, টিলার কাছে। জামাইবাবু, ওখানে দুটো সাঁওতাল মেয়ে ফল বিক্রি করছে। দে আর সো লাইভলি!

-- ওরা এমনিই। সুধাকর থামল একটু, -- তোমার মা কোথায়?

-- জানি না তো। বোধহয় পুজোয় বসেছেন।

-- তুমি আজ শাড়ি পরেছ যে! সুধাকরের ঠোঁট সিরসির করছিল। সিগারেট খুঁজল, পেল না।

-- দিদি বলল -- বরুণার চোখ নামানো। চাপা, পাতলা ঠোঁটে হাসলে ঠোঁটের দুদিকে কোলন ড্যাশের মতো সমান ভাঁজ পড়ে। আমার হ্যাবিট নেই, এক পলক সুধাকরকে দেখে নিচু গলায় বরুণা বলল -- মাদাররা বলেন, অ্যাট দিস্ এজ ইউ শুড্ ওয়্যার স্কার্টস্। দ্যাট কীপস্ ইওর মাস্ল্স ফ্রী। জামাইবাবু, আমাকে মানায়?

-- চমৎকার। এসো, তোমাকে ফুল চিনিয়ে দিই। হিয়ার উই হ্যাভ প্লেন্‌টি অফ দেম।

-- তোমার চা দিয়েছি --

বরুণার এক পা সিঁড়িতে, আর এক পা বারান্দায়। হাওয়ায় পুবের টান। বরুণা যাদের দেখেছিল টিলার কাছে, মাথায় ঝুড়ি নিয়ে সেই ওঁরাও যুবতীদের টিলার পাশ দিয়ে ঢালু সমতলে নেমে যেতে দেখল সুধাকর।

চায়ের কাপ হাতে অরুণা দাঁড়িয়ে ছিল। সুধাকর এগিয়ে গিয়ে কাপটা ওর হাত থেকে নিল। অরুণা বোধহয় নিজের হাতেই চা করেছে, গরম ভাপ লেগেছে মুখে। গলায় ঘাম, খুচরো কয়েকটা চুল কপালে জড়ানো।

-- রাত্রে কি তোমার ঘুম হয়নি! চায়ের কাপে আস্তে চুমুক দিল সুধাকর,-- তোমাকে ক্লান্ত লাগছে! কি খুকু, আর এক দফা হবে নাকি? তোমার দিদি আজ চা'টা ভালই বানিয়েছে।

-- কেন, আগে কি কখনো ভাল চা খাওনি? ক্ষুব্ধ চোখে স্বামীকে দেখল অরুণা, চাহনিতে ভ্রূকুটি ও সন্দেহ, গলায় শ্লেষ। কেমন অবলীলায় এই মানুষটি একসঙ্গে দুটো কথা, দুধরনের কথা বলতে পারে ভেবে অবাক হল ও।

সুধাকর গা করল না। অরুণাকে কিছু নতুন দেখছে না। এই মুহূর্তে বলে নয়, কিছুদিন থেকেই লক্ষ করছে সুধাকর, অরুণা যেন ঠিক আগের অরুণা নেই-- যে-অরুণাকে সে দেখেছে কলকাতায়, বাড়িতে; যখন সে আজকের সুধাকর হয়ে ওঠেনি তখন থেকে, লণ্ঠনের পোড়া আলোয় বা ফ্লুরোসেন্ট টিউবের নিচে, সুখে, দুঃখে, যে-অরুণা টুলটুলের মা, শান্ত ও নির্বিকার, অভিযোগহীন। আজ হঠাৎ তার এত অনুযোগ কেন! বীতরাগ কেন! কথায় কথায় এমন প্রবঞ্চনা কেন!

চায়ের কাপ হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সুধাকর। অরুণাকে কিছু বলবে কি না ভাবল। হঠাৎ-বিমর্ষতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তোমার বোন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ; আমাকে সমীহ না করো, উপেক্ষা করো না। এই কথাগুলো মনে মনে ভাবল সুধাকর, বলা প্রয়োজন মনে করল। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারল না।

সুধাকরকে চুপ করে থাকতে দেখে অখুশি হল অরুণা। সব সময় মানুষের মেজাজ ভাল থাকে না, দু-চারটে বেফস্‌কা কথা মুখ থেকে বেরিয়েই পড়ে। তা বলে তুমি অগ্রাহ্য করবে, হেনস্তার ভাব দেখাবে, তাই বা কেমন কথা!

বিভ্রান্ত সুধাকর আস্তে হেঁটে গিয়ে চেয়ার টেনে বসল। কতো বেলা এখন! ঘর থেকে বেরুবার সময় দেখেছিল সাড়ে সাতটা। যাই হোক, সুধাকর ব্যস্ত বোধ করল না।

অরুণা তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। বরুণার চোখ নিচু, না-দেখার মতো করে ফুলের কেয়ারি দেখছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাবার উপক্রম করল অরুণা।

-- যাচ্ছ কোথায়?

-- কেন! যেতে যেতে ফিরে দাঁড়াল অরুণা,-- কি বলবে তাড়াতাড়ি বল। আমার কাজ আছে।

-- এত কি কাজ তোমার! অসহিষ্ণুর মতো সিগারেট খুঁজল সুধাকর। কলকাতায় কাজ, এখানেও কাজ! দু'দন্ড বসলে কোন রাজ্যপাট যাবে!

-- আজ তোমার কাজ নেই, তাই বলছ! রুক্ষ গলায় বলল অরুণা,-- আমি আর কোন দিন হাঁফ ছেড়ে বসে থেকেছি!

অরুণা আর দাঁড়াল না।

সুধাকরের ভাল লাগল না। আজকের সকালটা ছিল সুন্দর, যত রোদ তত হাওয়া, বৃষ্টির জলে ভেজা সজীব তৃণ ও গাছ, পাতার মোলায়েম গন্ধ থেকে থেকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে : সুধাকরের মনে ক্রমশ একটা ঠাণ্ডা আমেজ ছড়িয়ে পড়ছিল। অরুণা যেন সব গণ্ডগোল করে দিয়ে গেল। বস্তুত, সুধাকর অনুভব করছিল, দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের কোথায় যেন এক অদৃশ্য ফাটল ধরেছে, সে অনুভব করে অথচ স্পর্শ করতে পারে না -- কবে, কোন মুহূর্তে বা কোন প্রশ্নে এর সূচনা বোঝা যায় না, কিন্তু, ধরাছোঁয়ার বাইরে এই ব্যবধানের চেয়ে বড় সত্য আজ আর কিছুই নেই। এই মুহূর্তে ব্যাপারটা চিন্তা করে ক্ষুব্ধ হল সুধাকর। ধোঁয়ায় গলার কাছে নিঃশ্বাস কুন্ডলীকৃত হতে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। এতক্ষণে তার খেয়াল হল বরুণা দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

-- খুকু, এখানে এসো। গলায় যতোটা সম্ভব স্নেহের টান এনে সুধাকর বলল,-- খুঁজে দেখ, আমার মাথায় আর ক'টা চুল পেকেছে।

-- আহা, আপনি যেন কতো বুড়ো!

বরুণা কাছে এল। কানের পাশে সুধাকর ওর নরম, হালকা স্পর্শ পেল। বরুণা খুঁজছে, ঘন চুলের ভিতর দিয়ে বরুণার আঙুল ওর চাঁদির ওপর নখের মৃদু আঁচড় কাটছে। সুধাকর একটা গন্ধ পাচ্ছিল, নতুন ধানের গন্ধের মতো, রহস্যময়।

-- জামাইবাবু, সেই গল্পটা আপনি ফিনিশ করেন নি--

-- কোনটা?

-- কাল ইভনিংয়ে যেটা বলছিলেন। সেই যে, আপনাদের রোমান্স --

-- ও, হ্যাঁ, সুধাকর হঠাৎই স্মরণ করতে পারল,-- কতোটা বলেছিলাম যেন?

-- সেই যে দিদিকে সাইকেলে বসিয়ে ময়দানে ঘুরছিলেন আপনি --

-- দাঁড়াও, ভেবে দেখি।

চোখ বন্ধ করে কাল কতোটা বলেছে, কি বলেছে, মনে করার চেষ্টা করল সুধাকর। আবছাভাবে তার কিছু কিছু মনে পড়ছিল। পুরো ঘটনা, অর্থাৎ তার আগে ও পরে কি ঘটেছিল ঠিক স্মরণ হচ্ছিল না। একবার সুধাকরের মনে হল তখন বর্ষাকাল, বৃষ্টি পড়ছিল অঝোরে, ঘন মেঘ ঝড়ের সঙ্গে মিশে আকাশ তোলপাড় করে ফিরছে, নির্জন প্রান্তরে অরুণাকে নিয়ে দ্রুত সাইকেল ছুটিয়ে চলেছে সে। পর মুহূর্তেই ভাবল সুধাকর, যেটুকু মনে পড়ে, এরকম ভীরু পলায়নের কোন ছবি তার স্মৃতিতে নেই। তাহলে কি তখন শীতের সময়, না কি বসন্ত! সময়টা সকাল না বিকেল! বরুণার সূত্রটা এই মুহূর্তে তার কাছে কেমন হেঁয়ালির মতো মনে হল।

নিজেকে অসম্ভব বিমূঢ় লাগল সুধাকরের। এটা ঠিক, ঘটনাটা সে বানিয়ে বলে নি। বরুণাকে জিজ্ঞেস করলে সে হয়তো আগের ঘটনা, সুধাকর যে-রকম বর্ণনা করেছে, ঠিক ঠিক বলে দিতে পারবে। সে-বড় লজ্জার ব্যাপার।

অসহায়ের মতো খানিক আত্মস্থ হবার চেষ্টা করল সুধাকর। অল্প ঘাড় ঘুরিয়ে বরুণাকে দেখল। বরুণার আঙুল তখনো ওর চুলে; পিঠের কাছে ঘন হয়ে থাকায় সুধাকব ওর ছোট স্তনের আলতো স্পর্শ পাচ্ছে; বাহুর খানিকটা, ধূসর কনুই ও খয়েরি ব্লাউজের কিয়দংশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।

গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে, কিছু বা ক্লান্ত গলায় সুধাকর বলল, -- খুকু, তোমাকে আমি পুরোটাই বলব --

দুপুরে খাবার পর আলস্য লাগছিল। মনে একটা খটকা ছিল, সকালের ঘটনা, ভুলে-যাওয়া গল্পটা সারাক্ষণ মনে করার চেষ্টা করছিল সে। বিছানায় শুয়ে অস্বস্তিতে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করল, একাগ্র হবার চেষ্টা করল। পারল না। যেন তার চোখেব সামনে কেউ একটা মুন্ডহীন ধড় মেলে ধরেছে, দ্যাখো, একে চিনতে পার কি না, এ তোমাব পরিচিত, হাত পা সমগ্র অবয়ব খুঁটিয়ে দেখ, চিনতে পার কি না।

জানালাব পাশে টুলের ওপর বসে অরুণা উল বুনছে। যে-কোন শব্দেই ও মুখ তুলে বাইরে তাকিয়ে দেখছিল। দুজনে অনেকক্ষণ কাছাকাছি আছে। এর মধ্যে শুধু একবাব প্রশ্ন করেছিল অরুণা, -- আমরা কবে ফিরছি? ওর কথার অর্থ ঠিক ধরতে না পেবে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল সুধাকর, -- কেন?

-- জানি না, একটু ভেবে অরুণা বলল, -- এই ফাঁকা বড় অসহ্য লাগছে।

সুধাকর অরুণাকে দেখল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে; অরুণাকে কথাটা জিজ্ঞেস করবে কি না ভাবল। অরুণার হয়তো সবই মনে আছে, ও হয়তো বলতে পারবে।

অরুণা --, খুব কাছের গলায় ডাকল সুধাকর।

নিচু হয়ে পায়ের পাতা চুলকে নিল অরুণা, শাড়িটা নামিয়ে দেখল সুধাকরকে।

-- তোমার মনে পড়ে, অনেক দিন আগে একদিন তোমাকে সাইকেলে চড়িয়ে ঘুরিয়েছিলাম --

কবে! অরুণার স্বরে বিস্ময় ফুটল; কাঁটা তুলে ঘাড়ের কাছে খুঁচিয়ে নিল। হাই তুলে হাত চাপা দিল ঠোঁটে।

-- আমার মনে নেই। হঠাৎ বলছ যে!

-- তোমার কিছুই মনে থাকে না! বারো কি পনেরো বছর আগেকার কথা, তাও না! কি মন! হোপলেস্! লোকে গত জন্মের কথা মনে রাখে!

-- অযথা আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন! অরুণা বিরক্ত। কখন তোমার প্রাণ উথ্‌লে উঠবে, আমাকে কি সেজন্য তৈরী থাকতে হবে! আমার কিছুই মনে নেই....

-- তা থাকবে কেন! তোমার মন কোথায় থাকে আমি জানি।

-- ইতরের মতো কথা বলো না। তোমাকে আমি চিনেছি --

-- কি বললে! আমি ইতর। তুমি কি, তুমি একটা --

-- একটু আস্তে --। তোমার সম্ভ্রমবোধ না থাকতে পারে, আমার আছে। ওরা শুনতে পাবে। উত্তেজনায় গলা কাঁপছিল অরুণার, -- এই তামাশা আর ভাঁলো লাগে না!

-- ভালো না লাগলে ছেড়ে দিলেই পার। কেউ তোমায় আটকে রাখে নি!

-- জানি, তাহলে তুমি বেঁচে যাও। অরুণা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অরুণা চলে যেতে সুধাকর কুঁকড়ে গেল। এভাবে কথাটা বলা উচিত হয় নি। অরুণার দোষ কি! সে নিজে যদি একটা জিনিস ভুলতে পারে, অরুণা কেন পারবে না! অথচ, একই সময়ে, সুধাকর এটাও বুঝতে পারছিল, কথাটা সে এভাবে বলতে চায় নি, হঠাৎ বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। আজকাল প্রায়ই এমন হয়, নিজের ওপর কোন অধিকার থাকে না, হঠাৎই সব-কিছু গোলমাল হয়ে যায়। অসহায়তার ভিতর পূর্বাপর অনেক কথা মনে পড়ল সুধাকরের। এতদিন তেমন করে ভাবে নি, আজ মনে হয় অরুণা চলে গেছে দূরে; এই দূরত্ব থেকে তার নাগাল পাওয়া কঠিন।

আলস্যে হাই তুলল সুধাকর। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুলো। এখন তার কিছুই করার নেই। অরুণা নিশ্চয় পাশের ঘরে গেছে। ওখানে বরুণা আছে, ওদের মা আছেন। বিকেলে পাঠকবাবুর গাড়ি নিয়ে আসবার কথা। আচ্ছন্নতার মধ্যেই বরুণাকে হাসতে শুনল সুধাকর। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল সুধাকর। স্বপ্নের ভিতর টুলটুলকে দেখল -- সে, টুলটুল আর অরুণা ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। তারপরেই হঠাৎ কার্সিয়াংয়ের পাহাড়ী রাস্তায় টুলটুলকে দৌড়তে দেখল। টুলটুল ছুটছে, সুধাকর দেখছে; হঠাৎ একটা বিশ্রী তারস্বর চীৎকার শুনল সুধাকর। ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভাঙার পরও পরিষ্কার স্বপ্নটা মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারল সুধাকর এবং পুরোপুরি স্বপ্নটাকে ধরে রাখতে পেরেছে ভেবে খুশি হল। পর মুহূর্তেই নতুন চিন্তা এসে বিঁধল তাকে। স্বপ্নের ভিতর, মনে পড়ে, সে একটা চীৎকার শুনেছিল। কার চীৎকার! টুলটুলের! নাকি অরুণার! ভীত, বিহ্বল, সুধাকরের হঠাৎ মনে হল, অসম্ভব নয়, চীৎকারটা তার নিজেরও হতে পারে।

বিকেল; সুধাকর নিজেই স্টিয়ারিং ধরল। গাড়িতে উঠে বরুণাকে ডাকল, -- খুকু তুমি সামনে এসো। আমার পাশে --

গাড়িটা ছোট। পাঠকও সামনে বসেছে। বরুণা একবার পাঠককে দেখল, তারপর দিদিকে। অরুণা অন্যমনস্ক, বাইরে মুখ করে বসে আছে। তারা ছাড়াও এ-গাড়িতে একজন মহিলা আছেন, পাঠকের স্ত্রী, নিতান্ত ভদ্রতা করেও তাঁর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলা উচিত, অরুণা যেন তা খেয়াল করে নি। অরুণাকে দেখে এই প্রথম মনে হল বরুণার, দিদি কেমন অখুশি ও বিরক্ত, অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধু সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে।

গাড়ির দরজা খুলে উঠতে উঠতে বরুণা বলল, -- জামাইবাবু, আপনার অসুবিধে হবে না তো?

-- না, মোটেই না। সুধাকর সরে গিয়ে বরুণাকে বসার জায়গা করে দিল। গিয়ার চেঞ্জ করে বলল, -- তুমি হলে আমার স্টেপনি। তোমার ভরসাতেই তো যাওয়া।

সুধাকরের কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল পাঠক। বরুণা অসহায়ভাবে তাকাল সুধাকরের দিকে। ঢালু রাস্তায় গাড়িটা প্রায় গড়িয়ে চলল। তারপর সমতল। সুধাকর বাঁ দিকে বাঁক নিল। দু পাশে লম্বা গাছের সারি, উঁচু-নিচু জমি, সমতলের রাস্তাও সহজ নয়। ইতস্তত ছড়ানো পাথরের টুকরোয় ধাক্কা খেয়ে গাড়িটা মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠছিল।

-- আই কুড'নট্ ফলো -- , পুরনো কথার জের টানল বরুণা, -- জামাইবাবু, আপনি কি বললেন! স্টেপনি কি?

-- স্টেপনি বোঝ না! শব্দ করে হাসল সুধাকর, -- পাঠকবাবু, আপনার গাড়িতে স্টেপনি আছে তো? না কি চার চাকাই ভরসা!

-- যা বলেছেন স্যার, চার চাকাই ভরসা। আমার কপালে ওসব জোটে নি। নিজের রসিকতায় মুগ্ধ পাঠক খানিক মোটা গলায় হেসে নিল। হাসির শব্দ মিলিয়ে যেতে, নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সুধাকরের মনে হল ছায়াঘন আকাশ ক্রমশ নিচু হয়ে আসছে। না কি মেঘ? বলা যায় না। এখানে কখন কি হয়, হাওয়ার চাল কখন কোনদিকে, অনুমান করা কঠিন। সুধাকর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। আবার ঢালু পথ, অল্প খাড়াই থেকে থেকে হার্ডল সৃষ্টি করছে। মেঘ আছে কি না দেখবার জন্য চোখ তুলল সুধাকর।

অরুণা দেখল সুধাকর অন্যমনস্ক; বাকি সবাই চুপচাপ, এমনকি বরুণাও। গাড়িটা ঝোঁকের মাথায় নেমে চলেছে। এতক্ষণ ওরা কি কথা বলছিল, কেন হাসছিল, ওদের হাসিঠাট্টার কিছু মনে আছে কি না মনে করার চেষ্টা করল অরুণা। মনে পড়ে না। তাহলে কি সারাক্ষণ, এই সারাটা পথ সে অন্যমনস্ক ছিল।

গাড়ির ঝাঁকুনি ও সম্মুখের শূন্যতায় আলস্য লাগছিল বরুণার। সুধাকরের পেশির চাপ তার কাঁধের ডান দিকে অনেকটা অংশ অবশ ও শিথিল করে দিয়েছে, অনুভূতির মধ্যে মন্থর অবসাদের ভাব ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। ছোট হাই তুলে হাতে মুখ চাপা দিল বরুণা। সীটের পিছনে মাথাটা হেলিয়ে দেবার আগে ও পিছন ফিরে অরুণাকে দেখল। দিদি, তুই এত চুপ কেন, বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে পারল না। সামনের দিকে তাকিয়ে ভীত, আর্ত একটা চীৎকার বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে।

চকিতে গাড়িটা এক দিকে কাত করে, চূড়ান্ত চেষ্টায় থামিয়ে ফেলল সুধাকর। উত্তেজনায় তখনো তার নিঃশ্বাস দ্রুত। সামনে চড়াই। জানোয়ারটা শিং দুলিয়ে ছুটতে ছুটতে প্রায় অর্ধেক উঠে এসেছিল, চড়াই বলেই আগে বোঝা যায় নি। ক' মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, গাড়িটা দেখল। তারপরেই বিরাট অবয়ব নিয়ে নিমেষে পিছন ফিরে উধাও হল।

-- কিভাবে চালাও! মারবে না কি!

স্ত্রীর কথায় আমল না দিয়ে আবার গাড়ি স্টার্ট করল সুধাকর। উত্তেজনা কমে আসায় খুচরো ঘাম জমে উঠল কপালে।

-- এত মৃত্যুভয় তোমার!

-- নিজের কথা বলিনি। অরুণার গলা বেশ আর্দ্র। একটু চুপ করে থেকে বলল,-- নিজের জন্যে আর ভাবি না।

সুধাকর কথা বাড়াল না। এতক্ষণে তাব ক্লান্ত লাগছিল নিজেকে।

কিছুক্ষণ কাটাল। দুপাশের শালবন ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। সামনের রাস্তাও আর তেমন প্রশস্ত নয়।

-- স্যার, আজ আর দুর্গ দেখা হবে না। বরং বাঁ দিকে চলুন। পাঠক বলল, -- কাছাকাছি একটা পাহাড়ী ঝর্ণা আছে। সাইট ভালো, টিলার ওপর থেকে দেখা যায়।

-- কতো দূর এখান থেকে?

-- কাছেই। মুখ বাড়িয়ে আকাশ দেখল পাঠক। মেঘ করেছে, হয়তো বৃষ্টি হবে। দূরে গিয়ে কাজ নেই।

সুধাকব জবাব দিল না। অরুণা কি বলল এবং যা বলল কেন বলল, অনুভব করার চেষ্টা করল সে । কথার ধরনেই বোঝা যায় অরুণা নিশ্চিত কিছু 'মীন' করেছে। সুধাকবের মুহূর্তের ত্রুটি ও অন্যমনস্কতা হেতু যদি তেমন কোন অঘটন ঘটত, যার ফল হত অনিবার্য ও ভয়াবহ, -- অরুণা যেন বুঝিয়ে দিল সে-রকম কিছুর জন্যও সে তৈরী ; তার কোন ভাবনা নেই। অরুণা কি তার জন্য চিন্তিত, না বরুণার জন্য! বোঝা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না!

মনের এই অনিশ্চিত অবস্থায় সুধাকরের হঠাৎ সেই বিস্মৃত গল্পটির কথা মনে পড়ল। বরুণা সেই ঘটনার শেষ শুনতে চাইবে। তখন কি বলবে সুধাকর; কি বলতে পারে বরুণাকে!

ব্যাস, এইখানে --

মাঠের ওপর দিয়ে খানিকটা ছুটে গিয়ে গাড়ি থামল।

-- স্যার, আপনি যেন কেমন আনমাইন্ডফুল হয়ে গেছেন! আক্ষেপ করল পাঠক, -- এতটা রাস্তা এলেন, কিছুই তাকিয়ে দেখলেন না!

-- দেখেছি তো। গাড়ি থেকে নেমে সিগারেট ধরলো সুধাকর। প্যাকেটটা এগিয়ে দিল পাঠকের দিকে। -- চমৎকার জায়গা, ফুল অফ ন্যাচারাল বিউটি! থেকে যেতে ইচ্ছে করে।

চতুর্দিকে তাকিয়ে অনতিদূরে পাহাড়ের সারি দেখল সুধাকর। হয়তো পাহাড় নয়, ওগুলো সত্যিই টিলা — দূরে থাকার জন্য পাহাড় বলে ভুল হয়। আকাশ ঘন হয়ে আসছিল ; ম্লান সূর্যালোক দিনের শেষে পৌঁছে শেষবারের মতো প্রকৃতি ও চরাচরের ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। আকাশের ভাবগতিক ভালো নয়। সুধাকরের মনে হল যে-কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

— ঝর্না কোথায় মশাই? টিলার কাছে নাকি?

— উঠলে দেখা যাবে। খাড়াই তেমন নয়। পাঠক বলল, — কেন, শব্দ শুনছেন না?

সুধাকর কান পাতল। সত্যিই জল পড়ার কোন শব্দ শোনা যায় কিনা অনুধাবনের চেষ্টা করল। এলোমেলো, অস্থির হাওয়ায় তেমন কিছুই শোনা যায় না। সুধাকর বলল, — কই, না!

— জামাইবাবু, আমি কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। সামনে হাঁটতে হাঁটতে বরুণা বলল, — আপনি বোধহয় কালা হয়ে গেছেন —

— তোমার দিদি বলে বধির, সুধাকর হাসল, -- আমি নাকি অন্ধ; তাকে দেখি না, তার কথা শুনতে পাই না। কিন্তু জলের শব্দ শুনতে পাব না এ কেমন কথা!

অরুণা কিছুটা পেছিয়ে পাঠকের বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সুধাকর একটু দাঁড়াল, অরুণার জন্য অপেক্ষা করল। অরুণা কাছে এলে জিজ্ঞেস করল, -- তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ, অরুণা? ঝর্নাব শব্দ?

অরুণা এমন মুখভঙ্গী করল যাতে মনে হবে সুধাকর গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিজ্ঞেস করছে, জবাব দেওয়াটা জরুরী। কান খাড়া করে শুনল অরুণা, সময় নিল। তারপর ঘাড় নাড়ল, যার অর্থ 'না'।

ওরা পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়ল। দূর থেকে যা মনে হয়েছিল কাছে এসে সুধাকর বুঝল তা নয়, এটা পাহাড়ই — রীতিমতো উঁচু। একটা নয়, পর পর প্রায় সমান-মাথা অনেকগুলো পাহাড় যেন পাঁচিল হয়ে রুক্ষ প্রান্তরকে পাহারা দিচ্ছে।

-- আপনারা উঠুন, পাঠক বলল, -- আমরা আগে দেখেছি। আর উঠব না।

— আচ্ছা --

বরুণা হঠাৎ দৌড়তে শুরু করল। পাহাড়ের ওপর দু-তিন ধাপ উঠে গিয়ে ডাকল, জামাইবাবু, আসুন।

-- এসো, অরুণা। পিছন ফিরে সস্নেহে স্ত্রীকে ডাকল সুধাকর, -- পারবে না উঠতে!

-- দেখি। শান্ত গলায় জবাব দিল অরুণা। — তুমি ওঠো সাবধানে। খুকু যা দাপাদাপি করছে ভয় লাগে --

অরুণার উদ্বেগ সুধাকরকে স্পর্শ করল। একরকম আবেগে ওঁর গলা বুঁজে এল। সামনে তাকিয়ে দেখল বরুণা উঠে যাচ্ছে, খেলাচ্ছলে, কালো পাথরের ওপর ওর অসম্ভব সাদা দুটি পায়ের পাতায় দুঃসাহসিক চাঞ্চল্য, যেন যমজ খরগোশ আপন মনে খেলছে, ছুটছে। বরুণা হোঁচট খেল, পড়তে পড়তে সামলে নিল। পিছনে তাকাল সুধাকর। অরুণাব

চোখ নামানো, ও ওপরে কিছু দেখছে না, প্রতিটি পাথরের বাঁক লক্ষ করছে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরখ করে নিচ্ছে, যেন প্রতি পদক্ষেপে ওর জন্য দুর্বিপাক লুকানো। স্ত্রীর জন্য করুণা হল সুধাকরের, অপেক্ষা করবে কি না ভাবল। ওপরে তাকিয়ে দেখল বরুণা অনেকটা উঠে গেছে। বরুণা ও তার মধ্যে, তার ও অরুণার মধ্যে দূরত্ব প্রায় সমান।

-- খু--কু--, হাত দুটো মুখের কাছে চোঙের মতো করে ধরে চেঁচিয়ে বলল সুধাকর, -- তুমি বড় তাড়াতাড়ি উঠছো! পড়ে যেও না।

-- ইস্, ভয় দেখাবেন না। খুশির দাপটে থেমে দাঁড়িয়ে বরুণা বলল, -- এ আপনার সাবজেক্ট নয়, জামাইবাবু; বটানি নয়। দেখুন, কি নিরেট সবকিছু, শুধু পাথর আর মাটি। একটা ঘাস নেই!

কথা শেষ না হতেই বরুণার যেন হঠাৎ চোখ পড়ল অরুণার ওপর, দেখল। তারপর বলল, -- দিদি, তুই কি! তুই না স্পোর্টসে ফার্স্ট হতিস! তাড়াতাড়ি আয় না!

বরুণার অবজ্ঞা অরুণার কানে পৌঁচেছে বলে মনে হল না। কোনরকমে সুধাকরের কাছাকাছি উঠে এল ও। কপালে, গলায়, মুখের সর্বত্র ঘাম, নিঃশ্বাস দ্রুত। সুধাকর হাত বাড়াল। অরুণা উঠে আসুক।

আকাশে ক্রমশ গোধূলির রঙ ধরছে। হু হু করা বাতাস। নিচে, সমতলের দিকে তাকাতে অপেক্ষমান পাঠক হাত নেড়ে ইশারায় উঠে যেতে বলল। সুধাকর অনুমান করল তারা প্রায় অর্ধেক উঠে এসেছে; এখান থেকে নিচে পাঠকদের দেখায় শিশুর মতো। আরো দূরে ছায়া; যে-রাস্তায় এসেছিল তার কোন চিহ্নই আর দৃশ্যমান নয়।

-- আমি আর পারব না। অরুণা বলল -- আমি হাঁফিয়ে উঠেছি।

-- ওঠো! আমার সঙ্গে এসো --

-- তুমি আর কতোটা নিয়ে যাবে! হতাশ, ক্লান্ত গলায় বলল অরুণা -- চেষ্টা তো করলাম। আর পারছি না।

-- কি যা তা বলছ! সুধাকর স্ত্রীর হাত ধরল, -- আর একটু তো। এতটা এসে ফিরে যাবে! তুমি নিশ্চয় পারবে --

-- না --

আস্তে সুধাকরের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল অরুণা। ক্লান্ত চোখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, -- আমি নামতে পারব। তুমি উঠে যাও।

আঁচল তুলে কপালের ঘাম মুছল অরুণা। তারপর নামতে শুরু করল।

বুকের মধ্যে হঠাৎ এক শূন্যতা অনুভব করল সুধাকর। অরুণা নেমে যাচ্ছে; ক' পলক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সে। এখানে নৈঃশব্দ্য বড় বেশি। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে ওঠায় কিছুই চিন্তা করতে পারল না। অসহ্য অবসাদে কেঁপে উঠল হাঁটু দুটো। ঘর্মাক্ত যে-হাতে অরুণার হাত ধরেছিল, সেই হাত চোখের সামনে মেলে ধরল সুধাকর; কিছু দেখল যেন। পাগল যেমন পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে হঠাৎ নিজের কররেখা দেখে।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৩০/সংখ্যা ৪: ১৩৭৫]

আত্মঘ্ন

প্রলয় সেন

[জন্ম ১৯৩৪ সালে পূর্ববঙ্গে। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রজীবন। বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। অনেকগুলি উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৯৯৭ সালে ক্যান্‌সার রোগে মৃত্যু। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' মৃত্যুর অল্প পরেই প্রকাশিত হয়।]

মল্লিনাথ এসেছিল খুব ভোরে। আমি তখন ঘুমে। ও খুট-খুট করে কড়া নাড়ছিল। জেগে উঠে প্রথমটায় আমি পাশ ফিরে শুয়েছিলাম। সকালের এই ঘুমটুকু, বলতে গেলে আমার সর্বস্ব। রাত করে ঘরে ফিরি। খেয়ে দেয়ে শুতে বেশ দেরি হয়। তারপর, অনেকক্ষণ বিছানায় ছটফট করি। সহজে আমার ঘুম আসে না। মল্লিনাথ একটানা কড়া নেড়ে যাচ্ছিল। কিছুতেই আত্মস্থ থাকতে না পেরে এক সময় উঠে পড়লাম। মনে হচ্ছিল, কেউ আমার মগজের কোমল অংশে হাত রেখে অবিরাম টাইপ করে যাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে মশারির এক কোণার দড়ি ছিঁড়ে গেল। বিরক্ত হয়ে খাট থেকে নেমে এগিয়ে দরজা খুলতে দেখি মল্লিনাথ। ওর এক হাতে রঙচটা টিনের সুটকেশ। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা। শ্রমকাতর চোখ। থুতনিতে কালচে শ্যাওলা।

আমি চোখ ডলবার অছিলায় দ্রুত স্মৃতি হাতড়ালাম তারপর বললাম, আরে মলু, তুই! মল্লিনাথ নিরুত্তর হাসল। আমি পেছিয়ে খাটের কাছে চলে এলাম। বালিশ দুটো দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। আমার বুকের ভেতর তখন কেউ লাটাইয়ের সুতো গুটোচ্ছিল। ফের বললাম, উফ্, কতদিন বাদে দেখা! তোর কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।

মল্লিনাথ জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার ভাই। সেটা বড় কথা নয়। দেশের বাড়িতে কৈশোরের অনেকগুলো দিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। ওর বাবা আসামে চাকরি করত। পড়াশুনোর অসুবিধের জন্যে মল্লিনাথ আমাদের বাড়িতে ছিল কিছুকাল। প্রায় বছর তিনেকের মতো। আমরা এক ক্লাশে পড়তাম। গলা জড়াজড়ি করে এক বিছানায় শুতাম। একসঙ্গে চলতাম ফিরতাম। আমাদের দুজনের খুব ভাব দেখে সোনাজেঠি প্রায়ই বলত, আর জন্মে নির্ঘাত তোরা এক মায়ের পেটে জন্মেছিলি। সুটকেশটা দরজার ওধারে রেখে মল্লিনাথ এগিয়ে খাটে বসল। বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ক্লান্তি দূর করে বলল, হ্যাঁ, তা বছর কুড়ি তো হবেই।

আমি দরজা ভেজিয়ে ফিরে আসার সময় ওকে ফের এক পলক গভীর করে চোখে তুলে নিলাম। ছেলেবেলার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। তেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না। সেই ছোট্ট কপাল। চৌকো মুখ। খোসাছাড়ানো লিচুর মত উদাস চোখ। চিবুকের কাছাকাছি গুটিকয় সরু প্রফুল্ল ভাঁজ। যেটুকু বিসদৃশ তা নেহাতই সময়ের কৌতুক। কপালের নদীনালা গালের অসমানতা, কিংবা ঝাপসা কণ্ঠস্বর।

আমি খাটের আরেক পাশে, ওর মুখোমুখি বসে, জিজ্ঞেস করলাম, এই সকালে, কোত্থেকে? মল্লিনাথ ঝুঁকে পাম্পশু খুলতে খুলতে জবাব দিল, রাতের লালগোলায় এলাম, ওর মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরকার আতিথ্যবোধ নড়েচড়ে উঠল। আমি বললাম, চা খাবি তো? সারারাত ট্রেনে—

মল্লিনাথ নীরব সম্মতি জানালে আমি দরজা খুলে রাস্তায় নামলাম। দুটো বাড়ি পরেই নিতাইয়ের চায়ের দোকান। আমি হাঁক পেড়ে দুকাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে ফিরে এলাম। মল্লিনাথ ততক্ষণে পাঞ্জাবি খুলে খাটে আধশোয়া হয়েছে। আমি ঢুকতে বলল, ঘরের কি অবস্থা করে রেখেছিস পন্টু! এভাবে মানুষ থাকতে পারে?

আমার ঘরের হতশ্রী কারুর চোখ এড়ায় না। ভাঙা খাট, অপরিচ্ছন্ন সুজনি, তেল চিটচিটে দুটো বালিশ, মেঝেয় ধুলো আর সিগ্রেটের মেশামেশি, বৈদ্যুতিক বাল্বের ওপর-নিচে বাহারি মাকড়সার জাল, নোনাধরা দেয়ালে ছয় ঋতুর দাপট—নানাবিধ প্রাকৃতিক জীব জন্তুর আভাস, কত দ্রষ্টব্য জিনিস আছে এঘরে। মাঝে মাঝে বকুল এসে গজগজ করে। কোমরে শাড়ির আঁচল গুঁজে ঘরের হালহকিকত পালটাতে তৎপর হয়। মাসিক ছাব্বিশ টাকার ইজারাদার হিসেবে এঘরে আমি আছি অনেক কাল। চাকরি জুটবার পর থেকেই। এবং সত্যি বলতে কি, এসব আমার ভালই লাগে। এমনি ছন্নছাড়া ভাব। এর ভেতরে আড়াল থেকে নিজেকে বেশ একান্ত করে পাওয়া যায়।

আমি অল্প হেসে প্রসঙ্গটা উদাসীন করে দিতে চাইলাম, তারপর, তোর খবর কি বল?

নিতাই চা নিয়ে এল। মল্লিনাথ একটা ভাঁড় তুলে নিয়ে বলল, আমার আর খবর। গণ্ডগ্রামে ইস্কুল মাস্টারি করছি।

আমি বললাম, বিয়ে-থা করেছিস তো?

মল্লিনাথ একচুমুকে ভাঁড় শূন্য করে বলল, কবে! দুটো বাচ্চা হয়ে গেল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। অফিসের তাড়া। স্নানের সময় হয়ে গেছে। বললাম, তাহলে ভালই আছিস কি বল! ওর মুখে মুহূর্তে হাল্কা ছায়া নামল, নারে পন্টু। একে টাকা পয়সার টানাটানি। তার ওপর ছেলেদুটো অপুষ্টিতে ভুগছে। বউর শরীরও ভাল নেই।

আমার খেয়াল হল, প্রশ্নটা নির্বোধের মতো করে ফেলেছি। কেইবা ভালো আছে আজকাল। ভাল থাকার দিন কি আর আছে।

কলতলা থেকে ফিরে আসতে দেখি মল্লিনাথ জানলার দিকে উদাস তাকিয়ে। আমি চটপট তৈরি হয়ে নিলাম। বললাম, চল্ তোকে হোটেলটা দেখিয়ে নিয়ে আসি। মল্লিনাথ উঠল, গায়ে পাঞ্জাবি চাপাল। গলিতে নেমে বললাম, সোনাজেঠির দুর্ঘটনার কথাটা জানিস মলু? মল্লিনাথ চলার গতি কমাল। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে স্বগতোক্তি করল, জানি! ছেলেবেলায় আমার মা মারা যায়। মল্লিনাথের মা-বাবা থাকত দূরে। সোনাজেঠি নিঃসন্তান, কচি বয়সে বিধবা। কিশোর বয়সে আমাদের জীবনে ওর একটা বড় ভূমিকা ছিল। দেশ-বিভাগের পর সোনাজেঠি উঠেছিল ভাইপো যতীনদার বাড়িতে। যতীনদারা বামুনগাছিতে আছে। দেশের জলমাটি মাঠপ্রান্তর হারিয়ে সোনাজেঠি কেমন মনমরা হয়ে গিয়েছিল। শেষের দিকটায় মাথার

ব্যামোতে ধরেছিল। সোনাজেঠি মারা গেল জলে ডুবে, গত বছর গ্রীষ্মের শুরুতে। আমি কালেভদ্রে বামুনগাছি গেলে আক্ষেপ করে বলত, কিছুই আর ভাল লাগে না রে পল্টু। দেশটার কি হয়ে গেল--

হোটেলে এক্সট্রা মিলের বন্দোবস্ত করে মল্লিনাথকে ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ও সরকারী বকেয়া টাকার তদ্বিরে শহরে এসেছে। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে বেরুবে। ঘরের চাবি মল্লিনাথের কাছেই রইল।

অফিসে এসে কাজে কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না। কতগুলি জরুরী চালান টাইপ করবার কথা। সময়মত না পেলে সুবোধ চাটখণ্ডী, আমার অন্নদাতা--সে একহাট লোকের মাঝখানে চেঁচাতে শুরু করবে। বার কয়েক বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এলাম। টাইপ শুরু করলেই আঙুল ঘেমে যাচ্ছিল। হতাশ হয়ে পর পর অনেকগুলো সিগ্রেট টেনে বুকটাকে কার্বনে ভরে তুললাম। আর, এরই ফাঁকে, ড্রয়ার খুলে এক শীট সাদা কাগজ টেনে বের করে রঙীন পেন্সিলে তার ওপর আঁকিবুঁকি কাটতে লাগলাম। এক সময়ে কাগজে চোখ পড়তে দেখি, আমার হিজিবিজি কখন একটা অদ্ভুত আকার পেয়ে গেছে। ছবিটা দেখে আমি আঁৎকে উঠলাম। মুণ্ডুটা সুবোধ চাটখণ্ডীর, আর ধড়টা এক নিটোল গাধার। আমি বুঝলাম, আজ মল্লিনাথই আমার সঙ্গে অদৃশ্যভাবে শত্রুতা শুরু করে দিয়েছে। বছর কুড়ি-বাইশ আগেকার কিছু হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতি মনের ভেতর চারিয়ে তুলে ও আমার ভাবনাকে এলোমেলো করে দিয়েছে। আমাদের গ্রাম, আমাদের বাড়ি, বাড়ির পেছনে কামরাঙা ঝোপের ওপাশে সরষেখেত, মাথার ওপর সুখদুঃখের আকাশ, আরো দক্ষিণে ইরফান মিঞার উঠোনে ছাঁচি কুমড়োর মাচায় বিষণ্ণ হরিয়াল, মুখুজ্জেদের আটচালায় শ্রাবণমাসে বয়ানী গান, দুপাশে দুধটসটসে আমন ধানের গন্ধে দ্বিপ্রহরে আমাদের বাধাহীন চলা, বর্ষাশেষে ঠাকুরঝির বিলে দোয়াড়ি পেতে কুচোমাছ ধরা, শীতের শুরুতে ছাঁচতলায় সোনাজেঠির মাঘমণ্ডল ব্রতের আয়োজন, অসংখ্য ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আর এসব ছবির সঙ্গে মল্লিনাথ এতটা জড়িয়ে আছে যে ওকে বাদ দিয়ে কোনকিছুই ভাবতে পারছিলাম না।

ছুটির কিছু আগে বকুল ফোন করল। আমি বললাম, কি ব্যাপার? ও নরম গলায় উত্তর করল, আজ ছুটির পরে তোমার সময় হবে? গতকালও বকুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কলেজ স্ট্রীটে। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আজ, হঠাৎ! বকুল গলার স্বরে আর্দ্রতা এনে জবাব দিল, হ্যাঁ, আজই। সাউথ স্টেশনে। একটা ভীষণ সুখবর আছে। প্লীজ--। বকুল ঢাকুরিয়ায় থাকে। বৌবাজারের দিকে টিচারি করে। আমি ভারী গলায় 'ঠিক আছে' বলে রিসিভার নামিয়ে দিলাম।

দারুণ ভিড়ে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে ক্যানিং স্ট্রীট থেকে শিয়ালদা পৌঁছতে কিছু দেরি হল। বকুল চায়ের স্টলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার দেরিতে রুষ্ট হল না। ও আমাকে দেখে এগিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে বলল, চল, ওদিকের বেঞ্চে গিয়ে বসি। কথা আছে। আমি জানতাম, আমার সম্পর্কে ওর বিশ্বাস বহুকাল হল একটা অস্পষ্ট সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। সারাদিন বদ্ধ ঘরে, দুপুরটা বিশ্রী কেটেছে, ভিড় ভাল লাগছিল না। তবু প্রতিবাদহীন এগিয়ে সামনে বেঞ্চে বসলাম। ওর শরীর থেকে একজাতীয় উগ্র সুগন্ধ বেরুচ্ছিল। ওর দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ছুটির পর বাড়ি ফিরে বকুল সেজেগুজে শরীর নিকিয়ে এসেছে। মেয়েরা অতিরিক্ত

প্রসাধিত হলে, আমার ধারণায়, কেমন সার্বজনীন হয়ে যায়। আমি দায়সারা বললাম, বল, কি সুখবর? — আমার কথায় তেমন উষ্ণতা না থাকায় ও মুহূর্তে অন্যমনা হয়ে উঠল। আমি কনুই দিয়ে ওর পাঁজরায় আস্তে করে খোঁচা মেরে বললাম, কি ব্যাপার, কথা বলছ না কেন । — বকুল ঘুমের ভেতর থেকে উত্তর করল, কিছু না, এমনি। বকুলের হেঁয়ালি অসহ্য লাগছিল। তবু, ওকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ওকে ফুরফুরে করে তোলার কৌশলগুলি আমার জানা ছিল। নাটকীয়ভাবে ওর ডানহাতটা টেনে নিজের কোলে এনে আদুরে গলায় বললাম, বকুল, বল না। আমাদের মাথার ওপরে বৈদ্যুতিক পাখা চলকাচ্ছে। সেই পাখার চিকন ছায়া বকুলের মুখে রহস্য আঁকছিল। এক সময় ও সপ্রতিভ হয়ে বলল, গত রবিবার গভর্নিং বডির মিটিং ছিল। সেই মিটিং-এ আমার কনফারমেশন হয়ে গেছে। আজ খবরটা পেলাম।—এ সংবাদটা ওর কাছে জরুরী হলেও তেমন উত্তেজনা বোধ করলাম না। আজ তিন বছর হতে চলল বকুলকে প্রাণপণে ঠেকাচ্ছি, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দোহাই দিয়ে। এতদিনে ওর চাকরিতে স্থিতি এল। এবার আমাদের সম্পর্কটাকে পাকাপাকি করে তোলার ব্যাপারে ওর তরফ থেকে জোর চাপ আসবে। আমি নিজের মনোভাবকে চেপেচুপে ঝানু খেলুড়ের মত ফস করে বলে ফেললাম, এতবড় একটা সুখবর। চল কোন চায়ের দোকানে গিয়ে সন্ধ্যেটা সেলিব্রেট করে আসি।—আমার শক্ত হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বকুল স্টেশনের বড় ঘড়ির দিকে মুখ তুলল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়ের কুঁচি ঠিক করে বলল, আজ নয় শান্তনু, বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে। কাল পঁচিশে বৈশাখ, ছুটি । কাল দুপুরে ঘুরব। আমি আর কচলাতে চাইলাম না। তাছাড়া, সেদিন সন্ধ্যায় আমি বড় গৃহকাতর হয়ে পড়েছিলাম। তবু বকুলকে উষ্ণ রাখার জন্যে ট্রেনে তুলে দেবার আগে বলেছিলাম, কাল তুমি আমাকে কি প্রেজেন্ট করছ?--উত্তরে বকুল প্রসন্ন হেসে বলেছিল, বল, তুমি কী চাও। আমি ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিসিয়ে কিছু একটা বলেছিলাম। ও ট্রেনে উঠবার আগে একপ্রস্থ চোখ মটকে কপট হেসে বলেছিল, তুমি ভারি ইয়ে--

ঘরে ফিরতে দেখি মল্লিনাথ খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে সিগ্রেট ফুঁকছে । আমার সাড়া পেয়ে উটে বসল। আমি বললাম, কখন ফিরলি? ও একটা বালিশ টেনে বুকে চেপে ধরে বলল, এই তো কিছুক্ষণ। আর বলিস না পল্টু, সরকারী টাকা পাওয়া--যেন বাঘের জিভ টেনে বের করা। এ টেবিল সে টেবিল করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়--। মল্লিনাথ আরো অনেক কিছু হয়ত বলত। আমি থামিয়ে দিলাম, চল, খেয়ে আসা যাক। ও কয়েকটা হাই তুলে শরীরের জট ছাড়াল। তারপর বিজ্ঞের মত বলল, এবার একটা বিয়ে করে ফেল পল্টু। কাঁহাতক এভাবে একলা দিন কাটাবি।--বিরক্ত হতে গিয়ে মনে মনে হাসি পেয়ে গেল। সকালে মল্লিনাথ নিজের বিবাহিত জীবনের যে নিদারুণ বর্ণনা দিয়েছিল সেটা স্মরণে এল। কেউ অন্যের অবস্থাটাকে সহ্য করতে পারে না। মল্লিনাথও তার ব্যতিক্রম নয়। এইজন্যেই ও বিয়ে করে আমাকেও জাহান্নমে যাবার পথটা বাৎলে দিচ্ছে। আমি মৃদু হেসে বললাম, কেন, বেশ তো আছি। মিছিমিছি ঝামেলা বাড়ানো--।--মল্লিনাথ উঠে পাম্পশু জোড়া পায়ে গলিয়ে বলল, তার মানে! বিয়ে করলে কি শুধু ঝামেলাই বাড়ে! এ তোদের অত্যন্ত বাজে ধারণা। আসলে স্বার্থপরের মত বাঁচতে চাস বলেই এসব ভাবিস।---ওর কথার ধারাটা আমি সঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

তবে কি আমাকে আত্মপর ঠাওরাচ্ছে। কিংবা আমার জীবনযাত্রার ব্যাপারে কোন কটাক্ষ করতে চাইছে। আমি ওর সদুপদেশকে উড়িয়ে দেবার জন্যে বললাম, আমার ঠিকানা কোথায় পেলিরে মলু?—ও হাসল, তবে কি আমার দুর্বলতা ওর চোখ এড়ায়নি, খুব সহজ সুরেই বলল, গত পুজোয় আসানসোলে গিয়েছিলাম। বিন্টুদার কাছ থেকে তোর ঠিকানাটা নিয়ে এসেছি।—বিন্টুদা আমার বড় জ্যাঠামশায়ের ছেলে। আসানসোলে চাকরি করে। আমার অথর্ব বাবা বিন্টুদার কাছেই থাকে। বস্তুত, তেমন কোন পারিবারিক দায়দায়িত্ব আমার নেই। ছোট বোন মাধুরী আছে মধ্যপ্রদেশে, ওর স্বামী কলিয়ারির টালিক্লার্ক।

হোটেলে থেকে খেয়েদেয়ে ফিরে খাটে বসে মল্লিনাথ ফের বৈষয়িক কথাবার্তা জুড়ে দিল। আমি ঘুরেফিরে পুরোন প্রসঙ্গে যেতে চাইছিলাম। ও দায়সারা উত্তর দিচ্ছিল। আমি কেবলই দেশের বাড়ির নানা কথা তুলছিলাম। সেইসব কথা, যা এখন আমার কাছে এজন্মের বলে মনেই হয় না, কিংবা রূপকথার মত দূরস্থ ও রোমাঞ্চকর মনে হয়। ওর জুলপির নিচের কাটা দাগটা দেখে আমার স্মৃতি নড়েচড়ে উঠল। এক গ্রীষ্মদিনের দুপুরে ভুবন চৌধুরীর বাগানে আম চুরি করতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল মল্লিনাথ। বাঁ গাল কেটে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। বাবার কাছে বেজায় বকুনি খেয়েছিল ও। অথচ দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী ছিলাম আমিই। ওকে জোরজবরদস্তি করে আমি গাছে উঠিয়েছিলাম। আরেক বারের কথা মনে পড়ে গেল। শীতের শুরুতে ঠাকুরঝির বিলে নানা জাতের পাখি আসত। হরিয়াল জলপিপি মাছরাঙা বক কাদাখোঁচা, আরো কত কি। মল্লিনাথ হাট থেকে টোন সুতো কিনে জাল বুনে বাঁখারিতে বেঁধে বিলের কাদাজমিতে ফেলত। পাখি ধরত। তার মধ্য থেকে বেছে দু-চারটে পাখি রেখে পুষত। আমাদের দরদালানের উত্তরে গোয়ালঘরের মাচায় খাঁচায় ভরে লুকিয়ে রাখত। কেননা বাবা এসব পছন্দ করত না। একবার মল্লিনাথ দুটো জলপিপি পুষেছিল। এক ছুটির দিনে, দুপুরবেলায়, কি যে দুর্বুদ্ধি হল, চুপি-চুপি গোয়ালঘরে ঢুকে পাখিদুটোকে খাঁচা থেকে বের করে ছেড়ে দিলাম। বিকেলে দানাপানি দিতে এসে পাখিদুটোকে দেখতে না পেয়ে মল্লিনাথের সে কি চীৎকার। সোনাজেঠি অনেক করে বুঝিয়েও ওকে থামাতে পারে না। সে রাতে যতবার ঘুম ভেঙেছে, পাশ ফিরতে টের পেয়েছি—মল্লিনাথ বালিশে মুখ লুকিয়ে অনবরত হেঁচকি তুলে কাঁদছে।

মল্লিনাথ এক সময় আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আয় শুয়ে পড়ি। তুই কিছুই শুনছিস না। আমি নীরবে হাসলাম। কত পাল্টে গেছে ও। রূঢ় সত্য কথাটা বলতে এখন আর ওর মুখে বাধে না। অথচ সেদিন, পাখিদুটো আমি ছেড়ে দিয়েছি জেনেও মল্লিনাথ কিছু বলেনি আমাকে।

আলো নিভিয়ে মশারির ভেতরে ঢুকে আমি মল্লিনাথের কাছে চলে গেলাম। ছেলেবেলায় ওর গা থেকে চমৎকার একটা বুনো গন্ধ ফুটত। সে গন্ধটা পেলাম না। ও পাশ ফিরতে আমার গায়ে হাত পড়তে চমকে উঠল, তোর গা এত ঠাণ্ডা কেনরে পল্টু!--লিভারের গণ্ডগোলে ভুগছি বহুকাল। ওর এ জাতীয় প্রশ্ন আমার ভালো লাগছিল না। আমি ওকে প্রশয় দেব না স্থির করে কোন উত্তর করলাম না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখি মল্লিনাথ দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে দরজার কাছে আলোয় খবরের কাগজ পড়ছে। ওকে ওভাবে দেখে প্রথমটায় আমার করুণা হল। বেচারী! কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছে। জীবনের ঢিলেঢালা সুখগুলিকে সময়ের সুতো দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। আর এখন, জীবনটা নয়, নিয়মই বড় হয়ে ওকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে। ফের ভাবলাম, নিয়মটা কি খারাপ। এই যে আমি, চালচুলো নেই, নেই দায়দায়িত্ব বন্ধন, উদ্দেশ্যহীন জীবন, বুক জ্বলছে মাথা ঘুরছে সবকিছু বিস্বাদ তাৎপর্যহীন লাগছে, দিনরাত দুশ্চিন্তা আর অস্বস্তিতে জ্বলছি, এর ভেতরেই বা কি সুখ আছে। বরং, মল্লিনাথই ভাল আছে। ছেলেবেলায় বাগান তৈরির শখ ছিল ওর। কামরাঙা গাছের ঝোপের পেছনে খানিকটা জমি কুপিয়ে নিড়িয়ে চমৎকার বাগান করত মল্লিনাথ, প্রত্যেক শীতে। রংকচু মল্লিকা গাঁদা যূঁই চারপাশে রংচিতার বেড়া-- স্নেহে যত্নে এক মনোরম প্রাকৃতিক সংসার রচনা করত। আর এখন, স্ত্রীপুত্র চাকরি-- জীবনের পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে নিজেকে নতুন করে তৈরি করে নিয়েছে।

আমি উঠে বাথরুমে গেলাম। ফিরে আসতে দেখি মল্লিনাথ সেজে গুজে প্রস্তুত। আমি বললাম, কিরে, কোথায় যাচ্ছিস ?—ও একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, সোনারপুরে। কাল মেজদার অফিসে গিয়েছিলাম। আজ ওদের ওখানে খাবার নেমন্তন্ন।

মল্লিনাথ চলে যেতে আমি খাটে শুয়ে কাগজ পড়তে লাগলাম। দিনকয়েক হল অসহ্য গুমোট। আকাশ মেঘে ভরে আছে। অথচ একটু বাতাস নেই, বৃষ্টি নেই। এক সময় নিতাই চা দিয়ে গেল। মল্লিনাথের ওপর রাগ হচ্ছিল। আজ সকালটা ওর জন্য ফাঁকা রেখেছিলাম। মল্লিনাথ না এলে, এমন ছুটির সকালটা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে কাটানো যেত। কাগজ পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙতে বেশ বেলা হয়ে গেল। আড়াইটের সময় শ্যামবাজারে এক সিনেমা হাউসে বকুল অপেক্ষা করবে। ওর সঙ্গে একটা রমরমা হিন্দী ফিল্‌ম দেখবার কথা। পেটের ডানদিকে একটা চোরা ব্যথা অনবরত ছুরি চালাচ্ছিল। উঠে বসতে গা ম্যাজ ম্যাজ করতে লাগল। অতিরিক্ত শ্লেষ্মা জমলে শরীর যেমন রসস্থ হয় তেমনি ভাব। উঠে কোন রকমে মাথায় খানিকটা জল ঢেলে শরীর মুছে নিলাম। বেলা তখন দেড়টার ওপর। দমদমের এই ঘিঞ্জি বাগজলা রোড থেকে শ্যামবাজার—এতটা পথ, হোটেলে গিয়ে খেয়ে সময়মত পৌঁছানো দুষ্কর।

ছুটির দিনেও দুপুরের বাসে ভিড়। বিপজ্জনকভাবে লাফিয়ে পাদানিতে উঠে কোন রকমে হ্যান্ডেল ধরলাম। ওপর থেকে একজন হেঁড়ে গলায় ধমকে উঠল, আচ্ছা লোক তো মশাই, এভাবে উঠতে গিয়ে একদিন বেঘোরে প্রাণটা দেবেন!—বকুলেব ওপর রাগে আমার সর্বশরীর রি-রি করে জ্বলছিল। ছুটির দিনেও ও রেহাই দেয় না। বকুলের হ্যাংলামি দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে। সিনেমা, ঋতুতে ঘুরতে নিত্যনতুন উপহার, ঘন ঘন দেখা করা,--আসলে এসব ছল। ও আমাকে বাঁধতে চায়। যেমন মল্লিনাথের বউ মল্লিনাথকে বেঁধেছে। এতদিনে বকুল আমাকে অনেকটা গ্রাস করে ফেলেছে। আমি সব বুঝেও ওকে এড়াতে পারছি না।

বাস টালা ব্রিজের মুখে এলে আমি লাফিয়ে নেমে পড়লাম। মাটিতে পা পড়তে গা থেকে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। হনহনিয়ে রাস্তা পেরুলাম। নীরদের বাড়ি কাছেই, ইন্দ্রবিশ্বাস রোডে, আমার শহুরে বন্ধু। দুপুরে ওর বাড়িতে অনেকেই আসে। ভাবলাম, ওর ওখানে গিয়ে

খানিক আড্ডা দিয়ে আসি। বকুলের জন্যে বুকের ভেতর উদ্বেগ একবার পাশ ফিরেছিল। ও সিনেমা হাউসের পোর্টিকোর নিচে এখন অপেক্ষা করছে। শো শুরু হবার বেশ কিছুক্ষণ পর অব্দি অপেক্ষা করবে। জয়পুরী বটুয়াটা কেবলই হাতবদল করবে। ঘন ঘন মণিবন্ধে চোখ রাখবে। তারপর ক্লান্ত, বোধ হয় অভিমানে ফিরে যাবে। ফিরে যাক বকুল। ওর ভুল ভাঙা দরকার। ও আমার কাছে যতটা চায় আমি ওকে ততটা দিতে রাজী নই। এ সত্যটা ও বুঝতে পারলে উভয়ের লাভ। ও নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারবে। আর আমিও স্বস্তি পাব।

নীরদের বাড়ি পৌঁছতে দেখি প্রিয়তোষ বসে। ওরা দুজনে ফ্লাশ খেলছিল। আমিও বসে পড়লাম। কয়েক বাজি খেলতে বিকেল ভেঙে এল। আমি প্রায় প্রতি ডিল-এ হেরে যাচ্ছিলাম। আসলে আমি তখন নিজের মধ্যে ছিলাম না। বকুল মল্লিনাথ আমার মনস্কতায় বাদ সাধছিল। এক সময় খেয়াল হল, আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে ওরা আমাকে ঠকাচ্ছে। নীরদ সর্ম্পকে কোন কালেই আমার ধারণা ভাল নয়। পরনিন্দায় ওর জুড়ি নেই। সুযোগ পেলেই পরিচিতদের কাছে আমার নামে সাতসতেরো রং ফলিয়ে বলে। বিজনটা আরো বাজে। অত্যন্ত পরশ্রীকাতর ও লোভী। তবু ওরাই আমার বন্ধু। ওদের বাদ দিলে আমার জীবনের একটা দিক শূন্য। এক সময় আমি হাতের তাস ফেলে দিয়ে বললাম, চল্, ওঠা যাক। ভাল লাগছে না।--বিজন বলল, কোথায় যাবি?—ওর চোখের বিরক্তি আমার দৃষ্টি এড়াল না।—আমি বললাম, চল না, ধর্মতলার দিকে যাই।—নীরদের চোখ শিকারী বিড়ালের মত চক্ চক্ করে উঠল। ও বলল, খাওয়াবি?--আমি উঠে দাঁড়ালাম। শার্টের কলার ঠিক করে নিয়ে বললাম, চল তো, দেখা যাক। পকেটে আমার বেশ কিছু টাকা ছিল। মাস মাস বাবাকে কিছু টাকা পাঠাই। এ মাসে একাজে সেকাজে মানিঅর্ডার করা হয়নি। মেজাজটা খিঁচড়ে ছিল। ঠিক করলাম, টাকাটার সদ্ব্যবহার করে আসি। বাবাকে তো প্রতিমাসেই পাঠাচ্ছি। তাছাড়া ওঁর টাকার কিইবা দরকার। বিল্টুদা যত্নের ত্রুটি করে না। তবু, প্রতিমাসের শেষে বাবার চিঠি আসে। সে চিঠিতে বাৎসলের চেয়ে পিতৃত্বের দাবিটাই প্রকট। যেন অর্থ ছাড়া আর কোন সর্ম্পক নেই ওঁর সঙ্গে। তলিয়ে ভাবছে, ছেলে হিসেবে বাবা তেমন কোন দায়িত্ব পালন করেনি কোনদিন। গ্রামের বাড়িতে থাকতে সাতপুরুষ আগেকার ক্ষেতের ফসলে আমরা প্রতিপালিত হয়েছি। এপারে আসার পর, কলেজের পড়াশুনা থেকে চাকরি—সব নিজের চেষ্টায় করেছি।

ট্রামে উঠবার পর নীরদ বিজন সারাটা পথ আমার তোয়াজ করেছিল। মদের দোকানে সেদিন তেমন ভিড় ছিল না। আমরা পুরনো খদ্দের। ম্যানেজার দেখেশুনে একটা ভাল জায়গা বেছে দিল। মদের দোকানে এলে আমি সাধারণত স্বাভাবিক হয়ে উঠি। নীরদ বিজন ঠিক উল্টো। ওদের মুখে খই ফোটে। নির্বোধের মত হইচই শুরু করে দেয়। কিছুক্ষণের ভেতর চড়া আলোগুলি নিভে ঘরটা রহস্যময় হয়ে উঠল। সামনের পাটাতনে মাইকের কাছে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। পেছনে দুজন ছোকরা বাজনদার। এ মেয়েটাকে আগে এখানে দেখিনি। ছিপছিপে চেহারা। ফিকে নীল আলোয় গায়ের রঙ ঠিক ধরা গেল না। পরনে সাদামাটা একখানা কটকি শাড়ি। চোখে কালো শেল-ফ্রেমের চশমা। নীরদ ওকে দেখেই আমার উরুতে চিমটি কেটে নিচু সুরে বলল, দেখেছিস, শালা হুরী মাইরী।--বিজনটা কামুক। ও চোখের গুলি স্থির করে মেয়েটাকে চাখছিল। এক সময় জোরে বাজনা বেজে উঠল। মেয়েটা একটা ডাইরি খুলে গান শুরু করল। খুব নির্বিকারভাবে। যেন চারপাশে আমরা কোথাও কেউ নেই। আমি

এক বোতল করে সান লেগারের অর্ডার দিলাম। ওরা একচুমুকে গ্লাস নিঃশেস করল। মেয়েটা বাঁপায়ে তাল ঠুকছিল। মুখে সস্তা হিন্দী গানের বোল, মাঝে মাঝে ডানহাতের সরু সরু আঙুল দিয়ে চশমার ডাঁটি চেপে ধরে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছিল। আমি নীরদকে বললাম, এবার কি খাবি?--ওপাশ থেকে বিজন বলে উঠল, রাম হলে মন্দ হয় না জমবে ভাল।--আমি সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারাকে ডেকে রাম আনতে বললাম। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আমার কেবলই বকুলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। মিলিয়ে ভাবতে গেলে বকুলের চেয়ে এই মেয়েটাকে সুশ্রী বলে স্বীকার করে নিতে হয়। মুখের গড়ন স্বাস্থ্য প্রগল্‌ভা সবদিক থেকে মেয়েটা ভাল। এমনকি অনেক নিরাপদও। কিছু টাকা ফেললে এখখুনি ওকে পাওয়া যায়। এবং কোন দায়দায়িত্ব না নিয়েই। বিজন মাঝে মাঝে হিক্কা তুলে আর্তনাদ করে উঠছিল, মরে যাব, মরে যাব। আমি আরো কয়েক পেগ রামের অর্ডার দিলাম। যাতে ওরা একেবারে বেচাল হয়ে পড়ে। ওরা অপ্রকৃতিস্থ হলে গাড়লের মত চেঁচাবে, হাত-পা ছুঁড়বে, খিস্তি করবে। আর আমি, ওদের নষ্টামি দেখে মনে মনে হাততালি দেব। দোকান থেকে বেরিয়ে আমি ট্যাক্সি ডাকতে ছুটলাম। ফিরে এসে দেখি, ওরা দুজনে দোকানের বাইরে একপাশে সার্কাসের জোকারের মত শরীর ভেঙেচুরে পরস্পরের গলা জড়িয়ে হাসছে কাঁদছে। চারপাশে কিছু ভিখিরি ভবঘুরে পথচারী মজা দেখছিল। আমি টেনে হিঁচড়ে নীরদকে ট্যাক্সির ভেতরে ঢোকালাম। বিজনটা আস্ত হাতি। ওকে বাগে আনতে প্রাণান্ত। শেষে গোটাকয়েক লাথি মেরে ট্যাক্সির ভেতরে ঢোকালাম।

মল্লিনাথ গলির মোড়ে অপেক্ষা করছিল। ঘরের চাবি আমার কাছে। ও বলল, এত দেরি হল কেন রে। কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।—আমি কোন উত্তর করলাম না। কথা বলবার মত উৎসাহ আমার ছিল না। ঘরে ঢুকে মল্লিনাথ জামাকাপড় ছেড়ে জানালার তাক থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট খুলে একটা বের করে ধরাল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, রাতের খাওয়াটাও ওখানে সেরে এলাম। তুই খেয়েছিস তো।--আমি মাথা নেড়ে জানালাম, খেয়েছি। ও বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, প্রতিদিন রাত করে ফিরছিস। খাওয়াদাওয়ার ঠিক নেই। এত বেহিসেবী হলে মারা পড়বি যে!--ছেলেবেলায় বরাবর আমি ওর ওপরে খবরদারি করতাম। ওর কথাগুলো আমার ভাল লাগছিল না। ওর এই ধরনের অযাচিত অভিভাবকত্বে আমি মনে মনে চটে গেলাম। আমার মনে হল, ও যেন আমাকেই হটিয়ে দিয়ে এঘরের কর্তা সেজে বসেছে। আমার সিগ্রেট ধবংস করছে, খাওয়ায় ভাগ বসাচ্ছে, আমার একান্ত নিজস্ব সময়টুকু কেড়ে নিতে চাইছে। এখন আমিই যেন এঘরে অবাঞ্ছিত, অনধিকারপ্রবেশকারী। আমি পাল্টা ওকে বিব্রত করার জন্যে বললাম, তোর কাজ কবে শেষ হচ্ছে রে মলু?--ও ভাবলেশহীন জবার দিল, আরো দিনদুই লাগবে। টোকেন তো পেয়ে গেছি। এখন এ.জি. বেঙ্গল থেকে টাকা তোলার ঝামেলা।—আমি বললাম, আয় শুয়ে পড়ি, রাত অনেক হয়ে গেল।

পরদিন বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল। শরীর গুরুতর কিছু খারাপ না হলে আমি এত বেলা অব্দি ঘুমোই না। পাশ ফিরতে দেখি মল্লিনাথ নেই। দরজাটা হাট করে খোলা। ঘরের ভেতর তেমন আলো নেই। খাট থেকে নামতে অল্প পা টলছিল। কপালে পুরু পুলটিশের মতো যন্ত্রণা লেগে। জিভের ডগা শুকনো। কণ্ঠনালীতে খানিকটা বাষ্প দলা পাকিয়ে। মেঝেয় চোখ পড়তে বুক থেকে আচমকা ভারি কিছু একটা নেমে গেল। দরজার ওপাশে পুরু ধুলোর

মাঝখানে খানিকটা শূন্য আয়তাকার জায়গা। ওখানে মল্লিনাথের সুটকেশটা ছিল। আরো ওদিকে জানলার গা ঘেঁষে ইতস্তত পায়ের ছাপ। বুঝতে কষ্ট হল না, মল্লিনাথ চলে গেছে। আমার জন্যে ও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। ওপাশের জানলার কাছে পায়চারি করেছিল কিছুটা সময়। আমাকে জাগাতে সাহস করেনি, অথবা, মল্লিনাথ আমাকে এখনো কুড়ি বাইশ বছর আগেকার মত ভালবাসে বলেই আমার ঘুম ভাঙাতে চায় নি। আমার আপশোস হল, ওর ঠিকানাটা নেওয়া হয়নি বলে।

বাসিমুখেই দাড়ি কামাতে বসলুম। অফিসে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে। আয়নায় চোখ পড়তে দেখলাম চোখের নিচের হালকা ছায়াটা গালের অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। কপাল, গলার ভাঁজে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দুচোখ রক্তাভ। তবে কি আমি ঘুমের ভেতর ভয়ঙ্কর কোন স্বপ্ন দেখেছি। মনে করতে পারলাম না। এক সময় অন্যমনস্কতাবশত আমার বাঁ গালের কিছুটা অংশ কেটে গেল। ঠিক জন্মদাগটার ওপরে। বেশ কিছুটা রক্ত বেরুল। ক্রমশ সেই রক্ত জন্মদাগটাকে লালচে করে তুলল। আমি হাতের তালু দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরতে এক ধরনের মৃদু যন্ত্রণা অনুভব করলাম। কুড়ি বাইশ বছর আগে যেমনটা করেছিলাম। এক মাঝরাতে। জলপিপি দুটোর দুঃখে মল্লিনাথ যখন বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

বাসস্টপে এসে পৌছতে আকাশ কালো হয়ে এল। এলোমেলো হাওয়ায় ধুলো লাট খেয়ে রাস্তায় হুটোপুটি খাচ্ছিল। একের পর এক বাস চলে যাচ্ছে। আমি কিছুতেই উঠতে পারছিলাম না। আমার বিশ্বসংসারের ওপর রাগ হচ্ছিল কোথাও একটু স্বস্তি নেই, অবকাশ নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। এক সময় মনে হল, আর দশজনের মতো আমিও কবে একটা অপদার্থ বনে গেছি। সকালে ঘুম ভাঙতে অফিসের তাড়া, অফিসে পৌঁছে লেজার টাইপ, সুবোধ চাটখণ্ডীর ধমকে চিড়ে চ্যাপ্টা, সন্ধ্যার দিকে বকুলের সঙ্গে পানসে কথা বলে সময় খোওয়ানো অথবা নীরদ বিজনের সঙ্গে আড্ডা— মনের ভিতর কিছু হিংসা-ঘৃণা-আক্রোশকে জাগিয়ে তোলা। তারপর ঘরে ফিরে গভীর রাত পর্যন্ত ছটফট করা।

আমি ধীর পায়ে রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে চলে এলাম। আজ আমি অফিস যাব না। আমার কোন কিছুই ভাল লাগছে না। আকাশে মলিন ধোঁয়ার মতো মেঘ উড়ছে। বাতাস ক্রমশ অশান্ত। একটা প্রাইভেট বাস স্টপে এসে থামতে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। ফিরতি বাস ; তেমন ভিড় নেই। জানলার কাছে সীট পাওয়া গেল। বাস ছাড়তে এলোমেলো হাওয়া আমার চোখেমুখে বুকের নগ্ন অংশে আঁচড় কাটছিল। দুপাশে মানুষের বহু যত্নে গড়া ঘরবাড়ি, সংসার। বাসটা নৌকোর মত হেলেদুলে এগুচ্ছিল। গত দুদিনের ঘটনাগুলি আমার ভাবনায় অনবরত পাক খাচ্ছে। এক সময় বুঝতে পারলাম, আমি বকুল নীরদ বিজন সুবোধ চাটখণ্ডী এমনকি মল্লিনাথ--সবাইকে একটা নোংরা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেয়েছি। হায়, ভেবেছি, ওরা বুঝি শুধুই আমার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে চায়। আমার আশ্রয় নিরাপত্তা ভালবাসা আনুগত্য স্বাধীনতা।

হাওয়ায় চুল উড়ছে। বাস কখন শহরের জটিলতা ছাড়িয়ে বিরাট মাঠের মাঝখানে এসে পড়েছে। বাতাসে অদ্ভুত মোহ জড়িয়ে। মাটি আর ঘাসের। বিষণ্ণ হরিয়ালের ডাক ভেসে আসছে। বৃষ্টির ছাটে আমার শরীর ভিজে যাচ্ছে। তবু আমি নির্বিকার।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৩১/ সংখ্যা ১ : ১৩৭৬]

অন্নদাতা

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

।জন্ম ১৯৩০ সালে। ছোটদের ও বড়দের জন্য নিয়মিত লিখে থাকেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: অসতী, দলবদল, বাগদা, প্রথম পরশ, ফাঁদ, ইত্যাদি।।

নরকুলে জন্ম নিয়েও লোকটা রাক্ষস। গোগ্রাসে খেতে পারে বলেই নয়, ওর প্রবৃত্তি, ওর আচরণ, সর্বোপরি ওর আকৃতি সব মিলিয়েই ও নর-রাক্ষস।

—কি নাম হে তোমার?

—আজ্ঞে, ঐ যে বললেন রাক্ষস : আমার নাম নর-রাক্ষস।

—রাক্ষসই বটে। অন্ধকারে যদি দেখতাম তোমাকে তা হলেই হয়েছিল আর কি! তা অমনধারা দাড়িগোঁফ আর জটাজুট না রাখলে কি চলত না তোমার? আর ও-টা কি পরেছ গায়ে, কাকতাড়ুয়াদের মত জামা! তা সত্যি করে বল দেখি তোমায় দেখলে কি পক্ষী-টক্ষি ভয়ে পালায়?

—মানুষজনই ভয় পায় বেশি! লোকটা হি হি করে একগাল হাসে। দত্তবাবুদের রোয়াকে একদিন ঘুমুচ্ছিলুম—লোকটা আবার হাসে, তা ঘুম ভাঙলে বুঝতে পারলুম কে যেন একটা ছুঁচলো কাঠি দিয়ে আমাকে খোঁচাচ্ছে। বলুন তো কি জ্বালা, আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দেখলুম দুটো উচ্চিংড়ে ছোকরা। গাবুৎ করে একটা শব্দ তুলে যেই ওদের তেড়ে গেলুম ওরা হাওয়া। লোকটা এবার দাঁত মেলে থাকে তৃপ্তিতে।

লাউবিচির মত পেছল-পেছল দাঁত। ঐ দাঁত দিয়েই ও অখাদ্য খায়, কুখাদ্য খায়।

বললাম,—তা যেমন তোমার চেহারা, ছোঁড়ারা তোমার পিছু লাগবে এ আর বেশি কি! আমারই ইচ্ছে হচ্ছে তোমার ঐ মাথার ঝোপ-জঙ্গলগুলোকে কাউকে দিয়ে সাফ করিয়ে দিই। কি সুখে যে ওগুলো পুষছো!

—আজ্ঞে, উকুন টুকুন বেশি উৎপাত করলে মাঝে মাঝে ন্যাড়া হই। একবার তো ন্যাড়া হয়ে নিসিন্দে পাতার রস লাগিয়ে ভাবলুম দিব্যি বাঁচা গেল, তা কি হল জানেন?

—কি?

—ন্যাড়া হওয়াতে নাকি আমাকে আর রাক্ষস বলেই মনে হচ্ছিল না। সাবু মাস্টার তো আমার ঐ অবস্থা দেখে রেগে কাঁই। বললে, ওরে হারামজাদা করেছিস কি! এ যে একেবারে ভদ্রলোক হয়ে গেছিস আজ। সর্বনাশ করেছিস! টিকিট কেটে কেউ আর তোর খেলা দেখবে না।

তখন উলুবেড়িয়াতে তাঁবু পড়েছিল সাবু মাস্টারের। আমিই তখন ওর একনম্বর

খেলোয়াড়। আমার জন্যই লোক এসে লাইন দিয়ে টিকিট কাটত। আমি সাজগোজ করে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখতাম আন্ডাবাচ্চারা তাদের বাপজানদের হাত ধরে চকচকে চোখে তাঁবুতে ঢুকছে। নর-রাক্ষস কেমন করে কাঁচা কাঁচা মাংস খায়, সত্যি সত্যি খায় কিনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে।

—তুমি কাঁচা মাংস খাও? সত্যি সত্যি খাও!

—খাই মানে! নর-রাক্ষস ধক ধকে চোখে তাকায়। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। না পারলে নাকে খত দিয়ে জুতো খেতে খেতে চলে যাব।

—তাই বুঝি! তাহলে তো সত্যিকারেরই রাক্ষস তুমি।

লোকটা আবার যেন পরিতৃপ্ত হয়, হাসে। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, সাবু মাস্টারের মুখখানা তো ভারী হয়ে উঠল কুমড়োর মতো। বললে, হারামজাদা,রোজ দুবেলা তোর পেছনেই আমার আধমণ করে চাল লাগে ;তা, তুই কিনা ন্যাড়া হয়ে ভদ্রলোকের মতো হয়ে গেলি!

—আমি বললাম, উকুন বড় জ্বালায় যে মাস্টার। রাত্রে কি ঘুমুতে পারি। ইস, কটর কটর কটর, মাথার মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ চলে।

—বললে পরে চার পয়সার গ্যামাক্সিন ঢেলে দেওয়া যেত। তুই বেটা সত্যিকারের একটা আহাম্মক।

—আমি বললাম, যাহ্ বাবা, আমি মরি আমার জ্বালায় আর তুমি মাস্টার পয়সা কামাবার ধান্দা দেখছ।

—কি, কি বললি! সাবু মাস্টার এই মারে তো সেই মারে। চেঁচিয়ে মেচিয়ে একাকার করে বললে, হারামজাদা আমার এই তাঁবু আছে বলে তুই দুবেলা তবু খেতে পাস। আধমণ চালের দাম জানিস রে আধমণী কৈল্লাস? যা না, নিজে রোজগার করে দেখ না।

—বললাম, আহ্ মাস্টার! অল্পেতে তুমি বড় ক্ষেপে যাও। না হয় একবার ন্যাড়াই হয়ে গেছি। তাই বলে কি আর কাঁচা মাংস খাব না নাকি? দেখো, খেলা আমি ঠিকমতো জমিয়ে রাখব।

সাবু মাস্টার কি করলে জানেন, তেলে গোলা রং কিনে আনল কয়েক কৌটো, একটা বুরুশ, কিছু তুলো, কিছু গদের আঁঠা। ব্যাস বুরুশ দিয়ে ডোরা ডোরা রঙের দাগ এঁকে দিলে আমার মাথায়, দিয়ে এবড়ো খেবড়ো কিছু তুলো সাঁটিয়ে দিলে এপাশে ওপাশে। তারপর বললে,নে জামাটা খোল দেখি।

—কেন? গায়েও রঙ লাগাবে নাকি? উঠবে তো আবার?

—আমার জামা খুলে নিয়ে পিঠে বুকে ডোরা ডোরা রঙের বুরুশ চালিয়ে দিল। আমার তখন পরনে একটা জাঙ্গিয়া, আর সর্বাঙ্গে কেবল রঙ। আমি তখন জাম্বুবানের মত একটা জীব।

টিকিট বিক্রি বেড়ে গেল।

সাবু মাস্টার বললো,—যাব্‌বেটা, সাপে বর হল আমার।

আমি বললাম,--তোমার যেমন লাভ হচ্ছে মাস্টার আমার খাওয়াটাও এবার থেকে একটু বাড়িয়ে দাও! বেশি না, আর দু-এক সের চাল বাড়িয়ে দাও দেখি দুবেলায়। পেট পুরে যদি নাই খেলাম গতর রাখব কি করে।

---এক এক বেলা দশ সের চালের ভাত খাও তুমি?

লোকটা এপার বিস্মিত চোখে তাকাল। তারপর হাসল বিনীতভাবে। যৌবনে আরো বেশি খেতে পারতাম গো বাবু। সে খাওয়া আপনি না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। কেউ করে না।

---এক সের চালের ভাত যে খায় তাকেই আমরা রাক্ষস বলি, তুমি তাহলে মহা রাক্ষস।

---তা যা বলেছেন, আমি নর-রাক্ষস। জন্মের পর থেকেই আমি আমার পেট চিনেছি। এই যে দেখছেন পেট, এটা একটা রবারের জ্বালা, যত ঢালবেন তত বড় হবে। চাই কি একবার পরীক্ষা করেই দেখুন না। একটা আস্ত মুরগী কিংবা হাঁস এনে দিন না, দেখুন না আমি টুঁটি ছিঁড়ে হালুম হালুম করে ওর গোটাটাই সাবড়ে দিতে পারি কি না।

---পালক শুদ্ধ খাবে তুমি?

লোকটা অসহায়ভাবে তাকায়। পালক কি আর খাদ্য হল, দুহাত দিয়ে হ্যাঁচকা টানে ওর চামড়া ছাড়িয়ে নেব, যেমনভাবে আপনারা বাবু গা থেকে গেঞ্জি খোলেন তেমনিভাবে ওর চামড়া ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে ওর মাংস হাড় রক্ত সব কিছু আমি খেয়ে ফেলব।

সাবু মাস্টার তার খেলা জমাবার জন্য বলত, এই বেটা নর-রাক্ষস জন্মভোর কেবল হাঁস মুরগীই খেয়ে দেখালি এবার একদিন আর একটু বড় সাইজের কিছু খা না! তোরও মুখ বদলাবে, লোকের কাছেও রোমাঞ্চ বাড়বে।

---কি খাব?

---একটা ছোটমোট পাঁঠা খা না একদিন।

বলুন তো কি কান্ড! লোকটা একবার ভেবেও দেখল না, আমি রাক্ষস হতে পারি কিন্তু মানুষ তো! না হয় তুই দুবেলা আমার ভাত জোগাস, তাই বলে।

---একদিন খেয়ে দেখলেই পারতে। কিছু অন্যায় বলেনি তোমার মাস্টার।

---না অন্যায় বলবে কেন! এই পেটে যা ধরাব, তাই ধরবে। খেলুম একদিন পাঁঠা। তাঁবুর চারদিকে তখন গমগম করছে ভিড়। তাঁবুর বাইরে ছোট্ট একটা মঞ্চে নকল নর-রাক্ষস সেজে একজন অঙ্গভঙ্গি করে আস্ত পাঁটা খাওয়ার অভিনয় দেখিয়ে লোক টানছে। নেহাত হাতি-টাতি নাকি পাওয়া যায় না, তাই হাতি খাওয়া দেখানো যাচ্ছে না এখানে। আসল নর-রাক্ষস রয়েছে ভিতরে। আসুন দেখুন, রোমহর্ষক দৃশ্যাবলী। জ্যান্ত নর-রাক্ষস, আফ্রিকার জঙ্গল থেকে ধরে আনা নর-রাক্ষস। শিশুদের সব সাবধান মতো রাখবেন নইলে--

বলুন তো কি সাংঘাতিক সব কান্ড!

তা তাঁবুর মধ্যে মঞ্চে খেলা শুরু হল। প্রথমে সাবু মাস্টার কয়েকটা তাসের খেলা দেখালো। তারপর দেখালো ফাঁকা চোঙের ভিতর থেকে জাদু দিয়ে আট-দশখানা ডিম বার করে, তারপর

আরো কয়েকটা মজার মজার খেলা। মাঝে মাঝে হাততালি, মাঝে মাঝে অহেতুক চেঁচামেচি! কিন্তু সেদিনকার সবচেয়ে সেরা খেলাটি দেখাবার জন্য সবার শেষে কোমরে দড়ি বেঁধে আমাকে নিয়ে আসা হল মঞ্চে। কোমরে দড়ি বেঁধে রোজই আমাকে আনা হয়। বলা যায় না, আমি তো নর-রাক্ষস, দড়ি দিয়ে বাঁধা না থাকলে হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে যারা বসে আছে তাদেরই খেতে শুরু করব।

আমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু যেন ফেটে পড়ল। সাবু মাস্টারের হাতে ম্যাজিক লাঠি। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বললে, এবার আপনাদের সামনে হাজির করছি জ্যান্ত নর-রাক্ষসকে। আপনারা সবাই জানেন, মানুষ সৃষ্টির সেই আদিম কালে রাক্ষসের মত কাঁচা ফল-মূল মাংস ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করত। আসলে ক্ষুধা, এই পেট, এই জঠর একে কোনদিন তৃপ্ত করা যায় না। যত যোগান দেবেন একে তত এ গ্রহণ করবে। আপনারা রুচির কথা ভাবছেন আমি জানি, কিন্তু ধরুন মহিম নামে কোন এক রুচিবান পুরুষকে বন্দী করে রাখা হল। তাকে একদিন দুদিন তিনদিন কিছু খেতে দেওয়া হল না। তখন যদি তাকে কাঁচা মাংসই ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয় সে প্রাণের দায়ে তাই খেতে শুরু করবে। এই জঠরের কাছে বন্দী হয়ে থাকে রুচি, প্রেম, ভালবাসা, ভাললাগা, খারাপ লাগা। এই জঠর, এই পেট, এই পেটই সব, সর্বস্ব।

আমার নর-রাক্ষস এই কথাই প্রমাণ করবে আপনাদের সামনে। ওকে সারাদিন একটি ফোঁটাও দানাপানি খেতে দেওয়া হয় না। ও তাই এত সাংঘাতিক। দেখছেন, ওকে গাছ কোমরে বেঁধে রাখা হয়েছে। অসুরের মত বল ওর গায়ে। ওর কোন বাছবিছার নেই, যদি নরমাংস দেওয়া যায় ও নরমাংসই খেয়ে ফেলবে। ও ক্ষুধার্ত। ও বর্বর। ক্ষুধাই একমাত্র ওর সব।

—হ্যাঁ হে নর-রাক্ষস, আমি কি মিছে কথা বললাম?

আমি শালা নর-রাক্ষস, বুঝলেন বাবু, আমার তখন কথা বলা বারণ, আমি ঘাড় দুলিয়ে রাক্ষসের মত অঙ্গভঙ্গি করে জানিয়ে দিলাম, না সাবু মাস্টার তুমি ঠিকই বলেছ, তুমিই আসলে আমার অন্নদাতা।

দেখলেন, নর-রাক্ষস আমার কথা স্বীকার করে নিল।—হ্যাঁ হে নর-রাক্ষস আজ তোমাব জন্য একটা কচি পাঁঠা আনিয়েছি, তোমার যদি আপত্তি থাকে তো বল?

আমি শালা নর-রাক্ষস, আমার আপত্তি হবে কেন! নেকড়ে বাঘের মতো লাফিয়ে ঝাঁপিযে কেঁদে কুঁদে কচি একটা পাঁঠা খেতে হবে আজ। খাব, তারপর গলায় আঙুল দিয়ে হড়হড় করে বমি করে আধঘণ্টা বুঁদ হয়ে তাঁবুর একপাশে লুকিয়ে থাকব। এত কিছু কসরত করে তবে না শালা ভাত!

একটা তিন-চার কেজি ওজনের পাঁঠা ছুঁড়ে দেওয়া হল আমার সামনে। তারপর--

নর-রাক্ষস লাউবিচির দাঁতগুলো বার করে হাসতে থাকল।--দিলুম শালাকে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে। রক্তে চর্বিতে সারা গা কেমন পিছলে একাকার হয়ে গেল আমার।

---খেয়ে ফেললে! জ্যান্ত একটা পাঁঠা!

---ঐ যে বললুম আপনাকে, আমি শালা সব খাই। খাই আর গলায় হাতে কব্জি ঢুকিয়ে বমি করি। মাঝে মাঝে মনে হয় যা খেয়েছি তা তো বেরুলই, পেটের নাড়িভুড়ি অব্দি উলটে

এল। বমি করতে করতে কখনো কখনো জ্বর এসে যেত গায়ে। কখনো কখনো মনে হত আমার বুঝি হাত-পা কিংবা দুটো একটা অঙ্গই কমে গেছে। হয়ত খাবার ঝোঁকে নিজেরই একটা হাত কিংবা পা গিলে বসে আছি। বুকে পিঠে মুড়মুড় করা ব্যথা আমার লেগেই থাকত বমির চোটে। তারপর যখন টেনেটুনে ভাতের গামলার কাছে আমাকে এনে বসিয়ে দেওয়া হত তখন আবার সব কিছুই ভুলে যেতাম। বুঝলেন বাবু যত কান্ড কারখানা সব এই পেটের জন্য।

—হুঁ। কিন্তু সাবু মাস্টারকে ছেড়ে এলে কেন, বেশ তো ছিলে?

—এই দেখ! আপনিও বলবেন, বেশ ছিলাম। তা'লে বলি সেই আসানসোলের গল্পটা। আসানসোলে তাঁবু পড়ল সাবু মাস্টারের। সাবু মাস্টারের ব্যবসা বেশ জমজমিয়েই চলছে। হররোজ আমার নামে একটা করে মুরগী বরাদ্দ হচ্ছে আর সাবু মাস্টার তেলে জলে আর পয়সার গরমে যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে। ছেঁড়া তাঁবু পালটে নতুন তাঁবু কিনেছে ও। আড়াই ফুটি বেঁটে একটা জোকার জুটিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। জোকার ছোকরা ছিল খেলুড়ে ঘুঘু। এমন করে লোক হাসায়, মাঝে মাঝে, আমি শালা নর-রাক্ষস,আমিও ফিক করে হেসে উঠি প্রায়।

সাবু মাস্টার নতুন লিকলিকে একটা চাবুক কিনে ফেলেছে এর মধ্যে। হাতে চাবুক না থাকলে নাকি মাস্টার মাস্টারই মনে হয় না। প্রথম দিনই আমি বললাম , দেখ মাস্টার ঐ চাবুক যদি আমার গায়ে তুলেছ কখনো তা'লে শালা আস্ত তোমাকেই খেয়ে ফেলব।

সাবু মাস্টার বলত, আরে ধুৎ! চাবুক হাতে থাকলেই বুঝি চালাতে হয়! ওটা হচ্ছে লোকদেখান। এই দেখ না, হাওয়াতে আমি এমনি করে চাবুক চালাব, ফটাস ফটাস করে শব্দ হবে, ব্যাস।

তা সেই আসানসোলের তাঁবুতে একদিন রাত্রিবেলা খেলা শুরু হল। তাঁবুর মধ্যে জম্পেশ করা ভিড়। শালারা সব নর-রাক্ষস দেখতে এসেছে, ইচ্ছে হয় গায়ের সব শক্তি ঢেলে গাঁক গাঁক করে তেড়ে যাই ওদের, পারি না। কোনদিনই বাবু আমি একটা হেস্ত নেস্ত করে উঠতে পারি নি। আর পারবও না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল নর-রাক্ষস।

—হুঁ, কি করলে তুমি আসানসোলে তাই বল?

—কিই বা আর করব। কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে আমাকে মঞ্চে এনে দাঁড় করান হল।

সাবু মাস্টার চাবুক হাতে হাওয়ায় দুবার চারবার ফটাস ফটাস শব্দ করে বক্তৃতা দিতে শুরু করলো, আপনাদের সামনে নর-রাক্ষসকে দাঁড় করিয়েছি এখন, ও ক্ষুধার্ত। ও আদিম কালের একটা জানোয়ারের মত। ও সব কিছু খেতে পারে। ইঁট কাঠ পাথর মাটি ঘাস..... গোটা দুনিয়াটাকেই ও গ্রাস করে ফেলতে পারে। দেখুন, কী অসীম শক্তি ধরে লোকটা। ওকে ঐভাবেই বেঁধে রাখতে হয় সমস্তক্ষণ।

বুঝুন, আমি যেন সত্যিকারের মানুষই নই, একথাই ও প্রমাণ করতে চায়। সাবু মাস্টার আমাকে দুবেলা ভাত যোগান দেয়, আমার অন্নদাতা, তাই বেটা এসব কথা বলে যেতে

পারল। আমি নর-রাক্ষস, ঠিক আছে। আমি মাথা পেতে সব কিছু মেনে নিতাম। মেনে নিলাম সে দিনও। কিন্তু বেটা সাবু মাস্টারই আমার মাথায় রক্ত চড়িয়ে দিল। দেখি একটা মরা মুরগী আমার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে : নে নর-রাক্ষস খা। মুরগীটাকে দেখেই কেমন যেন আমার সন্দেহ হয়েছিল। শালা চশমখোর হয়ে উঠেছিল। সকালবেলাই আমি লক্ষ্য করেছিলাম মুরগীটা হঠাৎ কোন ব্যামো হয়ে টেঁসে গেছে। আমার ধারণা ছিল ওটাকে ফেলে দিয়ে খেলা দেখাবার জন্য আর একটা নতুন জ্যান্ত মুরগী আনিয়ে নেবে মাস্টার। তা হারামী পয়সা চিনেছে যে।

মরা মুরগী দেখে আমার হাড়ে মাংসে যেন আগুন জ্বলে উঠল। আমি নর-রাক্ষস হতে পারি কিন্তু তাই বলে বলুন তো কি কান্ড!

—কি করলে তুমি?

আমি! মুখ বাঁকা করে পেট চুলকোতে চুলকোতে নর-রাক্ষস বলল,—আমি রাগের মাথায় গায়ে যত শক্তি ছিল তাই দিয়ে মুরগীটাকে একটা কিক্ করলাম।

আর যায় কোথায়! সাবু মাস্টার তেড়ে মেড়ে সপাং সপাং চাবুক চালিয়ে দিল আমার পিঠে। এই, এই শুয়োরের বাচ্চা রাক্ষস, বড্ড বেশি তেল বেড়েছে তোর, তাই না।

কিন্তু পরক্ষণেই সাবু মাস্টার বুঝলো এটা মঞ্চ। মঞ্চের সামনে সার বেঁধে লোক বসে আছে। সবাই টিকিট কেটে খেলা দেখতে এসেছে। এখানে নর-রাক্ষস গোলমাল করতে পারে কিন্তু সাবু মাস্টারের তা সামলে ওঠা উচিত। ও তখন হাত জোড় করে মঞ্চ থেকে দর্শকদের দিকে বলতে শুরু করল, আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। নর-রাক্ষসকে কিছুক্ষণের মধ্যে বশ করছি আমি। ওটা দিনে দিনে বড্ড বেশি বুনো হয়ে যাচ্ছে। মানুষের সঙ্গে বসবাস করার যোগ্যতা ওর নেই আপনারা তা জানেন। তাই—

এমন সময় দেখি ঐ শালা জোকার হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে মরা মুরগীটাকে তুলে এনে হাঁকল, মাস্টার এ যে মরা মুরগী।

সাবু মাস্টার দাঁত কিড়মিড় করে বলল, রোজ রোজ জ্যান্ত পাওয়া যায় না। ওটাই ওকে খেতে দে আজ।

আমি গাঁক গাঁক করে আবার প্রতিবাদ করলুম।

বলুন, আপনিই বলুন মরা মুরগী কি কখনো খাওয়া যায়?

আমি আর কি বলব। বললাম,—তারপর কি করলে? খেলে না বুঝি?

—মাথা খারাপ! জ্যান্ত খেয়েই বমি করে মরছি রোজ! মরা খেলে আর দেখতে হবে না আমাকে। তা আমি ঘাড় গোঁজ করে দাপাদাপি শুরু করলাম। কিন্তু সাবু মাস্টার আমার অন্নদাতা, এত সহজে আমাকে ছাড়বে কেন? দেখি জোকারটাকে কি যেন একটা ইশারা করল সাবু মাস্টার। আর অমনি, বুড়ো মতন একজন দর্শক একটা কুমড়ো কোলে নিয়ে বসে খেলা দেখছিল, সেটা তুলে নিয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল জোকারটা।

—এই, এই, আরে আরে, করে কি করে কি!

কিন্তু কে শোনে কার কথা। নে নর-রাক্ষস, আজ তুই কাঁচা কুমড়োটাই খেয়ে দেখা।

---মশাই, কি বলব আপনাকে! চার কেজির এক কণাও কম নয় কুমড়োটা। ভাবলাম, খেতে তো হবেই, তা দেই শালাকে সাবাড় করে। কুমড়োটাই ঘচ ঘচ করে সাবড়ে দিলাম সেদিন।

---একটা আস্ত কুমড়ো খেয়ে ফেললে?

---ফেললাম। হিঁ হিঁ করে লোকটা হাসতে থাকল।

—কুমড়ো খাওয়াতে অবশ্য দর্শকরা খুব একটা খুশী মনে বাড়ি ফিরল না। দুজন একজনকে বলতেও শুনলাম, খুব ফাঁকি দিয়ে আজ পয়সা মাবলেন দাদা। কোথায় হাঁস মুরগী খাওয়া আর কোথায় কুমড়ো।

---তা তো বটেই। কাঁচা মাংস না খেলে ঠিক রাক্ষস বলে ভাবাই যায় না। কুমড়ো তো একটা গরুকে দিলেও খেয়ে ফেলে!

লোকটা কেমন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, তা সেই রাতে খেলা ভেঙে যাওয়ার পর সাবু মাস্টারের সঙ্গে হয়ে গেল আমার এক চোট। মাস্টার বলল, তোর জন্য আজ আমার বদনাম হয়ে গেল সে খেয়াল আছে? আমি বললাম, আমাকে তাই বলে মরা মুরগীটা খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও মাস্টার। আমি কি মানুষ নই?

---কাঁচা মাংস যে খেতে পারে সে আবার মানুষ।

---বেশ, খাব না আর মাংস।

---খাস না, বেরিয়ে যা এখান থেকে। কে তোর আধ মণ করে চাল জোগান দেয় দেখে নেব। আধ মণ চাল রোজগার করতে পারিস? নেহাত তুই সঙ্গে সঙ্গে আছিস তাই তোকে বাঁচিয়ে রেখেছি। নইলে--

আমি সত্যি সত্যি বেরিয়ে আসতাম, কিন্তু মাঝে পড়ে গেল ঐ আড়াই ফুটি জোকারটা। ওই আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে সে রাতের মতো আমাকে শান্ত করল।

--ভালই করেছিলে, তবু তো ঐ সাবু মাষ্টাব তোমার খাইযে পবিয়ে বাঁচিযে রেখেছিল।

--হুঁ তা রেখেছিল। বর্ধমানে এসে একদিন এমন মাথা গরম হয়ে গেল, দিলুম ছেড়ে। সাবু মাস্টার ততদিনে এক হাজিপাজি রেন্ডি যোগাড় করে ফেলেছে। নাম ছিল কুসুম। গাছকোমরে ঢ্যাঙা, নচ্ছার্মী কি! সব সময় কেমন যেন সাবু মাস্টারের সঙ্গে সঙ্গেই লেগে আছে। প্রতি শোয়ে তিনটি করে নাচ নাচত ঐ কুসুম। খেলা শুরু হওয়ার প্রথমে একবার। সাবু মাস্টারের ম্যাজিক দেখান শেষ হলে একবার। আর একবার মুরগী খাওয়ার আগে। ওদিকে জোকার ছোকরা তো আছেই। আমি বুঝতে পারলাম, প্রথম দিকে আমার যত কদর ছিল সাবু মাস্টারের কাছে, দিনে দিনে যেন তা কমে আসছে। তা কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল আমার ভাতের পরিমাণও যেন কমে আসছে। একদিন আমি বললাম, কি হে মাস্টার, আমার ভাত কমাচ্ছ কেন?

সাবু মাস্টার কিছু বলার আগেই কুসুম বলল, একজনই যদি আধ মণ করে চাল ধবংস করে তবে চলবে কি করে?

---যে ভাবে এতদিন চলেছে।

—এতদিন তো দশ জনে খেত না। আর চিরকালই অমন ভাবে সাবু মাস্টারের মাথায় হাত বুলিয়ে খাবে সেটাই বা কি রকম! এখন থেকে আর অমন রাক্ষুসে খাওয়া চলবে না এখানে।

—কি মজার ব্যাপার দেখুন। সাবু মাস্টার কিন্তু একটাও কথা বলল না। আমি জানতুম ও বলবে না। শালার খুব চর্বি বেড়েছে এতদিনে। কুসুম ওকে বশ করেছে। তা ছাড়াও বেটার রোজগার এখন কমতি কি!

আমারই কপাল খারাপ। আমি মাথা ঠান্ডা রাখতে পারলুম না। বলুন বাবু কেউ কি শান্ত থাকতে পারে এর পর। দুবেলা দুটো খাওয়া, তাও কিনা খবরদারি করতে জুটে গেল একটা বাজারের মেয়েছেলে। আমি হঠ্ করে লাফিয়ে উঠে ওর চুলের মুঠি ধরে দিলুম কয়েক ঘা। আর যায় কোথায়! ঘিয়ে যেন আগুন পড়ল। সাবু মাস্টার ঐ রেন্ডি মাগীর পক্ষ নিয়ে চাবুক হাতে আমার দিকে তেড়ে এল।

—শুয়োরের বাচ্চা,তুই মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলিস?

আমি গজরাতে থাকি। কিন্তু সপাং সপাং করে কয়েক ঘা চাবুক আমার পিঠেই লাগিয়ে দিল সাবু মাস্টার। শংকর মাছের চাবুক, পিঠ চিরে হাঁ হয়ে গেল।

আমি প্রলয় কান্ড বাঁধিয়ে বসলুম। তারপর মনের দুঃখে ঘৃণায় আর অপমানে বেরিয়ে এলাম তাঁবু থেকে।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে থামল। পরে ছলছলে চোখে আবার বলতে শুরু করল, আমি শালা নর-রাক্ষস, রাক্ষসের মত চেহারা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় আমাকে। আমার কি আর মান অপমান থাকার কথা ;সাবু মাস্টার শালা বুঝলে তো! রেন্ডি মাগী বশ করছে ওকে। যা বোঝায় ও তাই বোঝে।

ঘৃণায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল সেদিন। একটা মেয়েছেলে কিনা শেষ পর্যন্ত আমাকে অপমান করে! আর সাবু মাস্টার কিনা সেই মেয়েছেলের পক্ষ নিয়েই আমার পিঠে চাবুক চালায়!

বেরিয়ে এসে দিন কয়েক যেতে না যেতেই বাবু আমি প্যাকাটি মেরে গেলুম! এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি এই আক্রাগন্ডার বাজারে আমার মত মানুষের বেঁচে থাকা যে কি দিকদারি তা আমি বুঝলুম। তখন আমি একা একাই নর-রাক্ষসের খেলা দেখাতে শুরু করলুম পাড়ায় পাড়ায়।

—এই যে দাদা , এই যে আমাকে দেখছেন, আমি একজন নর-রাক্ষস।

—তুমি নর-রাক্ষস।

—আজ্ঞে, আমি নর-রাক্ষস। দিন না একটা একটা হাঁস কিংবা মুরগী এনে, কাঁচা-কাঁচাই খেয়ে দেখাই আপনাকে।

—আচ্ছা পাগল দেখছি, কেটে পড় তো বাবা! থাকা হয় কোথায়?

—আমার কোন নিবাস নেই গো বাবু! যত্রতত্র ঘুরে বেড়াই।

—তাই ঘুরে বেড়াও গে যাও। এখানে আবার জ্বালাতে এলে কেন? ঘাস খেতে পার না মাঠে গিয়ে!

—তাও পারি হুজুর! খাব?

—ডাহা পাগলের পাল্লাতেই পড়া গেল আজ।

—আমি পাগল নই গো কর্তা। বিশ্বাস করুন, লোকে বলে আমি আধমণী কৈলাস। আমি এক ছোটখাট সার্কাসে এতকাল নর-রাক্ষস হয়ে মুরগী খেতাম কাঁচা কাঁচা। কিন্তু—

—আচ্ছা খাও দেখি এই জঙ্গলগুলো।

—খাব! কিন্তু হুজুর মজুরি দেবেন তো। পয়সা নয়, জামা জুতো কাপড়, বাড়ি গাড়ি কিচ্ছু নয়। চাট্টিখানি ভাত। পেটটি পুরে আমাকে শেষে ভাত খাওয়াবেন তো হুজুর?

—খাওয়াব। এই জঙ্গলগুলো যদি সব খেতে পার, খাওয়াব তোমাকে ভাত।

আমি সাবড়ে দিতাম জঙ্গলগুলো। প্রতিদিনই এমনি করে অখাদ্য খেয়ে কুখাদ্য খেয়ে ভাবতাম এবার বুঝি আবার আমার অন্নদাতা পেয়ে গেলুম। কিন্তু এই যে আমার পেট দেখছেন, শুদ্ধ ভাষায় জঠর, এর ভেতরে রয়েছে এক পাতালপ্রমাণ গর্ত, কিছুতেই ভরে না বাবু। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠে বলতে ইচ্ছে করে, আমি সত্যি সত্যি কোন মানুষ নই গো বাবু, আমি মানুষ নই। আমি একজন রাক্ষস। নরকুলে জন্ম নিয়েও রাক্ষস। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ইট কাঠ পাথর মাটি, তরুলতা, পশুপাখি, মানুষজন সব কিছু আমি খেয়ে ফেলি। বেবাক গ্রাস করে ফেলি। যেন তাবৎ ব্রহ্মান্ডটা জন্ম নিয়েছে আমাব খাওয়াব জন্য। আমার জঠরের আগুন নেভাবার জন্য।

দাও, দাও, আরো দাও। আরো খাব আমি। আমার ভীষণ ক্ষিধে। আমি ক্ষুধার্ত। ক্ষিধেয় আমি কাতর হয়ে পড়ছি গো বাবু। এমন করে আমাকে না খাইয়ে তোমরা আমাকে মেরে ফেল না। না,না, না—আচ্ছা দিননা, আমাকে একটা কচি পাঁঠাই এনে দিন না, আমি তাই খেয়ে প্রমাণ করি আমি নর-রাক্ষস।

ক্ষুধায় পরিশ্রমে দিনে দিনে আমি কাতর হয়ে পড়লাম। আর আমি যত কাতর হতে লাগলাম ততই আমার রাক্ষসের মত চেহারা হল। এই যেমন আপনি বললেন না,অন্ধকারে হঠাৎ যদি আমাকে দেখতেন তা হলেই একটা অঘটন ঘটত। মানুষের কাছে মানুষই বুঝি সবচেয়ে বড় ভয়ের বস্তু। অথচ—

যাক গে, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন একটা মজার ব্যাপার ঘটল। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক দুপুরবেলা হাসনাবাদে গিয়ে হাজির হলাম।

তখন হাট বসেছে ওখানে। মেলাই ব্যাপারী, মেলাই ভিড়। ঝাঁকায় ঝাঁকায় মুরগী নিয়ে বসেছে দোকানী। মুরগী দেখেই তো আমার বুকের মাঝে ধুপ ধুপ করে বেজে উঠল। আমি নর-রাক্ষসের মতো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে চেঁচিয়ে উঠলাম, নর-রাক্ষস এসেছে, নর-রাক্ষস।

ভিড় জমে গেল আমার চারপাশে। তা, রাক্ষসের মতোই চেহারা তোমার!

আমি বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে হেসে উঠলাম। আমি নর-রাক্ষস। প্রমাণ চান, প্রমাণ?

ঝাঁকা থেকে একটা মুরগী তুলে দিন, দেখুন আমি খেয়ে ফেলতে পারি কি না।

প্রমাণের আর কাজ নেই বাপু! কেটে পড় দেখি।

কেউ বিশ্বাস করল না আমি নর-রাক্ষস। অথচ বাজার ছেয়ে আছে তরিতরকারি, হাঁস মুরগী গরু ছাগল,মাছ—ঘুরতে ঘুরতে আমি মাছের বাজারেই চলে এলাম।

নর-রাক্ষস এসেছে নররাক্ষস। ও দিদি মেছুনি, তোমার বোয়াল মাছটা দেবে, দেখ না, কাঁচা কাঁচাই আমি খেয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের। আমি সব কিছু খেতে পারি। বিশ্বব্রহ্মান্ড খেয়ে ফেলতে পারি আমি।

—তা তো চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। এবার ঝামেলা কমাও দেখি এখান থেকে। এই বঁটি দেখেছ, নইলে—

কোন শালাই বিশ্বাস করল না আমাকে। বরং উলটো বুঝলি রাম! ফেউ জুটে গেল পিছনে। মর জ্বালা, খোঁচাচ্ছ কেন? এই এই--কে যেন দূর থেকে একটা কলার খোসা ছুঁড়ে মারল আমার দিকে। কেউ বলল আমার পেছন দিকে একটা ক্যানাস্তারা টিন বেঁধে দেওয়া দরকার।

বাচ্চাকাচ্চা জুটে গেল মেলাই। তখন আমার পেটের ভিতর দাউ দাউ করছে আগুন। একে এই ক্ষিধে তার উপর যদি বিরক্ত করতে আসে কেউ, তখন মনের অবস্থা কেমন হয় ভেবে দেখুন। আমি বার দুয়েক হুমকি দিয়ে একটা ইঁট কুড়িয়ে নিলাম। এই শালা শুয়োরের বাচ্চা ফের যদি এগিয়েছিস!

কিন্তু এ কি! মেলাই ঝঞ্ঝাটে পড়লাম আমি। তাকিয়ে দেখি পিছনে যারা মজা করতে করতে এগোচ্ছিল তারা মানুষই নয়। একদঙ্গল মুরগী হয়ে গেছে কোন ফাঁকে। ঘাড় দোলাচ্ছে, পাখা ফোলাচ্ছে, ঝুঁটি নাচাচ্ছে। কোনটা লালচে, কোনটা খয়েরি, কোনটা সাদা। কোনটা দিশি পাতিমুরগী, কোনটা বিলিতি। যাহ্‌বাবা, ভুল দেখছি না তো!

আমি চোখ কচলে আবার তাকালাম, মুরগী,হাজার হাজার লাখো লাখো মুরগী। সারা হাটে একটিও যে মানুষ নেই, কেবল নাদুস-নুদুস নধরকান্তি মুরগী সবাই। এতগুলো মুরগীর মধ্যে আমি একটাই মাত্র রাক্ষস, নররাক্ষস।

কেমন হল! বুঝুন ব্যাপারটা, হাসনাবাদের হাটে খানিকক্ষণ আগেও আমি গিসগিস করা মানুষজন দেখছি, আসলে ওগুলো যে মানুষই নয় কে বুঝতে পেরেছিল তখন।

মুরগীগুলো আমাকে ঘিরে যেন নাচতে শুরু করে দিল। মুগীরা আবার বাজনা বাজাতে জানে নাকি! ও মা, এ যে দেখছি কেউ বাজাচ্ছে বিউগোল, কেউ খোল করতাল, কেউ বা পাখা দুলিয়ে সেই রেন্ডিমাগী, কুসুমের মত নাচছে। কেউ হাসছে ফিক ফিক করে, হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছে ভুঁয়ে। ওমা। ঐ যে ঐ মুরগীটা অবিকল আড়াই ফুটি-- জোকার ছোকরাটার মত অঙ্গভঙ্গি করছে।

আরো সব মজার ঘটনা ঘটল ওখানে। রাত্রি হয়ে গিয়েছিল বলে এ-পাশে ও-পাশে হ্যাজাক জ্বলে উঠল। কোনটা অনেক উঁচুতে কপিকল দিয়ে যেন ঝোলান হয়ে গেছে, কোনটা রয়েছে ভুঁয়ে, কতগুলি আবার সার বেঁধে মালার মত, অবিকল যেন সাবু মাস্টারের তাঁবু। যেন আর

কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা শুরু হয়ে যাবে; তাঁবুর মধ্যে তারই সব আয়োজন।

আমি শালা নর-রাক্ষস, আমি কি আর ভাল মানুষের মত হাত-পা গুটিয়ে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারি। আমি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে জানান দিতে শুরু করলাম আমি নর-রাক্ষস।

আমার মনে হচ্ছিল সাবু মাস্টারের ফুটিফাটা তাঁবুটা যেন পালটে গেছে অনেককাল, আমি তার খবরই রাখি নি। আকাশছোঁয়া তাঁবু হয়ে গেছে সাবু মাস্টারের; এতদিনে লোকলস্কর খেলোয়াড় নাচনেওয়ালী হাজার গন্ডা জুটে গেছে ওর। হয়ত এখনি সব একে একে আসরে এসে হাজির হয়ে যাবে।

কিন্তু প্রথমে যে এল সে হচ্ছে সাবু মাস্টার। ঝলমলে একটা জামা গায়। হাতে সেই শংকর মাছের চাবুক। আমার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন খনখনে হাসল, কেমন আছিস.রে নররাক্ষস?

আমি শালা নররাক্ষস, ঘোঁত ঘোঁত করে হাসলাম।

হাসি দেখে কি জানি কি হয়ে গেল সাবু মাস্টারের, সপাং সপাং করে চাবুক চালাল আমার পিঠে। উঁহু, মের না মাস্টার মের না। আমি নর-রাক্ষস হতে পাবি কিন্তু মানুষ তো!

চাবুকের আঘাতেই বুঝি আমার তন্দ্রা কেটে গেল। দেখি হাসনাবাদের সেই হাটের তখন ভাঙাদশা। ব্যাপাবীরা সব পাততাড়ি গোটাতে ব্যস্ত। আমি সেই হাটুরে ভূতদের তাড়া খেয়ে মাঠের মধ্যে এসে পড়ে আছি। পড়ে বোধ হয় অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলাম। আসলে এতক্ষণ স্বপ্নের মত আবোল তাবোল কি সব মাথা মুণ্ডুই না দেখলাম। আসলে বুঝলেন বাবু পেটে ক্ষিধে থাকলে মানুষ কত কিছু না ভাবতে পাবে।

লোকটা হিঁহিঁ করে আবার হাসল। ওর লাউবিচির মত পেছল-পেছল দাঁতগুলো আবার বেরিয়ে পড়ল।

বললাম, আসলে সাবু মাস্টারই তোমাকে কিনে ফেলেছে।

নব-রাক্ষস পেট চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, হ্যাঁ বাবু, পেটেরই জন্য, এই জঠরের জন্য আমাকে কিনে ফেলেছে সাবু মাস্টাব। আব একবাব দেখা হলে ওব পায়ে হাত দিয়ে বলতাম,

---মাস্টার, তুমিই আমার অন্নদাতা, তুমিই।

তারপর ও বুঁদ হয়ে অনেকক্ষণ বসে বইল আমার পাশে। ওর চোখ ভিজে গেল জলে।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৩১/ সংখ্যা ৪: ১৩৭৬]

নীলুর দুঃখ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

[জন্ম ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহে। ছোটদের ও বড়দের কথাসাহিত্য রচনায় সমান দক্ষ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ঘুনপোকা, যাও পাখি, পারাপার, ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রাপ্ত।]

সকালবেলাতেই নীলুর বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। মাসের একুশ তারিখ। ধারে কাছে কোনো পেমেন্ট নেই। বাবা তিনদিনের জন্য মেয়ের বাড়িতে গেছে বারুইপুর—মহা টিক্‌রমবাজ লোক--সাউথ শিয়ালদায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলু যখন প্রণাম করল তখন হাসি হাসি মুখে বুড়ো নতুন সিগারেটের প্যাকেটের সিলোফেন ছিঁড়ছে। তিনদিন মায়ের আওতার বাইরে থাকবে বলেই বুঝি ঐ প্রসন্নতা—ভেবেছিল নীলু। গাড়ি ছাড়বার পর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনদিনের বাজার খরচ রেখে গেছে তো! সেই সন্দেহ কাল সারা বিকেল খচখচ করেছে। আজ সকালেই মশারির মধ্যে আধখানা ঢুকে তাকে ঠেলে তুলল মা—বাজার যাবি না, ও নীলু?

তখনই বোঝা গেল বুড়ো চাক্কি রেখে যায়নি। কাল নাকি টাকা তুলতে রনোকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু দস্তখত মেলেনি বলে উইথড্রয়াল ফর্ম ফেরত দিয়েছে পোস্টাপিস। কিন্তু নীলু জানে পুরোটা টিক্‌রমবাজী। বুড়ো আগে ছিল রেলের গার্ড, রিটায়ার করার পর একটা মুদির দোকান দিয়েছিল--অনভিজ্ঞ লোক, তার ওপর দোকান ভেঙে যেতো--ফলে দোকান উঠে গেল। এখন তিন রোজগেরে ছেলের টাকা নিয়ে পোস্ট-অফিসে রাখে আর প্রতি সপ্তাহে খরচ তোলে। প্রতিদিন বাজারের থলি দশমেসে পেটের মতো ফুলে না থাকলে বুড়োর মন ভেজে না। মাসের শেষদিকে টাকা ফুরোলেই টিক্‌রমবাজী শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহে যে লোক টাকা তুলছে তার নাকি দস্তখত মেলে না!

নীলু হাসে। সে কখনো বুড়োর ওপর রাগ করে না। বাবা তার দিকে আড়ে আড়ে চায় মাসের শেষ দিকটায়। ঝাঁক দেওয়ার নানা চেষ্টা করে। নীলুর সঙ্গে বাবার একটা লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে।

বাঙালের খাওয়া। তার ওপর পুঁটিয়ারীর নাড়ুমামা, মামী, ছেলে, ছেলের বৌ--চারটে বাইরের লোক নিমন্ত্রিত, ঘরের লোক বারোজন--নীলু নিজে, মা, ছটা ভাই, দুটো ধুমসী বোন, বিধবা মাখনী পিসি, বাবার জ্যাঠাতো ভাই, আইবুড়ো নিবারণ কাকা--বিশ চাক্কির নীচে বাজার নামে?

রবিবার। বাজার নামিয়ে রেখে নীলু একটু পাড়ায় বেরোয়। কদিন ধরেই পোগো ঘুরছে পিছন পিছন। তার কোমরে নানা আকৃতির সাতটা ছুরি। ছুরিগুলো তার মায়ের পুরোনো শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে জড়িয়ে সযত্নে শার্টের তলায় গুঁজে রাখে পোগো। পাড়ার লোক

বলে, পোগো দিনে সাতটা মার্ডার করে। নিতান্ত এলেবেলে লোকও পোগোকে যেতে দেখলে হেঁকে ডাক পাড়ে—কী পোগোবাবু, আজ কটা আজ কটা মার্ডার হল? পোগো হুস্ হাস্ করে চলে যায়।

পরশুদিন পোগোর মেজোবৌদি জানালা দিয়ে নীলুকে ডেকে বলেছিল—পোগো যে তোমাকে মার্ডার করতে চায়, নীলু, খবর রাখো?

তাই বটে। নীলুর মনে পড়ল, কয়েকদিন যাবৎ সে অফিসে যাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করেছে পোগো নিঃশব্দে আসছে পিছন পিছন। বাস-স্টপ পর্যন্ত আসে। নীলু কখনো ফিরে তাকালে পোগো ঊর্ধ্বমুখে আকাশ দেখে আর বিড়বিড় করে গাল দেয়।

আজ বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে যাওয়ায় নীলুর মেজাজ ভাল ছিল না। নবীনের মিষ্টির দোকানের সিঁড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকছিল পোগো। নীলুকে দেখেই আকাশে তাকাল। না-দেখার ভান করে কিছুদূর গিয়েই নীলু টের পেল পোগো পিছু নিয়েছে।

নীলু ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পোগো উল্টোবাগে ঘুরে হাঁটতে লাগল। এগিয়ে গিয়ে তার পাছায় ডান পায়ের একটা লাথি কষাল নীলু,—শালা, বদের হাঁড়ি!

কাঁই শব্দ করে ঘুরে দাঁড়ায় পোগো। জিভ আর প্যালেটের কোনো দোষ আছে পোগোর, এখনো জিভের আড় ভাঙেনি। ছত্রিশ বছরের শরীরে তিন বছর বয়সী মগজ নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। গরম খেয়ে বলল—খুব ঠাবহান, নীলু, বলে ডিট্টি খুব ঠাবহান!

—ফের! কষাবো আর একটা?

পোগো থতিয়ে যায়। শার্টের ভিতরে লুকোনো হাত ছুরি বের করবার প্রাক্কালের ভঙ্গিতে রেখে বলে—একডিন ফুটে ডাবি ঠালা।

নীলু আর একবার ডান পা তুলতেই পোগো পিছিয়ে যায়। বিড় বিড় করতে করতে কারখানার পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে।

সেই কবে থেকে মার্ডারের স্বপ্ন দেখে পোগো। সাত-আটখানা ছুরি বিছানায় নিয়ে ঘুমোতে যায়। পাছে নিজের ছুরি ফুটে ও নিজে মরে—সেই ভয়ে ও ঘুমোলে ওর মা এসে হাতড়ে হাতড়ে ছুরিগুলো সরিয়ে নেয়। মার্ডারের বড় শখ পোগোর। সারাদিন সে লোককে কত মার্ডারের গল্প করে! কলকাতায় হাঙ্গামা লাগলে ছাদে উঠে দুহাত তুলে লাফায়। মার্ডারের গল্প যখন শোনে তখন নিথর হয়ে যায়।

নীলু গতবার গ্রীষ্মে দার্জিলিঙ বেড়াতে গিয়ে একটা ভোজালি কিনেছিল। তার সেই শখের ভোজালিটা দিনসাতেক আগে একদিনের জন্য ধার নিয়েছিল পোগো। ফেরত দেবার সময়ে চাপা গলায় বলেছিল—ভয় নেই, ভাল করে ঢুয়ে ডিয়েছি।

—কী ধুয়েছিস? জিজ্ঞেস করেছিল নীলু।

অর্থপূর্ণ হেসেছিল পোগো, উত্তর দেয়নি। তোমরা বুঝে নাও কী ধুয়েছি। সেদিনও একটা লাথি কষিয়েছিল নীলু—শালার শয়তানী বুদ্ধি দেখ। ধুয়ে দিয়েছি—কী ধুয়েছিস আবেব পোগোর বাচ্চা?

সেই থেকেই বোধহয় নীলুকে মার্ডার করার জন্য ঘুরছে পোগো। তার লিস্টে নীলু ছাড়া আরো অনেকের নাম আছে যাদের সে মার্ডার করতে চায়।

আজ সকালে বৃটিশকে খুঁজছে নীলু। কাল বৃটিশ জিতেছে। দুশো সত্তর কি আশি টাকা। সেই নিয়ে খিচাং হয়ে গেল কাল।

গলির মুখ আটকে খুদে প্যান্ডেল বেঁধে বাচ্চাদের ক্লাবের রজত-জয়ন্তী হচ্ছিল কাল সন্ধেবেলায়। পাড়ার মেয়ে-বৌ, বাচ্চারা ভিড় করেছিল খুব। সেই ফাংশন যখন জমজমাট তখন বড় রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে বৃটিশ নামল। টলতে টলতে ঢুকল গলিতে, দু বগলে বাংলার বোতল। সঙ্গে ছুট্‌কু। পাড়ায় পা দিয়ে ফাংশনের ভিড় দেখে নিজেকে জাহির করার জন্য দুহাত ওপরে তুলে হাঁকাড় ছেড়েছিল বৃটিশ--ঈ-ঈ-ঈ-দ্ কা চাঁ-আ-আ-দ! বগল থেকে দুটো বোতল পড়ে গিয়ে ফট্-ফটাস্ করে ভাঙল। হুড়দৌড় লেগে গিয়েছিল বাচ্চাদের ফাংশনে। পাঁচ বছরের টুমিরানী তখন ডায়াসে দাঁড়িয়ে 'কাঠবেরালী, কাঠবেরালী, পেয়ারা তুমি খাও...' বলে দুলতে দুলতে থেমে ভ্যাঁ করার জন্য হাঁ করেছিল মাত্র সেই সময়ে নীলু, জগু, জাপান এসে দুটোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হরতুনের চায়ের দোকানে। নীলু বৃটিশের মাথায় জল ঢালে আর জাপান পিছন থেকে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কত জিতেছিস? প্রথমে বৃটিশ চেঁচিয়ে বলেছিল—আবেব, পঞ্চা-আ শ হা-জা-আ-র। জাপান আরো দুবাব হাঁটু চালাতেই সেটা নেমে দাঁড়াল দু হাজারে। সেটাও বিশ্বাস হল না কারো। পাড়ার বুকি বিশুর কাছ থেকে সবাই জেনেছে, ঈদ কা চাঁদ হট ফেবারিট ছিল। আরো কয়েকবার ঝাঁকাড় খেয়ে সত্যি কথা বলল বৃটিশ--তিনশো মাইরি বলছি--বিশ্বাস কর। পকেট সার্চ করে শ'দুইয়ের মতো পাওয়া গিয়েছিল।

আজ সকালে তাই বৃটিশকেই খুঁজছে নীলু। মাসের একুশ তারিখ। বৃটিশের কাছে ত্রিশ টাকা পাওনা। গত শীতে দর্জির দোকান থেকে বৃটিশের টেরিকটনের প্যান্টটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল নীলু। এতদিন চায়নি। গতকাল নিয়ে নিতে পারত, কিন্তু মাতালের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয় বলে নেয়নি। আজ দেখা হলে চেয়ে নেবে।

চায়ের দোকানে বৃটিশকে পাওয়া গেল না। ভি.আই. পি রোডেব মাঝখানে যে সবুজ ঘাসের চত্বরে বসে তারা আড্ডা মারে সেখানেও না। ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেখল নীলু। কোথাও নেই। কাল রাতে নীলু বেশিক্ষণ ছিল না হরতুনের দোকানে। জাপান, জগু ওরা বৃটিশকে ঘিরে বসেছিল। বহুকাল তাবা এমন মানুষ দেখেনি যার পকেটে ফালতু দুশো টাকা। জাপান মুখ চোখাচ্ছিল। কে জানে রাতে আবার ওরা ট্যাক্সি ধরে ধর্মতলার দিকে গিয়েছিল কিনা! গিয়ে থাকলে ওরা এখনো বিছানা নিয়ে আছে। দুপুর গড়িয়ে উঠবে। বৃটিশের বাড়িতে আজকাল আর যায় না নীলু। বৃটিশেব মা আর দাদা সন্দেহ ওকে নষ্ট করেছে নীলুই। নইলে নীলু গিয়ে বৃটিশকে টেনে তুলত বিছানা থেকে, বলত,--না, হকের পয়সা পেয়েছিস, হিস্যা চাই না, আমার হক্কেরটা দিয়ে দে।

নাঃ। আবার ভেবে দেখল নীলু। দুশো টাকা--মাত্র দুশো টাকাব আয়ু এ বাজারে কতক্ষণ? কাল যদি ওরা সেকেন্ড টাইম গিয়ে থাকে ধর্মতলায় তবে বৃটিশের পকেটে এখন হপ্তার খরচও নেই।

মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় নীলু। ভাবে, বিশ চাক্কি যদি ঝাঁক হয়েই গেল তবে কীভাবে বাড়ির লোকজনের ওপর একটা মৃদু প্রতিশোধ নেওয়া যায়!

অমনি শোভন আর তার বৌ বল্লরীর কথা মনে পড়ে গেল তার। শোভন কাজ করে কাস্টমসে। তিনবারে তিনটে বিলিতি টেরিলিনের শার্ট তাকে দিয়েছে শোভন, আর দিয়েছে সস্তায় একটা গ্রুয়েন ঘড়ি। তার ভদ্রলোক বন্ধুদের মধ্যে শোভন একজন-- যাকে বাড়িতে ডাকা যায়। কতবার ভেবেছে নীলু শোভন,বল্লরী আর ওদের দুটো কচি মেয়েকে এক দুপুরের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসবে, খাইয়ে দেবে ভাল করে। খেয়ালই থাকে না এসব কথা।

মাত্র তিন স্টপ দূরে থাকে শোভন। মাত্র সকাল ন'টা বাজে। আজ ছুটির দিন, বল্লরী নিশ্চয়ই রান্না চাপিয়ে ফেলেনি! উনুনে আঁচ দিয়ে চা-ফা, লুচি-ফুচি হচ্ছে এখনো! দুপুরে খাওয়ার কথা বলার পক্ষে খুব বেশি দেরি বোধহয় হয়নি এখনো।

ছত্রিশ নম্বর বাসটা থামতেই উঠে পড়ল নীলু।

উঠেই বুঝতে পারে। বাসটা দখল করে আছে দশ বারো জন ছেলে-ছোকরা। পরনে শার্ট পায়জামা, কিংবা সরু প্যান্ট। বয়স ষোলোর এদিক ওদিক। তাদের হাসির শব্দ থুথু ফেলার আগের গলাখাঁকারির---খ্যা-অ্যা-অ্যা-র মতো শোনাচ্ছিল। লেডীজ সীটে দু'তিনজন মেয়েছেলে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। দুচারজন ভদ্রলোক ঘাড় সটান করে পাথরের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে আছে। ছোকরারা নিজেদের মধ্যেই চেঁচিয়ে কথা বলছে। উল্টোপাল্টা কথা, গানের কলি। কন্ডাকটর দুজন দু দরজায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে। ভাড়া চাইবার সাহস নেই।

তবু ছোকরাদের একজন দলের পরমেশ নামে আর একজনকে ডেকে বলছে--পরমেশ, আমাদের ভাড়াটা দিলি না?

--কত করে?

--আমাদের হাফ্-টিকিট। পাঁচ পয়সা করে দিয়ে দে।

--এই যে কন্ডাক্টরদাদা, পাঁচ পয়সার টিকিট আছে তো! বারোখানা দিন।

পিছনের কন্ডাক্টর রোগা, লম্বা, ফর্সা। না কামানো কয়েকদিনের দাড়ি থুতনিতে জমে আছে। এবড়োখেবড়ো গজিয়েছে গোঁফ। তাতে তাকে বিষণ্ণ দেখায়। সে তবু একটু হাসল ছোকরাদের কথায়। অসহায় হাসিটি।

নীলু বসার জায়গা পায়নি। কন্ডাক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে সে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

বাইরে কোথাও পরিবার পরিকল্পনার হেডিং দেখে জানালার পাশে বসা একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল--লাল ত্রিভুজটা কী বল তো মাইরি।

--ট্র্যাফিক সিগন্যাল রে, লাল দেখলে থেমে যাবি।

--আর নিরোধ! নিরোধটা কি যেন।

-রাজার টুপি...রাজার টুপি ..

খ্যা-অ্যা-অ্যা-খ্যা-অ্যা-অ্যা .

—খ্যা...

পরের স্টপে বাস আসতে তারা হেঁকে বলল—বেঁধে লেডীজ...

নেমে গেল সবাই। বাসটাকে ফাঁকা নিস্তব্ধ মনে হল এবার। সবাই শরীর শ্লথ করে দিল। একজন চশমা-চোখে যুবা কন্ডাক্টররের দিকে চেয়ে বলল—লাথি দিয়ে নামিয়ে দিতে পারেন না এসব এলিমেন্টকে!

কন্ডাক্টর ম্লান মুখে হাসে।

ঝুঁকে নীলু দেখছিল ছেলেগুলো রাস্তা থেকে বাসের উদ্দেশ্যে টিটকারি ছুঁড়ে দিচ্ছে। কান কেমন গরম হয়ে যায় তার। লাফিয়ে নেমে পড়তে ইচ্ছে করে। লাঠি ছোরা বোমা যা হোক অস্ত্র দিয়ে কয়েকটাকে খুন করে আসতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ পোগোর মুখখানা মনে পড়ে নীলুর। জামার আড়ালে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোগো। স্বপ্ন দেখছে মার্ডারের। তারা সবাই পোগোর পিছনে লাগে, মাঝে মধ্যে লাথি কষায়। তবু কেন যে পোগোর মতই এক তীব্র মার্ডারের ইচ্ছে জেগে ওঠে নীলুর মধ্যেও মাঝে মাঝে। এত তীব্র সেই ইচ্ছে যে আবেগ কমে গেলে শরীরে একটা অবসাদ আসে। তেতো হয়ে যায় মন।

শোভন বাথরুমে। বল্লরী এসে দরজা খুলে চোখ কপালে তুলল—ওমা, আপনার কথাই ভাবছিলাম সকালবেলায়। অনেকদিন বাঁচবেন।

শোভনের বৈঠকখানাটি খুব ছিমছাম, সাজানো। বেতের সোফা, কাচের বুককেস, গ্রুন্ডিগের রেডিওগ্রাম, কাঠের টবে মানিপ্ল্যান্ট, দেয়ালে বিদেশী বারো-ছবিওলা ক্যালেন্ডার,মেঝেয় কয়ের কার্পেট। মাঝখানে নীচু টেবিলের ওপর মাখনের মতো রঙের ঝক্‌ঝকে অ্যাশ-ট্রে-টার সৌন্দর্যও দেখবার মতন। মেঝেয় ইংরিজি ছড়ার বই খুলে বসে ছিল শোভনের চার আর তিন বছর বয়সের মেয়ে মিলি আর জুলি। একটু ইংরিজি কায়দায় থাকতেই ভালবাসে শোভন। মিলিকে কিন্ডারগার্ডেনের বাস এসে নিয়ে যায় রোজ। সে ইংরিজি ছড়া মুখস্থ বলে।

নীলুকে দেখেই মিলি জুলি টপাটপ উঠে দৌড়ে এল।

মিলি বলে—তুমি বলেছিলে ভাত খেলে হাত এঁটো হয়। এঁটো কী?

দুজনকে দু কোলে তুলে নিয়ে ভারী একরকমের সুখবোধ করে নীলু। ওদের গায়ে শৈশবের আশ্চর্য সুগন্ধ।

মিলিজুলি তার চুল, জামার কলার লন্ডভন্ড করতে থাকে। তাদের শরীরের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে নীলু বল্লরীকে বলে—তোমার হাঁড়ি চড়ে গেছে নাকি উনুনে!

—এইবার চড়বে। বাজার এলো এইমাত্র।

—হাঁড়ি ক্যানসেল করো আজ। বাপ গেছে বারুইপুর। সকালেই বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। সেটা পুষিয়ে নিতে হবে তো! তোমার এ দুটো পুঁটলি নিয়ে দুপুরের আগেই চলে যেও আমার গাড্ডায়, ঘুমে লিও সবাই।

বল্লরী ঝেঁঝে ওঠে—কী যে সব অসভ্য কথা শিখেছেন বাজে লোকদের কাছ থেকে। নেমতন্নের ওই ভাষা!

বাথরুম থেকে শোভন চেঁচিয়ে বলে—চলে যাস না নীলু, কথা আছে।

--যেও কিন্তু। নীলু বল্লরীকে বলে--নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।

—বাঃ, আমার যে ডালের জল চড়ানো হয়ে গেছে। এত বেলায় কি নেমন্তন্ন করে মানুষ!

নীলু সেসব কথায় কান দেয় না। মিলিজুলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

শোভন সকালেই দাড়ি কামিয়েছে। নীল গাল। মেদবহুল শরীরে এঁটে বসেছে ফিনফিনে গেঞ্জি, পরনে পাটভাঙা পায়জামা। গত বছর যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এল শোভন। বাসা খুঁজে দিয়েছিল নীলুই। চারদিনের নোটিশে তখন সুখে আছে শোভন। যৌথ পরিবারে থাকার সময়ে এত নিশ্চিন্ত আর তৃপ্ত সুখী দেখাতো না তাকে।

পাছে হিংসা হয় সেই ভয়ে চোখ সরিয়ে নেয় নীলু।

নেমন্তন্নের ব্যাপার শুনে শোভন হাসে—আমিও যাবো-যাবো করছিলাম তোর কাছে। এর মধ্যেই চলে যেতাম। ভালই হল।

এক কাপ চা আর প্লেটে বিস্কুট সাজিয়ে ঘরে আসে বল্লরী।

শোভন হতাশ গলায় বলে---বাঃ ,মোটে এক কাপ করলে! ছুটির দিনে এ সময়ে আমারো তো এক কাপ পাওনা।

বল্লরী গম্ভীরভাবে বলে--বাথরুমে যাওয়ার আগেই তো এক কাপ খেয়েছো।

মিষ্টি ঝগড়া করে দুজন। মিলি জুলির গায়ের অদ্ভুত সুগন্ধে ডুবে থেকে শোভন আর বল্লরীর আদর-করা গলার স্বর শোনে নীলু। সম্মোহিত হয়ে যেতে থাকে।

তারপরই হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে—চলি রে। তোরা ঠিক সময়ে চলে যাস।

--শুনুন শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। বল্লরী তাকে থামায়।

—কী কথা?

—বলছিলুম না আজ সকালেই ভেবেছি আপনার কথা! তার মানে নালিশ আছে একটা। কারা বলুন তো আমাদের বাড়ির দেয়ালে রাজনীতির কথা লিখে যায়? তারা কারা? আপনাদেরই তো এলাকা এটা, আপনার জানার কথা!

—কী লিখেছে?

—সে অনেক কথা। ঢোকার সময়ে দেখেন নি? বর্ষার পরেই নিজেদের খরচে বাইরেটা রঙ করালুম। দেখুন গিয়ে, কালো রঙ দিয়ে ছবি এঁকে লিখে কী করে গেছে শ্রী! তা ছাড়া রাতভর লেখে, গোলমালে আমরা কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি।

নীলু উদাসভাবে বলে--বারণ করে দিলেই পারো।

-- কে বারণ করবে? আপনার বন্ধু ঘুমোতে না পেরে উঠে সিগারেট ধরালো আর ইংরিজিতে আপনমনে গালাগাল দিতে লাগল--ভ্যাগাবন্ডস্, মিসফিটস্ ,প্যারাসাইট্স্... আরো কত কী! সাহস নেই যে উঠে ছেলেগুলোকে ধমকাবে।

--তা তুমি ধমকালে না কেন? নীলু বলে উদাসভাবটা বজায় রেখেই।

বল্লরী হাসল উজ্জ্বলভাবে। বলল--ধমকাইনি নাকি! শেষমেশ আমিই তো উঠলাম। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললাম--ভাই, আমরা কি রাতে একটু ঘুমোবো না? আপনার বন্ধু তো আমার কান্ড দেখে অস্থির। পিছন থেকে আঁচল টেনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে--চলে এসো, ওরা ভীষণ ইতর, যা তা বলে দেবে। কিন্তু ছেলেগুলো খারাপ না। বেশ ভদ্রলোকের মতো চেহারা। ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে, হাতে কিছু চটি চটি বই, প্যাম্‌ফ্লেট। আমার দিকে হাতজোড় করে বলল--বৌদি, আমাদেরও তো ঘুম নেই। এখন তো ঘুমের সময় না এ দেশে। বললুম--আমার দেয়ালটা অমন নোংরা হয়ে গেল যে! একটা ছেলে বলল--কে বলল নোংরা! বরং আপনার দেয়ালটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট হল আগের চেয়ে। লোকে এখানে দাঁড়াবে, দেখবে, জ্ঞানলাভ করবে। আমি বুঝলুম খামোখা কথা বলে লাভ নেই। জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছি অমনি একটা মিষ্টি চেহারার ছেলে এগিয়ে এসে বলল--বৌদি, আমাদের একটু চা খাওয়াবেন? আমরা ছজনে আছি!

নীলু চমকে উঠে বলে--খাওয়ালে না কি ?

বল্লরী মাথা হেলিয়ে বলল - খাওয়াবো না কেন?

--সে কী!

শোভন মাথা নেড়ে বলল--আর বলিস না, ভীষণ ডেয়ারিং এই মহিলাটি। একদিন বিপদে পড়বে।

--আহা, ভয়ের কী! এইটুকু-টুকু সব ছেলে, আমার ভাই বাবলুর বয়সী। মিষ্টি কথাবার্তা। তাছাড়া এই শরতের হিমে সারা রাত জেগে বাইরে থাকছে--ওদের জন্য না হয় একটু কষ্ট করলাম!

শোভন হাসে, হাত তুলে বল্লরীকে থামিয়ে বলে--তার মানে তুমিও ওদের দলে।

--আহা, আমি কী জানি ওরা কোন দলের? আজকাল হাজারো দল দেয়ালে লেখে। আমি কী করে বুঝবো!

--তুমি ঠিকই বুঝেছো। তোমার ভাই বাবলু কোন দলে তা কি আমি জানি না! সেদিন খবরের কাগজে বাবলুর কলেজের ইলেকশনের রেজাল্ট তোমাকে দেখালুম না? তুমি ভাইয়ের দলের সিমপ্যাথাইজার।

অসহায়ভাবে বল্লরী নীলুর দিকে তাকায়, কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলে--না, বিশ্বাস করুন। আমি দেখিওনি ওরা কী লিখেছে।

নীলু হাসে--কিন্তু চা তো খাইয়েছো!

--হ্যাঁ। সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। গ্যাস জ্বেলে ছ' পেয়ালা চা করতে কতক্ষণ লাগে! ওরা কী খুশী হল! বলল--বৌদি, দরকার পড়লে আমাদের ডাকবেন। যাওয়ার সময়ে পেয়ালাগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে গেল। ওরা ভাল না?

নীলু শান্তভাবে একটু মুচকি হাসে--কিন্তু তোমার নালিশ ছিল বলছিলে যে! এ তো নালিশ নয়। প্রশংসা।

--না নালিশই। কারণ, আজ সকালে হঠাৎ গোটা দুই বড় বড় ছেলে এসে হাজির।

বলল--আপনাদের দেয়ালে ওসব লেখা কেন? আপনারা কেন এসব অ্যালাউ করেন? আপনার বন্ধু ঘটনাটা বুঝিয়ে বলতে ওরা থম্‌থমে মুখ করে চলে গেল। আপনি ওই ছজনকে যদি চিনতে পারেন তবে বলবেন--ওরা যেন আর আমাদের দেয়ালে না লেখে। লিখলে আমরা বড় বিপদে পড়ে যাই। দু দলের মাঝখানে থাকতে ভয় করে আমাদের। বলবেন যদি চিনতে পারেন।

শোভন মাথা নেড়ে বলে--তার চেয়ে নীলু, তুই আমার জন্য আর একটা বাসা দেখ। এই দেয়ালের লেখা নিয়ে ব্যাপার কদ্দূর গড়ায় কে জানে। এর পর বোমা কিংবা পেটো ছুঁড়ে দিয়ে যাবে জানালা দিয়ে, রাস্তায় পেলে আলু টপকাবে। তার ওপর বল্লরী ওদের চা খাইয়েছে--যদি সে ঘটনার সাক্ষীসাবুদ কেউ থেকে থাকে তবে এখানে থাকাটা বেশ রিস্কি এখন।

বল্লরী নীলুর দিকে চেয়ে বলল--বুঝলেন তো! আমাদের কোন দলের ওপর রাগ নেই। রাতজাগা ছটা ছেলেকে চা খাইয়েছি--সে তো আর দল বুঝে নয়! অন্য দলের হলেও খাওয়াতুম।

বেরিয়ে আসার সময়ে দেয়ালের লেখাটা নীলু একপলক দেখল। তেমন কিছু দেখবার নেই। সারা কলকাতার দেয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিপ্লবের ডাক। নিঃশব্দে।

কয়েকদিন আগে এক সকালবেলায় হরলালের জ্যাঠামশাইকে নীলু দেখেছিল, প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরার পথে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেয়ালের সামনে। পড়ছেন লেখা। নীলুকে দেখে ডাক দিলেন তিনি। বললেন--এইসব লেখা দেখেছো নীলু? কীরকম স্বার্থপরতার কথা! আমাদের ছেলেবেলায় মানুষকে স্বার্থত্যাগের কথাই শেখানো হত। এখন এরা শেখাচ্ছে স্বার্থসচেতন হতে, হিংস্র হতে--দেখেছো কীরকম উল্টো শিক্ষা!

নীলু শুনে হেসেছিল।

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন--হেসো না। রামকৃষ্ণদেব যে কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছিলেন তার মানে বোঝো?

নীলু মাথা নেড়েছিল।

না উনি বললেন--আমি এতদিনে সেটা বুঝেছি। রামকৃষ্ণদেব আমাদের দুটো অশুভ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিলেন। একটা হচ্ছে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, অন্যটা মার্ক্সিইজ্‌ম। ফ্রয়েডের প্রতীক কামিনী, মার্ক্সের কাঞ্চন। ও দুই তত্ত্ব পৃথিবীকে ব্যভিচার আর স্বার্থপরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার কী মনে হয়?

নীলু ভীষণ হেসে ফেলেছিল।

হরলালের জ্যাঠামশাই রেগে গিয়ে দেয়ালে লাঠি ঠুকে বললেন--তবে এর মানে কী? অ্যাঁ! পড়ে দেখ, এসব ভীষণ স্বার্থপরতার কথা কিনা।

তারপর থেকে যতবার সেই কথা মনে পড়েছে ততবার হেসেছে নীলু। একা একা।

বেলা বেড়ে গেছে। বাসায় খবর দেওয়া নেই যে শোভনরা খাবে। খবরটা দেওয়া দরকার। ফুলবাগানের মোড় থেকে নীলু একটা শর্টকাট ধরল। বড় রাস্তায় যেখানে গলির মুখ এসে

মিশেছে সেখানেই দেয়ালে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে সাধন—নীলুর চতুর্থ ভাই। কলেজের শেষ ইয়ারে পড়ে। নীলুকে দেখে সিগারেট লুকালো। পথ-চলতি অচেনা মানুষের মতো দুজনে দুজনকে চেয়ে দেখল একটু। চোখ সরিয়ে নিল। তাদের দেখে কেউ বুঝবে না যে তারা একই মায়ের পেটে জন্মেছে, একই ছাদের নীচে একই বিছানায় শোয়। নীলু শুধু জানে সাধন তার ভাই। সাধনের আর কিছুই জানে না সে। কোন দল করছে সাধন, কোন পথে যাচ্ছে, কেমন তার চরিত্র—কিছুই জানা নেই নীলুর। কেবল মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠে সে দেখে সাধনের আঙুলে, হাতে কিংবা জামায় আলকাতরার দাগ। তখন মনে পড়ে, গভীর রাতে ঘুমোতে এসেছিল সাধন।

এখন কেন জানে না, সাধনের সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছিল নীলুর। সাধন, তুই কেমন আছিস? তোর জামাপ্যান্ট নিয়েছিস তুই? অনার্স ছাড়িস নি তো! এরকম কত জিজ্ঞাসা করার আছে।

একটু এগিয়ে গিয়েছিল নীলু। থেমে, ফিরে আসবে কিনা ভেবে ইতস্তত করছিল। মুখ ফিরিয়ে সাধন তার দিকেই চেয়ে আছে। একদৃষ্টে। হয়তো জিজ্ঞেস করতে চায়--দাদা, ভাল আছিস তো? বড্ড রোগা হয়ে গেছিস, তোর ঘাড়ের নলী দেখা যাচ্ছে রে! কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে হল না শেষ পর্যন্ত, না? ওরা বড়লোক,তাই? তুই আলাদা বাসা করতে রাজী হলি না,তাই? না হোক কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে—কিন্তু আমরা--ভাইয়েরা তো জানি তোর মন কত বড়, বাবার পর তুই কেমন আগলে আছিস আমাদের! আহারে দাদা, রোদে ঘুরিস না, বাড়ি যা। আমার জন্য ভাবিস না--আমি রাতচরা—কিন্তু নষ্ট হচ্ছি না রে, ভয় নেই!

কয়েক পলক নির্জন গলিপথে তারা দুজন দুজনের দিকে চেয়ে এরকম নিঃশব্দ কথা বলল। তারপর সামান্য লজ্জা পেয়ে নীলু বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে লাগল।

দুপুরে বাড়িতে কান্ড হয়ে গেল খুব। নাড়ুমামী কলকল করে কথা বলে, সেই সঙ্গে মা আর ছোটো বোনটা। শোভনের দুই মেয়ে কান্ড করল আরো বেশী। বাইরের ঘরে শোভন আর নীলু শুয়েছিল—ঘুমোতে পারল না। সাধন ছাড়া অন্য ভাইয়েরা যে যার আগে খেয়ে বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে কি আস্তানায় কেটে পড়েছিল, তবু যজ্ঞিবাড়ির ভিড়ের মতো হয়ে রইল রবিবারের দুপুর।

সবার শেষে খেতে এল সাধন। মিষ্টি মুখের ডৌলটুকু আর গায়ের ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে তেতে কেমন টেনে গেছে। মেঝেতে ছক পেতে বাইরের ঘরেই লুডো খেলছিল বল্লরী, মামী, আর নীলুর দুই বোন। সাধন ঘরে ঢুকতেই নীলু বল্লরীর মুখখানা লক্ষ্য করল।

যা ভেবেছিল তা হল না। বল্লরী চিনতেও পারল না সাধনকে। মুখ তুলে দেখল একটু, তারপর চালুনির ভিতর ছক্কাটাকে খটাখট পেড়ে দাম ফেলল। সাধনও চিনল না।

একটু হতাশ হল নীলু। হয়তো রাতের সেই ছেলেটা সত্যিই সাধন ছিল না, নয়তো এখনকার মানুষ পরস্পরের মুখ বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

নীলু গলা উঁচু করে বলল—তোমার মেয়েদুটো বড় কান্ড করছে বল্লরী, ওদের নিয়ে যাও।

--আঃ,একটু রাখুন না বাবা, আমি প্রায় ঘরে পৌঁছে গেছি।

রাত্রির শোতে শোভন আর বল্লরী জোর করে টেনে নিয়ে গেল নীলুকে। অনেক দামী টিকিটে বাজে একটা বাংলা ছবি দেখল তারা। তারপর ট্যাক্সিতে ফিরল।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। ফুলবাগানের মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে জ্যোৎস্নায় ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল নীলু। রাস্তা ফাঁকা। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। দেয়ালে দেয়ালে বিপ্লবের ডাক। নিরপেক্ষ মানুষেরা তারই আড়ালে শুয়ে আছে। দূরে দূরে কোথাও পেটো ফাটবার আওয়াজ ওঠে। মাঝে মধ্যে গলির মুখে মুখে যুদ্ধের ব্যূহ তৈরী করে লড়াই শুরু হয়। সাধন আছে ঐ দলে। কে জানে একদিন হয়তো তার নামে একটা শহীদ স্তম্ভ উইঢিবির মতো গজিয়ে উঠবে গলির মুখে।

পাড়া আজ নিস্তব্ধ। তার মানে নীলুর ছোটোলোক বন্ধুরা কেউ আজ মেজাজে নেই। হয়তো বৃটিশ আজ মাল খায়নি, জগু আর জাপান গেছে ঘুমোতে। ভাবতে ভালই লাগে।

শোভন আর বল্লরীর ভালবাসার বিয়ে। বড় সংসার ছেড়ে এসে সুখে আছে ওরা। কুসুমের বাবা শেষ পর্যন্ত মত করলেন না। এই বিশাল পরিবারে তাঁর আদরের মেয়ে এসে অথৈ জলে পড়বে। বাসা ছেড়ে যেতে পারল না নীলু। যেতে কষ্ট হয়েছিল। কষ্ট হয়েছিল কুসুমের জন্যও। কোনটা ভাল হত তা সে বুঝলই না। একা হলে ঘুরেফিরে কুসুমের কথা বড় মনে পড়ে।

বাবা ফিরবে পরশু। আবো দুদিন তাব কিছু চাক্কি ঝাঁক যাবে। হাসিমুখেই মেনে নেবে নীলু। নযতো বাগই করবে। কিন্তু ঝাঁক হবেই। বাবা ফিরে নীলুর দিকে আড়ে আড়ে অপরাধীর মতো তাকাবে, হাসবে মিটিমিটি। খেলটুকু ভালই লাগবে নীলুর। সে এই সংসারের জন্য প্রেমিকাকে ত্যাগ করেছে-কুসুমকে--এই চিন্তায় সে কি মাঝে মাঝে নিজেকে মহৎ ভাববে?

একা থাকলে অনেক চিন্তার টুকরো ঝড়ে-ওড়া কুটোকাটার মতো মাথার ভিতরে চক্কব খায়।

বাড়ির ছায়া থেকে পোগো হঠাৎ নিঃশব্দে পিছু নেয়। মনে মনে হাসে নীলু। তারপর ফিরে বলে--পোগো, কী চাস?

পোগো দূব থেকে বলে--ঠালা, টোকে মার্ডার করব।

ক্লান্ত গলায নীলু বলে--আয়, করে যা মার্ডার।

পোগো চুপ থাকে একটু, সতর্ক গলায় বলে--মারবি না বল!

বড় কষ্ট হয নীলুর। ধীরে ধীরে পোগোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে--মারবো না। আয, একটা সিগাবেট খা।

পোগো খুশী হয়ে এগিয়ে আসে।

নিশুত রাতে এক ঘুমন্ত বাড়িব সিঁড়িতে বসে নীলু, পাশে পাগলা পোগো। সিগাবেট ধরিয়ে নেয় দুজনে। তারপর--যা নীলু কখনো কাউকে বলতে পারে না--সেই হৃদয়ের দুঃখের গল্প - কুসুমের গল্প--অনর্গল বলে যায় পোগোর কাছে।

পোগো নিবিষ্ট মনে বুঝবার চেষ্টা করে।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৩১/সংখ্যা ৯: ১৩৭৬]

নক্‌শী কাঁথার মাঠ

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

[জন্ম ১৯৫২ সালে কলকাতায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: চতুষ্পাঠী, নবম পর্ব, বাস্তুকথা, কমিউটার গেম, ভূমিপুত্র, সতর্কতামূলক রূপকথা, ভিডিও ভগবান, নকুলদানা, ইত্যাদি। তারাশঙ্কর পুরস্কার এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কারে ভূষিত। বর্তমানে আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত।]

ভোরবেলা দুহাতে গোবর মাখতে মাখতে জাগার বউ ভাবছিল এ সময়ে টঙুস্-টাঙুস্ চুড়ির শব্দ হলে মানাতো মন্দ না। বাপের বাড়ির বিয়ের পাওয়া রূপোর চুড়ি ছ গাছা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শোনালো--লক্ষ্মীলো করে নিয়ে গিয়ে হালের বলদ কিনেছে তার মিন্‌সে—বিয়ের জল না শুকুতেই।

গোবর মাখবার জন্য যতটা বলপ্রয়োগ সাধারণতঃ প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী জোর খাটাচ্ছে জগার বউ, মাঝে মাঝে গোবরের চাপড়া তুলে ভচাম্ শব্দে আছড় মারছে। কারণ ওর এখন মন ভাল নয়। শরীরে রাগ।

সোয়ামী গেছে তারকনাথে হত্যে দিতে। শাউড়ি গেছে দত্তবাড়ি ধান ঝাড়তে। যাবার সময় কযে গাল দিয়ে গ্যাছে তার পুতের বউকে—বাপ্-পিতেমো তুলে। শরীল এত লবম ঝ্যানো লনীর পুতুল, সাতমাস গভভ পড়ল এখনই ছেরাব হতিছে, পায়ে ফুলো দিতেছে-- যতবার গভভো হয় ততবার এই ঝ্যামেলি। পায়ে রসা হলে, অন্য মেয়েছেলের তেলাকুচোব রস তিনদিন খাওয়ালেই ফুলো মিশকে যায়। ঢ্যামনী বউয়ের শহরের হাসপাতালের নাল মিচকার চাই,-- এঁ.....ঃ। আদর বিবি চাদর গায় ভাত পায় না ভাতার চায়।

জগার বউয়ের গা-সওয়া এইসব। তবু রোগব্যাধি লিয়ে দিবালিশি আঁক্‌সী মারলে ভাল লাগে? বল দিনি! জগার বউ কাছে দাঁড়ানো খেঁকী কুকুরকে মনে মনে শুধোয়।

ভাতার খেটেখুটে ভাত দেয় মোর মুখি, সত্য বটে, ল্যাজ্য বটে, কিন্তু আমিও তো দেখদিনি নোকের বাড়ির গোবর মেঙে ঘুটে দিতেছি বেচব বলে, সেই পয়সা জমা করেই না ছেলের তরে গুড়মিছরি কিন্‌তেছি। শাউড়ি তবু ঠারবে, বউ নাকি ভাতারখাকী, পুতের মাথা খেয়ে শুধু বিয়োবার ফিকির আর খুঁটো গাড়াবার কম্মো ছাড়া কিছু জানে না মোটে।

--মরণও হয় না গো—ও-ও-ও। যদি শাউড়ি মরে সকালে, খেয়েদেয়ে যদি বেলা থাকে তো কাঁদব আমি বিকেলে।

হাত ধুয়ে কোলের বাচ্চাকে মাই খাওয়াতে বসে জগার বউ। দক্ষিণে যতদূর চোখ যায়--মাঠ। চোতের রোদদুরে সোনার গয়নার মত মাঠের রঙ। সামনেই বোরো ধান এ ওর গায়ে ঢলাঢলি করে। আমের বকুলের গন্ধে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে। উঠানের আমড়া গাছের ডালপালায় ঠিক্‌রে উঠছে নতুন পাতা, মাদার গাছে এয়োতি সিঁদুরের লাল ছোপ। করবী

গাছের পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে ঝিরঝিরে রোদদুর সোনা ব্যাঙের মতন উঠোনে লাফায়। ভোরবেলাকার পাতলা কুয়াশা দূরে মাঠের গায়ে দুধের সরের মত লেপ্টে রয়েছে।

কোলের বাচ্চাটা দুধ না পেয়ে কচিকচি দাঁত দিয়ে বোঁটা কামড়াতে শুরু করলে ধ্-রো বলে উঠোনে ছেড়ে দিয়ে কোমরের তাগায় দড়ি বেঁধে বাঁশের খুঁটোয় বেঁধে দেয়। তারপর লক্ষ্মীর সরার কাছে গতকালের বাসি পদ্মফুলের পাঁপড়িগুলো ছিঁড়ে মাঝখান থেকে পদ্মমুড়ি বার করে বাঁ হাতের তালুতে জমা করে ছেলেটার সামনে ছড়িয়ে দেয়। খাক্, খুঁটে খুঁটে খাক্।

রোদ্দরটা এতক্ষণে ঝিলিক্ মেরে উঠেছে। এভাবে ঝিম্ মেরে বসে থাকলে চলবেনি। ততক্ষণে ক্ষার-দেয়া কাঁথাটা পুকুর থেকে জলকাচা করে আনে জগার বউ। তারপর উঠোনে বাঁশের উপর শুকুতে দেয়।

দিদি-শাউড়ির তৈরী-করা কাঁথা। হাতে ভেল্কি ছিল বটে। দুইজোড়া হলুদ মাছের সারি দেয়া পাড়, কাঁথার মধ্যখানে এক পদ্মফুল, চারদিক থেকে চার প্রজাপতি, দুপাশে সাহেব মেম দুজোড়া। পাড়ের পাশে সবুজ সুতোর লতা আর লাল সুতোর ফুল।

গল্পকথা শুনেছে জগার বউ ওর দিদিশাউড়ির আমলের—চাল নাকি ছিল দুই টাকা মন। দুধ একপয়সা সের। ইছামতির জেলেরা হাঁক পেড়ে বলত, দুটো মাছ নে যাও কত্তা, একটা পয়সা থাকলি ছুঁড়ি দিও। এরকম কাল ছিল বলেই না রস ছিল অন্তরে। কাঁথাটার দিকে তাকিয়ে থাকে জগার বউ। কী মায়া ভরা পাড়।

এই রোদে-দেয়া কাঁথাটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কলকাতার বাবুরা, দুমাস আগে। বাবুরা কলকাতা থেকে এসেছিল মাঘী পুন্নিমের মেলায়। ওম্ ধরাবার জন্য রোদে দেয়া কাঁথাটা দেখে বাবুদের মনে ধরেছিল, বলেছিল এই কাঁথাটা ওরা কিনে নিয়ে যাবে। কলকাতা শহরে এক বিরাট পাকা দালানের মধ্যে এক মস্তো কাঁচের বাক্সের মধ্যে রেখে দেবে কাঁথাটা। কলকাতা শহরের লোকেরা টিকিট কেটে দেখবে।

'কিন্তু মাঘের শীত বাঘের গায়ে লাগে যে'--- এই মাঘ মাসে কাঁথাটা বেচে দিলে গায়ে দেবে কী! তাই ফাল্গুনের শেষাশেষি আসতে বলেছিল জগা। জগা কলকাতায় তেনাদের ঠিকানা চেয়েছিল, ভেবেছিল শীতটা ম'লে নিজে কলকাতার বাড়ি খুঁজে কাঁথাটা দিয়ে আসবে। ওরা বলেছিল বারই ফাল্গুন হাড়োয়ার মেলায় যাবার পথে ওরাই যেচে নিয়ে যাবে।

হোক্ না বাপ-পিতেমোর স্মৃতি, এই কাঁথা কত যত্ন-আত্তি করে বিছিয়ে দিয়েছিল জগার ঠাকুমা,---তার নতুন বে-হওয়া ছেলে-ছেলেবৌকে, - এই কাঁথার সেলাইয়ের খাঁজে গর্তে বাপ পিতেমোর নিশ্বেস, শরীলের গন্ধ, গায়ের ঘাম মিশে আছে। বেচে দিতে মায়া হয়, তবু ল্যাজ্য কথাটা মনে লাগে---দুটো পয়সা হলে যাহোক্, দেনা কিছু শোধা যায়।

মেলার দিন জগা আর জগার বউ সারাটা দিনমান দা'পায় বসে, বাবুরা এল না। পরদিনও নয়। এখনো আশায় আশায় আছে জগার বউ, হুট করে বাবুরা এসে যাবে একদিন।

শাউড়ি এলে তারপরে উননে আঁচ পড়বে। ঢেঁকিতে চাল কোটার ঢিপিক্ ঢিপিক্ শব্দ। সামনের বিলে ধানের লুটোপুটি। শ্যালোপাম্পের শব্দ আসছে দূর থেকে, বুলবুলি পাখি ঠোঁটে করে নিয়ে যায় বাসা বাঁধবার খড়, চারিদিকের বাতাসে বেঁচে থাকার শব্দ, কোলের

বাচ্চাটা উঠোনে পড়ে থাকা হলুদ কাঁঠালপাতা মুখে পোরে, বুড়ো ব্যাং ঘাড় উঁচু করে বসে থাকে জগার বউয়ের সামনে। ফরফর শব্দ করে ঘরের খুঁটোর বাঁশের ফোকর থেকে বেরিয়ে আসে বোলতা, জগার বউয়ের কিছু ভাল লাগে না।

---হ্যাগা বড়ঠাকুরন, হ্যাগা পিতৃপুরুষ! তোমরা কি দেখতে পাত্তিছ, তোমাদের হরিনামের ঝোলার পঞ্চাশ অন্তরী সোনার কলকা দুটো এখন কোন বাবুবাড়ির বৌ এর হাতের বাজু হয়ে গ্যাছে! হ্যাগো বড়ঠাকুরন, এই ক্যাথায় আছে তোমার গায়ের পরশ, তোমার চরণের ধুল গো, নাকের নিঃশ্বেস। ভাঙ খাবার পর দুধ খেয়ে ঘুমজড়ানো চোখে এখানে মুছে চ তোমার মুখ, এখানেই আমাদের জন্মকথা আছে। তবু এভাবে বেচে দেব কেনে। পঞ্চাশডা টাকায় কত আরাম বল দিদি, বাস্তু যে বন্ধকী।

যদি বল কেনে! তবে তো তোমাদেরই গেরো-গঞ্জনা দিতি হয়---সোয়ামীর ন্যাবা রোগ হলি তোমাদেরকে স্মরেছি কত, কমলনি তো। শহরের হাসপাতালে তিরিশ টাকার ওষুধ খেয়ে গতর সারা। হালের বলদ জোড়া ঝিম্ ধরে ম'ল, তারপর ন্যাবার পোড়ায় নতুন সববনাশের ব্যামো ধরলে উদরী। পেটে জল জমলে নাকি বাঁচে না। উদুরী বাদুরী যক্ষা--এ তিনে নাই রক্ষা। তবু বিন্‌চিকেচ্ছায় রাখা যায়, বল, তোমরাই বল, বিপত্তারিণী ব্রত কত করনু---কত। শেষে হাসপাতালে জবাব দিলে আমার ভাইয়েরা সব ধরে লিয়ে গেল টাকীর রায় ডাক্তারের কাছে। রাংতামোড়া ওষুধেব দাম রূপোর গয়নার সমান পেরায়। কপালে থাক্‌লি আব ভগমানের দয়া থাকলি বাস্তু গেলে ফিরে পাব, কিন্তু যমের কাছে খাতির নেইকো, বল, যমে নিলে আর ফিরতি দেয় না। কজনা সাবিত্রীর মত সতী---যে যমের থিক্যে ভাতাব ছেনাতে পাবে।

দুশো টাকা দেছে দত্ত,---বাস্তু বন্ধকী লিয়ে। সুদ দেবার তরে হপ্তা দু'দিন বিনি মাগনায় গতর খেটে দিতে হয়। আমি যাই,---নইলে শাউড়ি...

শাউড়ির চিৎকার শুনতে পায় জগার বউ, দূরের বাঁশঝাড় থেকে চিৎকাব পাড়ছে বুড়ি,---আয় দিদি অ---বউ. ..। জগার বউ তেড়ে যায়। গিয়ে দ্যাখে এক থলে চাল শাউড়ির কাঁখে!---অ্যাত্তো চাল, চোখকে পেত্যয় যায় না।

বাবুবাড়ি থেকে চাল মেগে এনেছে জগার মা বাগদীবৌ পাঁচির শলায় মেতেছে বুড়ি। পাঁচি চালের ব্যাবসা করে। পাঁচি শলা দিয়েছে।---ঝ্যামেলির কিছু নেইকো মাসীমা, কোনবকমে বারাসাত তক্ যাতি পাল্লিই হল। ইস্টিশনের কাছেই পাইকার আছে। বুড়ি তাব বৌমার জটাচুলে বিলি কাটতে কাটতে বললে,---গতর থাকলি আমিই যেতাম রে বউ। পাঁচি হেসেব দেলে বার কেজিতে দশ টাকা লাভ। তাই শুনে মার হাতে পায়ে ধরে এনেছি চালকটা। পাঁচি আজ দুটোব গাড়ি ধববে। --- যাবার সময় আসবাব তরে বললাম। তুই যাবি বৌ?

পাঁচি জগার বৌকে নিয়ে যাবার সময় বললে---কোন ডর নাই মাসীমা, সব আমার চেনাজানা।

ওরা রেলের কামরার কোনায় ঘুপটি মেরে বসল। পাঁচি আঁচল দিয়ে চালের ব্যাগটাকে ঢেকে নিল আর জগার বউ-এর দুই পা ফাঁক করিয়ে শাড়িটা একটু তুলে দুই পায়ের ফাঁকে বসিয়ে শাড়িটা নামিয়ে ভাল করে ঢেকে দিল। ঘোমটা টেনে জগার বউ পাঁচির মুখের দিকে

তাকাল। পাঁচি ওর চোখের ভাষা পড়তে পারল। চোখ বলছে---ঠিক আছে তো সব? ট্রেন ছাড়ল। জয় গণেশ! পাঁচি বললে,---পেরথম দিন একটু-আধটু খারাপ লাগবেই রে মতি, পেরথম রাতের স্বামীর ঘরের কথা ভাব, পেরথম রাতেই ভয়ডর,---তারপর য্যামোন ত্যামোন। কথায় আছে না, ---অল্পশোকে কাতর-- অনেক শোকে পাথর। -ও মতি--পুলিশ এলে ঘুপটি মেরে ওঁয়াদের চোখ চাইবিনি মোটে। জাল্‌না পানে চেয়ে থাকবি।

একটু পরেই পাঁচি বল্‌লে---পয়সা থাকে তো পাঁচটা থাকে তো পাঁচটা লয়া বার কর্ দিনি। জগার বউ গিট্টু খুলে পাঁচটা পয়সা বের করে। —কেনেরে,—আইস্‌কিরিম খাবি? পাঁচি বললে, --দূর! সামনের খাল এলেই মনসা মেঙে পয়সা ফেলে দিবি। ঐ জলে পীর আছে, বল্‌লি কথা শোনে। তেনার দয়া হলি দেখিস পুলিশে ছোঁবেনি। নে, হাত বাইর করে রাখ্।

ট্রেনগাড়ি চলে,--চার-পাঁচটা স্টেশন পেরিয়ে যায়, জালার ধারে বসে গালে হাত দিয়ে না একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই দুটি ছেলে এসে সমস্ত চালের লোকেদের কাছে পয়সা চায়। ওরা পাঁচিকে দেখায়,--পাঁচি ওদের চল্লিশ পয়সা দেয়। জগার বউ পাঁচিকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই পাঁচি ফিস্‌ফিস্ করে বলে, বাবুদের খরচ।

ট্রেনগাড়ি চলে,--জানালার ধারে বসে গালে হাত দিয়ে হুহু বাতাসে জগার বউয়ের মনখারাপের কথা মনে পড়ে। কি প্রকারে মহিষের মত মনিষ্যিটা বছর ঘুরতেই শুকিয়ে গেল। মেলায় দ্যাখা যুবতীর কঙ্কাল হওয়ার খেলাটার কথা মনে পড়ে, ঢাকঢোলের বাজনার তালে তালে এক মেয়ে মানুষের যৈবন গলে পড়ল আর শেষে কিনা, মাগো,--জগার বউয়ের বুকের মধ্যে ভীষণ জোরে ঢাক-ঢোলের বাজনা লাগাতে থাকে।

—হেই,---আজ বোধহয় চেকিং নাই, এখনো এল না যখন, ...তুই পয়া আছিস্‌রে মতি! পাঁচি কনুইয়ে খোঁচা মারে জগার বউকে।

জগার বউয়ের মনে বড় আনন্দ হয়। ও পাঁচির হাতটা টেনে নেয়। হাতের উপর হাত বুলোয়। আঙুলের ফাঁক্‌ফোঁকড়ে জলহাজার ঘা;তবু, আশ্চর্য এক নরম মমতায় এবং নির্ভরতায় পাঁচির আঙুলের গাঁট চেপে ধরে। জগার বউয়ের তখন নিজেকে তার বাস্তুভিটের তুলসীতলার কাছের অপরাজিতা ফুলগাছের মত লাগে। পাঁচি কি তবে সজনে গাছ?---যাকে জড়িয়ে ধরেই অপরাজিতা গাছের বাড়বাড়ন্ত?

শনিঠাকুরের দয়ায় এই রকম নির্বিঘ্নে কয়দিন কেনাবেচা করতে পারলেই একটা বলদ কেনার পয়সা কি জমবে না? তারপর মামাশ্বশুরের কাছ থেকে আরেকটা চেয়েচিন্তে আনবে। স্বামীর হাতে টাকা কটা দিলি পরেই ... আ মরণ, ঝপ্ করে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর প্রতিমার কথা মনে পড়ে তার, ---নিজে যেন হাত বাড়িয়েছে তার স্বামীর দিকে। ---আর তার স্বামী মহাদেবের মতন--ছি ছি--- মনের ভীমরতি! কি আস্তাজ বলদিনি,---ঠাকুর দেবতার সাথে নিজেদের তুলনা?

জগার বউ জানালা দিয়ে উদ্‌লো গায়ের মাঠ দ্যাখে। জট্‌পাকানো চুলের মধ্যে বাতাস, শাড়ির ফাঁকফোকড় দিয়ে শরীরের মধ্যে কিলবিল করে বাতাস, কল্পনায় দেখে তার স্বামী ফিরে পেয়েছে তার শরীর, তার বুকের লোম বর্ষার হিঞ্চে শাকের মত তরতাজা। যেন বাঁ

হাতের মুঠো উল্টো করে ধরে মুখের মধ্যে গলিয়ে দিল কাঁচা চাল, তারপর চাল চিবোবার কড়মড় কড়মড় শব্দ। ডানহাতের ঘটি থেকে হুড়হুড় করে মুখের মধ্যে ঢালছে জল, ঢকঢক করে গিলতে থাকলে গলার চাক্কি চড়ুইয়ের মত লাফায়।

সোয়ামী যাবে নাঙল দিতে। নাঙল দেয়া হয়ে গেলে জোড়া বলদে জোড়া থাকবে মই, তার উপর দাঁড়িয়ে দুহাতে বলদের ন্যাজ ধরে হেই—হেই—হুররে হেই! রেলের জানালা দিয়ে যতদূর পজ্জন্ত দ্যাখা যায়,যেখানে আকাশ মিশেছে মাটিতে, সেখান থেকে মইয়ে চেপে ছুটে আসছে হু-হু হাওয়ার মত হেই-হেই—হেই—হেইররে;তার পায়ের তলায় চেপে বসেছে মই। শক্ত মাটির ঢ্যালাগুলো মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়ো হচ্ছে,— প্রান্তরের দূরপ্রান্ত থেকে ছুটে আসছে ওর মনের মানুষ——সব জমি চষতে চষতে—হেই—হেই হুরররে ইস্টিশনে থেমেছে গাড়ি, করসিং আছে মনে হয়।

মঙ্গলচণ্ডিকা তুমি অমঙ্গল হর
মোর প্রতি শুভঙ্করী শুভদৃষ্টি কর।
মহামায়া তব মায়া মোহিত এ জনে
ত্রাণ কর কৃপাময়ী কৃপা বিতরণে।।

মা কালীর শতনামের বই বেচতে এসেছে এক বুড়ো। এই গ্রন্থ যেবা পড়ে যেবা রাখে ঘরে/কালীদেবী তুষ্ট হয় সবার উপরে। ফেরার পথে একটা শতনামের বই নিয়ে যাবে। একটা কলাই-করা থালার বড় দরকার। চালে লাভ হলে মুদি-দোকানে এট্টু নারকেল তেল কিনে চুলে দেবে। শাউড়ির কাপড়ে গন্ডা দুই গেবো—একটি কাপড় কিনে নে গেলি, শাউড়ির হাতে দিলি বড় রগড় হয়।—যদি বল ক্যানো,—না তুমি আমারে আঁক্‌শী মারো, তবু মোর তরে না লিয়ে তোর তরে শাড়ি নে এনু—মরণ! গরু না বিয়োতে ঘি—এর দর, চাল রইল কাপড়ের তলায়, এখনি সওদা কেনার ফিকির।

আশা-আকাঙক্ষাগুলো যেন মুরগীর কচিকচি ছানা। নিজের শরীলের ওমে ওদের জম্মো। সববদাই কাছে কাছে থাকে। ছুটোছুটি করে, লাচে। তেলাপোকার বাচ্চা পেলে ছানাগুলো কাড়াকাড়ি করে খায়। আশা-আকাঙক্ষাগুলির মুরগীর ছানার মতন নরম শরীল, পাল বেঁধে বড় হয়, বড় হলে হাটের মহাজন ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে সদানন্দের হোটেলে বেচে দেয়।

দু হাত মট্‌কে হাই তোলে পাঁচি। সামনের ইশটিশন সোন্দালিয়া, তারপরই বারাসত। ফিরতি গাড়িতেই ফিরে যাব রে মতি,—রাত নটার এধারেই ফিরব, ফিরে আজ আবার রান্না আছে।

ঝমঝম শব্দে ক্রসিংএর ট্রেন এসে পড়ে। জানালার থেকে মুখ বাড়িয়ে ওপারের ট্রেনের কেউ কেউ হেঁকে ওঠে—সোন্দালিয়ায় পেশাল চেকিং, চেকিং হে.....

পাঁচির আঙুলের ফাঁক দিয়ে জগার বউ ওর নিজের আঙুলগুলো সেঁধিয়ে দেয়। জলহাজার ভেজা স্পর্শ। পাঁচি হাতের চাপে নির্ভয় জানাতে চায়। জগার বউ রা কাড়ে না। ট্রেনের শব্দের মধ্যে—ভয় নেই তোর, ভয় নেই তোর, ভয় নেই তোর।

জগার বউ দ্যাখে যাদের কাছে চাল আছে, তারা কেউ রেলের পাইখানায় গ্যাছে চাল লুকোতে, কেউ ছাতের ফোকরে চাল রাখছে, কেউ গাড়ির চল্‌টা উঠিয়ে তার মধ্যে রাখতে চেষ্টা করছে। এক বুড়ী, এক লজেন্সওয়ালাকে বললে, ---খাবার তরে তিন কেজি নিয়ে যাচ্ছিরে ভাই, তোর ব্যাগের মধ্যে রাখ্‌নারে-।

---অত সুবিধের খায় না। তোমার চাল বাঁচিয়ে দিলে একটাকা আমার চাই। এইসব দেখে শুনে বড় ভয় পেল জগার বউ। পাঁচিও একটু ভয় পেল। চেয়ারে বসা একবাবুকে বিনয়-মিনতি করে বললে,---আপনার পিছনে রেখে দেবেন বাবু চালটা, হাত জোড়ছি। বাবু কট্‌মট্‌ করে তাকালে।

পাঁচি ফিস্‌ফিস্‌ করে গজরাল,---চাল কিনতে এনারাই থলি বাড়িয়ে আসে,---আবার দরে না পোষালে বলে সামাল্‌গার ।

জগার বউযের ছিদাম পটোর কথা মনে পড়ে,---জ্যাঠা বলে ডাকতো ওনাকে, বাবুর পটের 'বোলান' মনে পড়ে---

যত আছে ভদ্দর লোক মিঠে মিঠে কথা।
এঁয়ারাই চিরকাল সমাজের মাথা।।
এঁয়াদেরই হাতে পড়ে অবস্থা কাহিল।
পুঁটকীতে হাত বুলাইয়া কম্ম করে হাসিল।।

এইসব গান বেঁধে বুড়ো বয়সে ছিদাম পটো লোকের হাতে পেযাই খেয়েছিল।

---এখন কি আর এসব কথা ভাববার সময়! সামনের ইশটিশনেই রাজার ব্যাটা মদন হাস খায় খোলা ফেলায় শাঁস। তবুও বেগতিক বুঝলে দু পা জড়িয়ে ধরে উল্টি খেয়ে পড়লে মায়া মমতা একটু কি হবে না? হোক না পুলিশ, তবুও মনিষ্যি তো বটে।

বাপ্‌রে...। যেন বর্ষাকালের পুকুরপাড়ের সার-দেয়া ব্যাঙের ছাতা। ইস্টিশনের চাতাল জুড়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেপাই-পুলিশ।

ট্রেনটা থামতেই ছিত্তিছান-হওয়া ডেঁয়ো পিপড়ের মত পিলপিল করে মানুষগুলো ছুটতে লাগল। যে যেদিকে পাবে। মা এক আদানে পড়ে রইল তো ঝি ছুটল আরেক আদানে, কারুর মাথায়, কারুর কোলে, কোলের শিশুর মত চাল। কারুর কাঁখে তেষ্টার কলস যেমন। ছুটছে। ---রেল লাইন পেরিয়ে ভাট্‌ফুল আর খাম্‌চি কাঁটার জঙ্গল পেরিয়ে মাঠের দিকে পিছন পিছন লাঠি উঠিয়ে পুলিশ---

জগার বউয়ের কামরায় চার-পাঁচজন পুলিশ এসে ঢুকল। খট্‌খট্‌ বুটের শব্দ। জগার বৌয়ের বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ে। ওরা ঢুকেই কলঘরের দিকে যায়। কালী ঠাকুরের হাতের মুঠিতে যেমন ধরা থাকে মরা মানুষের মাথার চুল,---ঠিক্‌ সে রকম মুঠি করে ওরা চালের ব্যাগ বের করে আনে। তারপর পাঁচিকে বলে, তোমার মালপত্তর বার কর। পাঁচি বলে, অনেক দিন পরে আজ নেমেছি, ছেড়ে দ্যান ভাই।---

---আজ পেশাল চেকিং আছে দেরি কোরো না, বার করো।

---ছেড়ে দেন বাবু, ছেড়ে দেন, হেড পুলিশ আমার ভাই।

—ভাই! মজা মারাচ্চো? কি রকম ভাই?

—পাতানো।

—কে হেড পুলিশ!

—ঐ যে গো, —লম্বাপানা, মুখে মায়ের দয়ার চিহ্ন,—

এমন সময় ফুল প্যান্টলুন আর জামার জেবে তক্‌মামারা এক বাবু এসে হাঁক পাড়লে—এক কামরায় এতক্ষণ লাগে। একজন ছোট প্যান্ট পরা পুলিশ দাঁতমাজার আঙুল দিয়ে পাঁচিকে দেখায়। না স্যার—এ বলছিল ও নাকি আপনার পাতানো বোন।

—এ রকম বোন অনেক থাকে । মাল বার করো। এই—

পাঁচি হেড পুলিশের কালো বুটে তার দুই হাত রাখে।—বাবু আজ অনেকদিন পর নাইনে এসেচি বাবু। কালীর কিরে, মিথ্যে বললে কুষ্ঠব্যাধি হবে, আজ ছেড়ে দেন বাবু। ইতিমধ্যে দুজন হাফ্ প্যান্টপরা পুলিশ পাঁচির চাল কেড়ে নিয়েছে।

জগার বৌ ভাবছিল ও বোধহয় এ যাত্রা বেঁচে গেল, চুপচাপ ঠায় বসে পায়ে মাজায় ঝিম ধরে গেছে, জগার বউ মনে মনে তারকনাথের নাম করে।

জগার বউয়ের চোখের পানে এক নজর চায় হেড পুলিশ। জগার বউ বাঁ হাতে শাড়িটা তলার দিকে টেনে দেয়। আচম্বিতে বজ্রপাতের মত হেড পুলিশ হেঁকে ওঠে—কাপড়টা ওঠাও। বলতে না বলতেই একজন পুলিশ জগার বউয়ের দুই পায়ের মাঝখানে একটা সরু লোহার শলা গলিয়ে দেয়।

—এটা কী, অ্যাঁ ! পাক্কা স্মাগলার দেখছি। পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেও পুলিশকে ফাঁকি দেয়া যায় না।

তারপর কতগুলো হাত, যে হাত দিয়ে মানুষ পাঁঠা কাটে,—যে হাত কংস রাজার মত, —নৃসিংহ অবতারের নখর—সেই হাত এগিয়ে আসে তার দিকে। এগিয়ে আসা হাতগুলো কাপড়ের তলায় চালের বস্তা বার করে। জগার বউ কুঁকড়ে গিয়ে চালের বস্তাকে সাপের মত পেঁচিয়ে ধরে। জগার বউ ভীষণ জোরে চালের বস্তাটা চেপে রাখবার সময় মনে মনে ভাবে দানাদানা চালের কণা তার শরীরের গভীরে ঢুকে যাক—যেমন তুলোর গভীরে ভরা থাকে ওম্।

এ চাল দেবনি,—এ আমার গতর খাটুনির চাল। আমার অন্নজলের চাল। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন, সাপের মত জোরে জোরে প্রশ্বাস পড়ে ওর। ঝড়ের নারকোল গাছের মত মাথা নাড়ায়। আমি গরিব মানুষ বাবু, তোমরা না দেখলে মরি যাব বাবু। —চুলগুলো উৎপাটিত গাছের শেকড়ের মত ওর চোখের সামনে ঝুলছে।

—লেক্‌চার ঝাড়িস্ নি। চাল দে। —জগার বউ চাল কটা দেয় না। জগার বউ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে, শপথ আর প্রতিজ্ঞা দিয়ে চেপে রাখে তার চাল। টানাটানিতে বস্তার সুতো ছিঁড়ে যায়, তলা দিয়ে পড়ে একটা একটা চাল। পাঁচি ততক্ষণে পরপুরুষের পা ছেড়ে দিয়ে ঝরঝর করে পড়া চালগুলো আঁচল পেতে জমা করে।

কতটুকুই বা শক্তি থাকে জগার বউয়ের পেশীতে। শেষ পর্যন্ত চালের বস্তাটা ওরা নিয়ে যায়।

ঘুর্ণিঝড়ে ওড়া টুকরো কাগজের মত কিছু সর্বস্ব-হারানো মানুষ বুটের শব্দের পিছু পিছু ছুটে চলে। প্রত্যেকের বুকে একটা করে গোটা কামারশালা। কালো কড়াইয়ের উপর তপ্ত বালির নাড়াচাড়ায় যেমন শাদা খইয়ের জন্ম, সে রকম। তবুও বেঁচে থাকার ইচ্ছে। জগার বউ ডাঙায় ওঠানো মাগুর মাছের মত ইস্টিশনের চাতালে লুটোপুটি খায়—যেখানে থামের মত বুটওয়ালা পা দাঁড়ানো আছে। সমবেত কান্নার মধ্যে জগার বউয়ের কান্নার আলাদা কোন অর্থ নেই।—যেমন প্রতিটি শাপলাফুলের ডুবে যাবার একই রকম আর্ট, যেমন শীতের দিনে শিরীষ গাছের প্রতিটি পাতা একই অর্থ নিয়ে ঝরে যায়, যেমন মৃতদেহের কাছে প্রিয়জন কাঁদে, সেরকম সমবেত কান্নার মধ্যে পাঁচি, জগার বউ কিংবা ল্যাংড়া লোকটা---প্রত্যেকের চোখ থেকে একই রকম বৃত্তান্ত বয়ে আনে জল। জগার বউ শেষ বারের মত পা জড়িয়ে ধরে, —পরপুরুষের পা। সেই পরপুরুষের হাঁটুর কাছে জগার বউ-এর মাথা।---আর আসব না হুজুর---

পিপড়ে ধরে গেলে কোন জিনিস যে ভাবে ঝাড়তে হয়, সে রকম ঝাড়া দিয়ে ওঠে পরপুরুষের পা। জগার বউ তারপর কপাল থাবড়ায়।

তারপর শেষকালে সমস্ত চাল একটা কালো ভ্যানগাড়িতে ওঠানো হয়, ভ্যানটা ছেড়ে দিলে কিছু নিঃস্ব আতুর তাদের শরীরের অংশের জন্য কালো গাড়ির পিছু পিছু ছুটে যায়। জগার বউও ছুটে যায়। হাওয়ায় দু হাত, উন্মুক্ত বুক---ধূলোয় আঁচল। কতদূর যেতে পারে হবিবগঞ্জের জগার বউ?

তারপর সন্ধ্যে হয়। পাঁচি আর জগার বউ ইস্টিশনে আটটার গাড়ির জন্য বসে থাকে। খোলা মাঠে কেঁদে মরে চাঁদের আলো।

জগার বৌ ভাবে ও হচ্ছে অলক্ষ্মীর অলক্ষ্মী। বে হতে না হতেই স্বামীর ব্যামো,---বাস্তু গেল বন্ধকী। ও ভাবতেই পারে না এই চালের টাকা শুধবে কী করে।

ধম্মশাস্তরের সতীর কথা মনে পড়ে। ও যদি পারতো লন্ডভন্ড করে দিত বিশ্বজগৎ—রেল লাইন, বসিরহাটের বাজার, রায় ডাক্তারের দোকান, দত্তবাড়ির গোলা।

তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে জগার বউয়ের। রেলের কলে জল নেই। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নেয়।

জগার বউ ভাবে রাত্রেই কাপড়ে আগুন দেবে ও। ল্যাম্পের মধ্যে যেটুকু কেরোসিন আছে তাই ছিটিয়ে দেবে। দাউদাউ জ্বলবে। যে শরীরের মধ্যে সেলাই করা সবুজ রং-এর পাতা আর লাল রং-এর ফুলের মত আশা-আকাঙ্ক্ষা। যেমন একটা পুরুষ্ট খোকার সাধ, হলুদ সুতোর সাহেব মেম্ - যেমন স্বামীর সোহাগ, নীল সুতোর প্রজাপতি--মশলা দিয়ে তপশে মাছ। নক্শী কাঁথার মত শরীরের মধ্যে যেসব বাসনাগুলো সেলাই করা, সে শরীর জ্বলবে। জ্বলতে জ্বলতে ওর দেহের আগুন ঘর ছাড়িয়ে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়বে। ওর কোলের 'কচি' আগুনের ভাষা বুঝে চিৎকার করবে,---ওর শাশুড়ী চিৎকার করবে, পাড়ার

লোকেরা ওকে বাঁচাবার জন্য ভারী কম্বল বা তোশক কিছুই পাবে না, তখন কলকাতার বাবুদের জন্য তুলে রাখা নক্‌শী কাঁথাটাই পাবে। নিজে তো আর আগুনের ভিতর থেকে হাত নেড়ে বলতে পারবে না যে ওটা নয়, ওটা নিও না গো।

তারপর নক্‌শী কাথাটা পুড়বে। ঠিক্ হবে, বেশ হবে! 'তোমারাও পেলে না গো কলকাতার লোক'। আশা দিয়ে চলে গেল, আর এল না, সে সময় যদি তোমরা আস, দেখবে জগার বউ মতি পুড়ছে,---ওর আগুনে পুড়ছে নক্‌শী কাঁথা, পুড়ছে সবুজ সুতোর পাতা আর লাল সুতোর ফুল, পুড়ে যাচ্ছে হলুদ সুতোর জোড়া মাছ—সুখে থাকার সাধ, পুড়ে যাচ্ছে পদ্মফুল,পুড়ে যাচ্ছে প্রজাপতি।

ছিদাম পটো যদি বেঁচে থাকতো এখন, তা হলে একটা পট আঁকতে পারত, গাইতে পারতো,

হবিবগঞ্জের বউ মতি নাম যার
তাহার দুঃখের কথা করিনু প্রচার।
বসনে আগুন দিয়া ত্যজিল জীবন
সেই বেত্তান্ত ভাই বর্ণিব এখন।

জগার বৌ হাঁটুতে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ বসে ছিল। পাঁচি ওর চুলে হাত বুলোয়। পাঁচিব সারা হাতে জলহাজার ঘা। বলে,—চ। পাঁচি তারপর নিঝুম স্টেশনে, এবং শ্মশানের মত চৈত্রের মাঠে একটা দীর্ঘ প্রশ্বাস ছড়িয়ে বলে,—কপালটাই খারাপ আমাদের। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। বলে চ—চ মতি, রেলের সিংগেল দেয়নি এখনো। চলগে, খুঁজে পেতে জল খেয়ে আসি।

চিন্তা করিস্‌নি। তোতে পুলিশে টানাটানির সময় পড়ে যাওয়া কিছু চাল আমি আঁজলা পেতে জমা করেছি। কিলোটাক হবে। তুই নিস্। কালকের দিন পরশুর দিন চলে যাবে যাহোক্। তার পরের ভাবনা পরে।

---চালটা ধর্।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৩৭/সংখ্যা ১: ১৩৮২]

ছিনতাই

আবু রুশ্‌দ্‌

[জন্ম ১৯১৯ সালে কলকাতায়। সাবেক পূর্ব পাকিস্থান সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: রাজধানীতে ঝড়, প্রথম যৌবন, এলোমেলো, সামনে নতুন দিন, নোঙর, ইত্যাদি। ছোট গল্পে বাংলা একাডেমি এবং ব্যাঙ্ক পুরস্কার প্রাপ্ত।]

শুক্রবার বিকেলের এলিফ্যান্ট রোড। চলমান পথিকের সংখ্যা কম তবে মোটরগাড়ির বেহায়া বিজ্ঞাপন নতুন-বিজ্ঞানের প্রকোপ প্রকট করে তুলেছে। ক্রীম রঙের ২০০ মার্সিডিজ-এ উৎকট হলুদ রঙের পর্দা ভেতরের আব্রু রক্ষা করবার জন্য যেন কোন অনাচার-ক্লিষ্ট মনের উদ্ভাবন। সদ্য আমদানি করা এক চকোলেট রঙের টয়োটো রেডিওর অস্তিত্ব বাইরে লতার মতো হেলানো নতুন কালো এরিয়ালে অভ্রান্তভাবে স্পষ্ট।

চালক, দেখা যায়, বেশির ভাগই নবীন যুবা। তবে কোন্ বেকুবে বলবে বাঙালী তরুণের নম্রতা বা সৌজন্য তাদের চেহারায় বা দৃষ্টিতে। পরিপুষ্ট মুখে এক বেলুচী কাঠিন্য ; হিপি জুলপি ও আকস্মিক ভল্লুক-গুম্ফে এক আর্ন্তজাতিক চমক ও আরণ্যক সংকল্প তাদের সহজেই দৃষ্টি-গ্রাহ্য করে তুলেছে।

বিপণির নামকরণে কিন্তু বাঙালী উচ্ছ্বাস। যদিও বিদেশী সওদা তাদের মালিকের সমকালীন বৈষয়িক ধূর্ততার নমুনা। কী চান আপনি, বলেন? মুদ্রাবান হলে প্রায় সব-কিছুই পাবেন। 'বুটিক'- এর শার্ট, অভিজাত টাই, ইয়াডলি সাবান, রেভলনের লিপস্টিক, নিখুঁত এক আধুনিক ডিজাইনের আরামকেদারা, টেলিভিশন, ক্যামেরা, রেকর্ড প্লেয়ার, থ্রি ইন ওয়ান, জর্জেট শিফন মাদ্রাজী শাড়ি।

আর আপনার সচ্ছল সংসারে যদি কঠিন অসুখে পড়ে কেউ রুচিবিকৃতির পরিচয় দিয়ে থাকেন, ঘাবড়াবেন না। দুর্লভতম ওষুধটাও পেয়ে যাবেন। সব দোকানে নয়। দু-একজন কেমিস্টের নাক এখনও একটু উঁচু রয়ে গেছে। তারা দামের ব্যাপারে বেশি এদিক ওদিক করতে পারে না। তবে বাঘাটে কেমিস্টও পাবেন যিনি সে-ওষুধটা সহাস্যে আপনাকে দেবেন যদি আপনি হাসিখুশি ধরনের দাম দিতে রাজী হন আর কথা বেশি না বলেন।

মাঝখানের ও আশেপাশের বস্তিগুলোই বিপাক বাধায়। বদ্ধ নর্দমায় কীট-কলোনির মতো তারা কিলবিল করে। কোনই সুঠাম ভাব নেই বা আলাদা এক আকৃতি। ইত্যাদি ও প্রভৃতির মতো চুলকানি ও পাঁচড়া ও উকুন ও ন্যাকাটি পেটের ঝোলায় তারা নামহারা। 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা'ও তারা বোধ হয় চোখ তুলে কখনও দেখে না।

পি.জি হাসপাতালের দালানে নূতন বিপণি-বিতান পটুভাবে পট বদলায়। ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল-এ কোন বিদেশী আগুন্তুকের কক্ষে কিছু আমোদিত প্রহর কাটিয়ে অষ্টাদশী রাহেলা বা সালেহা

বা জমিলা বিলাসী পণ্যের দিকে নতুন সম্ভাবনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কেউ বা সাহস করে ভিতরে ঢুকে দু-একটা পছন্দসই সওদার দাম করে--গ্রামীণ কলহাস্য ও বিদেশী আগন্তুক-অভিনন্দিত পাছার দোলানি বাইরের পথচারীকে উপহার দিয়ে।

তবে কেন্দ্রীয় এক ঘটনার মতো পথের বাঁকটা প্রথমে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে পরে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। শাহবাগ অ্যাভিনিউর মাঝখানের ফোয়ারাটা বিকল হয়ে পড়েছে। ভরাপানি যা আছে তা সন্ধ্যার বিজলীবাতির বিজুরিতে খোলতাই হবে, তবে বিকেলের রোদে একটু গদ্য-গদ্য ভাব। অধিকাংশ যানবাহন কোনও কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে লোমহর্ষক দ্রুততার চলন অব্যাহত রেখেছে, তবে ডানদিকের একশ গজ জুড়ে মোটরগাড়ি বাস বেবী ট্যাক্সি রিকশা এক অস্বাভাবিক ব্যাসের সৃষ্টি করেছে। তাদের আরোহী ও চালক প্রত্যেকের মুখে আশু এক কর্মতৎপরতার কঠিন সংকল্প মূর্ত হয়ে উঠেছে। চারদিক থেকে জটলা করে পথচারীরা এসে জড়ো হয়ে সে ব্যাসের পরিধিকে বাড়িয়ে তুলছে ও আসন্ন নাটকের পটভূমি তৈরি করছে।

—না! এর একটা বিহিত করতেই হবে, এটাকে আর চলতে দেওয়া যায় না। পুরু কালো ফ্রেমের চশমা পরা মাস্টারি চেহারার এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক চোখের ঈষৎ-বক্র তারাকে রাগের দ্যোতনায় নেকড়ে-কুটিল করে বলে।

সর্দির তাড়নায় নাক থেকে অবিরত পড়া নোনতা পানিকে কিছুটা জিভ দিয়ে চেটে খেয়ে কিছুটা হাত দিয়ে মুছে এক মিশকালো রিক্‌শা-চালক অনির্দেশ্য এক লোকের দিকে অব্যবহৃত বাঁ হাতটা বাড়িয়ে কী এক কল্পিত তামাসায় হাসতে থাকে আর হেঁক হেঁক করে হেসে শিক্ষিত বাঙলায় বলে : ধর শালাদের ধর, পিটিয়ে তালগোল পাকিয়ে দে, শালারা হাইজ্যাক করার তালে আছো, হারামির পোলা।

ততক্ষণ বেশ প্রশংসনীয় তৎপরতা ও নিপুণ পন্থায় ছিনতাইয়ের কাজটা সম্পন্ন হচ্ছিল। এক ছোট্ট ছাইরঙের ফিয়াট থেকে নেমে তিনজন তরুণ মিলিটারি ধবনে গুরুত্বপূর্ণ কোণগুলো দখল করে এক ল্যাণ্ডরোভারকে থামায়। তারপর দরজাটা অনুশীলিত দ্রুততার সঙ্গে খুলে ড্রাইভারকে মস্ত এক হ্যাচকা টানে নামিয়ে পাশের আরোহীর হাত থেকে মাঝারি ধবনের এক সুটকেশ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে পেছনের আরোহীর কাছ থেকে আচানক বাধা পায়। পূর্ব-পরিকল্পিত ক্রিয়া সম্পাদনায় আগে থেকে আঁচ করতে পারেনি এমন এক বাধা পাওয়ায় তরুণটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । বিনা দ্বিধায়, যেন দৈনন্দিন এক অনুত্তেজিত কাজ করছে, স্টেনগান উঁচিয়ে পেছনের আরোহীকে তাৎক্ষণিক পটুতায় গুলি-বিদ্ধ করে সুটকেশটা পেশাগত স্বাচ্ছন্দ্যে ছিনিয়ে নেয় : তার লোম-ধনী হাতটা সুটকেশবহনকারী জিন্দা আরোহীর হাতে লাগলে হতা কাপুরুষ নাগরিক খরগোশের মতো কাঁপতে থাকে। তিন মিনিটে নিজেদের কাজ সেরে তিনজনই চারপাশে জমা পথচারীদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ফিয়াটে চড়ে ঢাকা ক্লাবের দিকে গাড়িটা ঘুরিয়ে সবেগে ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্‌টিটিউটের দিকে ধাওয়া করে, কিন্তু হঠাৎ একটা টায়ার ফেটে যাওয়ায় মাঝপথে থেমে গাড়ি ফেলে রেখে দুজন রমনা পার্কের দিকে আর একজন সোহরওয়ার্দি উদ্যানের দিকে দৌড় দেয়।

এদিকে ল্যাণ্ডরোভারের পেছনে সীট নিহত আরোহীর রক্তে কালচে লাল হয়ে ওঠে আর ড্রাইভার ও তার পাশে-বসা আরোহী কেমন উদ্‌ভ্রান্ত চোখে কৌতূহলী ও ক্ষিপ্ত জনতার দিকে চেয়ে থাকে।

কে একজন জিজ্ঞেস করে,--সুটকেশে ছিলো কী সাহেব ?

--টাকা। ড্রাইভারের পাশে-বসা আরোহীটা ঘোলা চোখে বিশেষ কারুর দিকে না চেয়েই বলে।

--টাকা নয়ত কি মার্বেল ছিনতাই করতে এসেছিলো? টাকা ছিল কত?

--তিন লাখ

—কী মজা, শালা আমি পেয়ে গেলে ধানমন্ডিতে একটা বাড়িতে কিনে ফেলতাম। তারপর আমার ঠাট দেখে কে!

কোন এক কোণা থেকে ছুঁড়ে মারা এই বিদগ্ধ মন্তব্যে সমবেত জনতার মধ্যে আমোদের এক সাময়িক হিল্লোল খেলে যায়।

দূর থেকে একজন চিৎকার করে বলে : সুটকেশ হাতে ছোকরাটাকে দেখতে পাচ্ছি। রেস কোর্সের ভেতর দিয়ে দৌড়াচ্ছে। আমি চললাম শালাকে ধরতে। আপনারাও আসুন।

আর নিমেষে ওলটপালট কাণ্ড। জনতার প্রায় সকলে লোকটার দিকে হুড়মুড়িয়ে ছুটে যায়। শৃঙ্খলা বলতে আর কিছু থাকে না, চলন্ত এক মোটর প্রচণ্ড আকস্মিকতায় ব্রেক কষে বিকট এক শব্দ করে থেমে পড়ে, ঠেলাঠেলিতে কয়েকজন রাস্তা থেকে ছিটকিয়ে ফুটপাথে নিক্ষিপ্ত হয়। হাঁচিতে গর্জনে হাসিতে ও তড়িৎ বেগে নিজেদের সম্মিলিত বাড়ন্ত রাগকে এক মানবীয় মুখোশ পরতে দেয়।

--কোথায়, কোথায় লোকটা?

--ওই যে। হাতে সুটকেশ দেখছো না।

--সুটকেশ দেখছি, তবে লোকটার তাড়া আছে বলে মনে হয় না। স্থির গতিতে চলেছে।

--হারামজাদার হাতে স্টেনগান আছে, তাই অত সাহস। ওরই স্টেনগান দিয়ে এবার ওকে মারবো। এবার দেখি তুমি কোথায় পালাও।

বর্ণালী সব হাওয়াই শার্ট আলোতে চমকায়। মাথার চুল জুলপি গোঁফ, পায়ের বিবিধ আকৃতি, দৌড়বার বিভিন্ন ধরন, পাজামা প্যান্ট ও লুঙ্গীর উঠতি-পড়তি হাঁপানি ও হিক্কা-বিকেলের বিশেষ নম্রতায় ও স্মিত প্রাঙ্গণের বিস্তারে তামাটে শালগাছের পশ্চাদ্‌ভূমিতে ও সামনের মন্দিরের চূড়ার আশ্বাসে সহসা এক কেন্দ্রীয় অর্থে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

জনতা সামনের দিকে প্রচণ্ডভাবে-উত্থিত এক সামুদ্রিক ঢেউ-এর মতো এগুতে থাকে। তার বিস্তারিত ও বলবান বাহুতে যেই আটকা পড়ুক না কেন ভয়াল ক্ষিপ্রতায় সে অমোঘভাবে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

--ধর শালাকে ধর, এবার দৌড়তে আরম্ভ করেছে। দেখি কত দৌড়াতে পারে।

হঠাৎ তাকে কেন্দ্র করে নিত্য বাড়ন্ত এক জনতার মারমুখী অভিযান দেখে যুবকটা একেবারে

হকচকিয়ে যায় আর নিজের স্বাভাবিকত্ব সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে উন্মাদের মত দৌড়াতে থাকে। আচানক ভয়ে তার নাড়ী পর্যন্ত ক্রিয়ারহিত হয়ে যায়, সম্বিত তো সম্ভ্রান্তভাবে আলাদা।

কিসের জন্য জনতা তার দিকে হন্তদন্ত হয়ে খেঁচিয়ে মারমুখী হিংস্রতায় এগিয়ে আসছে। সে করল কী! তার ফর্সা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হতে থাকে। তার মাছুম চোখ অব্যক্ত এক আশঙ্কায় ভরে গিয়ে তাকে সাময়িকভাবে ব্যক্তিত্বহীন এক ত্রাসে রূপান্তরিত করে। তার বুকের লৌহ-পিঞ্জরে তার তড়পড়ানো হৃদয় কিছুটা স্বস্তি পাবার জন্য কেমন আকুলি বিকুলি করতে থাকে।

তাকে কি ঠাহর করেছে জনতা? চোর, পকেটমার। তাকে মারবার জন্য ছিঁড়বার জন্য ক্ষিপ্ত জনতা হাজারে হাজারে তার পেছনে ধাওয়া করা আরম্ভ করে দিল কিসের প্ররোচনায়? যুবকের স্বাভাবিক চিন্তা-ক্ষমতায় কিছুই বুঝবার উপায় থাকে না। পা-টা হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে আসতে চায়। আক্রমণের কারণ একেবারে জানা না থাকায় বোধহীন আতঙ্কে যুবকের উচ্চকিত চেতনা ভরে যায়।

—আপনারা সকলে আমাকে তাড়া করছেন কেন? আমি তো কিছু করি নাই। জাগ্রত আশার মন্ত্রণায় যুবক জনতার ন্যায়বোধের কাছে আবেদন করা মনস্থ করে।

--কিছু করে নাই! কিছু করে নাই! শুধু একটা লোককে খুন করেছে আর সুটকেশে তিন লাখ টাকা নিয়ে পালাচ্ছে।

--স্বাধীনতা পেয়েছ বলে শালা লোক খুন করবে, বাহনচোদ টাকা ছিনতাই করবে। তোমাকে মেরে একদম গুড়গুড়িয়ে দিব না।

--অনেক সয়েছি, আর না। কেউ যখন কিছু করবে না, আমরাই এর বিহিত করবো।

বাড়ন্ত রোষের তাড়নায় জনতা দ্রুততর গতিতে ধেয়ে যুবককে প্রায় ধরেই ফেলেছিল যদি মাঝখানে জনতার একাগ্রতায় আকস্মিক ছেদ না পড়তো।

রমনাপার্কের কাছ থেকে কোলাহল ও গুঞ্জন এই পর্যন্ত ভেসে আসে আর তামাটে শালগাছ হঠাৎ আগুনের হলকায় সাময়িক এক রোশনাই ছড়িয়ে অপ্রতিরোধ্য আগুনের তাপে কিছুটা জ্বলতে থাকে।

দূর থেকেও জনতা দেখতে পায় পরিত্যক্ত মোটরগাড়িটা আশেপাশে আগুনের লেবাশ পরে মাঝখানে একেবারে পোড়া কয়লার মত কালো হয়ে গেছে। সে দৃশ্যই জনতার একাংশের কাছে বেশী নয়নাভিরাম মনে হয়। হল্লা করতে করতে তারা সে-দিকে ছুট দেয়। কিন্তু জনতার সামনের সারি নিজের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হয় না। কলগুঞ্জনে ও পরিত্যক্ত মোটরটাকে আগুনে পুড়তে দেখে তারাও অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য পেছন ঘুরে চেয়েছিল তবে মানুষ-শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে আবার সামনের দিকে দৃষ্টি ঘুরায়। সেই অবসরে যুবকটা প্রায় পাঁচশ গজ দূরত্বের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যবধান রচনা করতে পেরেছিল। তা দেখে ধাবমান জনতা আরও দৃঢ়সঙ্কল্প ও ক্ষিপ্ত হয়ে যুবকের দিকে বিপুল বিক্রম ও বেগে এগুতে থাকে।

জনতার আকস্মিক নীরবতা ও পাগলা ঢেউ-এর মত উল্লাসিত অগ্রগতি যুবককে আবার

নতুন করে তার আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সন্ত্রাসের সঙ্গে সচেতন করে তোলে। তার মাথার চুল বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকে তার ধাবমান ও ত্রাস-পিষ্ট শরীরের স্পন্দিত নীড় হয়ে; তার ছানাবড়া চোখ দুটা আসমানের অঙ্গনের দিকে চেয়ে খামখাই কার যেন করুণা ভিক্ষা করছে।

আর ঠিক সে সময় ঘুঘু দেয় এক ডাক। বড় উদাস মধুর। ভেতরের কোন খবর যেন দিতে চায় অতীতের অনেক বিচ্যুতির ডাকহরকরা হয়ে।

যুবক তখন নিশ্চিত বোঝে তার আর পরিত্রাণ নেই। উদ্যত বন্যতায় মরণ-ছোবল মারবার জন্য ভুল নিশানার দিকে তারা ধাওয়া করেছে, এই যুক্তির কথা বলে জনতাকে এখন নিরস্ত করা যাবে না। পুরো দম দেওয়া এক যন্ত্রের মত ছাড়া পেয়ে তারা নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে অমোঘভাবে এগিয়ে আসছে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার মত কোন মাষ্টারী হাত কোথাও দেখা যায় না।

তবু যুবক একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে। উচ্চলম্ফনে অপ্রত্যাশিত কৃতিত্ব দেখিয়ে যুবক বেড়াটা এক ফুট ব্যবধান রেখে পেরিয়ে যায়। বাঙলা একাডেমি এখন প্রায় মুখোমুখি। ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাশেই শিল্প ও চারুকলার মহাবিদ্যালয় তার অস্তিত্বকে মৃদুভাবে জাহির করছে। সেখানেই সে যাচ্ছিল নাসিমার সদ্য-সমাপ্ত প্রতিকৃতি নিয়ে। সস্তা বাদামী রঙের প্লাষ্টিকের ব্রিফ কেসটা এখনও হাতে রয়ে গেছে। সেটা পালাবার এক অতিরিক্ত কারণ। প্রতিকৃতিটা যেমন করেই হোক একবার নাসিমাকে দেখাতে হবে। একই মহাবিদ্যালয়ে নীচু ক্লাসে পড়া এই মেয়েটিকে যুবকটি কোন গণিতের ধারায় না গিয়েই হৃদয়মন দিয়ে বসে আছে। বড় জনপ্রিয় নাসিমা। প্রায় সব ছাত্র আর দু-একজন মাস্টারও তার পেছনে হরদম ধাওয়া করছে। কিন্তু গত সপ্তাহে নাসিমা যুবকের হাতে গোলাপফুল উপহার দিয়েছিল। আজকে তার প্রতিকৃতি নাসিমাকে দিয়ে চমকে দেবে বলে যুবকের বড় সাধ ছিল।

নাসিমা বলেছিল প্রায় প্রতি ভোরে সে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ধানমণ্ডি লেকের দিকে বেড়াতে যায়। তাই একদিন ভোরের আজানের পর পরই তাদের টিনের বাসা থেকে বেরিয়ে যুবকটি ধানমণ্ডি লেকের দিকে পুরো পথ অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় হেঁটে এসেছিল।

দেখাও হয়েছিল। নাসিমার বান্ধবীটি সুলোচনা বটে তবে কালচে পাড়ের হালকা পীতরঙের এক শাড়িতে নাসিমাকে জব্বর দেখাচ্ছিলো। ভোরের হাওয়া তখন আবার একটু ইয়ারকি দেওয়া আরম্ভ করেছে। আর এক কোকিল মুখ খুলবার পরে অন্য এক রেল্লিক কোকিল তার সঙ্গে তাল রেখে ভোরের বাড়তি-আলোর আসমানকে অঢেল সুধায় ভরে দিয়েছিল। আর সম্রাট-সূর্য পুরন্ত লালিমায় আসমানের এক কোণকে একেবারে বশ করে ফেলেছিল।

নীরব ছোবলানিতে দলিত মর্দিত হয়ে জনতা অমোঘভাবে এগিয়ে আসছে। শরীর আর যুত পায়না, পা আর উঠতে চায় না। শুধু নাসিমার পরিপুষ্ট স্তন চোখের সামনে পরিস্বাব রেখায় ভেসে ওঠে। যেন তাতে সমস্ত পিপাসার সমাধান, মোক্ষম এক শান্তি।

পেছন দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। চালককে ভদ্র ও সদাশয় মনে হয়। মরীয়া হয়ে তার সামনে শেষ প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে যুবকটি গাড়িটাকে থামায়। চালককে আশু আবেদনের সমস্ত আর্তি দিয়ে বলে : আমাকে একটু উঠতে দেন, নইলে ও লোকরা আমাকে খামখাই

মেরে ফেলবে। বিশ্বাস করুন, আমার কোনই দোষ নেই। আমাকে না বাঁচালে আমার মা-বাপ বড় কষ্ট পাবে।

হুঙ্কার দিয়ে জনতা ছুটে আসছে।

চালকের পাশে বসা তরুণী সহোদরার মমতায় বলে, --নাও না তুলে, দোষ যদি কিছু করে থাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেই হবে।

--পাগল হয়েছ! তাহলে ওরা আমাদেরকেও পিটিয়ে শেষ করে দেবে।

যুবকটি গাড়িটা দ্রুত চলে যেতে দেখে আর এই প্রথমবারের মত পিঠে কার যেন স্পর্শ লাগে। তার পরেই জনতার ঢেউ আছড়ে পড়ে।

যখন তার শরীরের উপর দিয়ে এক এক করে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য সব কান্ড ঘটে যায় তখন যুবকটি চরম বোধনের অপ্রাসঙ্গিকতায় ভাবে..

ব্রিফ কেসটা ছিঁড়ে তচনচ হয়ে গেছে, যুবকের মগজের কিছুটা কিন্তু নাসিমার দুড়মুড়ানো প্রতিকৃতির সঙ্গে সহ-অস্তিত্ব পেয়েছে।

--এ যে দেখছি মেয়ের এক ছবি, টাকা কই? জনতার একজনের আর্ত জিজ্ঞাসা। আর একজন অনেকটা অনিশ্চিত ধরনে মুখে হাসি ফুটিযে নিজেব সঙ্গে কথা বলে : শালা কারে পাকড়াও কবলাম কে জানে। শালার বিচিটা যখন ছিঁড়ে দিচ্ছিলাম বাবু বলে কি : ছেড়ে দাও ভাই, বড় ব্যথা লাগে। আরে আমি শালা ওর ভাই হলে তার ওই জিনিসটা ছিঁড়তে যাই নাকি? বেটা অগারাম কোথাকার।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৩৭/সংখ্যা ২: ১৩৮২]

চিত্তবনে বাঁশি বাজে

মাফরুহা চৌধুরী

[১৯৩৪ সালে জন্ম। বাংলাদেশের লেখিকা। পেশা সাংবাদিকতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: অরণ্যগাথা ও অন্যান্য গল্প, কোথাও ঝড়, নিঃশর্ত করতালি, এক নয় সাত এক, একদা এক দ্বীপবাসিনী, ইত্যাদি। বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পুরস্কার, বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার প্রভৃতি পেয়েছেন।]

পথটায় এসে দাঁড়াল নাসিম। রঙের ভেতরে তুলি চুবিয়ে বোলাতে লাগল এখানে ওখানে। ভালো করে দেখল এবার -- ঠিক যেন সেই পথ, পাশে যার একটি পুকুর। কিছুদূর এগিয়ে চৌধুরীদের বাগান, আরো এগোলে খেলার মাঠ! যে মাঠে সারা বছর খেলার পর্ব লেগেই থাকে। ফুটবল, ফুটবলের পর ভলি বল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টন, একধারে বাস্কেট বল -- এমনকি হাডুডু, দাড়িয়াবান্দা -- সবরকম।

মাঠের এককোণে ছোট্ট একটি মসজিদ। মসজিদটি আছে বলেই ঈদের সময় এই মাঠে ঈদের জামাত হয়। চৌকোনা মাঠটিকে দুটি ত্রিভুজে ভাগ করে ফেলেছে একটি পায়ে-চলা পথ। জ্যামিতিক বিভাজনক্ষমতা মানুষের কিছুটা সহজাত হয়তো।

সিঁথির মতো এই পথ চলে গেছে মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের গেট পর্যন্ত। এদিক দিয়ে নাসিম হাটে গেছে বাবার হাত ধরে। প্রায়ই তেমনি কোনো পথ-ঘাট-মাঠ দেখলে ও দাঁড়িয়ে যায়, রঙ লাগিয়ে চেহারা ফিরিয়ে নেয়। ফুটিয়ে তোলে পূর্বস্বরূপটি।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার শেষ মাথায় বাবার অফিস। ওখানে ভোজ্যতেল ইত্যাদি পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার জন্যে যে তেল আসে, তার অবশিষ্ট তেল বাবারা ভাগ করে নেয় কজন মিলে। টেস্টের জন্যে সামান্য একটু তেলের প্রয়োজন। বাকি তেলের পেটমোটা বোতলের গলা হাত বাড়ালেই ধরা যায়। চক্ষুলজ্জা ছেড়ে আর সবার সঙ্গে বাবাও হাত বাড়ায়।

একদিন শুধু সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে রাস্তাটি চিনিয়ে দিয়েছিল ওকে। তারপর থেকে একা-একা প্রায়ই গেছে। মাঠের সিঁথিপথ পার হয়ে গেট। গেট পেরিয়ে সরু কাঁচা রাস্তা। কাঁচা খোয়া-ওঠা রাস্তাটি বহুদূর অবধি চলে গেছে। নাসিমের তখন মনে হত পৃথিবীর দীর্ঘতম পথ বুঝি এইটিই।

ধীরে ধীরে হাঁটত আর তাকাত এদিক ওদিক। কত বাড়ি-ঘর। বাড়ির ফল-ফলারির গাছ। পড়ন্ত রোদ রাস্তা জুড়ে। অনেক দূর অবধি তাকালে মনে হয় বিয়ের মজলিশে বিছানো চাদরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

এই চাদরের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে ওর ভালোই লাগে। পায়েও ব্যথা পায় না। মনে হয়, অফিসে পৌঁছে গেলেই তো বাবার দেখা পাবে। বাবা তখন ওর হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে বলবে -- চল। সেই সঙ্গে বলত -- ভালো করে ধরিস, কাত হয় না যেন!

বাবা ওকে নিয়ে বাজারে যায়। বিকেলের ভাঙা বাজার, খুব ফাঁকা। লোকজনের ভিড় থাকে না। দু-চারজন জেলে, কিছু তরকারিআলা। কম দামের জিনিস-পত্র সব। সরেস জিনিস, ভালো টাটকা জিনিস ওবেলাতেই বেচা হয়ে যায়। বাজারের শেষ নিংড়ানো সওদা নিয়ে বসে আছে ওরা। বাবাকে দেখে হারু জেলের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে। বলে — অ্যায় যে ভাইসব, আপনের জন্যে রাখিছি। এই একভাগা মাছই আছে। বাছ্য থুয়া দিছি। জানিই আপনে আসপেন। তাই কাকো দেই নি।

বাবার মুখে কোমল হাসি — ভালো হবে তো হারু! বলতে বলতে থলের মুখ মেলে ধরে। — পচা- ধচা নয়তো!

— আপনে খায়া তারপর কবেন।

কিন্তু বাড়ি এসে যেন বে-আক্কেল হয়ে যায় বাবা। মা চেঁচিয়ে- মেচিয়ে বলে — একশোবার বলেছি, বিকেলে তুমি মাছ কিনতে যেয়ো না। সারাদিন অন্তর পচা মাছগুলো তোমাকে গছায়! তা শুনবে না। যে যা বলে তাই। এরপর আনলে ধরে ফেলে দেব!

চুপ করে থাকে বাবা। কখনো বলে — এ রকম তো হবার কথা নয়। ও যেভাবে বলল!

ঘটনা, সংলাপ সব যেন নাসিমের চোখের সামনে — কানে বাজে। হেসে ওঠে ফিক করে। বাবা-মার কান্ডগুলো ঠিক যেন নায়ক-নায়িকার মতো। আসলেও দুজনের ভেতরে খুব ভাব ছিল।

বাবা ওকে বাজারে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে — কী খাবি নাসু? কটকটি, ঝালমুড়ি না শনপাঁপড়ি!

— কটকটি।

কটকটির দাম কম, খেতে ভালোই। বাবা বুঝে ফেলে ব্যাপারটা। বলে, না বোধহয় — শনপাঁপড়িই!

দু ছটাক শনপাঁপড়ি কিনে ওর হাতে দেয়। বলে, তাজিমের জন্যে একটু রেখে খা। ছোট বোন তো, খুশি হবে।

নাসিম বাবার দিকে এগিয়ে ধরে বলে — খেয়ে দেখো, খুব মজা।

আচমকা হেসে ওঠে বাবা — পাগল।

নাসিম আরো এগোয় — হাতে রঙ-তুলি। খোঁজে সেই পুকুরটি। হঠাৎ বলে ওঠে — এই তো, এই তো সেই! পুকুরের কিনার ঘেঁসে একটি গাছ। গাছের তলায় বসে। সেই পুকুরটার বাঁধানো ঘাট ছিল, যদিও ভাঙাচোরা। এখানে ঘাট নেই। নাসিম আর চেষ্টা করল না ওকে একটি ঘাট বেঁধে দিতে। থাকগে, ঘাট ক্ষয়স্থায়ী একটি জিনিস। একজন বানায়, তারপর কিছুদিনের ভেতরেই দিনের ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে যায়। থাক।

বেশ নিরিবিলি জায়গা। প্রতীক্ষা করতে থাকে, কখন একটি কাক এসে কিনারে কাপড়-ধোয়া তক্তার ওপরে দাঁড়াবে। ঠোঁট চুবিয়ে দেবে পানিতে। তারপর আরেকটু নেমে পাখনা ডুবিয়ে পানি তুলে গা ধোবে। আবার ঠোঁট দিয়ে পানি তুলে তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠে নামিয়ে আনবে সেই পানি।

নাসিমের শ্বশুরবাড়িতে যেতে হলে এদিক দিয়ে যাওয়া যায়। বাপের বাড়িতে সুরাইয়া এসেছে বাবলাকে নিয়ে। নাসিম এলে শ্বশুরবাড়ি খুব খুশি হয়, যত্ন করে খাওয়ায় কত কিছু।

ওর শ্বশুরবাড়ির ভোজসভায় হঠাৎ একসময় বাবার মুখ ভেসে ওঠে। বাবা খেতে খুব ভালোবাসত। .... বাবার শ্বশুরবাড়ি .... তেমন কিছু মনে পড়ে না ওর।

দারুণ বর্ষা। একবার বৃষ্টি শুরু হলে সাত দিন — পনেরো দিন আর সূর্যের মুখ দেখা যায় না। সামনের ছোট্ট বৈঠকখানাঘরে ওরা ভাইবোনেরা, সবাই বাবাকে ঘিরে বসেছে। গল্প বলছে বাবা, ওরা শুনছে আর বৃষ্টি দেখছে। টিনের চাল, কী ঝমাঝম শব্দ বৃষ্টির। পৃথিবীর আর-সব শব্দ তলিয়ে গেছে তার নীচে। পথ-ঘাট সব জনশূন্য — বহুদূর অবধি, যতদূর দৃষ্টি যায় — গাছগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে কেবল বোকার মতো।

ওরা খুব ঘন হয়ে বসেছে, প্রায় জড়াজড়ি করে। একসময় বাবা বাইরের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে — ইট্‌স্ রেইনিং ক্যাট্‌স্ অ্যান্ড ডগ্‌স্!

কথাগুলোর অর্থ ওরা বোঝে না। তবু কিছু জিজ্ঞেস না করে কেবল বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। থেকে থেকে একটি কলকল শব্দ সব কথা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এত বৃষ্টি হচ্ছে যে গলির ভেতর থেকে পানির একটি স্রোত ছুটে আসছে — গিয়ে মিশবে পুকুরে। তারই শব্দ। সামনে খোলা উঠোনের সরু পথটি পানির তোড়ে কেটে গভীর নালা তৈরি হয়ে গেছে। শাখানদীর মতো সেই নালা বেয়ে পানি ছুটছে।

বৃষ্টি কমে এল। ঝিরঝির করে পড়ছে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। বাবা মাকে গিয়ে বলে, দাও তো গোটা দুয়েক টাকা আর ছাতাটা। এই সময় বাজারে ইলিশ পাওয়া যাবে খুব সস্তায়। চট করে গিয়ে নিয়ে আসি।

চুপ করে থাকে মা। সংসারের জমাখরচের ফিরিস্তি সারা বাড়ির দেওয়ালেই তো টাঙানো! কিন্তু বাবা সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। তাড়া দেয় — দেরি কোরো না! আবার জোরে বৃষ্টি এলে বের হওয়া যাবে না! এই ফাঁকে গিয়ে নিয়ে আসি। একেবারে ঝকঝকে রূপার পাতের মতো ইলিশ, জেলেদের ঢাকি বোঝাই।

ভাইজান শুধু টাকা পাঠায়, আসে না। আসার কথা লিখলে উত্তর দেয় — আসতে যে টাকা খরচ হবে —

সুরাইয়া বাবলাকে বুকের কাছে নিয়ে দিব্যি ঘুমায় আর নাসিম উঠে এসে বারান্দায় পায়চারি করে। সামনেই রেলস্টেশন। সারারাত ট্রেন চলে — সান্টিঙ লেগেই থাকে। মাঝে মাঝে ওর সাড়া পেয়ে মা উঠে আসে দরজা খুলে। বলে, এখনো ঘুমাস নি। বারান্দায় পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে মা আর নাসিম। একটি ট্রেন হুইসিল দিয়ে এগিয়ে আসছে। নাসিম বলে — চলো মা, দেশে যাই একবার। অনেকদিন যাওয়া হয় নি। আমাদের বাড়িটা এবারই মেরামত করে ফেলি। মধ্যে মধ্যে গিয়ে থাকব!

মা যেন বুঝে ফেলে অনেক কিছু। বলে, তুই এত সব ভাবিস, এইজন্যেই চোখে ঘুম নেই!

সেদিকে কান দেয় না নাসিম। বলে, ভাইজান এই বাড়ি দোতলা করার জন্যে টাকা

পাঠাচ্ছে, সেই টাকা নিয়ে বরং চলো, তুমি আর আমি যাই! বাড়িটা ঠিকঠাক করে নিই এই সুযোগে। — যাওয়া তো এমনিতেও দরকার। তোর বাপের গোর জিয়ারত, মিলাদ টিলাদ।

দুজনেই চুপ করে থাকে। মা বলে, কী ভাগ্য মানুষটার। সারা জীবন খালি কষ্ট করেই গেল! তোদের নিয়ে আশা করতে করতে জীবনই শেষ করে দিল। দেখতে পেল না কিছুই। ভোগেও এল না ছেলেদের কামাই-রোজগার।

রাস্তায় নিয়ন বাতি জ্বলছে। কিন্তু ওরা যেখানে বসে আছে, সেখানে কিছু গাছগাছালি আড়াল করে রেখেছে নিয়নের উজ্জ্বল আলো। একটু আব্রুর মতো অন্ধকার। এই অন্ধকারে সবরকম কথা বলা যায়। আলোর ভেতরে যেসব কথায় সংকোচ — সেসব।

— আমার মনে আছে মা, ভাইজান ঢাকায় কী যেন ছোটখাটো এক চাকরিতে ঢুকেছিল পড়তে পড়তেই। বাবা বাড়ি থেকে চিঠি লিখল — কেউ এলে তার হাতে আমার একটা শার্টের কাপড় পাঠিয়ে দিয়ো। কাপড়টা যেন একটু ভালো হয়! কিন্তু ভাইজান পাঠাতে পারে নি। বাবার সে কী রাগ তোমার সঙ্গে। — খবরদার, ও যেন একটি পয়সাও আর না পাঠায়। ওর পয়সা আমার জন্যে হারাম। কিন্তু ভাইজান বাড়িতে এল যখন, বাবা যেন সব ভুলে গেল! কী সে আদরযত্ন তার! খাওয়া-দাওয়া! অবশেষে ভাইজানের একটি শার্ট দেখে বলল — এটা রেখে যা! তুই এমনি আরেকটা করে নিস!

মা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। মা যেন এসব সহ্য করতে পারে না বেশিক্ষণ। বাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই দিনগুলোকেও কবরে পাঠিয়েছে তাই! বলে — যা, ঘরে যা! শুয়ে পড়।

বাবলা কেঁদে উঠল বুঝি। ঘুমের ভেতরে ও মাঝে-মাঝে কেঁদে ওঠে। কেন কাঁদছিস, জিজ্ঞেস করলে চোখ না মেলেই বলে, রোকন আমাকে বল দিচ্ছে না! অথবা—

নাসিমের মনে আছে ও বাবার কাছে ঘুমাত। আর রাতে এমনি স্বপ্ন দেখত। একদিন সকালবেলা ওর এক স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে বাবা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। — নাসিম একেবারে দাঁড়িয়ে গেছে মশারির ভেতরে। বাবা হঠাৎ জেগে দেখে, নাসিম দাঁড়িয়ে তার দিকে পা উঁচু করে আছে। বাবা বলে উঠল — এই নাসু! কী রে! কী করিস!

ও চোখ বন্ধ করেই বলল, দাঁড়াও বাবা, এই শটটা মেরে নিই— বলেই বাবা আবার হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগল।

বাবলার বয়স এখন সাত। সকালে ওদের ইস্কুল। ইউনিফরম পরে ইস্কুলের গাড়িতে ইস্কুলে যায়। সুরাইয়া সকালবেলা উঠে ইস্ত্রিকরা কাপড়-জামা পরিয়ে চুল আঁচড়ে ওকে তৈরি করে দেয়। টেবিলে বসে নাশতা খাওয়ায়। টিফিন বক্সে টিফিন দিয়ে ছেলেকে ইস্কুলে পাঠায় যেন পাঁজরের একটি হাড় খুলে দিচ্ছে।

ছুটির দিন বাবলার নাসিমেরও। নাসিম বলল — বাবলা, বাজার যাবি আমার সঙ্গে?

লাফিয়ে উঠল বাবলা — যাব আব্বু!

হাঁ হাঁ করে উঠল সুরাইয়া — পাগল হয়েছ! এই রোদের ভেতরে! আর বাজারের মতো জায়গা! নোংরা-কাদা! মানুষের ভিড়! এ কী খেয়াল তোমার! বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে বাজার যাবে!

— কত ছোটো-ছোটো ছেলেরা একা-একা বাজার করছে। তোমার কাজের ছেলেটা কত বড়! ও কি আজ থেকে বাজার করছে।

— ওদের কথা আলাদা।

— আমার কথাও আলাদা। একটু জোর দিয়েই বলে উঠল কথাটা।

সুরাইয়া তাকাল ওর মুখের দিকে — থেকে- থেকে এমন সব পাগলামি দেখাও তুমি! অবাক লাগে।

সুরাইয়ার এই কথাগুলো নিয়ে মনের ভেতরে নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ। সুরাইয়া ঠিকই ধরেছে। আসলে ও খুব বুদ্ধিমতী। নানা বিষয়ে দারুণ বুদ্ধি খেলে ওর মাথায়!

সে রাতে আবার ঘুম আসছিল ওর। চুপচাপ শুয়ে থাকল। পাখা চলছে। মাঝে-মাঝে ট্রেন যাচ্ছে। আলো ঠিকরে এসে পড়ছে দেয়ালে।

সুরাইয়া প্রায়ই বলে, যেন ফুসলায় — আমাদের বাড়িটা কিন্তু ভারি সুন্দর, সবাই বলে! শুধু উপযুক্ত ফার্নিচার কিছু হয় নি। এই বাড়ি ঠিক মনের মতো করে সাজালে যা লাগবে না! অদ্ভুত!

— কেন, ঠিকই তো আছে! অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয় নাসিম।

সুরাইয়া বোঝে তা। বলে, তুমি আসলে আমার কথা শুনতেই পাও নি। আমি বলছি, ভাইজানের টাকা এলে এই সোফা-সেটটা মেরামত করে কভার পালটে বারান্দায় সাজিয়ে রেখে দেব। আর ড্রয়িংরুমের জন্যে একটা বেশ মডার্ন ডিজাইনের সেট, একটা ডিভান করে নেব। বাড়ির আসবাবই সে বাড়ির মানুষের রুচির পরিচয়! বুঝেছ! তুমি তো আবার সেসবের ধার ধার না! যাই হোক, রীতা ভাবীর সঙ্গে গিয়ে দেখেও এসেছি।

একটু থেমে বলল — রীতা ভাবী মানে বুঝলে তো!

নাসিম অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ। অন্যদিকে তাকিয়েই শুনছিল বুঝি। এবার ফিরল।

বলে উঠল সুরাইয়া — পাশের বাড়ির বউ রীতা! চিনলে? তোমার তো কিছুই খেয়াল থাকে না!

— হুঁ।

— ওরাও কিনবে। তবে একেবারে পাশাপাশি বাড়ি বলে আমি একটু অন্য ধরনের ডিজাইন নেব। বরং তুমি আর আমি একসঙ্গে গিয়ে কিনে আনব। কী বল।

নাসিম চুপ করে না থেকে একটা শব্দ করল মুখ দিয়ে অথবা গলা থেকে। ওকে বোঝাবার জন্যে যে, সে শুনেছে ওর সব কথা।

— কথা থাকল কিন্তু! টাকা এলেই আগে এটা করতে হবে! না হলে টাকা খরচ হয়ে যাবে অন্য সব বাজে কাজে!

একটু থেমে বলল সুরাইয়া — তোমরা নাকি দেশের বাড়ি মেরামত করতে যাচ্ছ? কী লাভ।

কোনো সাড়া দিল না নাসিম।

বাবলা কিন্তু তার কথা ভোলে নি। চুপিচুপি আব্বুর পাশে এসে বলে — আব্বু, চলো আমরা বাজার যাই।

বাবলাকে কোলের ওপরে তুলে নেয়, চুমু দেয় কপালে— অনুভব করে সে বাপ। বলে, থাক। বাজারে গিয়ে কাজ নেই। তুমি আর আমি বরং বিকেলবেলা বেড়াতে যাব।

বিকেল হতেই বাবলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাবলার হাত ধরে হাঁটছে। বাবলা অনেক প্রশ্ন করছে। সামনে অবারিত আকাশের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল — আকাশের ওপারে কী আছে আব্বু? — যারা মরে যায়, তারা কি সবাই ওপারে গিয়ে জমা হয়? তোমার বাবা! — এরোপ্লেন ওপারে যেতে পারে না?

ওদের ভেতরে যেন প্রশ্ন আর উত্তরের খেলা চলছে। নাসিম এবার প্রশ্ন করে — বাবলা, করতোয়া নদী দেখেছিস?

— হ্যাঁ— অ্যাঁ! করতোয়া নদীর ওপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিল, তখন তুমি বললে, এই নদীর নাম করতোয়া।

— ঝাউগাছ চিনিস?

— বাবলা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল— না।

— ঝাউগাছের একরকম গোটা হয়। আমরা বাঁশের নলের ভেতরে সেই গোটা ঢুকিয়ে দিয়ে একরকম পটকা ফোটাতাম। ঠিক বন্দুকের মতো আওয়াজ হত। আমরা বন্দুক-বন্দুব খেলতাম।

— এখনো আছে আব্বু?

— হ্যাঁ। আমাদের বাড়ির পেছনেই আছে। একেবারে ঝাউবন।

— তোমাদের দেশে গেলে আমাকে অমনি বানিয়ে দেবে?

নাসিম ছেলের মুখের দিকে তাকাল — ওটা তোরও দেশ বাবলা।

ছেলের মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকে নাসিম। আবার বলে — আচ্ছা, আমার বাবা যদি বেঁচে থাকত তবে আমরা বাবার কাছে দেশে থাকতাম নায় এখানে থাকতাম? বল তো।

বাবলা যেন একটু বিপদে পড়ে। অনেক ভেবে বলে, ওখান থেকে তোমার বাবাকে এখানে নিয়ে এসে —

— কিন্তু জানিস! থামিয়ে দিল সে বাবলাকে। আমাদের কী সুন্দর ছোট্ট বাড়িখানা। মাটির চার দেয়ালের ভেতরে সাজানো। ঢুকে পা রাখতেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। রাজ্যের পাখি এসে বসে আঙিনার পেয়ারাগাছে, কামরাঙাগাছে। কোঠাভরা কবুতর। সকালবেলা কবুতরের বাক-বাকুম ডাকে ঘুম ভাঙে। খিড়কিদরজার পাশে একটা গাছ আছে। আঁশফলের গাছ। আঁশফলের পাতা কী ঘন সবুজ! তুই অমন দেখিস নি কখনো! দেখেছিস?

মাথা নেড়ে বলে বাবলা — না! জিজ্ঞেস করে, আঁশফল কেমন আব্বু?

— গেলে দেখতে পাবি। যখন আঁশফল ধরে তখন একবার নিয়ে যাব তোকে। দুপুরবেলা সেই গাছের ঘন সবুজ পাতার আড়ালে ছায়ায় এসে বসে ঘুঘু। ইচ্ছে হলে মনের খুশিতে

ঝিমধরা সুর করে ডাকে ঘু-উ-ঘু, ঘু-উ-ঘু—

বাবলা ওর মুখের দিকে তাকাল। সব কথা যেন বুঝতে পারছে না।

ওরা হাঁটতে আর কথা বলছে। এক সময় নাসিম বলে, তোর পা ধরে গেছে — আয়, আমার কোলে আয়!

সত্যিই পা ধরে গেছে বাবলার। সে হাত বাড়িয়ে দেয়। নাসিম কোলে তুলে নেয় ওকে।

— হাঁটতে হাঁটতে আমার পা ধরে গেলে আমার বাবাও আমাকে এমনি করে কোলে নিত। আমি তোর মতোই এমনি হালকা আর পাতলা ছিলাম।

— তুমি তোমার বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেতে?

— হ্যাঁ। হাটে যেতাম, বাজারে যেতাম! এমনিতেও বেড়াতে যেতাম!

— আর কতদূর যাবে আব্বু?

— কেন, তোর ভালো লাগছে না! ওই যে বাড়িগুলো টিনের চাল, খড়ের চাল, মাটির ঘর! সামনে কত খোলা জায়গা, পুকুর, মাঠ, তরি-তরকারির খেত—ওখানে যেতে ইচ্ছে হয় না তোর!

— তুমি চেন ওদের?

নাসিম চট করে জবাব দিতে পারে না। একটু ভেবে বলে, গেলেই চেনা হবে। এই পথটা করতোয়ার পাশ দিয়ে বকুলতলার হাটে গেছে যে পথ, ঠিক তারই মতো। পৃথিবীর পায়ে-হাঁটা সব পথের চেহারা আসলে একই রকম, বুঝলি বাবলা।

— বড় চাচা যেখানে আছে, সেই দেশেও ঠিক এইরকম পথ?

— এইরকমই হবে! আমি তো দেখি নি। তোর বড় চাচা এলে জিজ্ঞেস করিস তাকে।

— বড় চাচা কবে আসবে? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

— আসবে! আমরা ভালো করে বললেই আসবে। বড় চাচা চলে এলে তোর ভালো লাগবে?

— না, একেবারে চলে আসবে না। এসে আবার চলে যাবে! ওখানে তো বড় চাচা অনেক টাকার চাকরি করে আম্মু বলে। এখানে এলে অত টাকা পাবে না!

ছেলের মুখের দিকে তাকায় নাসিম। আস্তে নিঃশ্বাস ফেলে।

একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। নাসিম চোখ দুটো চারদিকে ঘুরিয়ে নিল। — বাড়ির সামনে ঝাপড়া গাছ। তার নীচে দাঁড়াল ওরা। খোলা আঙিনায় খুটখুট শব্দ করে শালিক, চড়ুই কী- যেন খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে। ওদের দেখেও উড়ে গেল না। একটি বাঁশের আড়ে কাপড় শুকোচ্ছে একপাশে।

কানে এল — কাকে চান? একজন লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

— কাউকে না। বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছি।

— আসেন! ভেতরে বসেন!

— বসব না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঘুরে ফিরে একটু দেখি।

— আব্বু, বাসায় চলো।

— হ্যাঁ বাবা। এটাও তো বাসা। কেমন সুন্দর না।

লোকটি শুনতে পায়। বলে আমাদের বাসা আর কত সুন্দর হবে। মাটির ঘর-দোর। আপনারা বড়-লোক মানুষ! এসেছেন যখন বসুন দয়া করে! এক পেয়ালা চা খেলে খুব খুশি হব — বলতে বলতে এগোল লোকটি। নাসিম তার পিছু পিছু বারান্দায় উঠে এল।

ছোট্ট বৈঠকখানা ঘর। ছোট্ট একটি জানালা। জানালার কাছে চৌকিতে বসে ওরা। চৌকির ওপরে একটি সতরঞ্চি পাতা, তার ওপরে চাদর। নাসিম চৌকির বিছানায় হাত বুলোয় ধীরে ধীরে। সামনে গরম চায়ের পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছে। বাবলা ধীরে ধীরে মোয়া চিবোচ্ছে তার পাশে বসে।

— বৃষ্টির দিনে এখান থেকে বৃষ্টি দেখতে খুব মজা লাগবে, তাই না! আর কী সুন্দর হাওয়া আসছে দেখেছিস?

বাবলা জবাব দেয় — হ্যাঁ।

— এখান থেকে কতদূর দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছিস?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ!

— কেমন লাগছে তোর?

— ভালো।

— আর কী মনে হচ্ছে?

বাবলা বুঝল না কথাটা। আব্বুর মুখের দিকে তাকাল।

— এইরকম যদি আমাদের একটা বাড়ি হয়!

বাবলা এবারও ঠিক বুঝে উঠল না।

— ওই বাড়িতে আর থাকব না তাহলে! কী বলিস! রাগ করবি?

— হ্যাঁ। মাথা নাড়ল। — সবাই রাগ করবে। মা — বাপের মুখের দিকে তাকাল।

চা শেষ হয়ে এসেছে নাসিমের। বাবলা উঠে দাঁড়াল -- হয়েছে আব্বু, চলো!

বেরিয়ে এল ওরা। লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে এল পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে।

— আসি! বিদায় চাইল নাসিম।

পথে নেমে বাবলাকে বলল -- অনেকদূর চলে এসেছি রে! এখান থেকে ফিরতে অনেক সময় লাগবে।

বাবলা একটু অভিমানের সুরে বলল— এলে কেন এতদূর!

— তাই তো! ছেলের মুখের দিকে তাকাল নাসিম।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৪৫/সংখ্যা ১ : ১৩৫১]

সংকট—বিহার

শওকত ওসমান

[১৯১৭ সালে হুগলী জেলায় জন্ম। পেশায় অধ্যাপক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ক্রীতদাসের হাসি, জাহান্নাম হইতে বিদায়, পতঙ্গ পিঞ্জর, জননী, জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প, জন্ম যদি তব বঙ্গে, ইত্যাদি। বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে ফেব্রুয়ারী পুরস্কার প্রভৃতি প্রাপ্ত।]

পরস্পরবিরোধী দুই সামাজিক শক্তি বা প্রবণতা যখন হেস্তনেস্ত মোকাবিলায় দাঁড়ায় তখনই সংকটের সূত্রপাত হয়। মানুষ, ঘটনা, পরিস্থিতি — নানা উপাদান পেছনে থাকে। ফলে সংকটের তালিকা করা দায়। সেইজন্যে প্রধান কোনো একটি উপাদানের উপর জোর দেওয়া হয়। এবং সেইভাবে সংকটের নামকরণ ঘটে। যথা, জাতীয় সংকট, রাজনৈতিক সংকট, পারিবারিক সংকট ইত্যাদি।

হাল আমলে নৈতিক সংকটের একটা বড়ো উদাহরণ : উৎকোচ বা ঘুষ। দেশী-বিদেশী বহু সমাজচিন্তাবিদ তথা অর্থনীতিবিদ অনুন্নত দেশে এই ব্যাধির উল্লেখ করে থাকেন। সুইডিশ অর্থনীতিবিদ গুনার মিরদাল একাধিক বার বলেছেন যে দুর্নীতি থেকে সূত্রপাত স্বৈরাচারের। অনুন্নত দেশে এই ফাটল ধরে হাজির হয় সামরিক শাসন।

উৎকোচ প্রধানত টাকা-পয়সা বা সম্পদের লেনদেন। কিন্তু তা অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পরিণাম সুদূরপ্রসারী। চৈতন্যের দিগন্ত ক্রমশ সংকুচিত হয়। ব্যক্তিমানুষ ব্যক্তিত্ব হারিয়ে আকারহীন পিণ্ডের দোসর বনে যায়। কবন্ধের জুলুম শুরু হয় সর্বক্ষেত্রে।

সংকট-সমাধানের কথা বহুজন ভেবে থাকেন। কিন্তু সেইখানে পথও মসৃণ অথবা সমস্যা সহজ নয়। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সম্পত্তি-সম্পদের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। এই গাজর গর্দভের সম্মুখে ইনসেনটিভ বা প্রয়োজক হিসেবে ঝুলন্ত না রাখলে তার চলৎশক্তি খোলে না। শাস্ত্রকারগণ কর্মযোগীর কথা বলেছেন যারা ফলের কোনো তোয়াক্কা না রেখেই ব্রত-সম্পাদনে সদা-মোতায়েন থাকেন। আদর্শ হিসেবে তোফা। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে সাধারণ প্রয়োজকের কথা ভাবতে হয়। তখন সামাজিক পুরস্কারের নিশান টানানো ছাড়া পথ থাকে না। ইউটোপিয়ার নকশা আঁকা সহজ। বাস্তব রূপে তা পাওয়া দায়। লোভ বজায় রেখে মানুষকে নির্লোভ করার দায়িত্ব হয়তো সকল যুগেই থাকবে। খ্যাতি, যশ, মান — গুণান্বিত লোভেরই এক দিক। সামাজিক পুরস্কার যতখানি নির্বস্তুক হয়ে উঠবে জীবনযাপনের বস্তুভিত্তির উপর, সেই সমাজের পরাকাষ্ঠা ততখানি। একথা বর্তমানে সকলে স্বীকার করেন।

উৎকোচ-প্রসঙ্গে এই কাহিনীর সূত্রপাত।

এতৎসঙ্গে অবিশ্যি স্মর্তব্য — বারাঙ্গনামাত্রেই একদা ছিল অরমিত কুমারী।

২

নায়কের নাম এই কাহিনীতে উহ্য। তাকে আমরা রাজপুরুষ বলব। বড়ো নয়, তবে পদ অফিসারের। যদিও কোনো এক বিভাগের কর্মচারী নিয়ে কথকতা, তবু এমন নৈতিক সংকট কেবল ওই এক বিভাগেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবিকার নানা পর্যায়ে এমন দুর্বিপাক দেখা দিতে পারে। বেতনদাতাও এই গন্ডির মধ্যে পড়ে। তারও জীবিকা আছে। এমন ব্যাপক অর্থেই জীবিকা শব্দটি এখানে গৃহীত। লেখক, প্রকাশক, সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক, ফার্মের স্বত্বাধিকারী, বিজনেস হাউসের পরিচালক অগয়রহ — যে-কেউ বিভিন্ন রূপে এমন নৈতিক-সংকটের মুখোমুখি হতে পারে। শুধু কাহিনী-কথনের সুবিধার জন্যে এক ব্যক্তি বা বিভাগের উল্লেখ আছে। তাই কারো নাম খুঁজতে যাবেন না। সব বিমূর্ত। কোথাও পেশা কোথাও সম্পর্কের সড়ক ধরে সকল সম্বোধন সম্পাদিত।

কলেজে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তারপর দশ বছর লা-পাত্তা। রাজপুরুষ অবাক হয়ে যায়, এক সাবেক সহপাঠী বাড়ি এসে উপস্থিত।

কারো অবয়বে তেমন অদলবদল ঘটে নি। সুতরাং নিমেষে চেনা-পর্ব সমাপ্ত।

— তুমি!?!?!?

— তুমি!?!?!?

— বসো বসো। বাড়ি চিনলে কী করে?

— গেজেটেড অফিসারদের বাড়ি কাক-পক্ষী চেনে।

— কোথা ডুব দিয়ে ছিলে এতদিন?

— বলব বইকি। সজনি, সব ধীরে-ধীরে।

সহপাঠী এবং রাজপুরুষ অনেক অতীত ইতিমধ্যে চায়ের কাপের উপর ছড়িয়ে দিয়েছিল।

রাজপুরুষ কমটিটিটিভ পরীক্ষায় বসেছিল, ফল খুব ভালো হয় নি। শেষে কাস্টমস—শুল্কবিভাগে এক হিল্লে হয়। সহপাঠীর কোনো স্থায়ী জীবিকা নেই। যখন যা জোটে গা ভাসিয়ে দেয়।

ছুটির দিন ছিল না বলে সেদিন আসর জলদি ভেঙে যায়। পরবর্তী শনিবারের বিকেল, রোববার সব অন্ধকার দূরীভূত। দশ বছর আর গত দশ বছর থাকে নি। পুরাতন সাহচর্য নতুন হয়ে উঠল। এক মাসে উভয়ের আরো মজলিস বসল। সহপাঠী আসর-গুলজারে অদ্বিতীয়। পুরাতন সকল খেই পাকড়াতে কারো বিলম্ব হয় নি।

একদিন রাজপুরুষের আপিসে টেলিফোন বেজে উঠল।

— হ্যালো। রাজপুরুষের হাতে রিসিভার।

— অবসর আছে?

অন্যপারে প্রশ্নকর্তা সহপাঠী।

— আছে। তোমার জন্যে আছে।

— অফিসার মানুষ। আমাদের মতো টোটো কোম্পানি নও। তাই আগেভাগে নোটিশ।

— এসো। চা খেয়ে যাও।

— আচ্ছা। ছেড়ে দিচ্ছি।

সহপাঠী অতঃপর হাজিরা দিয়েছিল। হাতে এক সুশোভন ব্রিফকেস। যদিও চায়ের কাপের উপর বর্তমান রাষ্ট্রীয় পলিসি ঠিক হয়, সহপাঠী সেদিন তার উদ্দেশ্য উহ্য রেখেছিল। শুধু সাহচর্যের লোভেই তার উৎপাত — বিদায় নিয়েছিল এমন ভাব পেছনে রেখে।

তিনদিন পরে এবার আপিস নয়, বাড়ি চড়াও সহপাঠী।

— কী খবর ওল্ড বয়? রাজপুরুষ অভ্যর্থনা জানায়।

— খবর আছে বইকি।

— একটু বসো। চা আনিয়ে নিই।

পরিস্থিতি তরল করতে সেদিন সহপাঠীর কোনো সংকোচ ছিল না। শুল্কবিভাগে তার একটা জরুরি কাজ আটকেছে। জীবিকার কোনো বাঁধা রাস্তা নেই। ভাবনা অনুযায়ী বাথান-বদল। বর্তমানে সে 'উজানী ট্রেডার্স' নামে এক ফার্মের সঙ্গে জড়িত। তাদের একটা কেস আছে কাস্টমসে।

— উজানী ট্রেডার্স? না, তেমন কোনো ফাইল এখনও আমার কাছে আসে নি।

— আসে নি। তবে আসতে পারে। তুমি ঠিক জান আসে নি? সহপাঠী সন্দেহ প্রকাশ করে।

— বহু ফাইল পাশ হয়। তবে ও-নামে কিছু আসে নি। যদি আসে —

— ধরে রেখো। আর আমাকে খবর দিও।

— কেসটা কী?

— কোন একটা অ্যানোমালি অর্থাৎ অসংগতি আছে। তোমার সব জানা নেই। পরে বলব।

রাজপুরুষ আশ্বাস দিয়েছিল 'তুমি ইন্টারেসটেড। উজানী ট্রেডার্স — নাম মনে থাকবে বইকি। তবে খোঁজ নিও।'

— তা নেব বইকি। আমার তো যখন-যা-পাই-ধরে-খাই-গোছের জীবিকা। খোঁজ নিতেই হবে।

— আমি চট করে কিছু করে বসব না, তুমি যখন ভেতরে আছ।

— ধন্যবাদ।

ধাইয়ের কাছে কোঁক চাপা থাকে না। রাজপুরুষের কাছে দু-তিন দিনের মধ্যে সব হদিস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

দেখা যায়, 'উজানী ট্রেডার্স' লাইসেন্স-অধীন কিছু মাল আমদানি করে। পরিমাণে অসংগতি তো আছেই, তা ছাড়া বাজারে মালের চলতি যা দাম ইনভয়েসে দাম তার চেয়ে ঢের কম। একে আন্ডার-ইনভয়েস বলে। ইনসপেক্টার এইসব গরমিল-অনুযায়ী রিপোর্ট দিয়েছে। আইনত অপরাধ। মাল বাজেয়াপ্ত, জেল, জরিমানা, লাইসেন্স বাতিল—সব কিছু হতে পারে। অফিসার বিচারকর্তা।

সহপাঠী বাড়ি এসে ধরনা দিলে। একদম ককানো অনুরোধ : বাঁচাও।

— আমি কী করতে পারি? বাঁধা আইন।

— তুমি পার।

— তোমার খাতিরে ওদের জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া যায়।

— তা হলে ব্যবসার আর থাকবে কী? লাইসেন্স বাতিল। আমারও রুজি গেল।

— ব্যবসা থাকবে না কেন?

— বাজারে সুনাম গেলে আর ব্যবসা থাকে?

— ইনসপেকশানের সময় ধরাধরি করে নি কেন, ভেতরে যখন গলদ?

সহপাঠী চেপে গিয়েছিল। ওদের চেনা ইনসপেকটর ইতিমধ্যে বদলি হয়ে যায়। ফলে এই গন্ডগোল। চোরের দশ দিনের জায়গায় এবার গেরস্থর এক দিন এসে গেছে। গেরস্থ এখানে শুল্কবিভাগ।

মাকু ঠেলাঠেলি চলল দু-তিন দিন।

পুরাতন ঘনিষ্ঠ সহপাঠীর অনুরোধ। ফাটা অসোয়াস্তির মধ্যিখানে পড়েছিল রাজপুরুষ।

ভালো ছাত্র ছিল কলেজে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে রাজপুরুষের চোখ যায় নি, এমন অপবাদ কেউ দেবে না। সামাজিক সমস্যাবলী তার ধী-শক্তিসমীপে আছাড় খেত বইকি। কিন্তু তেমন আমল পেত না। তার সহপাঠী অনেকে রাজনীতি নিয়ে বেশ মশগুল ছিল। রাজপুরুষ তর্কচ্ছলে সময়-কাটানোর নিমিত্ত হিসেবে তাদের গ্রহণ করত। তার বেশি না। সামাজিক দায়িত্ব মানুষের আছে। কিন্তু সেই বোঝা বইতে লাখ-লাখ মাথা প্রয়োজন। সেখানে একটি মাথা না থাকলে কী আসে যায়? এবংবিধ আঁচড় লাগত রাজপুরুষের মনে। অন্যদিকে 'কেরিয়ার'-গঠনের উচ্চাশার কোনো ভেলকি তার সামনে ছিল না। চার বছর চাকরি হয়ে গেল। সে উপরি-রোজগারের কথা কোনোদিন ভাবে নি। যদিও তার কানে পড়ত ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সহকর্মীদের কপাল-চমকানোর কথা। শুল্কবিভাগে আইন আছে। সেই মাপ-কাঠি দিয়ে ফাইলের উপর বিচরণ এবং মন্তব্য-দান ছাড়া একটি অফিসারের আর কী কাজ থাকতে পারে? অন্য কিছু ভাবত না রাজপুরুষ।

সহপাঠীর অনুরোধ তার কাছে প্রথম ধাক্কা এবং তা আশ্চর্যজনক। তার অধস্তন কোনো সহকারী তার কাছে বায়না ধরে নি কোনোদিন। যদিও স্বভাবে পরিহাসপ্রিয়, কিন্তু আপিসে রাজপুরুষ রীতিমত আমলা অর্থাৎ ব্যুরোক্র্যাট। আপিসে গল্প করা ছিল তার ধাতের বাইরে। সবাই জানত, বড়ো রাশভারি অফিসার।

সহপাঠী পরদিনই বাড়িতে এল ধরনা দিতে। অসোয়াস্তি আছে, তবু রাজপুরুষ কোনো ত্রুটি রাখে না অভ্যর্থনায়। অবিশ্যি সব কথা শেষে এককথায় গিয়ে ঠেকে।

— কী করবে ভাবছ? সহপাঠীর প্রশ্ন।

— কিছু করা যাবে না।

— আমার একটা অনুরোধ রাখো।

— অনুরোধ কী করে রাখব?

— তুমি ইচ্ছে করলে পার।

অন্দর থেকে এই সময় একটা কালো রঙের পুড্‌ল্ ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। এইজাতীয় খুদে সাইজের কুকুর কয়েকবার রোয়াব ঝেড়েই ঠান্ডা হয়ে যায়। রাজপুরুষ ওটাকে সামলে নিজের কোলে তুলে নিলে। কুকুরের কালো পশমি জঙ্গলে বিচরণশীল তার পাঁচ আঙুল। যেন সে-মুহূর্তে তার সামনে আর অন্য কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু সহপাঠী তো বেকার নয়। সে এত্তেলা দিলে।

— তুমি পার। খুব ঠেকা। তাই তোমার কাছে এত অনুরোধ। নচেৎ —

রাজপুরুষের জবাব দিতে বিলম্ব ঘটে। সময় যেন চোখ বুঁজে আছে, আদরলোভী পুড্‌লের তৎকালীন চোখের মতো।

কিন্তু উত্তর শেষ পর্যন্ত দিতে হয়। 'আমার পালটা অনুরোধ। উজানী ট্রেডার্স নিয়ে তুমি আমাকে আর কিছু বোলো না।' হাজার হাজার অসোয়াস্তি রাজপুরুষ গলা থেকে নিমেষে উগরে দিলে।

তারপর স্তব্ধতা পৃথিবীময়।

কিন্তু সহপাঠী নাছোড়বান্দা। সে বেশ শান্ত এবং জোবালো কণ্ঠে বললে, 'ওল্ড ফ্রেন্ড তুমি। আমি সব তাস খুলে ধরছি তোমার সামনে। তুমি আমার জন্যে একটা কিছু করবে — এই আশায়।'

— আমি—! রাজপুরুষ যেন ককিয়ে উঠল।

এই 'ডীল' যদি হয়, পার্টি বিশ হাজার টাকা খরচে রাজি। আমি ভেবে রেখেছি, আমার দিন-গুজরানের জন্যে পাঁচ হাজার রেখে দেব। বাকি পনেরো হাজার তোমার। এখন তুমি ভেবে দেখো। সহপাঠীর কণ্ঠস্বর আগের মতো শান্ত এবং জোবালো।

বক্তা চলে গিয়েছিল। সেদিন আর কোনো কথা হয় নি।

রাজপুরুষ ধাক্কা খেয়েছিল। পনেরো হাজার টাকা একসঙ্গে রোজগার? বিনা মেহনতে! পৃথিবীতে এই জাতীয় ব্যাপার ঘটে সে শুনেছে, পড়েছে। কিন্তু এমন চাক্ষুষ দেখে নি। দেখাব তো কিছু বাকি নেই। বাকি স্রেফ একটা 'নড'। বাকি স্রেফ সম্মতিসূচক ঈষৎ শিরোভঙ্গি।

দেওয়ালের কান থাকে। শত শত পোস্টার দেখেছিল রাজপুরুষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। লোকের কানাঘুষা তো থামবে না। পেছন থেকে মন্তব্য চলবে, সামনাসামনি না হোক। অধস্তন সহকর্মীরা কী ভাববে? তাদের ইঙ্গিতময় চোখ-ঠারাঠারি রাজপুরুষ তখনই দেখতে পেলে।

সহপাঠী এক ধন্দে ফেলে গেল। চব্বিশ ঘন্টা রেহাই নেই হাতছানি থেকে। পনেরো হাজার টাকা মানে অনেক কিছু। সাহিত্য-রসের প্রতি রাজপুরুষের তেমন আকর্ষণ ছিল না কোনোদিন। তাই বলে কল্পনার দৌড় থেমে রইল না। পার্থিব কত সুখের হাতছানি সঙ্গে। সবচেয়ে বড়ো কথা, বহু ধরনের নিরাপত্তা আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কৃতিত্ব ব্যক্তিত্বের পরিধি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অনেক দূর ঠেলে দেয়। অন্যদিকে — আপিসের মধ্যে কানাঘুষা এবং হতাশ ব্যক্তিত্বের ওজন-চুপসানো কৃত্রিম ভার নিয়ে দৈনন্দিন জীবিকা

অর্জনের কশাঘাত। বহু মানুষের সামনে ছোটো হওয়া কি বিধেয়?

এককথায়, আত্মদ্বন্দ্বে বিক্ষত রাজপুরুষ।

কয়েক দিনের মধ্যে এবং তা দৈব ব্যাপার বলা চলে রাজপুরুষ হঠাৎ কূল পেয়ে গেল।

হাতে কোনো কাজ ছিল না। তাই ছুটির ঘন্টা দুই আগে সে বাড়িতে ফিরেছিল। রাজপুরুষের পিতা ছিলেন গোছালো সংসারী মানুষ। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সদা-উৎকণ্ঠিত। রাজপুরুষের বর্তমান বাড়ি পৈতৃক-সূত্রে পাওয়া। উপর-নীচে চার-কামরার দোতলা। নীচে ডাইনিঙ রুম। অপর কামরা ভৃত্যাধীন। উপরে বেড-রুম। অন্য কক্ষ ড্রয়িংরুম। এখনও বাড়িতে কোন ছেলেপুলে আসে নি। সুতরাং প্রশস্ত বাসভূমি।

কড়া নাড়তে কিশোর ভৃত্য দরজা খুলে দিয়েছিল। রাজপুরুষ হনহন করে উপরে উঠে যায়। সিঁড়ি থেকেই তার চোখে পড়ল বেডরুমের দরজা ঈষৎ খোলা। অথচ এই সময়ে বন্ধ থাকার কথা। বাড়িতে কেউ এলে তা জানালা দিয়ে দেখার বন্দোবস্ত আছে। সেই অনুযায়ী উপরের দরজা খোলা হয়। একা-একা থাকার ঝামেলা অনেক। স্ত্রী রাজপুরুষের চেয়ে সেদিক থেকে ঢের বেশি হুঁশিয়ার। দরজার পাল্লা ঈষৎ খোলা দেখে আশঙ্কিত কৌতূহলী; সন্দিগ্ধ রাজপুরুষ সন্তর্পণে অকুস্থলের দিকে এগিয়ে গেল। তিন-চার ইনচি ফাঁক দুই পাল্লার মধ্যে। রাজপুরুষ দু-চোখ দূরবীন বানিয়ে নিলে। লং শটে ধরা পড়ল — গৃহিণী একদম বিবস্ত্র। দিগম্বরী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে চিরুনি। শাড়ির স্তূপ, খাটের উপর। পাশে উবু বসে আছে কালো পুড্‌ল্, তার সারমেয়-দৃষ্টি নিয়ে মনিবের দিকে। চুলে চিরুনি চালানোর কালে মাঝে-মাঝে কুকুরের দিকে চেয়ে দিগম্বরী মুচকি হেসে আবার নিজেকে ড্রেসিং টেবিলের দর্পণে সোপরদ্দ করছিল। রাজপুরুষ হতভম্ব। নীরব দর্শক। ফোকাসের উপর অবিচল দৃষ্টি। এক সময় সেও মুচকি হেসে ফেলে। এমন দিগম্বরী সে দিনে কখনও দেখে নি। এক সময় ধৈর্য-টলমল রাজপুরুষ দ্রুত পাল্লা ঠেলে হেঁকে ওঠে, 'আ রে, এ কী??'

সহধর্মিণী প্রায় আঁতকে উঠেছিল কোনো আততায়ীর আশঙ্কায়। কিন্তু ঝটিতি নিজেকে সামলে নেওয়ার পূর্বে শাড়ির স্তূপ সামলাতে থাকে এক কোণে সবে এবং মুখ খোলে, 'এ-ই তুমি। এমন হঠাৎ অসময়ে —।"

— দরজা খুলে রেখে — এসব কী খেয়াল চেগেছিল —? অন্য জনের প্রশ্ন।

— দরজার কথা খেয়াল ছিল না। গৃহিণী তখন দ্রুত বসনের তলায় প্রবেশার্থী। আরো যোগ করলে — তুমি বুঝি আড়ি পেতে দেখছিলে?

— দরজা খোলা। চোরের ভয়। বদমাশের ভয় —।

— বদমাশের ভয় নেই। এক তুমি ছাড়া। আর —। বাক্য অসমাপ্ত। সহধর্মিণী এবার হেসে উঠল স্বামীর দিকে চোরা চাউনি হেনে।

— কিন্তু দিগম্বরী হওয়ার সাধ কেন? রাজপুরুষের গলার আওয়াজ তরল হয় না।

— মানুষের কখন কী খেয়াল হয় তার বাঁধাধরা কোনো আইন আছে নাকি? প্রায়-সংযত-বসন স্ত্রী মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল।

— কিন্তু দিগম্বরী হওয়ার বাসনা কেন? রাজপুরুষ অস্বাভাবিকতা মেনে নিতে পারছিল না।

গৃহিণী এবার গলায় কিঞ্চিৎ ঝাল মিশিয়ে নিলে — কী ঘাট হয়েছে তাতে শুনি? বিবস্ত্র হয়েছি তো কুকুরের সামনে। মানুষের সামনে তো না।

ইতিমধ্যে পূর্ণ সংযত-বসন স্ত্রী স্বামীর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এবং আপ্তকণ্ঠে বলে — কুকুরের সামনে উলঙ্গ হওয়া দোষের কিছু না। মানুষের সামনে হলে ঘোর অপরাধ। বুঝেছেন, মিস্টার?

কৌতুক-দৃষ্টি আবার নিক্ষিপ্ত।

রাজপুরুষ হঠাৎ সঙ্গিনীকে আলিঙ্গনে বাঁধে। এবং একটু পরেই পাশ খানিক শিথিল করে বলে — আগে হাতে হাত মেলাও। তারপর স্ত্রীকে একদম আলিঙ্গনপাশ থেকে নিষ্কৃতি দেয় সামনাসামনি ঈষৎ তফাতে ঠেলে।

— হাত মেলাব? আমি?

— হ্যাঁ, তুমি লাখ কথার এক কথা বলেছ। রাজপুরুষ স্ত্রীর উপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি অনুরোধ প্রসারিত রাখে — বাক্যিটা আবার উচ্চারণ করো।

বিস্মিত সহধর্মিণী ধীরে ধীরে বলতে থাকে পুনরায় — কুকুরের সামনে উলঙ্গ হওয়া দোষের কিছু না। মানুষের সামনে অবিশ্যি অপরাধ।

তারপর উভয়ের হাতের ঝাঁকুনি আর সহজে থামে না।

৩

সহপাঠী পরদিন হাজির হয়েছিল। একবার দুপুরে আপিসে, আবার সন্ধ্যায় বাড়িতে, ঘোড়েল ব্যক্তি। অনভ্যাসের ভয় থাকে। সহপাঠী হিম্মত জুগিয়েছিল। পনেরো হাজার টাকা তো নস্যি। যে-কোনো অফিসারের ঘর থেকে বেরুতে পারে। রাজপুরুষের ভয়টা কোথায়? সে ধনীর সন্তান। তার স্ত্রী ধনীর দুলালী। উপরন্তু চাকরি চার বছরের। পনেরো হাজারের হিসেব দিতে হবে নাকি? যদি ফেউ লাগে। দুর্নীতি-দমন বিভাগের কেউ? সই-করা-নোট-যোগে যদি ফাঁসিয়ে দেয়। পুরাতন সহপাঠীকে অবিশ্বাস? সে নিজে ট্যাকসি করে এসে পাওনা মিটিয়ে যাবে। সংকোচের কিছু নেই। আর নেহাত যদি রাজপুরুষ হতাশ করে উপরে ছুটতে হবে। কালেকটর আছে। সবার উপরে বোর্ড-অব-রেভেন্যু — রাজস্ব বোর্ড আছে। তখন খরচ হয়তো বেশি। কিন্তু তার পনেরো হাজার — আর থাকল না। অত টাকা কি বানে ভেসে আসে? লোকনিন্দার ভয়? কিন্তু লোক কোথায়?

কুকুরের সামনে বিবস্ত্র হওয়া অপরাধ নয়।

সহপাঠী জিতে গেল।

তবু কাহিনীর সামান্য জের আছে। তা-ই পরিশেষে বিবৃত।

অন্ধকারে বিরাট মাঠে ভয় পেলে মানুষ গান ধরে। হিন্দু মন্ত্র জপে, মুসলমান পড়ে দরুদ। দুই বাহনই জাগতিক কাজে জবর লাগে।

রাজপুরুষ নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরাতন সহ-পাঠীর সঙ্গে রাখী-বন্ধন হল নতুন করে। কলেজ-জীবন আবার বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলছিল। কত সন্ধ্যা অভিজাত হোটেলে কেটে গেল।

রাজপুরুষ বীয়ার পান করে। সহপাঠী আরো কঠিন পদার্থে তৈরি। তার প্রয়োজন হয় আরো কড়া চোলাই। রাজপুরুষের গৃহিণী এ-সবের শরিক নয়। টাকা বাড়ির মধ্যে কোথাও ছিল। কিন্তু সে জানে না। রাজপুরুষ একদিন ভাবলে, গৃহিণীকে সুখ-সন্ধ্যার ভাগী করা উচিত। কপোত-কপোতীর সংসার। এক সন্ধ্যা ঘরে উনুন না জ্বালিয়ে বাইরে দুজনে স্বচ্ছন্দে খেয়ে নিতে পারে। খরচ বেশি। সেই টাকায় ঘরে আরো ভালো খাওয়া যায়। তার জন্যে অত ভাবনার কিছু নেই আর। সেদিন সহপাঠী অবিশ্যি বাদ থাকবে। তাকে ছাড়াই একসন্ধ্যা নীড় ছেড়ে তারা বিবাগী ডানা মেলে দেবে। সেদিন আপিস থেকে ফেরার সময় রাজপুরুষ এক শিশি দামি পারফিউম কিনে ফেললে স্ত্রীর জন্যে। পরবর্তী সন্ধ্যার পরিকল্পনা বাড়ি গিয়ে করা যাবে। কোথাও ক্যাবারে নাচ দেখা যেতে পারে। না, একদম অদ্দুর লাফ দিলে গৃহিণী সন্দেহ করবে। তার চেয়ে কোনো অভিজাত হোটেলে দামি ভোজনই উত্তম।

পরদিন সকাল। ছুটির দিন। একটু দেরিতে দম্পতি চা খেতে বসেছিল। রোববার কি ছুটির দিন তারা নীচে ডাইনিংরুমে চা খেতে যায় না। উপরে ভৃত্য ট্রলিযোগে সাজিয়ে আনে। আহার্য তালিকা অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু লম্বা হয়। ভোজনে ব্যস্ততা থাকে না। ছুটির দিন। খ্রীষ্টান ঈশ্বরের মতো সবাই বিশ্রামার্থী।

কেটলি থেকে রাজপুরুষ চা ঢালছিল। ছুটির দিন রুটিন উলটে যায়। গৃহিণী যেন সম্রাজ্ঞী। হুকুম-তামিলের ভার মিস্টারের উপর।

রাজপুরুষ প্রস্তাব উত্থাপন করলে — আজ সন্ধ্যায় বাইরে খেলে কেমন হয়?

— খুব ভালো, একঘেয়েমিও কাটে।

— গুড।

— কিন্তু খরচ?

— একবেলার লাট। কত আর যাবে?

— তোমার হিসেব তুমি বোঝ গে।

— তুমি প্রচন্ড বাক-পটীয়সী।

— সার্টিফিকেট দিচ্ছ?

— না।

— নমুনা কোথা থেকে পেলে।

— প্রতিদিন পাই। তবে সেদিন একটা কথা বলেছিলে বটে!

রাজপুরুষ এই সময় চায়ের কাপ স্ত্রীর হাতে তুলে দিলে। অন্য কাপে চুমুক দিতে-দিতে বললে — সেদিনের বাণীমন্ত্র আবার শোনাও।

— কোন্ দিনের?

— সেই দিগম্বরী অপরাহ্নের। রাজপুরুষ স্মিত হাসির জের কক্ষময় ছড়িয়ে দিলে।

— যাঃ! অপরপক্ষ তাচ্ছিল্যতায় সব উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।

— একবার বলো না। রাজপুরুষ গলায় মিনতি মাখায়।

সংকোচে আড়ষ্ট গৃহিণী প্রথমে আঁচল দিয়ে ঠোঁটের হাসি আড়াল করে। এবং হঠাৎ আঁচল সরিয়ে গড়গড় করে বেশ জোরেই বলে ফেলে — কুকুরের কাছে ন্যাংটো হওয়া যায়, মানুষের কাছে না।

রাজপুরুষ অতি আনন্দিত, উৎসাহিত মন্তব্য যোগ করে — দামি কথা। দামি মন্ত্র।

স্ত্রী স্বামীর চোখে চোখ ফেলে বলে — স্যার, কথার আর-একটু বাকি থেকে গেছে।

— বলো, বলো। স্বামীর যেন তর সয় না।

— কুকুরের সামনে কুকুর নিশ্চিন্তে ন্যাংটো থাকে।

এটুকু উচ্চারণের পর স্ত্রী খিকখিক হাসি আরম্ভ করে।

—ও—। প্রলম্বিত এই স্বরবর্ণের উপর রাজপুরুষ গোটা বাক্যের মর্মার্থ উপলব্ধির চেষ্টা করতে লাগল সেই নির্বিবাদ ছুটির সকালে।

৪

পশুর নিকট উলঙ্গ থাকতে মানুষের কোনো লজ্জা থাকার কথা নয়।

পশু পশু সমীপে বেমালুম ন্যাংটো থাকে।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৪৫/ সংখ্যা ৫: ১৩৯১]

বিবসনা ঈভ

আবুল খায়ের মুসলেউদ্দিন

[পাক-পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: নারিন্দা লেন, চিরকুট, শালবনের রাজা, নল খাগড়ার ছাপ, লাল টুকটুক, ইত্যাদি।]

করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল সারা হলঘর। কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি—সবাই প্রশংসায় ফেটে পড়ল যেন।

এত অনবদ্য অনিন্দ্যসুন্দর নৃত্য এমন একটা মফস্বল শহরে এর আগে কেউ দেখে নি।

অবনত মস্তকে স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে থাকল প্রীতিলতা। নাচের মুদ্রায় হাতদুটো জড়ো-করা। আবার করতালির প্রতিধ্বনি উঠল ঘরময়।

কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছেলেমেয়েরা দু মাস ধরে খেটেখুটে স্টেজ সাজিয়েছে একাঙ্কিকা নাটিকার রিহার্সাল দিয়েছে, নিজেদের মধ্যে থেকে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, ভাওয়াইয়া, লালনগীতি আর কমিকের শিল্পী খুঁজে বের করেছে।

স্কুলে ফ্রক পরে নাচত প্রীতিলতা। প্রাইজও পেয়েছিল বিভাগীয় ইনসপেকট্রেসের হাত থেকে। কিন্তু কলেজে এসে রূপলাবণ্যে ভরে গেছে ওর শরীর কানায় কানায। গাছপাথর ছাড়িয়ে লম্বায় বেড়ে উঠেছে বেতস লতার মতো। চাঁদসুলতানার মতো ক্ষীণ কটিদেশ, অথচ পরিপূর্ণ বক্ষোদ্বয়। মাথাভরতি কালোকেশের পাহাড়, খোঁপা যেন গৌরীশঙ্করের খাড়া শৃঙ্গ। 'সোয়ান লেকে'র মরালীর মতো গ্রীবা প্রীতিলতার। মুক্তোর মতো দাঁতের ওপর গোলাপী অধরে বঙ্কিম হাসির আভাস।

বউদির উৎসাহের শেয ছিল ছিল না প্রীতিকে নাচ শেখাতে। শহরের নামকরা ওস্তাদ সরফরাজ খাঁকে রেখেছে সংসাবের খরচ বাঁচিয়ে। সপ্তাহে দু-দিন করে নাচ শিখেছে প্রীতিলতা। ভরতনাট্যম, কত্থক, মণিপুরী, দরবারি—একে একে নৃত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করেছে অতীব নিষ্ঠাভরে। স্বচ্ছ স্ফটিক , ঘামে ভিজে গেছে কপাল, ঘুঙুরেব ব্যঞ্জনা যেন মোগল সম্রাটের দরবারে লখ্নৌর আখতারী বাঈর পায়ের মূর্ছনা।

মুগ্ধ হয়ে গেছেন ওস্তাদ। জরদা-কিমামের সুগন্ধি ভরা পানের খিলি মুখে পুরে বলেছেন, "মারহাবা। প্রীতির মতো ছাত্রী আমার সত্তর বছরের জীবনে জোটে নি। প্রীতি একদিন আমার নাম রাখবে।"

নাম রেখেছে প্রীতিলতা। কলেজের চত্বর ছাড়িয়ে সারা শহরময় ওর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। প্রিন্সিপাল সাহেব বলেছেন, "প্রীতি, এবার তোমাকে পাঠাব জাতীয় নৃত্য- প্রতিযোগিতায়। আমি নিশ্চিত, সোনার মেডেল নিয়ে আসবে তুমি।"

গেট দিয়ে কলেজে প্রবেশ করছিল প্রীতি। সঙ্গে আরো দু-তিনটে মেয়ে। ফার্স্ট পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়বে এক্ষুণি।

"এই শোনো। সেদিন ফাংশনে তোমার নাচের কয়েকটা ছবি তুলেছিলাম।"

বলতে-বলতে এগিয়ে আসে বরুণ। রাজাবাজারে ওর ছোট্ট স্টুডিও। কলেজের ছাত্র-সংসদ ওকে নিয়োজিত করেছিল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার ছবি তুলতে। ডিসেম্বরে কলেজ বার্ষিকীতে সেগুলো ছাপা হবে। কয়েকটা বাঁধাই করে ঝুলিয়ে রাখা হবে কমনরুমের দেয়ালে।

বরুণকে চিনত না প্রীতি। দেখেও নি কখনো। ফাংশনের রাতে ওর অনেক ছবি তুলেছে বরুণ। স্টেজের সামনে থেকে, উইং থেকে, কখনো সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে, আবার কখনো ঝুঁকে পড়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে। নাচের অপূর্ব সব ভঙ্গি। আকাশে উড়াল দেওয়া রাজহংসীর মতো, সমুদ্র-থেকে-উঠে-আসা কুঁচবরণ কিন্নরের মতো, বঙ্কিম-গ্রীবা মেনকার মতো সব পোজ।

বরুণের হাত থেকে ছবির খামটা ছোঁ মেরে নিল ফরিদা, "দেখি, দেখি। ওমা, কী সুন্দর। কী দারুণ!"

প্রীতির দিকে চেয়ে বলল বরুণ, প্রজাপতির মতো হালকা গোঁফ নাচিয়ে, "ফ্ল্যাশগানের আলোয় তুলেছি, দিনের আউটডোরের আলোয় তুললে আরো সুন্দর আসত।"

একদঙ্গল ছেলে ঢুকছিল গেট দিয়ে। ওরা অনেকে বরুণকে চেনে। পাসপোর্ট সাইজ ফটো তুলেছে ওর স্টুডিওতে। অ্যাডমিট কার্ডের জন্য ফটো লাগে।

ভীমরুলের মতো ছেঁকে ধরল ছেলেরা, "অপূর্ব ছবি তুলেছেন বরুণদা। প্রীতি, দারুণ সব পোজ এসেছে তোমার।"

ছবিতে নিজের রূপ আর দেহভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল প্রীতিলতা। এত সুন্দর ও, এ সুষম ওর দেহের রেখাবলি, চোখের বঙ্কিম চাহনি। আনন্দের শিহরণ খেলে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে।

"এগুলো তুমি রাখো। একদিন আমার স্টুডিওতে এসো। তোমার আরো ছবি তুলে দেব। প্রোফাইল, পোর্ট্রেট, লাইট অ্যানড শেডে খুব ভালো আসবে।" স্মিত হাসি বরুণের মুখে।

"দাম নেবেন না?"

"না, দাম লাগবে না। কলেজ থেকেই আমি বিল পেয়ে যাব। অতবড় শিল্পী তুমি, তোমার কাছ থেকে দাম নেওয়া যে পাপ।"

"আপনিও দারুণ শিল্পী, না হলে কি আমার ছবি এত ভালো আসে! বউদির সঙ্গে ঢাকায় স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তুলেছিলাম, শাঁকচুন্নির মতো চেহারা এসেছে।"

"আমি আবার শিল্পী হতে যাব কেন? আমি তো কমারশিয়াল ফটোগ্রাফার।"

বলতে-বলতে ছেলেমেয়েদের দলে ঢুকে পড়ে বরুণ। কলেজের অফিসে বাকি ছবিগুলো জমা দিয়ে ওর বিল আদায় করবে।

প্রীতিলতার ছবিগুলো নিয়ে ক্লাসে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এ-হাত থেকে সে হাত। মাহবুব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, "আমার মামা বঙ্গবাণীর নিউজ এডিটর। ওঁর কাছে পাঠিয়ে দিলে প্রীতির ছবি ফার্স্ট পেজে ছেপে দেবে।"

এত প্রশংসার মুখে বারবার রোমাঞ্চিত হতে থাকে প্রীতিলতা। আর স্বপ্ন দেখে, ঢাকায় জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে ও। সোনার মেডেল গলায় ঝুলিয়ে এসে মা, দাদা আর বউদিকে গড় হয়ে প্রণাম করবে।

রূপসা স্টুডিও। নদীর নামে নাম। ছোট্ট স্টুডিও ছোট্ট তার সাইনবোর্ড। তবুও খুঁজেপেতে বেগ পেতে হয় নি প্রীতিলতা আর কেতকীর।

ডার্করুমে কাজ করছিল বরুণ। কাস্টমার এসেছে ভেবে হাত মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এল।

"ও মা, তোমরা যে! বসো বসো।"

"আপনি না বলেছিলেন স্টুডিওতে আসতে। আমার আরো ছবি তুলে দেবেন। এটি আমার বন্ধু কেতকী। একে আমরা কেতি বলে ডাকি।" বলতে-বলতে গালে টোল ফেলে হাসে প্রীতিলতা।

বসে, দাঁড়িয়ে, ভাবুক-ভাবুক মুখ বানিয়ে, কাঁচভাঙা হাসি হেসে, বিভিন্ন পোজে ছবি তোলে প্রীতি। ছবি তোলে কেতকীও। দুই বন্ধু গলা জড়িয়ে ধরেও একটা ছবি তোলে। কথা কম বলে বরুণ। সিরিয়াস মুখ বানিয়ে ক্যামেরার লেনসের ভেতর দিয়ে দেখে প্রীতি আর কেতকীকে। তারপর আঙুলের মৃদু চাপে ক্লিক করে। বেরিয়ে যাবার সময় প্রীতি আবদারের সুরে বলে, "এবার কিন্তু ছবি আরো ভালো হওয়া চাই। আর আমাদের কিন্তু ফ্রী দেওয়া চলবে না।"

"না, ফ্রী দেব না। ফ্রী দিলে আমার দোকান লাটে উঠবে।" দুই সখীকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় বরুণ।

বারোটার দিকে দু পিরিয়ড অফ প্রীতিলতার। কেতকীর অফ নেই। একটা রিকশা নিয়ে রূপসা স্টুডিওতে একলাই আসে প্রীতি। হাতে শান্তিনিকেতনী ঢঙে কারুকাজ-করা একটা খদ্দর-কাপড়ের থলে। থলের ভেতর ওর বই আর খাতাপত্র।

হালকা ব্রাশ দিয়ে একটা মেয়ের ছবির ভুজোড়া ঘন করে দিচ্ছিল বরুণ। এনলার্জ-করা ফটো। নীচু হয়ে নিবিষ্টমনে কাজ করছিল, লক্ষই করে নি প্রীতি কখন এসে ওর সামনে দাঁড়িয়েছে।

দুপুরবেলা। রাস্তায় লোকজন কম। দোকান-টোকানেও তেমন ভিড় নেই।

"খুব মজা হয়েছে, তুমি এখন এসেছ। আমার হাতে তেমন কাজ নেই। গল্প করা যাবে।" একটা ভারি খামে প্রীতি আর কেতকীর ছবিগুলো ড্রয়ার থেকে বের করে এগিয়ে দেয় বরুণ।

"চা খাবে? আমি ফ্লাস্কে চা নিয়ে আসি রোজ ভোরে। বারে-বারে চা না খেলে আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করতে থাকে।" বলতে-বলতে দুটো পেয়ালা বের করে বরুণ। ফ্লাকস থেকে চা ঢালে।

"বাহ্! আপনার সঙ্গে আমার দারুণ মিল। আমিও কিন্তু চায়ের পোকা। হাঁড়ি-হাঁড়ি চা না গিলতে পারলে আমি ক্লাসের পড়াও শিখতে পারি না, নাচেও আমার পা মেলে না তবলার সঙ্গে।"

"সব বড়ো শিল্পীই চায়ের পাগল। তুমি তার ব্যতিক্রম হবে কেন?"

"আমি বুঝি শিল্পী? শিল্পী তো আপনি? যা সুন্দর ফটো তুলেছেন এবারও। আমার আর কেতকীর।

"সত্যি প্রীতি, তোমার মতো মডেল পেলে আমি মস্ত বড়ো শিল্পী হতে পারতাম। তাতে দারুণ নাম হত আমার, হত অঢেল টাকা।" একটা সিগারেট ধরায় বরুণ, "মাইকেল এনজেলো, লিওনারদো দ্য ভিনচি, রুবেন্স, পিকাসো—এঁদের সব্বার স্বর্গের অপ্সরীর মতো সুন্দরী যত সব মডেল ছিল, দিনের পর দিন ওদের সামনে বসিয়ে রেখেছেন শিল্পীরা, আর তুলির আঁচড়ে-আঁচড়ে জীবন্ত করে তুলেছেন ওদের ছবি। অতুলনীয় রূপ ছিল সেসব মডেলদের। ওদের জন্যেই তো শিল্পীরা আজ অমর হয়ে রয়েছেন। শত শত বছর ধরে চলছে ওঁদের কীর্তির অযুত প্রশংসা। ইউরোপ জুড়ে মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে ওঁদের ছবি আর স্ট্যাচু নিয়ে।"

"বা রে। অনেক জানেন দেখি আপনি! এত খবর রাখেন কেমন করে?"

"কেন? তোমাদের কলেজ থেকেই তো বি-এ পাশ করেছি। ফটোগ্রাফি আর পেইনটিং-এর ওপর কয়েকটা বই পড়েছি। আমি কিন্তু ফটো থেকে দেখে-দেখে ভালো পোর্ট্রেট আঁকতে পারি।"

"বলেন কী? তাই নাকি? দিন না আমার একটা পোর্ট্রেট এঁকে। রঙিন হতে হবে কিন্তু।" নাকি সুরে আবদার করল প্রীতি।

"বেশ, তাই হবে। তুমি কালো পরদাটার সামনে গিয়ে টুলটায় বসো। তার আগে পাশের ঘরটায় গিয়ে একটু মেক-আপ নিয়ে নাও। ওখানে আয়না, পাউডার, লিপস্টিক সব রয়েছে।"

ক্যামেরার লেনসের ভেতর দিয়ে প্রীতিকে দেখে বরুণ। অনেকক্ষণ ধরে নিবিষ্টমনে দেখে। ফটো থেকে দেখে-টেখে পোর্ট্রেট আঁকবে। দিন কয়েক লাগিয়ে।

"ঘাড়টা একটু ডানে কাত করো। না, হল না। বেশি কাত হয়ে গেছে। মুখটা সামান্য তোলো। ঠিক আমার নাকের দিকে তাকাও।"

এগিয়ে গিয়ে প্রীতির চিবুক ধরে ওর মুখটা তুলে ধরে। ডাগর-ডাগর চোখ তুলে তাকায় প্রীতি। বরুণের কালো চোখে শিল্পীর গভীর দৃষ্টি। বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যায় প্রীতির মেরুদণ্ডে। গোলাপি হয়ে ওঠে ওর পাউডারমাখা গাল দুটো।

একগুচ্ছ চুল পালছাড়া মেঘের মতো কপালে নেমে এসেছিল প্রীতির। হাত দিয়ে সেগুলো কানের পেছনে সেট করে দেয় বরুণ।

ওর আঙুলে সিগারেটের কড়া গন্ধ। বুকে বনমানুষের মতো ঘন কালো লোম। কী বিশাল বুক! আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেটের বুকের মতো চওড়া।

অনেকগুলো ছবি তোলে বরুণ বিভিন্ন পোজে। বিদায় দেবার সময় বরুণ আরেকটা সিগারেট জ্বালায়, "খুব ভালো মডেল তুমি। খুব কো-অপারেট করেছ। আজকের ছবি আরো ভালো উঠেছে। আরেক দিন সেশন দেবে কিন্তু।"

"আগে তো এগুলো প্রিনট করে দেখান। তার পর তো।"

"শুধু প্রিনট করেই শেষ করব না। এর থেকে তোমার একটা পোর্ট্রেট বানিয়ে নিজের ঘরে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখব। আরেকটা পাবে তুমি। একদিন তুমি বাংলাদেশের সেরা নৃত্যশিল্পী

হবে। তার ক্যামেরাম্যান সবার আগে আমি। এটা কি কম গৌরবের কথা?"

একটা অ্যালবামে ফটোগুলো সুন্দরভাবে এঁটে প্রীতিলতাকে উপহার দিয়েছে বরুণ। বড়ো একটা পোর্ট্রেট বাঁধাই করে দিয়েছে মেহগিনি কাঠের মোটা ফ্রেমে।

নারসিসাস রোগে ধরেছে যেন প্রীতিকে। অ্যালবামটা বালিশের নীচে লুকিয়ে রাখে আর পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে পাতা উলটে উলটে দেখে। মুগ্ধ হয়ে যায় নিজের রূপ দেখে, চোখের কালো তারায় চটুল হাসির স্ফুলিংগ দেখে।

দারুণ পোর্ট্রেট এঁকেছে বরুণ! শেলফে বইয়ের গাদার পেছনটায় রেখে দিয়েছে। ওটাও লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখে। আর দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে বিনতা দেবদাসীর মতো দেহভঙ্গি করে বলে আপন মনে, "বরুণদা, তুমি দারুণ শিল্পী। তোমার আঙুলে জাদু আছে।"

রাগে থর থর করে কাঁপছেন মলয়া দেবী। ধবধবে সাদা থানপরা, শুচিতার প্রতিমূর্তি যেন। কথা কম বলেন। সারাদিন পূজা-অর্চনা নিয়ে কাটান।

"না, এ বিয়ে হতে পারে না। আমি মরে গেলে আমাকে দাহ করে এসে তোমাদের মন যা চায় তাই করো বউমা। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে নয়। রমেশ গাঙ্গুলি মহাশয়ের কন্যা বিয়ে করবে ফটোগ্রাফারকে? যার সঙ্গে আমাদের বংশের, গোত্রের কোন মিল নেই।"

উঠোনের কোণে নিমগাছটার নীচে গিয়ে খড়মের শব্দ তুলে হাঁটতে থাকেন মলয়া দেবী, "সব দোষ তোমার বউমা। আমি তো বলেছিলাম, আট ক্লাস পাশ করতেই মেয়েব বিয়ে দিয়ে দাও। আমার কথা তুমি শুনলে না। তার ওপর ওস্তাদ রেখে নাচ শিখিয়েছে বাঈজীটাকে।"

"ওরা যে মা একে অপরকে ভালোবাসে।" মিনমিন করে বলেন ঘরেব বউ দূরে দাঁড়িয়ে থেকে। কাছে যেতে সাহস পান না।

"ভালোবাসে তো বেরিয়ে যাক আমার বাড়ি থেকে। রাস্তায় গিয়ে ভালোবাসুক।পাপ। পাপ ঢুকেছে এ বাড়িতে।"

দ্রুতগতিতে ঘরে গিয়ে ঢোকেন মলয়া দেবী। ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দেন। মেয়ের অপবিত্র মুখ দেখবেন না আর।

ভয়ে কাঁপতে থাকে প্রীতিলতা। হেঁসেলের পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মুখ মরা লাশের মতো ফ্যাকাশে।

নিজের পড়ার ঘরে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি। অর্থনীতির বইটার ভেতর বরুণের একটা ছবি লুকিয়ে রেখেছিল। সেটা বের করে বুকে চেপে ধরে। অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখে। তারপর ছবিটা চোখে ছোঁয়ায়। আর সঙ্গে-সঙ্গে বর্ষার অঝোরধারা নামে ওর দুচোখ বেয়ে।

দুদিন আগে অটোগ্রাফসহ ছবিটা প্রেজেন্ট করেছিল বরুণ।

বরুণের বাসাটা দুই বেহারার পালকির মতো ছোট। উঠোন টুঠোনের বালাই নেই। একপাশে সংলগ্ন রসুই ঘর আর কলতলা।

বরুণের কণ্ঠসংলগ্ন হয়ে মলিন হাসি হাসে প্রীতি "দুটো মানুষের জন্য এটাই যথেষ্ট।

আমি তো আর রাজা বিক্রমাদিত্যকে বিয়ে করি নি যে, আমার রাজপ্রাসাদ থাকতে হবে। আমি বিয়ে করেছি এক শিল্পীকে—নিপুণ এক আলোকচিত্রশিল্পীকে। আর,শিল্পীরা রাজপ্রাসাদে বাস করে না।"

কোর্টে গিয়ে বিয়ে করেছে ওরা। একসাগর চোখের জল ফেলেছে প্রীতি। বরুণের রোমশ বুক ভিজিয়ে দিয়েছে কেঁদে-কেঁদে। প্রথম ধাক্কা সামাল দিতে পারে নি।

ওর মাথায় স্নেহের হাত রেখে হেসেছে বরুণ, "দাঁড়াও, ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। কাঁদলে মেয়েদের অপূর্ব সুন্দর দেখায়। শুভ্রশুচি পর্বতশৃঙ্গের মতো বরফজলে স্নাত সৌন্দর্যের মহিমা তোমার মুখে। এটাকে ধরে রাখতে চাই আমার ক্যামেরায়।"

বরুণের নিবিড় আলিঙ্গনে কাঁদতে-কাঁদতে হেসে ফেলে প্রীতি।

দিন যায়। মায়ের জন্য মন কেমন করে। দাদা-বউদির মুখখানা মনে-মনে জপ করে প্রীতি। সারাটা দুপুর বুকের নীচে বালিশ চেপে অনাথ বালিকার মতো ফুঁপিয়ে-ফঁপিয়ে কাঁদে। আকুল হয়ে কাঁদে।

বরুণ তখন স্টুডিওতে চলে গেছে। একা ঘরে কান্না ছাড়া কীই-বা আর করতে পারে প্রীতি। কলেজে যায় না। গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে।

বিষণ্ণ দুপুর। একটা দুষ্টু কাক একটানা ডাকছিল পাশের বাড়ির ছাদে বসে। অমঙ্গলের ডাক। আহা! মা জানি কেমন আছে! মার অম্বলেব ব্যথা কি আবার বাড়ল! বউদির ছেলে হবে। ও নিশ্চয়ই খুব লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে আশু মাতৃত্বের সম্ভাবনায়। দাদার প্রমোশন পাওয়ার কথা। হয়তো ক্যাশিয়ার থেকে অ্যাকাউনট্যান্ট হয়েছে। দাদা বলেছিল, " প্রীতি, প্রমোশনটা পেলে তোকে একজোড়া সোনার দুল গড়ে দেব।" আর উত্তরে প্রীতি হেসে উঠেছিল, "না দাদা, তার চেয়ে তোমার খোকা হলে ওকে সোনার বাটি গড়ে দিও। রাজপুত্তুর দুধু খাবে ওতে।"

রিকশায় চড়ে কখন যে প্রীতি গাঙ্গুলীবাড়িব দরজায় এসে থেমেছে নিজেই টের পায়নি।

মৃদু কড়া নাড়ল। একবার দুবার। চারদিকে দুপুরের নিস্তব্ধতা।

নিশ্চয় বউদি এসে দরজা খুলে দেবে। মা তো এখন স্নানঘরে। বুকের ভেতর আশার কৌতুক, বউদি ওকে দেখে অবাক হয়ে যাবে। বুকে জড়িয়ে ধরবে। কপালে একটা দীর্ঘ ভেজা চুমু খাবে। তারপরে বলবে, "আয়, ঘরে আয়।"

সত্যি বউদি এল শব্দ পেয়ে। দরজার হুড়কো খুলে প্রীতিকে দেখে আঁতকে উঠল যেন। কে যেন ওর মুখে একবোতল কালো কালি ঢেলে দিল।

"বউদি, কেমন আছ বউদি?" উচ্ছ্বাসে হাত বাড়াল প্রীতি।

দরজাটা আস্তে-আস্তে বন্ধ করে দিল গাঙ্গুলী বাড়ির বউ। বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী শাশুড়ীঠাকরুনের হুকুম "ও কুলটা যেন কোনো দিন এ বাড়িতে ঢুকতে না পারে।"

কপোত কপোতী ঠোঁটে ঠোঁট ঠোকে। ঠোঁট পেরিয়ে দাঁতে দাঁত ঠোকে বরুণ আর প্রীতি। আদরে চুম্বনে বরুণ ভাসিয়ে দেয় প্রীতির সারা শরীর। সন্ধ্যায় স্টুডিও বন্ধ করে বাড়ি ফেরার সময় এটা সেটা নিয়ে আসে। সন্দেশ, কচুরি, কাঁচের চুড়ি, লেস-আঁটা কাঁচুলি।

দিনে-দিনে সহজ হয়ে উঠছে প্রীতি। সারা দুপুর বসে বসে উল বোনে, গল্পের বই পড়ে, আর দরজা বন্ধ করে নাচের পোশাক পরে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করে। তারপর হঠাৎ যখন মায়ের জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে, বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। ও যখন ছাগলছানার মতো হামা দিতে শিখেছে তখন সেই ছোট্ট বয়সে মা বিধবা হয়েছেন। দাদা নাকি তখন কলাপাতায় অ আ লেখা মকসো করছে। সে বয়সেই দাদা মাকে সাহায্য করত। উঠোন ঝাঁট দিত, বাসন ধুত, দোকান থেকে তেল নুন কিনে আনত।

"মা। দুঃখিনী মা আমার। তোমাকে ছেড়ে আমি চলে এলাম। আমাকে ক্ষমা করে দিও তুমি!" ভাবতে ভাবতে চোখে বর্ষা নামে প্রীতির।

রূপসা নদীতে ডিঙি নৌকো ভাড়া করে ওরা বেড়াতে গেল চরের দিকে। সাদা বালুর ঝিলিমিলি নদীর পাড় ধরে। মাঠ জুড়ে মিষ্টি আলু আর মসুর-কলাইয়ের খেত।

লোকজন তেমন নেই মাঠে। একটা বাঁকে নদীর স্রোতটা কলকল করছে। নৃত্যের তাল যেন।

বালুর ওপর বসে পড়ল প্রীতি। আঙুল দিয়ে কনুই খুঁটতে লাগল বরুণের। আলতোভাবে ঠোঁট ছোঁয়াল বরুণের খোঁচ-খোঁচা দাড়িভরা গালে।

ওকে বুকে টেনে নিল বরুণ। ব্লাউজের হুকগুলো খুলল আস্তে-আস্তে। ব্রা-টা সরিয়ে ফেলল তারপর। তাতানো মুখখানা নীচু হয়ে এল ওর।

শীতের রূপসী দুপুর। সোনালি রোদের আভা সারা বালিয়াড়ি জুড়ে। কোথায় যেন একটা শঙ্খচিল ডেকে উঠল। দারুণ আরাম লাগছিল প্রীতির। বরুণের হাঁটুতে মাথা রেখে চোখ বুজে রইল ও।

আস্তে আস্তে ওকে সোজা করে বসিয়ে দিয়ে ক্যামেরা হাতে করে উঠে গেল বরুণ। অনেকগুলো স্ন্যাপ নিল। ক্লোজ- আপ স্ন্যাপ। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে।

কামনার আগুনে চোখদুটো ঘোলাটে হয়ে উঠেছে প্রীতির। মুখে ওর রক্তাভা। বরুণের কাণ্ড দেখে মৃদু মৃদু হাসছে ও।

"কেউ যদি ছবিগুলো দেখে ফেলে?"

"কে দেখবে? আমি নিজেই তো প্রসেস করব। নিজেই তো প্রিন্ট করব।' মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে কয়েকটা পোজের স্ন্যাপ নিয়েছিল বরুণ। মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, 'একটা বড়ো অ্যালবাম থাকবে আমাদের। আর সেটাতে থাকবে আমার ঈভের যত নগ্ন ছবি। 'কাম সূত্র'কেও হার মানাব আমি তোমার নগ্নরূপ বিশ্লেষণে।"

ভিউ কার্ডে অজন্তা ইলোরার নগ্ননারীর ছবি দেখেছে প্রীতি। নিজেকে সেরকম অবস্থায় দেখবে ভেবে হঠাৎ যেন শিউরে ওঠে।

তারপর ভাবে, ক্ষতি কী। বরুণ যা ভালোবাসবে তাইতেই তো আমার সুখ। কয়েকটা ভালো ছবি ওর কাছে দিয়ে দেব। ও স্টুডিওতে রেখে দেবে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবে কাজের ফাঁকে-ফাঁকে।

ঘরে এসে বড়ো আয়নার সামনে সম্পূর্ণ বিবসনা হয় প্রীতি। বরুণ তখন বাইরে গেছে

বাজার করতে। নিজের ফিগার দেখে নিজেই খুশি হয় মনে মনে। নিটোল নির্ভাঁজ ত্বক। কোথাও একরত্তি বাহুল্য নেই, মেদ নেই তলপেটে। পরিপূর্ণ খাড়া বুক। পিচ্ছিল নিতম্ব, মসৃণ জানু।

যা দারুণ আসবে না বরুণের ক্যামেরায়! আনন্দের আবেগে পায়ে ঘুঙুর পরে প্রীতি। তারপর একা ঘরে নাচতে থাকে নগ্ন দেহে। বড়ো আয়নাটার সামনে। ঘাড় কাত করে নিজের পেছনটা দেখতে চেষ্টা করে। নানা ভঙ্গিতে, নানা মুদ্রায়।

নৃত্যের নানা ভঙ্গিতে মুদ্রায় একগাদা ছবি তোলে বরুণ। প্রীতির নগ্ন ছবি। বিবসনা ঈভের ছবি। কখনো কড়া আলোয়, কখনো আলো-আঁধারের কন্ট্রাসটে, কখনো ছায়া-ছায়া আলোয়।

প্রথমটা মৃদু আপত্তি করেছিল প্রীতিলতা।

একটা পুরু অ্যালবাম প্রীতির বালিশের নীচে। পাতায় পাতায় ওর ছবি। নগ্ন নারীর অপূর্ব রূপের ছবি। কী এক-একটা দেহভঙ্গি! কোথাও স্বচ্ছ ঝরনার হাসির ঝিলিক ওর চোখেমুখে, কোথাও আষাঢ়ের ম্লান বিষণ্ণতা, আবার কোথাও শৃঙ্গারের অভিব্যক্তি সারা অবয়বে, কামনার আগুন জ্বলছে সুপুষ্ট ঠোঁটজোড়ায়।

রাতে শুয়ে শুয়ে ছবিগুলো দেখে দুজনে। বরুণের ঘাড়ে নাক ঘসতে ঘসতে বলে প্রীতি, "সত্যি, গ্রেট শিল্পী তুমি। তোমার হাতের গুণেই আমার ছবিগুলো এত চমৎকার এসেছে। ইস, কত্তো বড়ো আলোকশিল্পী আমার স্বামী। নাহ্ আমার দেবতা।"

"না প্রীতি , ফটোর চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর তুমি। আমি আরো গবেষণা করব তোমার শরীর নিয়ে। আরো অনেক অনেক ছবি তুলব তোমার। ঢাকা গিয়ে কিছু বই কিনে আনব মর্ডান ফটোগ্রাফির ওপর।"

বলতে-বলতে সিগারেটে কড়া দম দেয় বরুণ। আজকাল দামি সিগারেট খায় বরুণ। বিলেতি সিগারেট। প্রীতির আগমনে ওর সংসারের চেহারা ফিরে গেছে। আয় বেড়ে গেছে কয়েকগুণ।

মাঝে-মাঝে বাইরে যেতে হয় বরুণকে। সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোহর , ঈশ্বরদি। কখনো-কখনো ঢাকা চট্টগ্রাম, বরিশাল। কাজের নাকি অর্ডার আসে, ছবি তোলার অর্ডার। ফুটবল ম্যাচে শীল্ড-পাওয়া টীমের ছবি, বিয়ের বরকনের যুগল ছবি, সভা-সম্মেলনের গ্রুপ ছবি ইত্যাদি। ছবি তোলে, নিজে গিয়ে ছবি ডেলিভারি দিয়ে বিল আদায় করে।

বেশি দিন বাইরে থাকে না বরুণ। সে সময়টা পাশের বাড়ির মালতীর মা এসে রাতে শোয় বারান্দায়। ঘরে একা-একা ভয় পায় প্রীতি।

ঢাকা গেছে বরুণ। ফিল্ম, ম্যাট পেপার, কেমিক্যালস্, আরো যত সব মালমশলা কিনতে স্টুডিওর জন্য। তিন-চার দিনের পাড়ি। একলা ঘরে ছটফট করে প্রীতি। কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। মালতীর মা এলে রাতে গল্প করে সময়টা কাটে ভালো।

কাঁচভাঙা একটা আলমারিতে বরুণের কলেজজীবনের বইখাতা। পুরনো বইগুলোর ওপর ধূলোর প্রলেপ। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে একটু গোড়ায় প্রীতি বরুণের বালিশটা বুকে নিয়ে। আজ আর ঘুম আসছিল না। উঠে গিয়ে আলমারিটা ঝাড়তে লেগে যায়। বইখাতাগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে। আলমারির ওপর রাখবে ওদের যুগল ছবি। বরুণের এক ফটোগ্রাফার বন্ধু

তুলে দিয়েছে। কৃষ্ণের মতো একরাশ চুল বরুণের মাথায়।

হঠাৎ প্রীতি দেখতে পায় পুরনো একটা বইয়ের ভেতর একজোড়া চাবি। স্টুডিওর ডবল লকের চাবি।

মনে খটকা লাগে প্রীতির। চাবিজোড়া সঙ্গে নেয় নি বরুণ। ওর কাছেও রেখে যায়নি। বইয়ের ভেতর লুকিয়ে রেখে গেছে। তবে কি বরুণ ওকে বিশ্বাস করে না। স্টুডিওতে এমন-কী টাকার খনি রয়েছে যে, সেটা প্রীতির দেখা চলে না। সত্যি তো, দোকানের চাবি তো কোনোদিন প্রীতির কাছে রাখে নি বরুণ। কখনো হাত ছাড়া করেনি চাবির গোছা। ভাবে প্রীতি।

কৌতূহল চড়তে থাকে প্রীতির মনে। একটা রিকশা ডেকে রওয়ানা হয় স্টুডিওর দিকে। মনে মনে আকাশপাতাল ভাবে। নাহ্, বরুণের ভালোবাসায় কোথাও খাদ নেই, উত্তাপের দৈন্য নেই কোথাও। চুম্বকের আকর্ষণ ওর চুম্বনে, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসে রোজ পাঁজাকোলা করে বুকে তুলে নেয় ওকে। গল্প করতে-করতে মাঝরাতে পার করে দেয়। তবে! তাহলে চাবির গোছা লুকিয়ে রাখা কেন?

টেবিলের প্রথম ড্রয়ার খোলে প্রীতি। ওতে অনেকগুলো অর্ডারি ছবি। নানা লোকের ছবি। যুগল ছবি, গ্রুপ ছবি। চমৎকার সব ছবি তুলেছে বরুণ।

দ্বিতীয় ড্রয়ারটার খামে-খামে সাজানো যত সব নেগেটিভ। প্রত্যেক খামের গায়ে নম্বর দেওয়া আর লোকের ঠিকানা লেখা। উলটে-পালটে নেগেটিভগুলো দেখে প্রীতি। কী সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখেছে বরুণ। থরে-থরে সাজানো নিপুণ হাতে।

নীচের ড্রয়ারটা খোলে প্রীতি। একগাদা খাম ঠাসা ওটাতে। মোটা-মোটা খাম। কোনো-কোনোটায় নানা লোকের, নানা জায়গার ঠিকানা লেখা, রেজিস্ট্রির জন্য ডাকটিকিট আঁটা। বাকিগুলোর গায়ে ঠিকানা নেই, তবে টিকিট আঁটা রয়েছে। সেগুলোব মুখে আঠা লাগানো নেই। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ছবি তোলে বরুণ। সেগুলো নিশ্চয় প্রিন্ট করে পাঠাচ্ছে। রেজিস্ট্রি করে, যাতে পথে খোয়া না যায়। চঞ্চল মনে ভাবে প্রীতি।

একটা প্যাকেট খোলে প্রীতি। ক্ষিপ্র হাতে। উৎসাহ ওর তুঙ্গে।

ভেতরে একগাদা নগ্ন ছবি। একসেট নগ্ন ছবি। বিভিন্ন ভঙ্গিতে তোলা নগ্ন ছবি।

প্রীতিলতার নগ্ন ছবি।

কালো স্লেট রঙ আকাশের। রাত নামে। দু-চারটা তারার ম্লান প্রভা নভোমণ্ডলে। কলতলায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে চেষ্টা করে প্রীতি। কান্না আসে না ওর। মরুভূমির মতো শুকনো ওর চোখদুটো। কণ্ঠস্বর মরে গেছে। আওয়াজ বেরোয় না একটুও।

"মা মা, মাগো, আমাকে তোমার পায়ে ঠাঁই দাও মা।" মায়ের নাম করে কাঁদতে চেষ্টা করে প্রীতি। চোখ ভেজে না। কেমন করে মায়ের কাছে যাবে ও? ও যে কুলটা,অশুচি, অপবিত্র। পয়সার বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে ওর অশ্লীল ছবি বিভিন্ন শহরে নানা ঠিকানায়।

"দাদা, ও দাদা, হামা দিয়ে আমি তোমার কোলে উঠব। তোমার সঙ্গে স্কুলে যাব আমি, আমিও কলা পাতায় বর্ণমালা লিখব।....বউদি, তোমার ছেলের নাম—"

বড়ো আয়নাটার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি। নখ দিয়ে নিজের মুখটা খামচাতে

থাকে জোরে জোরে। দাঁত দিয়ে কামড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত করে ফেলে ঠোঁট দুটো। টেনে-টেনে উপড়ে ফেলে একগোছা চুল। জোরে চড় মারে দু'গালে।

তারপর গায়ের শাড়িটা খুলে নগ্ন হয় প্রীতি। ব্লাউজ, অন্তর্বাস, পেটিকোট সব খুলে ফেলে দেয় মেঝেতে। বিবসনা ঈভ। অট্টহাসি হাসে উন্মাদিনীর মতো। উচ্চমার্গে তবলা বাজাচ্ছে ওস্তাদ সরফরাজ খাঁ। না, ওর মাথায় তবলার হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে ওস্তাদ।

নড়বড়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে একটা চিরকুট লেখে টেনে-টেনে, "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।" স্টুডিওর চাবির গোছা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখে কাগজের টুকরোটা। হাঃ হাঃ শব্দে ফেটে পড়ে প্রীতি। তারপর লাটিমের মতো ঘুরে-ঘুরে নাচতে থাকে। ওর পদশব্দে ঘরের মেঝে কেঁপে-কেঁপে ওঠে। কলেজের ফাংশনে নাচছে শ্রীমতী প্রীতিলতা গাঙ্গুলী।

ভোর হয়ে গেছে। রাস্তায় লোক চলছে। ঢাকা থেকে ফিরেছে বরুণ। দরজাটা মুখে-মুখে লাগানো। খোলাই ছিল। হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে ঘরে ঢোকে। ব্যাগের ভেতর ক্যামেরা, কিছু কাপড়-চোপড়, আর এক প্যাকেট মিষ্টি। খালি হাতে কখনো ফেরে না বরুণ। প্রত্যেক বারই কিছু না কিছু নিয়ে আসে। আর কিছু না হোক একঠোঙা গরম জিলিপি কিংবা একডজন কাঁচের চুড়ি।

রাতভর ঝুলে থেকে লাশটা বীভৎস হয়ে উঠেছে। বেদনায় মুখ নীল। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বের হচ্ছে। দাঁতের নীচে চাপা পড়ে ঝুলন্ত চ্যাপটা জিভটা কেটে গেছে। গালের দুপাশ বেয়ে কসের ধারা শুকিয়ে রয়েছে। দুটো নোংরা মাছি জিহ্বার লালা চেটে চেটে খাচ্ছে।

পরনের শাড়িটা দুভাঁজ করে এক প্রান্ত ঘরের কড়িবরগার সঙ্গে বাঁধা। আরেক প্রান্ত দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছে প্রীতি।

হকচকিয়ে যায় বরুণ। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। টেবিলের ওপর রাখা চাবি আর কাগজটা চোখে পড়ে। চিরকুটটা পড়ে। কয়েকবার পড়ে।

আস্তে আস্তে একটা কুটিল হাসির রেখা ভেসে ওঠে বরুণের চোখে। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে, "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। বেশ!"

হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বের করে। ঝুলন্ত লাশের পায়ের কাছে উলটে পড়ে থাকা চেয়ারটায় দাঁড়িয়ে কয়েকটা ক্লোজ-আপ স্নাপ নেয়। মড়ার বীভৎস ভয়ঙ্কর ছবি। উসকোখুসকো রুক্ষ চুল। নগ্ন পিশাচিনীর হরিবল ছবি

পত্রিকায় পড়েছে, আজকাল ইয়োরোপে-আমেরিকায় ধর্ষণ, হত্যা আত্মহত্যা, মুণ্ডুহীন ধড়, ধড়হীন মুণ্ডু এসবের দারুণ ডিমান্ড। সাদামাটা নগ্ন ছবিতে আর তেমন উত্তেজনা পায় না মানুষ। চরম ভয়ানক কিছু চায়। ওতে থ্রিল আছে, বৈচিত্র্য আছে।

বিকৃত নগ্ন লাশের চাহিদা এদেশেও আছে। ভালো দাম পাওয়া যাবে। তবে মুখটা একটু বদলে নিতে হবে, ব্রাশ টেনে যাতে শনাক্ত করা না যায়। আবার মৃদু হাসে বরুণ।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৪৫/সংখ্যা ৭:১৩৫১]

জগন্নাথের জমি

আশাপূর্ণা দেবী

[জন্ম ১৯০৯ সালে। এ যুগের অন্যতম প্রবীন মহিলা কথাশিল্পী। উল্লেগযোগ্য গ্রন্থ: প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুল কথা, গজু উকিলের হত্যা রহস্য, ছোট ঠাকুর্দার কাশী যাত্রা, ইত্যাদি। জ্ঞানপীঠ, একাডেমি ও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত। মৃত্যু: ১৯৯৫ সালে।]

চা খেয়ে খবরের কাগজখানা হাতে নিতে যা দেরি। যথানিয়মে ধূমকেতুর মতোই এসে উদয় হল লোকটা। হাঁটু অবধি ধুলোর স্তর, খড়ি-ওঠা গা, শিরা-ওঠা হাত, খোড়োর বাড়ির চালের মতো মাথা, এবং আগাছার জঙ্গলে ঢাকা মুখটা নিয়ে। এক দৃশ্য!

দেখলে আহ্লাদ হবার কথা নয়। তীর্থঙ্করেরও হল না। তবু বলতেই হল,এই যে।

তা ধূমকেতুরও উদয়-অস্তের একটা নিয়ম থাকে,এরও আছে। উদয়ক্ষণ প্রতিটি রবিবারের সকাল, আর অস্তক্ষণ, ছুটির সকালের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে, ঘড়ির কাঁটাটাকে বারোটায় ঠেলে দিয়ে।

নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। অর্থাৎ যত দিন থেকে লোকটা তীর্থঙ্করের ঘাড়ে চেপেছে, তীর্থঙ্করের ছোটো ভাই শুভঙ্কর বলে,তা ঘাড়ে চাপা-ই। তীর্থঙ্করের ছোটো ভাই শুভঙ্কর বলে, তা ঘাড়ে চাপা-ই। ভূতের মতোই ঘাড়ে চেপে বসে আছে। তো, তুমি যে দাদা রোজায় রাজি নও। আমার হাতে একবার ছেড়ে দাও, দ্যাখো,ভূত ছাড়াতে পারি কিনা। ব্যাটাকে এই ভোলাপুরের রাস্তা ভুলিয়ে দিতে পারি।

কিন্তু তীর্থঙ্কর তাঁর ভাইয়ের এই প্রেসক্রিপশনে রাজি নন। ওই পাগল-ছাগল লোকটার মধ্যে তিনি একটা মহত্ত্ব দেখতে পান।

যদিও ওকে দেখলে গা জ্বলেই যায়। যাবে না? ঝড়ের বেগে এসেই লোকটা ওর ওই মাথাভরতি (কে জানে উকুনভরতিও কিনা) খোড়ো-চুল-সমেত মুখটা জোর করে তীর্ঙ্করের পায়ের ওপর ঘশটাতে-ঘশটাতে বলে ওঠে আবার আপনারে একটু জ্বালাতে এলুম উকিলবাবু।

তীর্থঙ্কর যে কস্মিনকালেও উকিলবাবু নন, নেহাতই একটা সওদাগরি আফিসের কেরানিবাবু মাত্র, একথা লোকটাকে বলে বোঝানো যায় নি। বোঝাবার চেষ্টায় কাহিল হয়ে গিয়েই তীর্থঙ্কর এই উকিলবাবু ডাকটাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কে যে ওর মাথায় এই ধারণাটি ঢুকিয়ে দিয়েছে, তা ও জানে আর ভগবান জানেন। তবে বদ্ধ পাগলের বদ্ধমূল ধারণা ছাড়ানো যায় না।

উকিল নই বললে, ও অক্লেশে বলে, আমি আপনারে ফীজ দিতে পারব না বলে ছলোনা করচেন উকিলবাবু। কিন্তু আমারে ঠকাতে পারবেন না।

অতএব তীর্থঙ্করই ঠকে চলেছেন। মাসের পর মাস রবিবারের সকালটি ওর পায়ে উৎসর্গ করে মরছেন।

অথচ সপ্তাহে এই একটিই তো সুখের সকাল। অন্য সব দিনই তো আটটা-পাঁচের ট্রেন ধরতে ছুটতে হয়।

আরামের আর আয়েসের জন্যে ছিল এই রবিবারের সকালটি। কিন্তু এই এক হতভাগা ছিনেজোঁক কিছুদিন যাবৎ জীবন মহানিশা করে তুলছে তীর্থঙ্করের। অথচ দূরছাই করে তাড়াতেও মন চায় না , এই এক দুর্বলতা।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? এই প্রতিটি ছুটির সকালে এসে হানা দেবার কারণ কী লোকটার?

কারণটা একান্তই হাস্যকর।

ওই চেহারা, ওই সাজসজ্জা -- লোকটা আসে নাকি তার উকিলবাবুর কাছে একটা উইল লেখাতে। হ্যাঁ আবেদনপত্র-টত্র নয়---উইল!

কোথায় কোন্‌খানে নাকি ওর একটা জমি আছে, সেটাকে সে কোনো সৎকাজে দান করে দিয়ে যেতে চায়। তাই এই উইলের বায়না।

গুছিয়ে বসে বলে,বউ নাই, ছেলে নাই, ভাই নাই, বুন নাই, কার তরে রেখে যাব বলেন? অ্যাঁ? তো,একটা সৎকাজের জন্যেই রেখে যাওয়া ভালো। কী বলেন? অ্যাঁ?

এখন মুশকিল এই, সেই সৎকাজটি পর্যাপ্তপরিমাণে সৎ হচ্ছে কিনা, সেটাই তার অহরহ চিন্তাভাবনাব বিষয়। একখানা খসড়া লিখিয়ে নিয়েই, আবার সারা সপ্তাহ চিন্তাভাবনা করতে থাকে। আর, পরেব ববিবার সকাল হলেই ছটফটিয়ে ছুটে আসে, আগের উইলের খসড়াটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন একটা লেখবার জন্যে।

এই পাগলামির তালে তাল দিয়ে চলতে হচ্ছে তীর্থঙ্করকে। তবে কেন হচ্ছে, সেটাও আর-একটা চিন্তাভাবনার বিষয়। কে জানে,উদারতা, না চক্ষুলজ্জা! তবে, এসে হাজির হলেই, হাতের খবরেব কাগজখানা পাশে সরিয়ে রেখে তাপ-উত্তাপহীন গলাতেই প্রশ্ন কবেন,আবাব কী হল? অ্যাঁ?

আজও ওই কথাটাই বলে উঠলেন তীর্থঙ্কর পা-দুখানাকে ওর মাথার তলা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে।

লোকটা মাটিতে বাবু গেড়ে বসল। বলল, ওই তো বললুম, আবার জ্বালাতে আসা! গেল হপ্তাব উইল খানা তো বদলের দরকার।

কী মুশকিল!

তীর্থঙ্কর বললেন, আরে বাবা, অনেক বারই তো বদল করলে --

লোকটা মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা করলুম বটে। তো, আসলে কী জানেন? জমিখানা য্যাখন একটা সত্যিকার সৎকর্মেই লাগাব ঠিক করেছি, ত্যাখন একটু ভালোমতো ভেবেচিন্তে করাই উচিত নয় কি? কী বলেন, অ্যাঁ? এই যে -- গেল হপ্তায় জমিখানা একটা লাইব্রেরির জন্যে দেওয়ার কথা হল --

তীর্থঙ্কব অসহিষ্ণুভাবে বলেন, কথা হল কেন? ঠিকই তো হল? দস্তুবমতো সবটি লেখা হল, তোমার টিপছাপও দেওয়া হল --

হ্যাঁ, টিপছাপই।

যদিও উইল তৈরির বয়ানটা সে গড়গড়িয়ে বলে যায়, এবং কথার মাঝখানে-মাঝখানে হঠাৎ-হঠাৎ বেশ এক একটা সাধু শব্দও প্রয়োগ করতে পারে, তবে ওই টিপছাপের উর্ধ্বে যায় না।

বেশ গড়গড়িয়ে বলে চলে,আমি শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ চক্রোবর্তী অদ্য সজ্ঞানে সুস্থো দেহে লিখিতেছি যে আমার নিজস্বো যে জমিখানা আছে---

এই আদালতি ভাষাটা যে সে কোথা থেকে রপ্ত করেছে কে জানে,তবে বলেও তো। কিন্তু নামটি স্বাক্ষরের সময় বলে ওঠে, দ্যান, আপনার কালির দোয়াতটা দ্যান অ্যাকবার, টিপছাপটা বসিয়ে রাখি। ব্যাস, কোনো একদিন কোর্টে গিয়ে রেজিসটিরিং করিয়ে আনার ওয়াস্তা। এই শেষ!

গেল সপ্তাহেও বলে গেছে একথা। আবার এ সপ্তাহে এই আবির্ভাব।

রাতভোর সমিস্যের তাড়নায় ঘুমাতে পারি নাই, উকিলবাবু। ভাবতেছি যে জমিখানা তো জগা লাইবেরিতে দিল ; কিন্তু পরে ভবিষ্যতে যদি পাড়ার পাঁচটা মস্তান ছেলে সেখানে আড্ডাখানা বসায়, বিড়ি-সিগরেট খায়, লাইবেরির বইপত্তর ছেঁড়ে, হারায়, তবে তো জগার দানটা অসৎকর্মেই গেল।

তীর্থঙ্কর হেসে ফেলে বলেন, তা উইল তো কার্যকর হবে তোমার মৃত্যুর পরে হে। তুমি তো আর দেখতে আসছ না!

অ্যাঁ! কী বললেন!

লোকটা রুষ্ট হল, ক্ষুব্ধ হল, উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, দেখতে আসব না বলে ভেতরে একটা দায়দায়িত্বো নাই? বিবেকবুদ্ধি নাই? বর্তোমানের ছেলেছোকরাঁদের মতি বুদ্ধি দেখছেন তো? ভবিষ্যতে আরো-কি নিদি হবে বুঝছেন না? না না, লাইবেরির চিন্তা ছাড়ুন আপনি, উকিলবাবু। ওটা আপনি ছিঁড়ে ফ্যালেন।

শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ চক্রবর্তীর উইলের খসড়া তীর্থঙ্করের ড্রয়ারেই সুরক্ষিত থাকে। জগন্নাথের ভাষ্য -- জগা কোথায় থাকে, কোথায় না থাকে, প্যাঁটরা-বাকসের বালাই নাই, তো উইল নিয়ে-নিযে কোথায় বেড়াবে? ওটুকুরে আপনি গুছিয়ে রেখে দিন। রেজিসটারি-কালে আপনারেই য্যাখোন যেতে হচ্ছে।

অন্য অনেক দিনের মতো, আজও, তীর্থঙ্করের ড্রয়ার থেকে একখানা রোল-করা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বার করা হল, ছেঁড়া হল। অতঃপর আর-একখানা নতুন কাগজ টেবিলে বিছানো হল।

তীর্থঙ্কর বললেন, তা দেখো জগন্নাথ, তোমার সেই আগের সপ্তাহের ইচ্ছেপত্রটিই তো ভালো ছিল। ওটাই বজায় রাখো। হাসপাতালে দান করার থেকে সৎকাজ আর কী আছে।

জগন্নাথ ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠল, এটা আবার অ্যাখোন নতুন করে কী বলবেন উকিলবাবু! হাসপাতালের বিবরণ তো জানা হয়ে গেছে। হাঁসপাতালে জগোতের যত অনাচার, কেলেঙ্কার আর পাপচক্রো না? রুগীতে ওষুদ পায় না, পত্যি পায় না, আরো কতো দুর্নীতি। না না, হাসপাতালের চিন্তা ছাড়ুন আপনি।

যেন তীর্থঙ্কর সত্যিই চিন্তা করে মরছেন।

এখন তীর্থঙ্কর একটু রাগ-রাগ গলায় বলেন তা, তোমার তো বাপু কিছুতেই মনঃস্থির হচ্ছে না, গোড়ায় তো বেশ বলেছিলে -- একটা শিবমন্দিরের জন্যে জমিটা দিয়ে দেবে। ভালোই হত। পুণ্যকর্মই হত একটা।

বুজলাম পুণ্যকাজ, জগন্নাথ বিরস গলায় বলে। কিন্তু এটা তো দেখছেন, আমাদের এই দেশখানায় গাঁয়ে গঞ্জে যেখানে সেখানে কতো কতো শিবমন্দির হাড়মুড় ভেঙে পড়ে আছে, না পুজোপাঠ, না কিচ্ছু। তো, আপনারা আর দেখবেন কোত্থেকে! রেলে যাওয়া, রেলে আসা। এই জগার মতোন হাঁটা যে পিথিবী চযতেন তো টের পেতেন। তা, শিবমন্দিরের অবস্থা দেখে ও ইচ্ছে ছেড়েছি। যাক গে, আপনিই একটা ভালোমতো ব্যবস্থা দিন।

ওইরকমই বলে, কিন্তু অন্যের ব্যবস্থা নেয় না।

তীর্থঙ্কর আর নতুন গাড্ডায় পড়তে চান না, তাই তাড়াতাড়ি বলেন, আগে-আগে তো বাপু ভালো ভালো ব্যবস্থাই হচ্ছিল, বলেছিলে, কোনো একটা ইসকুলবাড়ির জন্যে জমিটা দেবে -- বেশ ভালো-ভালো কথাই বলেছিলে -- শিক্ষার বড়ো জিনিস নেই; জ্ঞানের আলোকহীন মনিয্যিজীবন বিগ্রহহীন মন্দিরের তুল্য।

আজ্ঞে, সে তো নিজ্জস। বলতেই তো হবে, এই যে হতভাগা জগা -- জ্ঞানবুদ্ধি নাই বলেই না এমন দশা। শিক্ষাই মূলাধার।

তবে আর মন বদলালে কেন?

জগা উঁচু হয়ে বসে।

কেন -- সে কথাটা আবার অ্যাখোন সুদোচ্চেন?

শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ চক্রবর্তীর কোটরে-বসা চোখ দুটোয় ফস করে দুটো দেশলাইকাঠি জ্বলে ওঠে। আগুনঝরা গলাতেই বলে, বর্তোমানে শিক্ষাবিভাগে কতো দুর্নীতি, আপনারা জানেন না? খপোরের কাগজে পড়েন না রাতদিন। এসব কথা তো হয়ে গেছে সিদিনকে। তো, এই দুর্নীতির ক্ষেত্রে জমিটা উচ্ছুগু করব? তো, চেয়েটেয়ে না দেখে হুট করে অপাত্রে কন্যেদানের মতোন দান করে বসব?

তীর্থঙ্কর হতাশ গলায় বলেন, তা একটা কিছু ঠিক করে ফেলো। আর কতদিন চলবে?

জগন্নাথ এই স্বর শুনে হঠাৎ যেন চমকে ওঠে। বলে, কাজটায় আপনি ব্যাজার হন, উঁকিলবাবু?

এরপর তীর্থঙ্করকে তাড়াতাড়ি বলেই উঠতে হয়, না না সে কী কথা! তুমি একটা মহৎ কাজ করতে চাইছ -- এটা তো আহ্লাদের বিষয়। তবে কিনা --

কথার মাঝখানেই জগা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে তাই বলেন, আপনি নিজে মহোৎ মানুষ, বিষয়টা বুজছেন। আর-পাঁচজনা তো শুনতেই চায় না, দাঁত বার করে হাঁসে। তো,একটা কিছু ঠিক এবার আমি করে ফেলেছি। গতো রাত্তিরে, ভেবে-ভেবে ঘুম নাই, তো সহসা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলুম। এটাই ফাইনাল।

ফাইনাল? গুড! তীর্থঙ্কর উৎসাহে মুখর -- বলো শুনি তোমার সিদ্ধান্ত।

জগন্নাথ একটু নড়েচড়ে বসে, বলতেছি তো আগে বরোং চাটুকু খেয়ে --

চা এখানে জগন্নাথের অবশ্যপ্রাপ্য পাওনা। বাড়ির লোকেবা জগন্নাথ সম্পর্কে যতই বিরক্তি পোষণ করুক, গেরস্থবাড়ির ধর্মটা তো লঙঘন করতে পারে না। করলে তীর্থঙ্কর ক্ষুণ্ণ হবেন, সেটাও জানা।

চা এসে গেল বাড়ির খুদে কাজের ছেলেটার হাত দিয়ে। সঙ্গে যথারীতি একবাটি মুড়ি আর কয়েকটা ফুলুরি। ছুটির সকালে সেটা ভাজা হয়ে থাকে।

মুড়ির বাটিতে হাত দেবার আগেই চা-টা ঢকঢকিয়ে খেয়ে নিয়ে জগন্নাথ উদ্দীপ্ত গলায় বলে ওঠে, অনেক ভেবে দেখে ঠিক করলুম, মনিষ্যির জন্যে কিছু করার দরকার নেই, সেটা নিহাতই তেলা মাথায় তেল ঢালা। তাদের জন্যে চাদ্দিকে কতো ব্যবস্তা, কতো আয়োজন। জমিটা আমি পথকুকুরদের জন্যে উছছুগু করে যাব।

শুনে তীর্থঙ্কর হাঁ — কাদের জন্যে?

বললুম তো, পথে-ঘুরে-বেড়ানো বেওয়ারিশ নেড়ি কুকুরগুলোর জন্যে। আহা, তাদের জন্যে ভাববার কেউ নাই। জলে ঝড়ে দুর্দশার শেষ নাই, কাঠফাটা রোদে হাঁপিয়ে মরে। যেখানে যাবে দূরদূর ছেইছেই। অথোচো পোষা কুকুরের কতো আদর সোহাগ, ওদের দুঃখু দেখে প্রাণটা ফাটে। তো,ঠিক করেছি, ওদের জন্যে একটা আস্তানা গড়ে, ওইসব অভাগাদের আছুয় দেওযাব --

তীর্থঙ্কর অসতর্কভাবে বলে ফেলেন, শেষ পর্যন্ত রাস্তার নেড়ি কুকুরদের জন্যে!

এ অসতর্কতাব ফল সঙ্গে-সঙ্গেই পান তীর্থঙ্কর। জগন্নাথ ঠিকরে ওঠে, কেন নয়, উকিলবাবু? ওরা ভগোমানের সিষ্টো জীব নয়? ওদের দুঃখু-দুর্দশা দেখতে পান না? কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী সকল প্রাণীকেই ভগোমান গত্তো-টত্তো খোঁড়বার বুদ্ধি দিয়েছে, ওদের দেয় নাই। তবে? ওদের দিকটা দেখাই তো বেশি দরকার। তা, মানুষের আক্কেলটি দেখবেন — যাকে পুষব তার জন্যে গদি-বিছানা, মাংস-ভাত, আর যেটা পথে ঘুরে মরছে, তাকে দূরদূর, এই চিন্তাতেই —

তীর্থঙ্কর খুব সামলে নিয়ে সাবধানে বলেন, তা বস্তুত বলেছ, ওদের কথা কে ভাবে! ঠিক! খুব ভালো সিদ্ধান্ত।

এই তো! এই তো জ্ঞানী-গুণী মানুষের কথা। তো, এটাই গে আপনাব শেষ খাটুনি, লিখে ফেলেন চটপট -- আমি শ্রীযুক্ত বাবু জগোন্নাথ চক্রবর্তী অদ্য সজ্ঞানে সুস্থো শরীলে --

তালভঙ্গ ঘটে।

যে লোক সাতজন্মে এ সময় এ ঘরে ঢোকে না, সে হঠাৎ ঢুকে পড়ে। ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে ওঠে, ভালো! ভালো! জগন্নাথবাবু তাহলে এত দিনে দানধর্ম করতে সত্যিকার সৎপাত্রের সন্ধান পেলেন। তো, গুনতিতে তো ওরা দুটি-চারটি নয়। ওদের জন্যে আশ্রম বানানো তো অনেক বিশাল ব্যবস্থা দরকার।

পাগল-ছাগল বলে কি জগন্নাথ বোকাসোকা? তা বলে তো নয়। কথাটা শুনেই বিরস গলায় বলে, আশ্রমের কথা তো বলি নাই ছোটোবাবু, একটা আছুয়ের কথাই হচ্ছে --

আহা, ও একই কথা। আশ্রয় আর আশ্রম। তা লাগবে তো বেশি। জমিটা আপনার

ক বিঘে, ক কাঠা?

এ প্রশ্নে জগন্নাথ বিচলিত হয়। আর সেটা ঢাকতেই অধিক উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, সে হিসেব জগোন্নাথ জানে? সময়কালে কোটকাচারির লোক এসে মাপজোপ করে নেবে।

আহাহা! ঈশ! জগন্নাথবাবু!

শুভঙ্কর ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে, নিজের জমির মাপ জানা নেই? তা, জমিটা কোনখানে, সেটা জানা আছে তো? দেখিয়ে দিলে এখন থেকেই --

তীর্থঙ্কর তাঁর ভাইকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কাজ হয় না। শুভঙ্কর আজ বোধহয় বদ্ধ পরিকর হয়েই রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছে। তার মুখে হাসির ঝিলিক।

কই হে, বললে না? জমিটা কোথায়? এই ভোলাপুরেই তো? নাকি আর কোথাও?

জগন্নাথ ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বলে, এই ভোলাপুরে ? জগন্নাথ ভোলাপুরের মানুষ? কবে কখন ঘুরতে-ঘুরতে ছিটকে এসে পড়েছে --

ওঃ তাও তো বটে! তবে জানতে পারলে ভালো হত। আশ্রমের কাজ শুরু হয়েযেতে পারত। সময় লাগবে তো!

জগন্নাথ সহসা গম্ভীর হয়।

বলে, একটা কথা মনে রাখছেন না ছোটোবাবু, উইল কার্যোকরী হয় মিত্যুর পর।

'মিত্যুর পর! এই সেরেছে' ও জগন্নাথ, তুমি বেঁচে থাকতেই জমির হদিস মিলছে না, তো পরে কী হবে? হদিসটা জানা থাকলে কার্যকরী করার সুবিধে হত,

তীর্থঙ্কর তাড়া দিয়ে বলে ওঠেন। শুভো, তোর বাজার সারা হয়েছে?

সে এ ইশারা গায়ে মাখে না। বলে ওঠে, ভালো করে ভেবে দেখো দিকিনি, জগন্নাথ, কলকাতার গড়ের মাঠটাই তোমার নয়তো? নাকি, হাওড়া ময়দানটাই তোমার?

জগন্নাথের চোখে আগুন ঠিকরোয়।

পাগল আর শিশু ব্যঙ্গে যতটা অপমানাহত হয়। সহজ বয়স্ক মানুষ বোধহয় ততটা হয় না ক্রুদ্ধ গলায় জগন্নাথ বলে ওঠে, ছোটোবাবু কি আমার সঙ্গে মশকরা করছেন? আমি আপনার মশকরার যোগ্য?

কী মুশকিল! মশকরা কেন? শুধু তো জানতে চাইছি। জমিটা তোমার এই পৃথিবীতেই আছে তো? নাকি আকাশে-টাকাশে --

ছোটোবাবু! কোটরে-বসা চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসে। তার সঙ্গে একঝলক জল।

এই কথাটা বললেন আপনি? জগার জমিখানা আকাশে আছে! তার মানে---নাই, কেমন? অবিশ্বাস! তো, অ্যাতো বড়ো বিশ্বেবম্ভান্ডে জগার একখন্ড ভূমি নাই ? এই কথাটা মানতে বলেন আমায়? পাগল-ছাগল মানুষ, বিত্তান্তটা গুলিয়ে ফেলেছি, দলিলপত্তরের হিসাবটা নাই, তাই বলে জমিটাই নাই? পিথিবী থেকে অ্যাকেবারে আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছেন?

ময়লা ধুতির কোণটা তুলে চোখের কোণটা একটু মুছে নিয়ে বলে, জগা ব্যাটা হতোভাগা বলে কি অ্যাতোই হতোভাগা যে ভগোমান তাবে সিষ্টি করে নিঃসম্বোল শূন্যে ছুঁড়ে দেছে?

অ্যাকখন্ড ভুমির বরাদ্দো রাখে না? বলি, এই পিথিবীখানার মানুষপিছু মাটির বরাদ্দো নাই তার? চুলচেরা হিসাব নাই? জমিখান আছেই নিজ্জস কোনোখানে। হক্কের ধন যাবে কোথায়? আপাততো খুঁজে পাচ্ছি নে, সেটাই দুকখু, জেবনভোর তো খুঁজে মরছি। না পেলে? তাই বলে হ্যানোস্তা দেখিয়ে, নাই করে উড়িয়ে দিতে হবে? আপনারা শিখ্যিত মানুষ, এই আপনাদের বিচার? বলি, জমিটুকু তো জগা বেচে খেতে চায় নাই, অ্যাকটা ভালো কাজেই দিয়ে যেতে চায়। চেরোটা কালই তো ট্যাঁক গড়ের মাঠ, কখনো ভিকিরিকে একটা কানাকড়ি দিতে পেরেছে জগা? থাকার মধ্যে ওই জমিটুকুন, সেটুকু নিয়েই নাড়াচাড়া। তো, দলিলখানা দেখাতে পারছি নে বলে ঠাট্টা, মশকরা সন্দ! ধুত্তোর পিথিবী! থাক উকিলবাবু, উইলে আর কাজ নাই আমার! শিকখা হয়ে গেছে।

সটান হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, টেবিলে সদ্য-বিছানো কাগজটা ফস করে টেনে নিয়ে ছিঁড়ে কুচিয়ে মেজেয় ছড়িয়ে ফেলে গটগট করে বেরিয়ে যায়। পায়ের ধাক্কায় মুড়ির বাটিটা ছিটকে গিয়ে মুড়ি ছড়াছড়ি হয়ে যায়। মুড়ির একটি দানা মাটিতে পড়ে গেলে যে কুড়িয়ে খায়, বলে, মা নোকখি, ফেলতে নাই।

তীর্থঙ্করের চোখটা জ্বালা করে ওঠে। মাথা ঝুঁকিয়ে সেই ছড়ানো মুড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বসে থেকে অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন, মানুষ এমন অকারণ নিষ্ঠুর হয় কেন? অহেতুক হিংস্র!

তীর্থঙ্কর বুঝে ফেলেছেন, পাগলা জগাকে আর কোনোদিন এই ভোলাপুরের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে না।

হয়তো আর কোনোখানে ছিটকে গিয়ে তার ন্যায্য পাওনার জিনিসটা খুঁজে বেড়াবে—খড়ি—ওঠা গা, শিরা-ওঠা হাত, খোড়ো চালের মতো মাথা আর হাঁটু পর্যন্ত ধুলোর স্তর নিয়ে। যেটা সে একটা সত্যিকোর সৎকাজে লাগাতে উইল করে যাবে।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৪৫/সংখ্যা ৮ : ১৩৫১]

যৌবন-নিকুঞ্জে

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

[১৯৩৩ সালে খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: শাহ্জাদা দারা শুকো, কুবেরের বিষয় আশয়, ঈশ্বরীতলার রূপকথা, হাওয়াগাড়ি, ইত্যাদি। একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত।]

তেজোময় নামটা পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগে আগে আধুনিক ছিল। বেশ ছিমছাম, চাই কি চোখে-চশমা—আটাশ থেকে পঁয়ত্রিশের ভেতর কোনো সুবেশ যুবাকেই বোঝাত। প্রেমময়, তেজোময়, মনোময়—এখন এইসব নামের লোকেরা রীতিমতো রিটায়ার্ড। বছর পাঁচ-ছ হল তারা সকালের কাগজ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে। সবার মাইনে বাড়ছে। ডি এ বাড়ছে। সরকার আমাদের পেনসন বাড়াবে না?

এই তেজোময়—ওর পদবী মজুমদার। আসলে ওরা সান্যাল—মজুমদার—নবাবি আমলের পাওয়া টাইটেল। এখনো কিন্তু দীপ্তি হারায় নি। সে তার তিন বছরের দাদুভাইকে কোলে নিয়ে রাসবিহারীর মোড়ে এসে দাঁড়াল। ডিসেমবরের বিকেল। ড্যামপ রোদ তার মাথার রুপোলি জায়গাগুলোকে সবে ঝকমকে করে তুলছিল—এমন সময় নাতি চেঁচিয়ে বলল, ট্যাকসি।

সঙ্গে-সঙ্গে তেজোময়ের একখানা হাত উঠে গেল। অজানতেই। এইভাবেই সে চাকরিজীবনে ট্যাকসি থামাত। এই রাসবিহারীর মোড়ে। উঠতি বয়সে এ জায়গাটাতেই একদম তার নিজের ঘোরাফেরা ছিল। ওই পানের দোকানটায় দু-খিলি একসঙ্গে নিয়ে গুনগুন করে সুর ভাঁজতেন সুধীরলাল। পাশেই দোকানে তাঁর রেকর্ড।

তখন মোড়ে দাঁড়ালে একটা রাস্তাকে সে মাঠের পোল পেরিয়ে আদিগঙ্গা পেরোতে দেখত। সে রাস্তার বাঁ হাতে দেশবন্ধুর স্মৃতিমন্দির। আরেকটা রাস্তা চলে যেত লাইন বুকে নিয়ে একদম ট্রামডিপোয়, যার একদিকে রেসকোরস, আরেক দিকে গলফ ক্লাবের মাঠ—কচুরিপানায় ঢাকা নির্জন-নির্জন দীঘি। কবরখানা।

এর ঠিক উলটো রাস্তায় আশুতোষ কলেজ। যেখানে দুপুরবেলার ক্লাসে বন্ধু—শ্রীহরির দোকানের চা—লবঙ্গবসানো লবঙ্গলতিকা। অনারস্ ক্লাসে সকালবেলার কলেজ থেকে আসা বান্ধবী। বেণী, খোঁপা, রহস্য।

আজও রাস্তাগুলো সেই-সেই রাস্তাতেই আছে। তবে যৌবনের রাস্তাটাই কেমন গা-ছমছম-করানো। কোন্ দিকে যাব? ট্যাকসিওয়ালার এ কথায় হুঁশ হল তেজোময়ের। কোন্ দিকে যাব দাদুভাই?

তিন বছরের দাদুভাইয়ের পক্ষে এ জায়গাটা খুব রঙিন। কারণ, চারদিকেই নানা রঙের

উলে বোঝাই দোকান। তার ওপর ফুলকপির সিঙাড়া কড়াইশুঁটির কচুরির আবির্ভাব ঘোষণা করে লালসালু দুলছিল মোড়ের মাথায়—শীতের বাতাসে হেলে-হেলে।

সে ট্যাকসিতেই বেজায় খুশি। তার ওপর একজন লম্বামতো লোক তাকে কোলে নিয়ে মতামত জানতে চাইছে। কচি নাতিটি নবীন দাদুর কোলে দু-পা ছুঁড়ে একটা ঝটকা খেল। তলো-তলো দাদু—মানে—চলো। এখুনি চলো , দেরি করো না আর—

তেজোময় মজুমদার বলল, চলো ভাই--চলো—

কোন্ দিকে? বলবেন তো—?

গাড়ির ইনজিনটা ছোট্ট ক্রোনোমিটারের নীল কাঁটার সঙ্গে থরথর করে কাঁপছিল। অস্থির সারথির বয়স বড়ো জোর তেইশ। কাঁচা শিখ। তেজোময় মনে-মনে দুবার বলল—ঠিক এই বয়েসটায়—এই বয়সেই—

মুখে বলল, হরিশ মুখারজিসে চলিয়ে—

গিয়ার খুলে অবলীলায় বাঁক নিল ড্রাইভার। নিশ্চয় ভবানীপুরে জন্ম। একদম বাঙলায় কথা বলে।

হরিশ পারক, এলগিন মোড়, পি-জি পেরিয়ে ভিকটোরিয়ার খিড়কি।

রোখকে—রোখকে—

ব্যাস!

হ্যাঁ ভাই। এমনি ঘুরতে চায় তো বাচ্চারা—

আপনার ছেলে আছে?

এই তোমার বুদ্ধি !—বলতে-বলতে গাড়ি থেকে নামল তেজোময়। একটু দঁড়াবে ভাই? এখুনি ফিরে যাব।

ওনেক ট্যাকসি পাবেন। সোময় নেই। ছেড়ে দিন হামাকে।

ভিকটোরিয়ার পেছন দিয়ে বেঁটে গেট পেরিয়ে ঢোকার সময় নাতি থমকে দাঁড়াল। বেঁটে পাঁচিলের গায়ে বাঁকানো ডান্ডার মাথায় জ্বলন্ত আলো জ্বলছে। সূর্য ডুবুডুবু। ঝাঁকড়া গাছের মাথা ফুঁড়ে তার আলোর লাঠি অন্ধকার ঘাসে বিঁধে আছে। আর সামনে একটা বিশাল সাদা বাড়ি।

বাড়ি? দাদু? কাদের?

ইনডিয়ার দিদিমার। এক-এক সময় এই খোকাটির সঙ্গে তার রসিকতার ইচ্ছে হয়—সামলাতে পারে না তেজোময়।

কার দিদা?

তেজোময় তখন মনে-মনে বলছিল, আমার ভালোবাসা ভাঙার বাড়ি। এখানেই আমার ভালোবাসা আছাড় খেত। আমি নতুন বয়সে ভিজে বর্ষার ভ্যাপসা গরমে প্রেমে পড়েছি, তখন আমি পাটভাঙা ধুতি পানজাবি পরি, শীত এসে জমে উঠলে এই বাড়িটার বারান্দায় আমার সেইসব ভালোবাসা ভেঙে যেত। প্রেমে বেড়াতে বেরিয়ে এই বাড়িটার সিঁড়িতে এসে বসেছি কত বার।

কারও দিদা নয়, দাদুভাই।

বলো না কার দিদা—

কারও না, দাদুভাই। এমনি বলেছি।

যুক্তি কোনো শিশুই মানে না , মনোমত জবাব না পেয়ে তেজোময়ের কোলে নাতিটি ঝচকা খেতে লাগল। সঙ্গে সেই এক কথা—কার দিদা?

কিছুটা এগিয়ে তেজোময় একটা বেনচে বসল। তার একদিকে দুজন মহিলা বসে। বেনচের সামনে একটা বেঁটে কলের মুখ শুকনো পাতায় ঢাকাপড়ার জোগাড়। হয়তো এক সময় ওখান থেকে বাগানে জল দেওয়া হত।

সন্ধ্যা হয়-হয়। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের বাইরে অন্ধকার-হয়ে-আসা রাস্তায় আলো জ্বেলে আলো নিভিয়ে গাড়িরা ছুটছে। নানা স্পীডের ছুটন্ত সব ফলা। মাঝে-মধ্যে ছুটন্ত মিনিবাস। তারই এক পাশে খুব চেনা ভঙ্গিতে দাঁড়ানো বিবেকানন্দর স্ট্যাচু। মুখের ওপর আলোর ফোকাস।

মহিলা দুজন বিড়বিড় করে কথা বলছিল। বোধহয় অবাঙালি। কলকাতায় নতুন এসে ঘুরে-ঘুরে সব দেখতে বেরিয়েছে। অন্ধকার হবার পর এ শহরে কোথায় বিপদ হতে পারে তা এদের জানা নেই।

এমন সময় তেজোময়ের নাতি আবার জানতে চইল, কার দিদা? বলো না দাদু--

আর অমনি তেজোময়ের পাশের মহিলা দিব্যি পরিষ্কার গলায় গেয়ে উঠল—

আমি বেধ্‌বা হয়েছি

কিশমিশভরা বানরুটি খাব

আমি দারজিলিঙ বেড়াতে যাব

আমি যে বেধ্‌বা হয়েছি

চমকে উঠে দাঁড়াল তেজোময়। খনখনে কাঁপা গলায অন্ধকার সন্ধেবেলায় এ কী গান? তায বাঙালি।

পাশের মহিলা পরিষ্কার বাঙলায় বোঝাচ্ছিল, হ্যাঁ, খাবে। নিশ্চয় খাবে। কেন খাবে না? চলো। এইবার আমরা উঠি।

ভয় পায় নি তেজোময়ের নাতি। সে ঠান্ডা গলায় বলল, দিদার কী হয়েছে, দাদু?

এ গলা এত পরিষ্কার---এত চিকন---যে কারও কানের একদম তলায় গিয়ে পৌঁছবে, তাই গান-গেয়ে-ওঠা মহিলা আবার ঘুরিয়ে গাইল--তেজোময়ের নাতিকে শোনাতেই ---

কিশমিশভরা বানরুটি খাব

আমি দারজিলিঙে বেড়াতে যাব

পাশের মহিলা বলল, হ্যাঁ খাবে। খাবে তো বললাম--- তাতে এই খনখনে গলায় গান যেন পেয়ে বসল ঃ

দারজিলিঙ বেড়াতে যাব

যত ইচ্ছে বানরুটি খাব

নাতি-কোলে-দাঁড়িয়ে-পড়া তেজোময় বুঝল, বিধবার বারণ বানরুটি খাবার বড়ো ইচ্ছে মহিলার। আহা! খেতে দিলেই পারে। হয়তো মাথার ঠিক নেই। পৃথিবীসুদ্ধ কত জায়গায় কত লোক হামেশা পাগল হয়ে যাচ্ছে। যে পাগল হয়—তার কষ্ট। যাদের লোকজন পাগল হয়—তাদেরও কষ্ট।

পাশের মহিলা বলল, এবার ওঠো মা। আমরা ফিরব।

দাদুর কোলে বসে নাতি সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল। শুনছিল। সে এবার বোবা হয়ে গেল। সে তার নিজের দিদার মতো শাড়িপরা কাউকে এভাবে অন্ধকারে গাইতে দেখে নি কোনো দিন।

তেজোময় উঠে দাঁড়িয়ে সরে আসছিল পায়ে-পায়ে। এমন জায়গায় এরকম গানে নাতির মনে চাপ পড়তে পারে।

গান গাইতে-গাইতে ভদ্রমহিলা বাগানের দিকে ছুটে গেল।

আর সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, পড়ে যাবে। গর্ত আছে, মা—আবার পা ভাঙবে।

কিন্তু সে কথা শুনল না মহিলা। মাথার সাদা এলোচুলে দু-ধারে ডানা মেলে রোগা একটা বড়ো কোনো পাখি অন্ধকারে ঝাঁপ দিল—অন্ধকার চিরে।

মহিলার মেয়ে ছুটে এসে তেজোময়ের সামনে দাঁড়াল। এ তো এক অদ্ভুত অবস্থা। তিন বছরের নাতি তেজোময়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে দু-হাতে—ভয়ে। মেয়েকে মহিলাই বলতে হয়—এই ঊনচল্লিশ থেকে একান্ন-বাহান্ন-যে-কোনো একটা বয়স হবে, কাঁদছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। তার মা অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে কোথায় পড়ল কে জানে, পাতাবাহার, অজানা সব গাছের আড়ালে তারকাঁটার বেড়া থাকে। তাতে লটকায় নি তো। কিংবা কিছুতে হোঁচট খেয়ে এমন পড়াই পড়েছে—হয়তো ব্যথায় একদম অজ্ঞান।

ধরুন তো—বলে তেজোময় নাতিকে মহিলার মেয়ের দিকে এগিয়ে দিল।

নাতি যাবে কেন? সে কুঁকড়ে তেজোময়ের বুকেই ঘিরে আসছিল।

চোখে জল। তবু হাসি এনে মহিলা দু-হাত বাড়াল। এসো—

অবিশ্বাসের চোখে নাতি সে হাতে ধরা দিল। তেজোময় দেখল, সে নিজেও এবড়ো-খেবড়ো জায়গায় ঠিকমতো পা ফেলে এগোতে পারে না। বেমক্কা পা পড়লেই মুচকে যায়। অন্ধকারে তার চোখও তো ঠিকমতো দেখতে পায় না।

তাই গাছের পাতা খানিকটা সরিয়ে এগোতে গেল। তার মুখে এসে গেল—এমন সময় কেউ কি বেড়াতে আসে! তার ওপর আপনার মা যখন সুস্থ নন—

নাতিকে আঙুল দিয়ে দূরের কী একটা দেখাতে দেখাতে মহিলা বলল, আজ অফিস যাই নি—তাই ভাবলাম ঘুরিয়ে আনি মাকে —বেরোলে মনটা ভালো হবে—

এসব কথা শুনতে-শুনতেই তেজোময় একখানা আধলা ইঁটে পা রেখে টলে পড়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে একটা ডাঁটো কামিনীর ঝাড় খুঁটি ধরার কায়দায় ধরে ফেলে সে দাঁড়িয়ে

থাকতে পারল। তখনই তেজোময় দেখতে পেল—বিবেকানন্দ স্ট্যাচুর আলোয়—সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

মরে যায় নি তো! সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হল তার— কোনো বিপদে জড়িয়ে যাচ্ছি না তো।

খুব সাবধানে মহিলার মাকে পাঁজাকোলে তুলে বেরিয়ে আসছিল তেজোময়। ভীষণ হালকা।

সামনেই মহিলার মেয়ে তেজোময়ের নাতিকে কোলে নিয়ে আকাশেরই কিছু দেখাচ্ছিল আর এটা ওটা কথা বলছিল। তেজোময়ের মনে পড়ল —হ্যাঁ, ঠিক এই সময়টাতেই কলকাতার আকাশে তারা ফোটে। আরেকটু বাদেই চাঁদও এসে পড়বে।

মহিলার মেয়ে তখন জানতে চাইছিল, তোমার দাদুর নাম কী?

নাতি কী একটা বলল। কিন্তু তা শোনা হল না মহিলার। তেজোময়ের কোলে নিজের মাকে ওরকম অবস্থায় দেখে নাতিকে নুড়িছড়ানো রাস্তায় ধপ করে নামিয়ে দিয়ে ছুটে এল।

তেজোময় হাঁপাচ্ছিল। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে এমন একটা ঘটনায় সে কাউকে তুলে আনতে পারলে নিশ্চয় শিভালরির ঘাম খানিকটা তার কপালে ফুটে উঠত, এখন সে স্রেফ চাপা গলায় বলল, বেঁচে আছেন—

ওই বেন্‌চটায় শুইয়ে দিন—

মেয়ে হয়েও নিজের মাকে ঠিক ওভাবে কোলে নিতে পারল না মহিলা। ভিকটোরিয়ার মাঠটা যেখানে আলো পায় নি—সেখানে অন্ধকার একদম কালো। তেজোময় দম নিয়ে মহিলার মাকে বেন্‌চে শুইয়ে দিল। দিতেই উঠে বসল সে। আর সেই একই গান:

আমি দারজিলিঙে যাব

বানরুটি খাব

ও আমি বানের কিশমিশ

খুঁটে-খুঁটে খাব

অত বড়ো একটা সাদা বাড়ির পেছনে অন্ধকারে এমন কাঁপা-কাঁপা গলায় গান—সেই সঙ্গে শীত—দুজন দুই বয়সের মহিলা বেড়াতে এসে কাঁহাতক আটকে গেছে—মেয়ের ঘরের নাতি তেজোময়ের কোলে উঠবে বলে দু-হাত বাড়িয়ে দিলে—মেমোরিয়ালের সাদা সিঁড়িগুলো এইমাত্র চাঁদের আলো পেয়ে জ্বলে উঠেছে।

শুনুন—

তেজোময় ঘুরে দাঁড়াল।

আমি মাকে এখান থেকে তুলতে পারছি না।

তাহলে ট্যাকসি ডেকে আনুন—

ডাকলেও সেই দূরে রাস্তায় দাঁড়াবে।

একটু সুস্থ হলে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলবেন আপনার মাকে—বলতে-বলতে তেজোময়

দেখল, তার কোলে নাতি রীতিমতো বুঝদার হয়ে পড়েছে এই কয়েক মিনিটে। কোনো আবদার নেই। একটুও দাপাদাপি করছে না। যেন অবস্থা বুঝে সে শান্ত হয়ে পড়েছে!

মায়ের মেয়ে পরিষ্কার গলায় বলল, এখানে এখন ট্যাকসি পাওয়া যায় না। কথাটা খুবই ঠিক। আর মেয়ে যদি-বা ট্যাকসি ডাকতে যায়ও--মা হয়তো অন্ধকারে আবার ছুট দিয়ে গিয়ে সামনের দিককার একটা পুকুরে গিয়েও পড়তে পারে। কিংবা এবার হোঁচট খেয়ে পড়লে আর হয়তো উঠতেই হবে না।

মেমোরিয়ালের সামনের দিকে তবু নিজের গাড়ি করে লোকজন বেড়াতে আসবে, তাই কিছু পাবলিক ওদিকটায় সব সময় থাকে। কিন্তু এদিকটা তো একদম ফাঁকা। চাই কি ট্যাকসি ডাকতে গিয়ে মেয়ের হাতঘড়ি কানের দুল ছিনতাই হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু তেজোময় দেখল, সে-ই বা এ অবস্থায় কী করতে পারে। নাতি হয়তো এখুনি বিগড়ে যেতে পারে। যে-কোনো একটা বায়না ধরল বলে। কিন্তু নাতি তো কোনো বায়না ধরছেও না। তখন তেজোময় মজুমদার এই অদ্ভুত অবস্থায় মনে-মনে নিজেকে বলল, দেখা যাক— সঞ্জীবচন্দ্রের মতো একটা বাণী বানানো যায় কিনা—

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে—

তেজোময় এইভাবে তার বাণীটি সাজিয়ে মনে মনে খুশিই হল--

বিপদে শিশুও বুঝদার।

এর জুড়ি একটা লাগসই লাইন খুঁজতে গিয়ে তেজোময় বুঝল এখন বাণী বানানোর উপযুক্ত সময় নয়। নয়তো—পথি নারী বিবর্জিতা জাতের কথাগুলো তার মনে বেশ চাগাড় দিয়েই ভেসে উঠছিল।

সে মহিলার মেয়েকে দেখতে-দেখতে বুঝল,এ উনচল্লিশ নয়। নির্ঘাত আটচল্লিশ কিংবা একান্ন। শরীর আর মন—দুটোই অব্যবহারে অব্যবহারে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতে পেরেছে। তার নিজের মতো এই মেয়েটি সন্তানসন্ততিতে জড়িয়ে বা ছড়িয়ে পড়ে নি বোধহয়।

সে ফস করে বলে উঠল, তুমি কি দীপা?

নাঃ। মাকে ধরাধরি করে ওই সিঁড়িটায় শুইয়ে দিলে--

তেজোময় দেখল---তার মানে এখন তাকে আবার মহিলাকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে যেতে হয়। সে বুঝল, লম্বা চাকরি-জীবনে সময়মতো ডাকঘরে টাকা রেখে এলে রিটায়ারের পর যে নিশ্চিত সুদের অন্ন হয়— তার সবটাই সাফল্য বলে ভুল করা ঠিক নয়। এর কোথাও পুরনো, ব্যথায় বিঁধে-থাকা তীর একা-একা তিরতির করে কাঁপে। তখন কোলের নাতিকে নামিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

মেমোরিয়ালের সব সিঁড়িই এখন শ্বেত। কারণ, ধাপে -ধাপে এখন চাঁদের আলো। তার একটাতে মহিলাকে শোয়াতেই তেজোময় দেখল, মেয়ের মা খোলা চোখে চেয়ে আছে। গালে মাংস নেই। শরীর বলতে শুধু কাঠামোটা। সব জায়গায় হাড় জেগে। দু-চোখের ভ্রু বুঝি-বা কোনো টুপির এগিয়ে-থাকা কারনিশ--চোখ এতটাই গর্তে।

মহিলা তেজোময়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। সাদা চুলে ঢাকা মুখখানা তো ডিম। সে ভয় পেয়ে পিছিয়ে এল।

মহিলা তাতে খ্যা-খ্যা করে আরও বেশি করে হেসে উঠল। ভয় কি খোকন! আমি তোদের দারোগা-মাসি।

চমকে উঠল তেজোময়। সত্যিই তো তার ডাকনাম খোকন। এখন এ নাম জানার কথা শুধু মা-মাসিদের। দীপার বাবাই তো দারোগা ছিলেন। সেই সুবাদে ওর মাকে সবাই দারোগা-মাসি বলত। বিশুর ছোটো বোন দীপা। অথচ দীপাই একটু আগে বলল—সে দীপা নয়।

দীপার কোল থেকে নাতি তার দাদুর কোলে চলে এল। তেজোময় বুঝল, এখন আর তার তেজোময় হয়েই বা কী লাভ! খেল খতম। পয়সা হজম। দীপাই বা কেন আজ আর দীপা হয়ে থাকতে চাইবে, বয়সকাল চলে গেল। ইচ্ছেগুলো সব আজ বুড়ো। তাতে আর কোন তেজ নেই। তবে সে আর কেন শুধু-শুধু তেজোময় হয়ে থাকে।

দারোগা-মাসি তো ঠিক চিনতে পেরেছে। তেজোময় মজুমদার ঝুঁকে তাকিয়ে পিছিয়ে এল। আর কিছুক্ষণ এই ঠান্ডা শ্বেত পাথরের সিঁড়িতে শুয়ে থাকলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া। দারোগা-মাসি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। আকাশটা হিম। আকাশটা নীল। দীপা একটু দূরে দাঁড়িয়ে মাথাটা নীচু করে চোখ মুছছে।

পাছে নাতি এইসব দেখে ভয় পায়--কিংবা এসব দেখে ওর মন খারাপ হয়—তাই তেজোময় পিছিয়ে এল। কিন্তু পিছিয়ে এসেও একেবারে সরে আসতে পারল না। এইসব সাদা পাথরে সে নিজেই কত বার বসেছে। যেমন---

সন ইং ১৯৫১ শীতকালে। নবেমবর ডিসেমবর হবে। বেলা সাড়ে তিনটে।

সেদিন দীপা ওখানটায় বসে ছিল। অফিস-কাটা চেহারা দীপার। ঝাঁঝিয়ে উঠল, কী বলতে ডেকে আনলে বলো। নতুন চাকরি--এভাবে আমার বেরিয়ে আসা ঠিক নয়।

তুমি তো আর চিরকাল চাকরি করবে না!

কে বলল, খোকনদা? চাকরি তো আমায় করতেই হবে। তোমার বন্ধু বিশুদা বিয়ে করে আলাদা। বড়দা বদলি হবার পর নিজের ফ্যামিলি নিয়ে ব্যস্ত। বাবা নেই। নীচের ভাই দুটো অপোগণ্ড। আমি চাকরি না করলে মাকে দেখবে কে? নাও, কী বলবে বলো---

এত তাড়াতাড়ি এসব বলা যায়, দীপা?

তাহলে ভাবো বসে-বসে।

আমি জানি দীপা--- তোমার সময় নেই কেন। তোমার বড়োবউদির ভাই কৃষ্ণবাবু এলে তোমার সময়ের অভাব হয় না।

ঠিক ওই গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে দীপা ঘুরে তাকাল, ঈর্ষা খুব হেলদি জিনিস, খোকনদা। এতে যদি তোমার কিছু উন্নতি হয়। আজকাল হজমের ওষুধ খাচ্ছ?

এমন সময় দারোগা-মাসি আবার চেঁচিয়ে ডাকল, অ খোকন—তোর মা তোদের সারা জীবন বেলপোড়া খাওয়াত, তোর মা আমার খুব বন্ধু ছিল।

একথাটাও সত্যি। অন্তত দশ-পনেরো বছর কোনো দেখা নেই। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের কথাও ঠিক মনে আছে। এ মানুষকে পাগল বলবে কে?

যে বলেছিল—সে দীপা নয়—সেই দীপাই বলল, আমি সারাদিন অফিসে থাকি। বাবলু আর ডল সারাদিন টো-টো কোমপানি। মা একা থেকে-থেকে পাগলের মতো হয়ে গেছে—

বাবলু আর ডল এখনো টো-টো করে?

হুঁ। একজন চল্লিশ, একজন তেতাল্লিশ। কোথায় যেন কি করে। একজন সারা মাসের রেশন তোলে। অন্যজন দুধ আর খবরের কাগজের দাম দেয়।

বিয়ে করেছে?

নাঃ, নিজেদেরই চালাতে পারে না।

বিশু আসে?

ভাইফোঁটার দিন দেখা দেয়। খোকাটি তোমার মেয়ের ঘরের ছেলে ?

হুঁ। বড়ো মেয়ের বড়ো ছেলে।

কতটুকু দেখেছি ওর মাকে ।

ঠিক এই সময় দারোগা-মাসি আমার সেই গান ধরল—

আমি বেধ্‌বা হয়েছি

আমি দারজিলিঙে যাব

আমি বানরুটি খাব

ভেতর থেকে কিশমিশ বেছে খাব—

দীপা এগিয়ে এসে ঠান্ডা গলায় বলল, হ্যাঁ খাবে। নিশ্চয় খাবে, এবারে ওঠো। আর দৌড়োদৌড়ি করে না—

দারোগা-মাসি তবু উঠল না।

দীপা জানতে চাইল, বাবার লাস্‌ট পে সার্টিফিকেট তুলে রেখেছি যত্ন করে। কাগজপত্তর দেখালে কি উইডো পেনসন পাওয়া যাবে?

শেষ তো এস-পি ছিলেন জলপাইগুড়িব?

হুঁ।

দীপার এই সায়-দেওয়া থেকে পরিষ্কার মনে পড়ল তেজোময়ের--দারোগা-মাসি--তখনো বিশুর বাবা দারোগাই ছিলেন--এখন থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ঠিক এমনভাবে দোতলার বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়ে থাকতেন। একদিন সে সময় মফঃস্বল শহরের আকাশে জ্যোৎস্না উঠেছিল। ঘরের ভেতর বসে দারোগা মেসো কে সি দে-র রেকর্ড দিচ্ছিলেন কলের গানে। সে গানে একটা কথা ছিল--চাঁপাবনে-এ-এ।

ভারি গমগমে গলা কে সি দে-র। গানটার দোলায় কী এক মিষ্টি ঘূর্ণি ছিল। কে যেন ভালোবাসার ভেতর চু-কিত-কিত-কিত দিতে-দিতে ঝোঁক নিয়েই অন্যদিকে ঘুরে গেল, কিছু না বুঝে সেদিনকার দীপা মাদুরে বসে একমনে রান্নাবাটি খেলছিল। ছবিটা আজও ভোলে নি তেজোময়।

দীপার সঙ্গে আমার যৌবনের ভাঙাকপালে জায়গাটায় সেই দারোগা-মাসিই এখন শুয়ে। বোধগম্যি হারিয়ে। ওই সিঁড়িতে আমি বসেছি—তাও তো তিরিশ বত্রিশ বছর আগে।

দীপার দিকে তাকিয়ে ফস করে হেসে ফেলল তেজোময়। তখন আমি ডিসপেপসিয়ার রুগি—

সময়টা ঠিক ধরে নিয়ে দীপা বলল, হুঁ, বড় ভুগতে ।

মুখে এসে গিয়েছিল তেজোময়ের— সেজন্যেই আমার ওপর ডিপেনড করতে ভরসা পাও নি। আসলে আমি ভুগে-ভুগে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমরা পাস দিয়ে চাকরির অ্যাপ্লাই করছি- আর তুমি শাড়ি ধরেই সুন্দরী হয়ে উঠছিলে—

তেজোময় বলে বসল, আমি তখন পালাজ্বরে ভুগতাম।

দীপা চুপ করে থাকল।

দারোগা-মেসো সন্ধেরাতে কে সি দে-র 'চাঁপাবনে' এ-এ গানটা কলের গানে ফিরিয়ে-ফিরিয়ে চাপাচ্ছে। আমি বিশুদের পোড়ো ইজিচেয়ারটায় শুয়ে-শুয়ে বুঝতে পারছি—এইবার আমার জ্বর আসছে। একটু পরে বমি আসবে। দারোগা-মাসি মাদুরে শুয়ে আকাশে তাকিয়ে। আমাদের মফঃসল শহরের আকাশে তখন জ্যোৎস্না উঠেছে। জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি—দারোগা মেসো রেকর্ড চাপিয়ে দিয়েই কাঁটাচামচে একটা ডবল ডিমের হলদে ওমলেট চেপে ধরল বড়ো সাদা প্লেটে। দীপা, তুমি তখন মাদুরের কোণে বসে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে রান্নাবাটি খেলছ। এর অনেক অনেক পরে তুমি শাড়ি ধরেই আমাদের চোখে সুন্দরী হয়ে উঠলে। তখন তোমরা—আমরা সবাই কলকাতায়। আমাদের মফঃসল শহরটা ওদেশে পড়ে থাকল। আমরা পাস দিয়ে চাকরির অ্যাপ্লাই করছি।

দারোগা-মেসো গোল সাদা বড়ো প্লেটের ওপর হলদে রঙের বিশাল একটা ডবল ওমলেট কাঁটাচামচে চেপে ধরেছেন। খাবেন বলে হাঁ করে মুখে এগোনো। কে সি দে-র গলায় চাঁপাবনে-এ-এ। দারোগা-মাসি আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে। পোড়ো ইজিচেয়ারটায় আমার জ্বর চেপে ধরল। চোখ ছোটো হয়ে আসছে। একটু পরে অজ্ঞান হয়ে যাব। বড়ো সাদা প্লেটে হলদে রঙের বিশাল ডবল ওমলেট।

প্রায় পঞ্চাশ বছরেও এ ছবি আমি ভুলি নি।

তেজোময় বলল, গত বছর তোমাদের ছোটোবেলার বাড়িটা পাসপোর্ট করে দেখে এলাম।

বাড়িটার কথা শুনেছি, আমার কিছু মনে নেই, আমি তো তখন খুব ছোটো।

দোতলার বারান্দা ঘর-সব-ঠিক তেমনই আছে।

মাকে বোলো। ওই সময়টার কথা মা শুনতে খুব ভালোবাসে।

তেজোময় গায়ের চাদরখানা তুলে নাতির মাথায় ঘোমটা করে চাপিয়ে দিল। দিয়ে নিজেকেই বলল, আমারও যে একটা সময় এখানে পড়ে আছে। মেমোরিয়ালের ওই সিঁড়িতে।

ওঁকে দারজিলিঙ ঘুরিয়ে আনলে পার।

গত দশ বছরে তিন-চার বার নিয়ে গেছি। গিয়ে সেই এক বায়না। বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে প্রথম জীবনে নাকি কোন্ সাহেবি বেকারির বান খেয়েছিল। সেই রুটি খাওয়াতে হবে তাকে।

তোমার কাঁধের স্টোলটা ওঁর গায়ে দিয়ে দাও।

কিছু রাখবে না গায়ে। মাথা গরম বলে আজকাল বাবলু আর ডল ঘটি ঘটি ঠান্ডা জল ঢালে--তবে মা ঠান্ডা হয়।

তুমি একে ধরো। আমি ওঁকে রাস্তা অব্দি নিয়ে যাচ্ছি।

এবার নাতি কিন্তু তার দাদুর কোল থেকে দীপার কোলে যেতে রাজি হল না। সে কুঁকড়ে তেজোময়ের কোলেই বেশি করে মিশে যেতে থাকল। ছোট্ট অবুঝ ছেলে--কত কাল কোলে নেওয়া হয় না। নিজের নাতিকে অন্যের কোলে দিতে কার ভালো লাগে। বিশেষ করে নাতির গায়ে যদি একরকমের গরম আর গন্ধ থাকে--যা নাকি নিজের বাবা হওয়ার প্রথম দিকটা মনে করিয়ে দেয়।

ঠিক আছে। তোমার মায়ের একটা দিক তুমি ধরো। আরেকটা দিক আমি ধরছি। শক্ত করে ধরবে কিন্তু। এখন ছুট লাগালে আমি কিন্তু আর ছুটতে পারব না। একরকম যৌথ আকর্ষণে দারোগা-মাসি উঠে দাঁড়ালেন। গায়ে জোর নেই। তেজ আছে। মাংস নেই। হাড় আছে। আহ্লাদ পোয়াবার লোক নেই। তীব্র স্মৃতি আছে দারোগা-মাসির।

সামনে বিবেকানন্দর স্ট্যাচু। আরও এগিয়ে রাস্তার ওপারে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যালের কাচের জানলা। পেছনে পড়ে থাকল ইনডিয়ার দিদিমার বাড়িটা।

আমি বানরুটি খাব

আমি দারজিলিঙে--

দীপা আর গাইতে দিল না মাসিকে। ধমকে উঠল, শুধু নিজের-নিজের কথা! লজ্জা করে না এই বয়সে!

আহা। চুপ করো তো।---বলেও থামাতে পারে না তেজোময়।

আমি বা-আ-আ-ন রুটি-ই খা-আ-ব

চুপ করো, মা। খোকনদার নাতিকে একবার তো কোলে নিতে পারতে---

নাতির মুখে তাকিয়ে দারোগা-মাসি থমকে দাঁড়াল। সামনেই চিন্তিত গাড়িগুলো খুব অঙ্ক কষে নিজেদের পাশের গাড়িকে ওভারটেক করছিল। দারোগা-মাসি ফিক করে হাসল। রাগ করিস নে খোকন। স্নেহ-ভালোবাসা নাতিনাতনি অব্দি যায়। নাতির ঘরে পুতি অব্দি আর ওসব গড়ায় না। এ তোদের হবে দেখবি---

ও কী কথা মা?

যা সত্যি তাই বললাম। ---বলেই নিজের মেয়ের দিকে তাকাল দারোগা-মাসি। আরেট্টা কথা বলি। সেদিন খোকন যদি এট্টু চাপাচাপি করত--- তাহলি তোর বিয়ে হয়ে যেত খোকনের সঙ্গে--। খোকন তা তো করে নি সেদিন।

---মা--এর বেশি আর চেঁচাতে পারল না দীপা। তেজোময় বুঝতে পারল না---দারোগা-মাসি এখন পাগল-পাগল অবস্থায়? না, সুস্থ? তবু ঠান্ডায় চোবানো এই অদ্ভুত সন্ধেরাতটা তার ভালোই লাগতে লাগল।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৪৫/সংখ্যা ১১: ১৩৯১]

গাহে অচিন পাখি

ইমদাদুল হক মিলন

[জন্ম ১৯৫৫ সালে। বাংলাদেশের লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : দুঃখকষ্ট, প্রিয় নারী জাতি, তুমি কেমন আছো, ভালোবাসার গল্প, প্রেমের গল্প, ইত্যাদি। জনপ্রিয় সাহিত্যিক। ইকো সাহিত্য পুরস্কার, হুমায়ুন কাদির সাহিত্য পুরস্কার প্রভৃতি নানা সম্মানে বিভূষিত।]

হাওয়ায় কী একটা ভাজা-পোড়ার গন্ধ ওঠে। ভারি মনোহর। সেই গন্ধে মাছচালার ধুলোবালি থেকে মুখ তোলে বাজারের নেড়িকুত্তাটা। তারপর প্রথমেই তার প্রভু পবন ঠাকুরকে খোঁজে। নেই। গন্ধে আর প্রভুর টানে কুত্তাটা তারপর উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে পুরোনো কালের রোঁয়াওঠা,মদ্দা শরীরখানা টানা দেয়। তখন দেখে , দূরে খাদ্যি খাওয়ার দোকানটার সামনে প্রভু বসে আছে। গন্ধটাও সেদিক থেকেই আসছে।

কুত্তাটা তারপর কিছু না ভেবে গন্ধের দিকে, প্রভুর দিকে ছুটে যায়।

আমার বাপে আছিলো ডাকাইত। বিকরামপুবের বুড়া মাইনষের মুকে হোনবেন কেষ্ট ঠাকুরের নামডাক। মাইনষে কইতো কেষ্টা ডাকাইত। যাগ বয়েস পাঁচ কুড়ি ছয় কড়ি। আমার বাপের নামে হেই আমলে গেরস্তরা রাইত্রে গুমাইতো না। রাইত্রে বিচনায় হুইয়া পোলাপান কানলে বউ-ঝিরা কইতে কেষ্টা আইলো। কেষ্টার নামে পোলাপানও ডরাইতো। কান্দন থামাইতো,গুমাইয়া পড়তো। গেরামে গেরামে মাইনষে চকি দিত। দল বাইন্দা। কেষ্টারে ঠেকাও। অইলে অইবো কী, কাম অইতো না. বাপে আমার ঠিক ঐ মাইনষের মাথায় বাড়ি মারতো। সবর্বশান্ত করতো। দিবেননি কত্তা একখান আমিত্তি?

লতিফ ময়রা খুব মনোযোগ দিয়ে রসে-ডোবা আমৃত্তি তুলে মাটির ঝাজরে রাখছিল। ঝাঁজরের নীচে বসানো একখান বালতি। আমৃত্তির রস চুইয়ে-চুইয়ে পড়ছে তাতে।

লতিফ বসে আছে মাটি থেকে হাতখানেক উঁচু একটা চৌকির ওপর। তার ডানদিকে. দোকানের ভেতর মিষ্টির আলমারি। ওপরে দুটো র‍্যাকে সাজানো চমচম বালুশাই কালোজাম সন্দেশ আমৃত্তি আর গজা। আর নীচের র‍্যাকে পেতলের বিশাল গামলায় রসে-ডোবা রসগোল্লা. লালমোহন আর ছানার আমৃত্তি। সারাদিনে সতেরো বার আলমারির কাঁচ মোছে লতিফ। পদ্মার জলের মতো ঘোলা কাঁচ। একটার এককোনা ভাঙা। আর দুটোতে হিজিবিজি ফাটল। হলে হবে কি, কাঁচ পালটায় না লতিফ। অযথা পেচ্ছাপ-পায়খানার মতো কিছু পয়সা বেরিয়ে যাবে। দরকার কী। ভাঙা আলমারিই কি কম দেয়!

লতিফের বাঁ দিকে দোকানের বাইরে পরপর সাজানো আঁটাল মাটির তিনখান আলগা চুলা। একখান দুমুখী আর দুখান একমুখী। দুমুখীটায় বিয়ানরাতে এসে তুলে দেয় পুরোনো কালের বিশাল একটা কেটলি। হ্যানডেলে ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় জড়ানো। তাপে-তাপে পোড়ামাটির রঙ ধরেছে।

কেটলির মুখে পাতলা কাপড় দোপাল্লা করে বাঁধা। ছাঁকনি। রাত একপ্রহর অব্দি চায়ের জল ফোটে কেটলিতে। বিয়ানরাতে একবারমাত্র পদ্মার জল আর চাপাতা ছেড়ে চুলায় ওঠায়। তাতেই রাত একপ্রহর অব্দি চলে। গাঁও-গেরামের লোকে কত আর চা খায়! তবুও পুরো এক কেটলি চা শেষ হয় লতিফ ময়রার। আর তিন-চার সের দুধ।

দুধের কড়াইটা থাকে কেটলির পাশেই। দুমুখী চুলার অন্যটায়। চায়ের গেলাস, চিনির টোফা থাকে লতিফের পায়ের কাছে। চুলার সঙ্গে। গাহাকরা চাওয়া মাত্রই কেটলিটা গেলাসের ওপর একটুখানি কাত করে লতিফ। তারপর গোল চামচের এক চামচ দুধ, ছোট্ট চামচের দেড় চামচ চিনি। হাতের মাপ বটে লতিফের। একফোঁটা দুধ এদিক ওদিক হয় না, একরোঁয়া চিনি। এ সবই অভ্যেস। বহুকালের।

লতিফের দোকানটা ছোটো। দোকানের ভেতর মিষ্টির আলমারিটা, কিছু হাঁড়ি-পাতিল,বস্তা আর চৌকিটা ছাড়া অন্য কিছু থোয়ার জায়গা নেই। গাহাকরা লতিফের বসে সব বাইরে, লতিফের দোকানের সামনেটা খোলামেলা। একদিকে লতিফের চুলাচাক্কি আব অন্যদিকে লম্বা একখানা টেবিল। পায়া নড়বড় করে তার, টেবিলের দুপাশে লম্বা দুখানা বেনচি। বেনচির গা ঘেঁষে লতিফের দোকানের দু নম্বর ঝাঁপ ঠিকনা দেয়ার বাঁশটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যটা চুলার কাছে।

সবই অনেক কালের পুরোনো জিনিসপত্র। কিছুই বদলানো হয় নি লতিফের, পাই-পাই হিসেব করে এই অব্দি এসেছে। সংসারটা ভারি লতিফের। সাতখান পোলাপান। আর-একখান আছে বউর পেটে। মাস দুয়েক বাদে নাজেল হবে। বুড়ি মা আছে। আর একটা ঢ্যাঙা বোন। কুড়ির ওপর বয়েস। বিয়ে দেওয়া হয় নি। টাকা-পয়সার অভাব।

ভোর থেকে রাত দশটা অব্দি দোকান চালায় লতিফ তারপর ক্যাশবাক্স খালি করে টাকাকড়ি বাঁধে তফিলে। দোকানে ভারি চারখানা তালা লাগায়। তারপর দেড় মাইল বিল পাড়ি দিয়ে বাড়ি যায়।

জশিলদিয়া থেকে মেদিনীমন্ডল যেতে মাঝে এক বিল। পাক্কা দেড় মাইল। চাঁদনি রাতে সেই বিল পাড়ি দিতে-দিতে লতিফ কেবল একটা কথাই ভাবে—এইদিন থাকব না, দোকানের আয় উন্নতি বাড়ব। টেকাপয়সাব অভাব মাইনষের চিরদিন থাকে না।

এই কথাটা লতিফ ভেবে আসছে,আজ সতেরো আঠারো বছর। কিন্তু দিন বদলায়। আয়-উন্নতি বাড়ে নি লতিফের। যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে সব। দোকানটা আর লতিফ নিজে। আসলে লতিফ তার জীবনের ঘোরপ্যাচটা বোঝে না। আয়-উন্নতি বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খরচাটাও যে বেড়েছে লতিফ তা বোঝে না।

এই দোকান দেওয়ার পরই বিয়ে করেছে লতিফ। মা-বোন ছাড়া আর-একটা নতুন মানুষ। তার খাইখরচা। সাধ আহ্লাদ। তারপর বছর-বছর আর-একজন করে। সাকুল্যে মানুষ এখন এগারোজন। আর-একজন নাজেল হওয়ার ফিকির করছে।

টাকাপয়সার মারটা যে এইখানে, লতিফ তা বোঝে না। এখনো আশায় আছে-এইদিন থাকব না। আয় উন্নতি বাড়ব। জীবন অন্যরকম অইয়া যাইব।

দু-একখানা বড়ো গাহাক পেলে ধারণাটা জোর পায় লতিফের। এই যেমন আজ। সকালবেলা কান্দিপাড়ার মাজেদ খাঁ আধমন আমৃত্তির অর্ডার দিয়ে গেছে। কাল সকাল নেবে। বাপের চল্লিশার মেজবানি। গোরু মারবে একখান। আর আগল-আগল ভাত। পয়সা দিয়েছে আল্লায়। আত্মাটাও বড়ো মাজেদ খাঁর। মাংস-ভাতের পর খাওয়াবে আমৃত্তি। আর অন্যদিকে সত্তর-আশি টাকার কাজ হয়ে যাবে লতিফের। সেই সুখে সারাদিন বিভোর হয়ে ছিল লতিফ। সকালবেলা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গেছে মাজেদ খাঁ আগাম। টাকাটা হাতে পেয়েই জিনিসপত্র জোগাড় করেছে লতিফ। বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে রাতে ফিরবে না। একলা মানুষ। পুষ্যি অনেক। সেই ভয়ে দোকানে কর্মচারী রাখে না লতিফ। একলাই আধমন আমৃত্তি বানাতে হবে। আধমন আমৃত্তি কি যা তা কথা! রাত কাবার হয়ে যাবে।

জিনিসপত্র জোগাড় করতেই দুপুর পার হয়ে গেছে লতিফের । তারপর একমুখী চুলো দুটো সাজিয়ে, একটায় চিনির সিরা তুলেছে। অন্যটায় তেলের কড়াই। পায়ের কাছে, ক্যাশবাক্সের সঙ্গে বড়ো একটা অ্যালুমিনিয়ামের ব্যাঁকাত্যাড়া গামলায় ময়দা, পানি আর কলাই মিশিয়ে, হাতে যখন নারকেলের তলাফুটো আইচা নিয়ে বসেছে, তখন দুপুর পার। বাজার ভেঙে গেছে। বাজারটা চালু থাকে দুপুর অব্দি। মানুষেব হল্লা-চিল্লা, দোকানিদের হাঁকডাক, আনাজপাতি-পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে থাকে । আর পচা মাছের বোঁটকা একটা গন্ধ আসে মাছ চালার দিক থেকে। এসবের ওপরে আছে বাজারের সম্পূর্ণ আলাদা চিরকালীন গন্ধটা।

সকালের দিকে আজার পায় না লতিফ। বাজার করতে এসে গেরামের গণ্যমান্য লোকেরা লতিফের দোকানে আসে চা খেতে। বরাত ভালো থাকলে মিষ্টিও খায়। এক-আধসের কিনেও নেয় কেউ-কেউ। সেই আয়ে জীবন চলে যাচ্ছে লতিফের। আজ সতেরো আঠারো বছর।

তারপর দুপুরবেলাটা সব ফাঁকা, নিটাল। জনা সাতেক স্থায়ী দোকানদার ছাড়া বাজারের নেড়ি কুত্তাটা আর পবনা পাগলা, সারা জশিলদিয়া বাজারে কেবল এক-জনই। জেলেরা যে যার ঝাঁকা মাথায় ফিরে যায়। চারপাশের গেরাম থেকে যেসব গেরস্তরা খেতের আনাজপাতি নিয়ে আসে, গোয়ালারা আসে দুধ নিয়ে--বিক্রি হলে ভালো, না হলে যে যার বস্তু নিয়ে দুপুরের মুখে-মুখে ফিরে যায়। বাজারের খোলা চত্বরে তখন পবনা পাগলা, নেড়ি কুত্তাটা আব দোকানের ভেতর আজার দোকানিরা।

বাজারখোলার পাশেই বড়ো গাঙ, পদ্মা। দুপুরের পর পদ্মার হু-হু হাওয়া এসে বাজারের ধুলোবালির গন্ধটা একটুখানি উশকে দেয়। তখন বাড়ি থেকে আনা ভাতপানি খায় লতিফ। তারপর খালি গায়ে বাবুরহাটের লুঙিপরা, মাজায় বাঁধা একটা লাল গামছা--ক্যাশবাক্সের পাশে আয়েশ করে বসে বিড়ি টানে। আজ সেই আজারটা পায় নি লতিফ। ভাতটা একফাঁকে খেয়ে নিয়েছে। তারপর বিড়ি টানতে-টানতে, আধমন আমৃত্তির মাল-সামান ঠিকঠাক করে যখন বসেছে, তখন বিকেল হয়-হয়। চার-পাঁচ খোলা আমৃত্তি তুলে ঝাঁজরের ওপর রেখেছে লতিফ, তখন দু-তিন জন গাহাক এল। গেরামের যুবক পোলাপান। তাই দেখে এক হাতে আমৃত্তি আর অন্য হাতে চা বানিয়ে ফেলে লতিফ। তারপর গাহাকদের টেবিলে দিয়ে যখন আবার

এসে চুলার পাড়ে বসে, তখন টের পায় আমৃত্তি ভাজার গন্ধে বাজারের হাজার বছরের পুরনো গন্ধটা বেপাত্তা। হু-হু হাওয়া বাজারময় বয়ে বেড়াচ্ছে আমৃত্তি ভাজার মনোহর গন্ধ। সেই গন্ধে, সতেরো-আঠারো বছরে যা হয় নি লতিফের আজ তাই হয়। পেটের ভেতরটা চনমন করে ওঠে। একখানা আমৃত্তি খাওয়ার সাধ জাগে।

কিন্তু কাজটা করে না লতিফ। একখানা আমৃত্তির দাম পড়ে এক সিকি। একদিন খেলে যদি লোভটা বেড়ে যায়! লোকসান। লোকসান হলে পুষ্যিরা খাবে কী!

এসব ভাবতে-ভাবতে আরেক খোলা আমৃত্তি তোলে লতিফ। তখন দেখে চুলার ওপারে এসে দাঁড়িয়েছে পবন ঠাকুর। লোকে বলে পবনা পাগলা। চেহারা সুরত কী শালার! ধড়খান মরা গয়া গাছের মতো। মাথাভরতি বাবরি চুল। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি গোঁফ। চোখ দুটো গর্তে। তবুও ভাটার মতো দেখতে, হাত-পা মরা ডালপালার মতো পবনার। বুকের পাসলী গোনা যায়। পেটখান দেখলে মনে হয় ফেনগালার মাইট্টা খাদা উলটো করে বসানো। তার তলায় টুটাফাটা একখানা ধুতি। জন্মের পর থেকেই পরে আছে।

মাছ চালার মাটিতে শোয় পবনা মাটিতে বসে। ফলে ধুতিটার রঙ হয়েছে বাজারের বাইলা মাটির মতো। আর পবনার গায়ের গন্ধটা বটে বাজারের হাজার বছরেব পুবোনো গন্ধটাও বাইসানি বলে পালায়। পবনা হেঁটে গেলে মনে হয়, গেবস্তর আনাজপাতির খেত থেকে খড় আর বাঁশের মাথায় পোড়া মাটির মালসা বসানো কাকতাড়ুয়া হেঁটে যাচ্ছে। গেবস্তর খেতখোলা পাহারা দেয়, ইঁদুর বাদুড় তাড়ায়।

পবনাকে দেখলে বাজারের লোকজন যায় খেপে। কুত্তা-বেড়াল খেদানোর মতো দূর-দূর করে। কিন্তু পবনাও, চিজ একখানা--কারো দোকানের সামনে গেলে কিছু না কিছু আদায় করবেই। ঘেঙটি পাড়ার ওস্তাদ। দিনরাত ভরপেট খিদে নিয়ে ঘোরে। দোকানিদের কাছে যায়। এটা নেয়, ওটা নেয়। তারপর মাছ চালাব ওদিকে, নিবালায় বসে আয়েশ করে খায়। সঙ্গে থাকে বাজাবের নেড়ি কুত্তাটা। জগৎসংসারে এই একটাই জীব, পবনার বড়ো বাধুক। পবনা নিজে খাবে যা তার একটু-আধটু কুত্তাটাকে দেয়। রাতের বেলা, পবনা যখন ধুলোবালি গায়ে দিয়ে মাছ চালায় শোয় কুত্তাটা থাকে পাশে। পাশাপাশি দুটো জীবকে একরকমই দেখায়। খোলাবাজারে যেসব গেরস্তরা আনাজপাতি নিয়ে বসে, ভালো বেচাবিক্রি হলে খুশিমনে এত-আধ পয়সা দেয় পবনাকে। পবনা তখন অন্য দোকানিদের কাছ থেকে দু-পয়সায় দু-আনার জিনিস আদায় করে। কত কাল ধরে যে এটা চলে আসছে কেউ জানে না। লতিফও না। লতিফ এই বাজারে আছে সতেরো-আঠারো বছর। তখন থেকে পবনাকে দেখে। একইরকম। ওই একখান ধুতিপরা, একরকমই চেহাবা সুরত। দিন এল গেল, লোক বদলাল। পবন ঠাকুর বদলায় নি। আরো কতকাল যে এই সুরত আব ধুতিখান নিয়ে টিকে থাকবে, কে জানে।

পবনাকে দেখে এখন এই কথাটা মনে হয় লতিফের। তারপর একটু মায়া হয়। দূর-দূর করে না তাড়িয়ে লতিফ বলল, কী রে পবনা, কই আ ছি লি হারাদিন? আইজ দিহি তরে দেকলাম না?

এই কথায় পবনা খুব খুশি। কেউ নরম গলায় কথা বললে সেখানে সে লেগে যায়।

এখনো তাই করে। লতিফের চুলার ওপারে ঝাঁপ ঠিকনা দেওয়ার ত্যারা হয়ে-দাঁড়ানো বাঁশটার সঙ্গে মাটিতে আসনপিঁড়ি করে বসে। তারপর দাঁত কেলিয়ে হাসে। আপনেরে তো হারাদিন ঐ দেকলাম কত্তা। বহুত কাম করতাছেন।

হ। ম্যালা কাম পইরা গেছে আইজ। হারা রাইতই দোকানে থাকতে অইবো।

ক্যা?

মাজেদ খাঁর বাপের চল্লিশা কাইল। আদমোন আমিত্তি বানাইয়া দিতে অইবো।

লোকের ভালো খবর শুনলে পবনা খুব খুশি হয়। যেন নিজেরই বিরাট একটা কিছু হয়ে যাচ্ছে—এমন গলায় বলল,আ-হা-হা-হা-হা। ভালাকতা,বহুত ভালাকতা। ভগমান দেউক, আরো দেউক, আপনেরে।

ঠিক তখুনি মাছচালার দিক থেকে ছুটে আসে নেড়ি কুত্তাটা। পবনার দোসর।

লতিফের গাহাকরা ওঠে এসবের একটু পরে। পয়সা দিয়ে চলে যাওয়ার পর লতিফ দেখে গেলাসগুলো টেবিলের ওপর পড়ে আছে। তার হাত আজার না। একহাতে আমৃত্তি পেচিয়ে ছাড়ছে তেলের কড়ায়ে আর অন্য হাতে রসের সিরা থেকে তুলে ঝাঁজরে রাখছে। টেবিল থেকে চায়ের গেলাস আনে কে?

লতিফ বলল, এই পবনা, গেলাসটি আন।

কেউ কোনো কাজের কথা বললে পবনা খুব খুশি হয়। ছুটে গিয়ে গেলাস এনে দেয়। দুইয়া দিমু?

লতিফ ভাবে, পবনার আতে চার গেলাস দোয়াইতে দেকলে বদনাম অইয়া যাইবো। গেরামের গইনা-মাইন্য মাইনষে তাইলে আর আমার দোকানে চা খাইতে আইবো না। এগারোজন পুষ্যি লইয়া আমি কি তাইলে না খাইয়া মরুম! ইট্টুহানি আয়াশের লাইগা দোকানের বদলাম করুম!

লতিফ ব্যবসায়ী মানুষ। মুখে এসব কথা বলে না। পবনা পাগল-ছাগল মানুষ। বাজারের নেড়ি কুত্তা। তবুও। কায়দা করে বলল, না থাউক। থুইয়া দে। আইজ আর গাহাক আইবো না। আজাইর পাইলে আমি ধুমু নে।

গেলাস কটা লতিফের পায়ের কাছে রেখে দেয় পবনা, তারপর আবার মাটিতে আসনপিঁড়ি করে বসে। একখান আমিত্তি দিবেন নি কত্তা?

শুনে লতিফ একটু বিরক্ত হয়। নারকেলের আইচায়ে তেলের কড়াইয়ের ওপর প্যাঁচিয়ে-প্যাঁচিয়ে আমৃত্তি ছাড়ে।

তুই হারাদিন খালি খাওনের প্যাচাইল পরিচ ক্যা?

এ কথায় পবনা খিকখিক করে একটু হাসে: কী করুম কত্তা, পোড়াপেটখান খালি খাই-খাই করে। আর আইজ আপনে যেই আমিত্তি ভাজতাছেন, ঘেরানে গাঙের মাছও উপরে উইট্টা যাইবো। আমি তো মানুষ ঐ। গাঙপার বইয়া আছিলাম। তহন বাজার থনে একখান বাতাস গেলো। হায়-হায়, বাতাসে খালি আমিত্তির ঘেরান। আমি পাগলের লাহান দৌড়াইয়া আইলাম।

লতিফ কোনো কথা বলে না । হাসে। আর মনোযোগ দিয়ে তেলের কড়াইয়ে আমৃত্তি ছাড়ে, আমৃত্তি তোলে।

পবনা বলল, দেন একখান আমিত্তি। ভগমান আপনের কিরপা করবো। শুনে লতিফ কেন যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে । তারপর উদাস গলায় বলে, পবনা রে, আইজ হারা রাইত আমার আমিত্তি ভাজন লাগবো, তুই এই চুলার পারেই বইয়া থাকিচ। হারা রাইত। বোজচ না একলা মানুষ হারা রাইত বইয়া ভাজম। আমার ডর করে। বাজানে কইতো আমিত্তি ভাজনের ঘেরানে বলে পরিস্তান থনে জ্বীনপরীও আইয়া পড়ে।

পবনা বলল, এই যে আপনের এহেনে বইলাম কত্তা, আর উড়ুম না, তয় একখান কতা কই আপনেরে, আইজ এই বাজারে জ্বীনপরী আইবোই। যেই ঘেরান বাইরাইছে। তামাম দুনিয়া ঘেরান পাইবো।

লতিফ কোনো কথা বলে না। এককড়াই আমৃত্তি ছেড়ে ওঠে। তারপর দোকানের ভেতর থেকে দুটো-দুটো করে আটখান মাটির পাতিল এনে চৌকির কাছে, মাটিতে সার ধরে রাখে। আড়াই-সেরি পাতিল একেকখান। নবকুমারের দোকান থেকে দুপুরবেলাই এনে রেখেছে।

দেখে পবন বলল,কয় সেইরা পাইল্লা?

আড়াই সেইরা।

কয়খান?

আষ্টখান। তুই কি নিকাশ বুজচ না? আড়াইসেইরা আষ্টখান পাইল্লা না অইলে আদমোন আমিত্তি আডে নি?

পবনা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসে। হ। তয় একখান কতা কই আপনেরে কত্তা, আমি কইলাম পুরা আড়াই সের আমিত্তি এক বহায় খাইতে পারুম। এক ঢোকও পানি খামু না। এট্টুও উড়ুম না।

শুনে ধমকে ওঠে লতিফ, বড়ো প্যাচাইল পারচ তুই। তর বাপে নি খাইছে কুনোদিন এক বহায় আড়াই সের আমিত্তি?

মাছ চালার দিক থেকে হেঁটে আসছিল আউয়াল। মুদি-মনোহারির দোকান চালায়। সারাদিন দোকান করে,সন্ধেবেলা দোকানে তালা মেরে বাড়ি যায়। রাত-বিরাত দোকানে থাকে না আউয়াল। আগে থাকত। নতুন বিয়ে করেছে, রাতের বেলা বউর কাছে না থাকলে কি ঘুম হয়?

বাড়ি যাওয়ার সময় লতিফের দোকানে একবার আসে আউয়াল। খানিকক্ষণ বসে যায়। গল্পগুজব করে। বেচাবিক্রির আলাপ। হাসি, বিড়ি খাওয়া।

আজ হাসতে-হাসতেই আসে আউয়াল। তারপর লতিফের দিকে তাকিয়ে বলে--কী কয় পাগলায়?

লতিফও হাসে। কয়, ও বলে এক বহায় আড়াই সের আমিত্তি খাইতে পারবো। একঢোকও পানি খাইবো না। উডবো না।

হালায় একটা পাগলই। বলে ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে আউয়াল। লতিফকে দেয় একখান, নিজে নেয়। তারপর বিড়ি ধরিয়ে বেনচে বসে। ওই পাগলার পো, তর বাপে নি খাইছে কুনোদিন এক বহায় আড়াই সের আমিত্তি!

তারপর আবার হাসে।

আউয়াল মানুষটা মন্দ না। ঠাট্টা-মশকরা পছন্দ করে। আর হাসতে। এজন্যে দোকানে গাহাক পড়ে বেশি আউয়ালের। দেখে অন্য দোকানিদের পোদ জ্বলে। হলে হবে কী, মুখে কেউ কিছু বলে না।

পবনা বলল, আমার বাপে পারতো পাচ সের খাইতে। এক বহায়। আমি হেই বাপের পোলা, আড়াই সের পারুম না! দিয়া দেহেন কত্তা, কেমনে খাই!

লতিফ বিরক্ত হয়ে বলল, আজাইরা প্যাচাইল পারিচ না পবনা। বয়। অন্য কতাবার্তা ক, আমার কাম আগগাইবো।

একথায় পবন একটু উদাস হয়। ফাঁকা, শূন্য চোখে আকাশের দিকে তাকায়। তাকিয়ে থাকে। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে বলে, আমার বাপে আছিলো ডাকাইত। বিকরমপুরের বুড়া মাইঁনষের মুকে হুনবেন কেষ্ট ঠাকুরের নাম। মাইনষে কইতো কেষ্টা ডাকাইত। যাগ বয়েস পাঁচ কুড়ি ছয় কুড়ি। আমার বাপের নামে হেই আমলে গেরস্তরা গুমাইতো না। রাতে বিছানায় হুইয়া পোলাপান কানলে বউ-ঝিরা কইতো কেষ্টা আইলো। কেষ্টার নামে পোলাপানও ডরাইতো। কান্দন থামাইয়া গুমাইয়া পড়তো। গেরামে গেরামে দল বাইন্দা মাইনষে চকি দিতো। কেষ্টারে ঠেকাও। অইলে অইবো কি, কাম অইতো না। বাপে আমার ঠিক ওই মাইনষের মাতায় বাড়ি মারতো, সব্বর্শান্ত করতো, দিবেন নি কত্তা একখান আমিত্তি?

পবনার শেষ কথাটা কেউ গায়ে মাখে না। লতিফ মনোযোগ দিয়ে ঝাঁজরের ওপর আমৃত্তি তোলে। আউয়াল বিড়ি টানতে-টানতে বলে তর বাপে আছিলো ডাকাইত। মাইনষের মাতায় বাড়ি মাইরা টেকাপয়সা, মালসামান লইতো। আর তুই নেচ বিক্কা কইরা। বলে আবার সেই গাহাকভোলানো হাসি হাসে।

পবনা বলল, এইডা অইলো গিয়া কত্তা বরাতের খেইল। ডাকের কতা আছে না--চোর-ডাকাইতের গুষ্টির অন্ন জোটে না, আমার অইছে হেই দশা।

তারপব ফুরুক করে মুখের ভেতর লালা টানে। কত্তা, দিবেন নি একখান। পেট্টা পুইরা গেলো।

লতিফ কথা বলে না। বলে আউয়াল, ওই পবনা, পারবি তুই আড়াই সের আমিত্তি খাইতে? এক বহায়?

কন কী কত্তা? পারুম, হাচাই পারুম। দিয়া দেহেন না।

যদি না পারচ?

না পারলে আপেনেরা বিচার করবেন।

কী বিচার করুম?

যা আপেনেগ মন লয়।

আউয়াল মানুষটা আমুদে, পবনার কথায় হঠাৎ ভারি ফুরতি হয় তার। যদি তুই এক বহায় আড়াই সের আমিত্তি খাইতে পারচ, আমিত্তির দাম তো আমি দিমুঐ আবার কাইল থনে আমার দোকানে তর খাওন-থাকন ফিরি। যতোদিন তুই বাচবি। আর যদি না পারচ তাইলে এই বাজার থনে আইজঐ তরে বাইর কইরা দিমু। কুনুদিন এহেনে আইতে পারবি না। ক, রাজি আছ চ নি?

পবনা ফুর্তিতে ঘাড় কাত করে। ফুরুক করে মুখের ভেতর লালা টেনে নেয় আবার। এক বহায় তো খামুঐ। একঢোকও পানি খামু না। উড়ুমও না।

লতিফ এসব কথা খেয়াল করছিল না। আধমন মিষ্টির অর্ডার। ষাট-সত্তর টাকারি কাজ। ওই একটা চিন্তায়ই সে মগ্ন। দিন বুঝি তার বদলায়।

আউয়াল বলল, হুনছো নি লতিফ?

লতিফ আনমনে বলল, কী?

পবনা যুদি এক বহায় আড়াই সের আমিত্তি খাইতে পারে, তয় আমিত্তির দাম তো আমি দিমু ঐ, আবার কাইল থনে আমার দোকানে অর থাকন খাওন ফিরি।

আউয়াল মৃদু হেসে বলল কী কচ পবনা?

হাচাঐ কই কত্তা। দিয়া দেহেন না।

আউয়ালের কেন যে এত উৎসাহ। বলল , খাড়া, মানুযজন ডাক দেই। বলেই চেঁচিয়ে আশপাশের দোকানিদের ডাকে। ও মিয়ারা আহেন ইদিকে। কাম আছে।

শুনে লতিফ হাসে। আর ভেতরে-ভেতরে খুব খুশি। আরো আড়াই সের আমৃত্তি বুঝি বিক্রি হয়। দশ-বারো টাকার কাজ।

আউয়ালের হাঁকডাকে দু-তিনজন আজার দোকানদাব এসে জোটে। কী অইলো আউযাল মিয়া?

আউয়াল মহাফুর্তিতে ঘটনাটা বলে। শুনে কাশেম বলল, কী কচ পবনা? হাচাঐ পারবি? নাইলে বুজিচ বাজার ছাড়তে অইবো, এহেনে আর কুনুদিন আইতে পারবি না,

পবনা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসে। আমি কি আপনেগ লগে মশকরা করতাছি নি?

এবার কথা বলে লতিফ। বুইজ্জা দেক পবনা আড়াই সের আমিত্তি এক বহায় খাওন খেলা কতা না।

পবন বলল, আমি বুইজ্জাঐ কইতাছি।

আউয়াল বলল, আবার বোজ।

বুজছি, বুজছি, দিয়া দেহেন।

এবার উত্তেজনা বেড়ে যায় আউয়ালের। লতিফের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলে,আড়াই সের আমিত্তিমাইপা দেও, লতিফ। টেকা আমি দিমু।

লতিফ তো মহাখুশি। তবুও মুখে কী একটা বলতে যায়, তাকে থামায় কাশেম।

তোমার কী লতিপ বাই, দেও। ইট্টু কষ্ট কইরা আড়াই সের আমিত্তি বেশি বানাইবা।

দাঁড়িপাল্লা হাতে নিয়ে লতিফ বলল, আমার অসুবিদা নাই। মালসামান আছে। আদাঘন্টার খাটনি। আমি চিন্তা করি পাগলার লেইগা। পবনা বলল, আমার লেইগা আপনের কুনো চিন্তা নাই, কত্তা। আপনে আমিত্তি বানান আর দেহেন পাগলায় কেমন বেবাকটি খায়।

দুপালায় সোয়াসের করে গরম আমৃত্তি মেপে,একটা মাটির খাদায় ঢেলে পবনকে দেয় লতিফ। তারপর হাসে, অহনও টেইম আছেস পবনা।

পবনার তখন দিকবিদিকের খেয়াল নেই। হাতের সামনে গরমাগরম আড়াই সের আমৃত্তি। সবগুলোই তার। একলা খাবে। কতকালের সাধ। সাধ পূরণের যে কী সুখ, পবনা ছাড়া পৃথিবীর আর কে তা এই মুহূর্তে জানে!

প্রথম আমৃত্তিটা মুখে দিয়ে পবনা বলল, আহা কী সোয়াদ গো কত্তা। আইজ রাইতে আপনের দোকনে জ্বীন-পরী আইবোই।

একথায় লতিফ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বাপের মুখে শুনেছিল, খাঁটি মিষ্টি নিতে পরীস্তান থেকে জ্বীন-পরী আসে গভীর রাতে, দোকানের বেবাক মিষ্টি নিয়ে যায়। যত হাঁড়ি মিষ্টি নেয়,টাকা দেয় তত হাঁড়ি। ভাগ্যকুলের কালাচাঁদ একরাতে সাত হাঁড়ি টাকা পেয়েছিল। সেই টাকায় কালাচাঁদ এখন মহা ধনী। কলিকাতায় শয়ে-শয়ে মিষ্টির দোকান তার। বাড়ি,গাড়ি।

লতিফ ভাবে, আইজ রাইতে যদি হাচাঐ জ্বীন-পরি আহে আমার দোকানে, যদি আদামোন। আমিত্তি লইয়া আদামোন টেকা দেয়! ইশ, তাইলে আর কতা নাই। দিন বদলাইয়া যাইবো।

গপাগপ দশ-বারোটা আমৃত্তি খেয়ে পবনা বলল, বেশি খাওন সামনে থাকলে আমার আবার ইট্টু প্যাঁচাইল পাবতে অয়, বুজলেন নি কত্তারা , আপনেরা আইজ্ঞা করলে কই।

আউয়াল বিড়ি ধরিয়ে বলল, ক। তয় বুজিচ, বেবাক কইলাম খাইতে অইবো। ওকাল-পাকাল করতে পাববি না।

পবনা হাসে। দেহেন না কত্তা, কেমনে খাই। তারপব আর-একটা আমৃত্তি মুখে দেয়। একবার আমার বাপে গেছে চরে ডাকাতি করতে। আমি তহন পোলাপান। সাত-আষ্ট বছর বয়সে। আমাগ বাড়ি আছিলো কোরাটি গেরামে। পদ্মার পারে। অহন আর কোরাটির নামগন্ধ নাই। পদ্মায় ভাইঙা গেছে। তয় আমি করতাম কী, হারাদিন গাঙপাব পইরা থাকতাম। মায় আমারে গাঙপার থনে দইরা আইনা বাত-পানি খাওয়ায়।

পবনা আরেকটা আমৃত্তি মুখে দেয়। ততক্ষণে আরো দু-চারজন দোকানদার এসে ভিড় করেছে লতিফের দোকানের সামনে। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বেনচে বসে। সবাই হাঁ করে দেখছে পবনাকে। পবনার পাশে কুত্তাটা। আমৃত্তির লোভ তারো আছে। এর মধ্যেই বার দুয়েক ঘেউ দিয়ে ফেলেছে সে । কী ঠাকুর, আমারে ইট্টু দিবা না!

পবনা খেয়াল করে নি। সুখের সময় কে কার কথা মনে রাখে!

আমৃত্তি চিবাতে-চিবাতে পবনা বলল, বাজানে গেছে চরে ডাকাতি করতে--সাতদিন চইলা যায়, ফিরে না। কোনো সম্বাত নাই। গাঙপার আটতে-আটতে আমাব খালি বাজানের কতা মনে অয়। কাঁসার বাসনে বাত বাইরা দিলে মারে আমি জিগাই, বাজানে আহে না ক্যা মা?

মায় কয়,আইবো। বড়ো কামে গেছে।

তয় বাজানে কলম কুনোদিন ডাকাতি করতে গিয়া দুই দিনের বেশি দেরি করতো না। হে কতা ভাইবা মনডা কেমুন করে আমার। অইলে অইবো কীস পোলাপান মানুষ, মারে বেশি কতা জিগাইতে পারি না, রাইত-বিরাইত জাইগা হুনি আন্দার গরে মায় জানি কার লগে কতাবার্তা কয়। বিয়ানে কেঐরে দেহি না। মারে জিগাইলে কয়, আমি গুমের তালে কতা কই।

আবার তিন-চারটা আমৃত্তি খায় পবনা, ততক্ষণে বিকেল ফুরিয়ে গেছে, পদ্মার হাওয়ার সঙ্গে উড়ে-উড়ে আসছে অন্ধকার, দোকানে-দোকানে জ্বলে উঠেছে হ্যারিকেন হ্যাজাগবাতি। লতিফ ময়রাও যে কোন্ ফাঁকে পুরোন কালের জঙধরা হ্যাজাগটা পামপ করে, তেল ভরে, কাঁচ পরিষ্কার করে—ম্যানটেলে আগুন দিয়েছে, কেউ খেয়াল করে নি। হ্যাজাগটা এখন মিস্টির আলমারীর সঙ্গে বসে জ্বলছে। কী আওয়াজ তার। শোঁ-শোঁ। সেই আওয়াজের সঙ্গে মিলেমিশে আসছে আগরবাতির গন্ধ। সন্ধেবেলা দোকানে আগরবাতি জ্বালায় লতিফ। আজ সতেরো-আঠারো বছর। যে ধর্মের যে রীতি। হিন্দুরা দেয় ধূপ, মুসলমানরা আগরবাতি। যাবতীয় সুগন্ধই বুঝি পবিত্র!

হ্যাজাগ জ্বালিয়ে লতিফ আবার বসেছে চুলার পাড়ে। মনোযোগ দিয়ে আমৃত্তি তুলছে। পবনার চারপাশের ভিড়টা একটুও নড়ে নি। দোকানিদের কতো কাজ থাকে সন্ধেবেলা, আজ সেসব কাজের কথা কারো মনে নেই। হ্যাজাগের দিকে তাকিয়ে আবার দুখানা আমৃত্তি খায় পবনা—ছয় দিনের দিন নিশিরাইতে গুমের তালে আমি তহুনি কী,কই জানি- বহুত দূরে,কী একখানপইক ডাকতাছে। কু কু। হুইলা আমার বুকের বিতরে কেমুন জানি করে। পোলাপান মানুষ তো, কিচ্ছু বুজি না। বিয়ানে উইট্টা দেহি মনে নাই কিছু। পরদিন দুইফর বেলা, আমি আর মায় বইয়া রইছি দাওয়ায়, এমুন টেইমে একজন অচিন মানুষ আইলো। মাতায় তার আড়াই- সেইরা একখান মাইট্টা পাইলা। নতুন। মুখখান আবার বাঁশকাগজ দিয়া বান্দা, দেকলে মনে অয় মিষ্টি মাতায় লইয়া বিয়ার চলনে যাইতাছে। আমি চাইয়া-চাইয়া মানুষটারে দেহি। হেয় দেহি আমাগ বাইতঐ আহে। দেইক্কা আমি আর আমুদে বাচি না, আমাগ কুনো সজন আইলো নি। মেলাদিন বাদে আইলো দেইক্কা বুজি মিষ্টি লইয়া আইছে। মিষ্টির মইদ্যে আমিত্তি আইলো আমার জান- পরান। পাইলা দেইখা আমার লোল পইরা যায়। আহা আইজ পেট বইরা আমিত্তি খামু। কুনোদিন তো ভরপেট আমিত্তি খাই নাই। দুই-চাইরখান খাইছি। পেডের কোণাও ভরে নাই।

আউয়াল বলল, ওই, পবনা খাচ না? অহনো তো একসেরও খাইতে পারচ নাই। বেবাকটি যদি না পারচ তাইলে বুজিচ। আইজই পিডাইয়া বাজরা থনে খেদামু।

লোকে বোঝে, আড়াই সের আমৃত্তির দাম দিতে অইবো, আবার কাইল থনে পবনার থাকন-খাওন, জেদের চোটে কাজটা করেছে আউয়াল। সেই রাগে ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছে এখন। দেখে অন্য দোকানিরা খুশি হয়। ভালা হোগামারানী খাইছে হালায়। পয়সার গরম বোজ অহন।

লতিফ মনে-মনে হাসে। হোগায় গুরা কিরমি অইলে এমুনঐ অয়।

কথা বলতে- বলতে পবনা একটু আনমনা হয়েছিল। আউয়ালের খ্যাঁকানিতে আমৃত্তির কথা মনে পড়ে। আবার নতুন করে খাওয়ার লোভটা হয়। এক থাবায় দু-তিনটে আমৃত্তি তোলে পবনা। মুখে দেয়। এইভাবে চার-পাঁচবার। দেখে ভিড়টা হল্লাচেল্লা করে ওঠে— এইবার পবনা ওকাল করবো।

শুনে গর্জে ওঠে আউয়াল। লতিফের দোকানের ঝাঁপ ঠিকনা দেয়ার বাঁশটা আঁকড়ে ধরে, ওকাল করলেই পিডান আরম্ব করুম।

পবনা সেসব খেয়াল করে না। আমৃত্তির স্বাদ মুখে দিয়ে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসে। চেইতেন না কত্তা। বহেন আর দেহেন। তয় আমারে ইট্টু কতাবার্তা কওনের টেইম দিতে অইবো।

আউয়াল বলল, হেইডা তো দিচ্ছিঐ।

পবনা আবার দুটো আমৃত্তি খায়—মানুষডা করছে কী, বুজলেন নি কত্তারা, পাইল্লাখান মার পার সামনে নামাইয়া ইট্টু খাড়ায়। খরালি কাল আছিলো। কত্তা চুলার লাহান গরম অইয়া গেছে দুনিয়া । মানুষজন গাইম্মা-চুইম্মা সারা। মাজায় বান্দা আছিলো লাল একখান গামছা। খুইল্ল্যা মোক পোছে। চেহারাখান কী তার—দেকলে ভয় করে। মাতার বাবরি চুল। মোকে খাঁসির লাহান কালা মোচদাড়ি, চক্কু দুইখান শোলমাচের পোনার লাহান লাল। কইলো, ওস্তাদ আপনের লেইগা মিষ্টি পাডাইছে। হেয় আইবো সাতদিন বাদে। হুইন মায় আমার কুনো কতা কয় না। মানুষডা কুনদিকে যে চইলা যায়, আর দেহি না। তয় আমার তহন কুনোদিকে খেল নাই। মায় যেমুন বইয়া রইছিলো, তেমুনই বইয়া থাকে দেইখা আমার পরানডা আইঢাই করে। পাইল্লাডা খোলে না ক্যান মায়! বইয়া রইছে ক্যা! মোক দিয়া আবার লোল পড়ে আমার সইতে না পাইরা কাগজ ছেঁদা কইরা ভিতরে আত দেই। হায়-হায়, আত দিয়া দেহি কী, মিষ্টি কৌ! আতে দেহি বেতকাডার লাহান কী বিন্দে। উঁকি দিয়া দেহি কী, হায়-হায়, মিষ্টির নামে হারে বাইশ- পাইল্লার মইদ্যে বাজানের কল্লাডা।

বাজানের মাতার চুল আছিলো কুড়ি-কুড়ি। বেত-কাডার লাহান খাড়াখাড়া। মোকভরা মোচদাড়ি। গায়ের রঙখান আছিলো চুলার ছাইয়ের লাহান। আন্দারে বাজানের চক্কু দনইডা ছাড়া আর কিচ্ছু দেহা যাইতো না।

পাইল্লার মইদ্যে বাজানের কল্লাডা দেইক্কা, আমি পোলাপান মানুষ কিচ্ছু বুজি না। মারে কই-- মাগো পাইল্লার মইদ্যে দিহি বাজানের মাতাডা।

কী কচ? মায় আমার পাইল্লার মইদ্যে ফালাইয়া পড়ে। তার বাদে চিক্কইর মাইরা অজ্ঞেন। বুজলেন নি কত্তারা, মায় অজ্ঞেন অইয়া গেলো। হেইয়া দেইক্কা আমি চিইক্কর আরম্ব করি, আমার চিইক্করে পড়শিরা দরাইয়া আহে। ওই পবনা, কী অইছে রে ?

আমি কিচ্ছু বুজি না। কী কমু। পড়শিরা বাজানের কল্লাডা বাইর করে। তার বাদে হারা গেরামের মানুষ আইয়া ওডে আমাগ বাইতে। আসলে অইছিলো কী বুজলেন নি কত্তারা, চরে ডাকাতি করতে গিয়া ডাকাতির মাল-সামান লইয়া সাকরিদগ লগে কাইজ্জ লাগে বাজানের। হের লগের মাইনষেঐ হেরে মারে । তার কাইল্লাডা কাইট্টা আত্মীয়র বাইত মিষ্টি পাডানোর হোন আমাগ বাইত পাডাইয়া দেয়।

পবনা আবার দু-তিনটে আমৃত্তি খায়। লোকজনেরা নিজেদের মধ্যে কী-কী সব কথাবার্তা কয়, পবনার কথা শোনে কি না শোনে, বোঝা যায় না। কেবল পবনা আড়াই সের আমৃত্তি খেতে পারবে কি পারবে না, তাই নিয়ে কথা।

আউয়াল দেখে অর্ধেকের বেশি আমৃত্তি খেয়ে ফেলেছে পবনা, বাকি অর্ধেকও বুঝি খেয়ে ফেলবে, যেভাবে কথা বলে আর খায়—বেজায় লোকসান হয়ে গেল আউয়ালের। কেন যে চালাকি করে আগে সময় বেঁধে দেয় নি, এখন পবনা যদি সারারাত বসে আস্তে-ধীরে খায় আর কথা বলে! একথা ভেবে ভাবনায় পড়ে যায় আউয়াল। পবনা যদি সারারাত বসে খায় তাহলে তো তারও সারারাত বসে থাকতে হবে। ওইদিকে নতুন বউ বিছানায় শুয়ে সারারাত এপাশ-ওপাশ করবে। সকাল-বেলাও বাড়ি ফেরা যাবে না। দোকান। যেতে-যেতে কাল সন্ধ্যা। তখন বউ থাকবে মুখ ভার করে। কথাই বলবে না। তার ওপর নতুন বউর শরীরের স্বাদ, আহা, দুনিয়ার যাবতীয় মিষ্টি দ্রব্যের চেয়েও মিষ্টি। সেই কথা ভেবে মাথা খারাপ হয়ে যায় আউয়ালের। খেঁকিয়ে বলে, ওই পবনা, হবিরে কর, তর লেইগা কি হারা রাইত বইয়া থাকুম নি!

একথায় পবনা একটু ব্যাজার হয়। এমুন কলম কতা নাই কত্তা। আমি কইছি এক বহায় খামু। বান্দা টেইম দেই নাই। আপনে খালি দেখবেন, আমি না খাইয়া উডি নি। তাহলে যা মনে লয় করবেন।

লতিফ ততক্ষণে ছ-সাত সের আমৃত্তি ভেজে শেষ করেছে। মাঠির ঝাঁজরটা এখন আমৃত্তিতে ভরা। না সরালে পরের খোলা নামাবে কোথায়?

এই ভেবে লতিফ তার টিনের দাঁড়িপাল্লা টেনে নেয়। গামছা দিয়ে মোছে, তারপর সোয়াসের ওজনের দুখানা বাটখারা একপাল্লায় আরেক পাল্লায় আমৃত্তি মেপে নতুন পাতিলে রাখতে থাকে, এক-একটায় দুপাল্লা করে। মাপতে-মাপতে বাইরেও চোখ রাখে। বাইরে আড়াই সেরের কারবার। আট-ন টাকার কাজ। কথাটা ভেবে ভেতরে খুশিতে মরে যায় লতিফ। আইজ সবকিছু কেমুন জানি লাগে। বিয়ানে পাইলাম আদামোন আমিত্তির গাহাক, বিয়ালে আড়াই সের। নিশিরাইতে ভাইগ্যাকুলের কালাচান্দের দোকানের লাহান আমার দোকানে আইজ জ্বীন-পরী আইবো না তো। আদামোন আমিত্তি লইয়া আদামোন টেকা যুদি দেয়। হায় হায়রে, তাইলে আর কতা নাই! দিন বদলাইয়া যাইবো।

দিনবদলের চিন্তায় মগ্ন থাকে লতিফ। বাইরে কে কী বলে, পবনা কতটা আমৃত্তি খায় না খায়, খেয়াল করে না। পবনার কথায় চুপ করে আছে আউয়াল। নিজের দোষে নিজে ফেঁসেছে। কিছু বলার নেই। তবুও তেজি গলায় বলে বাইত যামু না বেডা!

পবনা হাসে। যাইয়েন নে। বহেন হপায় তো হাজ অইলো। তারপর আবার আমৃত্তি মুখে দেয়। ঘজঘজ করে আমৃত্তি চিবায় আর কথা বলে.........বাজানে তো মরলো। হেই দুখে আমি আর বাইত থনে বাইর অই না। খালি চিন্তা করি, মাইনষে মইরা যায় কই! ফিরত আহে না ক্যান!

তয় একখান কতা কী, মারে দেহি আগের চাইয়া যেমুন বেশি আশিখুশি। পোলাপান

মানুষ তো, বুঝি না ক্যান। রাইতে আন্দার গরে শুইয়া ফুসুর-ফাসুর মাইনষের কতা শুনি। বেডামাইনষের গলা। কেডা আছে রাইতে আন্দার গরে। মায় তার লগে কী এতো কতা কয়? অইলে অইবো কি,বেশি পুচপাচ করন যায় না। আবি পোলাপান মানুষ--জিগাইলে মায় কয়, তুই সপন দেহচ। আর নইলে আমি যে গুমের তালে কতা কই, হেই শুনচ। হায় ভগবান।

তার বাদে অইলো কী, বুজলেন নি কত্তারা। এক দিন নিশিরাইতে অইছে কী--আমি গুমের মইদ্যে শুনি কই জানি বহুত দূরে হেই পইকটা আবার ডাকতেয়াছে। কু কু। হেই ডাকে আমার নিদ ছুইটা যায়। আর ডর করে। আন্দারে আইত্তাই--মা মাগো। মার কুনো হদিশ পাই না এই ঘুটঘুইট্টা আন্দারে মায় গেলো কই! তার বাদে মালুম করি পেশাপ-পাইখানা ফিরতে গেছে। আইবো নে। আবার গুমাইয়া যাই। একগুমে রাইত পার। মাইনষে কয় না কালগুম, হেই কালগুম, বুজলেন নি কত্তারা। বিয়ানে উইট্টা দেহি, মায় তো আমার কুনোহানে নাই। হারা বাইত বিচরাই। নাই। পাড়া বইরা বিচরাই গেরাম বইরা বিচরাই--নাই। হেষমেষ যাই দাইমার বাড়ি। হেয়ও আমার লগে বিচরায়। নাই।

দাইমার আছিলো এক মাইয়া, হরিদাসী। আমার লাহান বয়সে। দাইমার পতি চিতায় গেছে একখান ঘোড়া রাইখা। সেই ঘোড়াখান বেলদারগ কাছে বর্গা দিয়া, মাইয়া লইয়া দুইবেলার অন্ন জোটে দাইমার। এমুন মানুষ। হেয় আমি আর হরিদাসী মিইল্লা বেবাক জাগায় মারে বিচরাই। সম্বাত নাই। আমি পোলাপান মানুষ, বিয়াল অইয়া যায়--মারে না দেইক্কা আমি চিইক্কর পারি। হেই দেইক্কা দাইমায় আমারে তাগো বাইত লইয়া গেলো। বুজলেন নি কত্তারা, তার বাদে কতো দিন গেলো আইলো, মায় আর আইলো না, বয়েসকালে বুজি, মার একখান পিরিতের মানুষ আছিলো, রাইতে বাজান থাকতো না বাইত, হেই মানুষখান আইয়া মার লগে কতাবাত্তা কইতো, বাজানে বাইচা থাকতে হের ডরে পলাইতে পারে নাই। কেষ্টা ডাকাইতের গরের বউ লইয়া পলাইবো, এমুন ক্ষেমতা কুন মাইনষের আছে! তয় পলাইলো, বাজানে মইরা যাওনের পর। আমারে একলা থুইয়া........

পবনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর আস্ত একখানা আমৃত্তি মুখে দিয়ে উদাস হয়ে চিবায়। কুত্তাটা,কুত্তাদের চিরকালীন ভঙ্গিতে তখনো পবনার পাশে বসা। অবাক হয়ে প্রভুকে দেখছে। প্রভু যে আজ তাকে না দিয়ে একলাই খায়! কী কারণ? মানুষের সব আচরণ বোঝে না সে। মানুষ জাতটা বড়ো অদ্ভুত। কুত্তাদের মতো উদার না । কুত্তাটা কেবল এই কথা ভাবে।

ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে। বাজারের ঠিক উপরে ফুটে উঠেছে কাটা বাঙির মতো চাঁদ। তার ম্লান একটা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বাজারের সাদা মাটিতে। পদ্মার হাওয়াটা আছেই। বাজারের ওপর ঘুরে-ঘুরে আমৃত্তি ভাজার গন্ধ আর চাঁদের আলোর মিশেল দিচ্ছে এখন।

আমৃত্তি চিবাতে-চিবাতে গলাখাঁকারি দেয় পবনা..... বুজলেন নি কত্তারা, আমি তার বাদে দাইমার বাইতই থাকি। নিজের মাইয়ারে আর আমারে এক রহমই সোয়াগ-আহ্লাদ করে দাইমায়। রাইতে হোয়ায় তার লগে। অইলে অইবো কী, মার কতা কলম আমি ভুলি নি। যহন-তহন মনডা কান্দে। পরানডা কান্দে। আর দিন যায়। শইলখান আমার বাজানের লাহানঐ

জুয়ানতাগড়া অইতে থাকে। হেই দেইখা দাইমায় একদিন কয়, অই পবনা, জুয়ান-মদ্দ তো অইয়া গেলি, কামকাইজ কর, বিয়া সাদি কর, আমি আর কয়দিন। আপনা পেডেরডা তো আছেই, তুইও অহন আপনাঐ। তগো বেবস্তা না কইরা চিতায় উডুম কেমনে।

কাম-কাইজের কতাডা বালাই, বিয়াসাদির কতা বুজলেন না কত্তারা, হুইনা আমার লাজ করে, কই, কী কাম করুম! বাজানের লাহান চুরি-ডাকাতি!

হেই হুইনা দাইমায় আমারে মুইরা পিছা লইয়াছে পিডাইতে, চুরিডাকাতি করনের লেইগা তরে পালছি অ্যাঁ গোলামের পো!

দাইমারে আমি বহুত ডরাইতাম। কই, তয় তুমি কও কী কাম করুম! দাইমায় আর কতা কয় না , পরদিন বেলদারগ থনে ঘেড়াডা ফিরাইয়া আনে। ঘোড়াডার নাম আছিলো পঙ্খিরাজ, আইনা দাইমায় কয়, ল এই ঘোড়া দিলাম। এইডা লইয়া আটবার গোয়ালীমান্দ্রা যাবি, দিগলী যাবি। ধান-চাইল টানবি, গেরস্তর সবজি টানবি। আমরা তিনজন মানুষ, দিন চইলা যাইবো।

হরিদাসী তহন ডাঙার অইয়া গেছে, জোলাগো কাপড় পিন্দা চলে। আর খালি আসে, আমারে দেইখাও লাজ করে। হেই দেইক্কা, বুজলেন নি কত্তারা—দাইমায় হরিদাসীর লগেই আমারে.......

কথাটা শেষ করে না পবনা, পাগল-ছাগল মানুষ তবুও লাজ-লজ্জা আছে। তাই দেখে লোকজন হাসে। আমৃত্তি ভাজতে-ভাজতে লতিফ বলে, কইয়া হালা পবনা হরিদাসীর লগে আদম খেল খেলনের বেস্তা কইলা দিলো।

শুনে হাসির রোল পড়ে যায়। পবনা কথা বলে না। আমৃত্তির খাদার দিকে তাকায়। তাকিয়ে খুশি হয়, পেরায় খতম অইয়া আইছে, আর তিন সাড়ে তিঁন গনডা অইবো আছে। পেডের তো অহনও কিছু অয় নাই আমার। আহা, কী সুখ গো! আউয়াল কত্তায় কইছে কাইঁল্ থনে হের দোকানে থাকন-খাওন ফিরি। আমারে আর পায় কোন্ হালায়!

সুখের কথা ভাবে আর গাপগুপ আমৃত্তি মুখে দেয় পবনা..... পঙ্খিরাজ আছিলো হরিদাসীর বাপের আমলের। বেলদারগ কাছে বর্গা আছিলো। হালায় বেলদারেব পোরা জবর খাডাইতো পঙ্খিরাজরে। আমরক্ত বাইর কইরা হালাইলো ধান-চাহেল টানাইতে-টানাইতে। পঙ্খিরাজরে পয়লা দিন দেইক্কাই আমার এমুন মায়া লাগলনা কী কমু কত্তারা , বিলে ছাইরা আইট কইরা খাওয়াইলাম কয়দিন দেহি, হ পঙ্খিরাজ ঝাড়া দিয়া উডছে। তার বাদে শুরু করলাম কাম। গোয়ালীমান্দ্রা আড়ে যাই, দিগলীর আড়ে যাই। আডবার না থাকলে যাই অইলদার বাজারে, আয় ভালাই অয়, দিন চইলা যায়।

তয় আমি কইলাম কত্তারা, পঙ্খিরাজরে জবর সোয়াগ করতাম। হারাদিন কাম কইরা রাইতে দিতাম বিঁলে ছাইরা। পঙ্খীরাজ আছিলো আমার খুব বাদুক। বিয়ানে ইদ উডনের আগেই বাইত আইয়া পড়তো। আবার কামে যাও। পেডের ধান্দা অইঁলো বড়ো ধান্দা।

তয় পঙ্খিরাজেরে কলম হরিদাসী দেকতে পারতো না। কইতো এইডা অইলো আমার হতিন। এই ফাঁকে আরেকখান কতা কই কত্তারা, যেদিনই আড়ে-বাজারে যাইতাম, বাইত আহনের টেইমে আমি কলম একখান দুইখান আমিত্তি কিন্না খাইতাম। আমিত্তি খাওনের

লোবডা আমার যে কেমুন, হেইডা আপনেরা বুঝবেন না। বাজানের কল্লাডা যেদিন মিষ্টির পাইল্লার লাহান আমাগো বাইত আইলো, ওইদিন যেই লোকটা আইছিলো, আহা আইজ পেড বইরা আমিত্তি খামু--হেই লোবডা আর যায় নাই। অহনও আছে। মাইনষে কয় না, ভগমান মাইনষের বেবাক আশা পূরণ না করলেও দুই একখান করে। আমার আমিত্তি খাওনের আশাড়া কইলাম পূরণ অইয়া গেলো। এই যে আইজ। ইচ্ছামতন খাইতাছি। পেড বইরা। বলেই পবনা আবার আমৃত্তি মুখে দেয়। তাই দেখে আউয়ালের মুখে মরা বটপাতার রঙ ধরে। আদতেই তো হালায় বেবাকটি খাইয়া হালাইবো। আর তো আছে পাঁচ-ছয়খান, ঈশ রে, কী কামডা করলাম। কতোডি টাকা লোকসান। আবার কাইল থনে পাগলার থাকন-খাওন দিতে অইবো, ঘাইরামি করলে বদলাম।

নিজের ওপর রাগে জ্বলে যায় আউয়াল।

কাশেম বলল, হ বুজছি, বেবাকটিই খাইবো হালায়। তারপর পবনাকে বলে, একটানে খাইয়া হালা পবনা, দেইক্কা দোকানে যাই।

লতিফ বলল, আর কী দেকবা। যাও। ওই তো আর কয়খান! ধীরে-সুস্থে খাউক।

আউয়াল মনে-মনে বলে, তোমার কী চোদানির পো। খালি মাইনষের হোগা মারনের তালে থাকো।

মুখে এসব কথা বলা যায় না। আউয়াল আবার বিড়ি ধরায়। তারপর চাঁদের ম্লান আলো আর পদ্মার হাওয়ার ওপর ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে শোনে.....বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হরিদাসী গেল পোয়াতী অইয়া। হেই দেইক্কা আমি হারাদিন পঙ্খিরাজরে লইয়া আড়ে বাজারে পইরা থাকি। আমিত্তি খাওন ছাইরা দেই। খাওনের মুক বাড়তাছে। আয় না বাড়লে কেমনে চলবো। দাইমায়ও হেই কতাই কয়। ভালা কইরা কাম-কাইজ কর। পোলাপান অইলে খরচা আছে। খালি হরিদাসী কয়,এতো কাম কইরো না। নিজের জান-পরানডার খেল রাইখো। পবনা আবার একটা আমৃত্তি মুখে দেয়। মুখে দিয়েই টের পায়, পেটটা কেমন করে। বুকটা কেমন করে। হায় হায়, ওকাল পাকাল অইবো না তো! তাইলে সর্বনাশ অইয়া যাইবো। আউয়াল কত্তায় অহনই বাশ দিয়া পিডাইবো। কাইল থনে এই বাজারে আর থাকন যাইবো না। তাইলে আমি যামু কই! যাওনের একখান জাগা আছিলো দাইমা, হেয় চিতায় উটছে একযোগে বারো বছর।

পবনা একটু নড়েচড়ে বসে। তাতে পেটটা একটু আরাম পায়। বুকটা একটু আরাম পায়। .. ... একদিন রাইতে হরিদাসীর বেদনা উঠলো, বাইত আছিলো একখান গর। দাইমায় কইলো, মই পবনা, তুই গিয়া গাচতলায় ব। এই টেইমে মরদরা গরে থাকে না।

উডানে আচিলো একখান রোয়াইল গাচ। আমি হেই গাচের লগে ঢেলান দিয়া বহি। নিশিরাইত। পঙ্খিরাজ গেছে বিলে। আসমানে চুনাকুমড়ার লাহান গোল একখান চান। চান্নি কী। ফকফক করে। মাইত্তে ফুঁ দিলে ধুলাবালি উড়তে দেহা যায়, এমুন। আমি গাচতলায় বইয়া-বইয়া বিড়ি টানি আর হুনি গরের মইদ্যে হরিদাসী আগুইজ্জা বেদনায় কোকায়। আমার কেন জানি পরানডা কান্দে। কেমুন জানি লাগে। এমুন টেইমে হুনি কি, বুজলেন নি কত্তারা-- কই জানি,বহুত দূরে হেই পইকখান ডাকতেয়াছে। কু কু। হুইনা আমার পরানডা কান্দে।

কেমুন লাগে।

বিয়ান অয় নাই, তহন দাইমায় চিইক্কর দিয়া উটলা। হায় হায় রে,কি সর্বনাশ অইল গো...

আমি দরপাইরা গরে যাই। গিয়া দেহি হরিদাসী নিজে গেছে,পেডেরডাও লইয়া গেছে। দেইক্কা আমার যে মাতার মইদ্যে একখান চক্কর মারলো, হেই চক্করডা আর কুনোদিন গেলো না। অহনও আছে।

পবনা তারপর আর কোনো কথা বলে না । উদাস হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী যে দেখে, কী যে ভাবে--কেউ জানে না।

খাদায় তখন একটা মাত্র আমৃত্তি। দেখে আউয়াল উঠে দাঁড়ায়। মরা বটপাতার মতো মুখটা নিয়ে বলে, খাইয়া হালা পবনা, বাইত যামু, ম্যালা রাত অইলো।

কাশেম বলল, দেরি করচ ক্যা পবনা? খাইয়া হালা।

পবনার তখন পেটটা কেমন করে, বুকটা কেমন করে। এত কালের পুরোনো শরীরটা আর নিজের মনে হয় না, ভাবটা চেপে থাকে পবনা, মুখে খুব বিনীতভাবে বলে---কত্তারা,এইডা না খাইলাম। কুত্তাডা হারাদিন বইয়া রইলো, এইডা অরে দেই।

শুনে গর্জে ওঠে আউয়াল। বানড়ামি পাইছো বেডা হালা। খাও। নাইলে অহনই পিডামু।

পবনার আর কথা বলার মুখ থাকে না। মনে-মনে কুত্তাটার কাছে ক্ষমা চায় সে। ভাই রে, ক্ষেমা কইরো। তারপর শেষ আমৃত্তিটা মুখে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পবনা। দাঁড়িয়ে টের পায় এত কালের পুরোনো শরীরটা আর তার নিজের মধ্যে নেই। অচেনা হয়ে গেছে।

তখন ভিড়টা ভাঙছে। দোকানিরা পবনার গর্বে বুক ফুলিয়ে ফিরে যাচ্ছে। কত পদের কথা তাদের। সাববাস পবনা, বাপের নাম রাকছ্চ। পবনা এসবের কিছুই শোনে না। অচিন শরীরখান টেনে-টেনে, ভাঙা চাঁদের ম্লান আলো মাথায়, নদীর দিকে হেঁটে যায়। সেই সময় পৃথিবীব দূর কোনো প্রান্তে বসে কি সেই পাখিটা ডাকছিল! কু কু!

পরদিন সকালে মাচ্ছালার ধুলোবালি থেকে মুখ তুলে নেড়ি কুত্তাটা তার প্রভু পবন ঠাকুরকে খোঁজে। নেই। কুত্তাটা তারপর ওঠে । উঠে বাজারময় চক্কর খায়! প্রভুকে খোঁজে। নেই। প্রভু কোথাও নেই।

কুত্তাটা তারপর মন খারাপ করে নদীতীরে যায়। সেখানে জেলেদের দু-তিনখান নাও ডাঙ উপুড় করে রাখা। মেরামত হবে। আলকাতরা মাইটা তেল খেয়ে আবার জলে নামবে।

কুত্তাটা দেখে দুখানা নাওয়ের মাঝখানে মাটিতে তার প্রভু পবন ঠাকুর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। দেখে কুত্তাটা দু-তিনবার ঘেউ দেয়। পবন ঠাকুর নড়ে না। কুত্তাটা কী বোঝে কে জানে, সে আর ঘেউ দেয় না। একটা নাওয়ের সামনে পা তুলে পেচ্ছাপ করে।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৪৬/ সংখ্যা ১০: ১৩৯২]

কবন্ধ

গৌরী আইয়ুব

[জন্ম ১৯৩১ সালে পাটনায়। শিক্ষা শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পেশা অধ্যাপনা। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী। বহু সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: তুচ্ছ কিছু সুখদুঃখ, এই যে অহনা, আমাদের দুজনের কথা, ইত্যাদি। মৃত্যু ১৯৯৮ সালে। তাঁর অনেক লেখা এখনও অগ্রন্থিত।]

শীতের পড়ন্ত বেলা। পিঠের উপর মিঠে রোদ, সবুজ ঘাস থেকে একটা ঠান্ডা আমেজ উঠে এসে সমস্ত শরীর-মনকে যেন আদর করছিল। খোলা মাঠে কী একটা অনুষ্ঠান চলছিল। সারি-সারি স্টীলের ফোলডিং চেয়ার অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো। হালকা নীলরঙের চেয়ারগুলি চোখকে আরাম দিচ্ছিল। অবশ্য সারি ভেঙে কোথাও-কোথাও চেয়ারগুলিকে কিছুটা এলো-মেলো করে দিয়েছিল দর্শকরা। যে যার সুবিধামতন এদিক সেদিক টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

তখন বোধহয় একটু বিরতি চলছিল। তাই অনেকেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল, হাতপায়ের আড়ষ্টতা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল কেউ-কেউ....কেউ বা পরিচিত জনকে খুঁজে পেয়ে নীচু গলায় কথা বলছিল। সব নিয়ে বেশ একটা সুন্দর সংযত পরিবেশ। অথচ কী যে ঘটছিল সামনের দিকে সেটা কিন্তু মনে নেই।

আমি প্রথম থেকেই একা বসেছিলাম, তখনও একাই বসে রইলাম। বাঁ পায়ের উপর ডান পাটি তুলে সেই হাঁটুর উপর অলস হাত দুটো জড়ো করে রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, অন্যমনস্ক। নিজের মনেই কী জানি কী ভাবছিলাম। আমার সারির দক্ষিণ প্রান্তের একেবারে শেষ চেয়ারটি বেছে নিয়ে বসেছিলাম আমি! পারতপক্ষে দুপাশে দুজন অচেনা লোক নিয়ে বসতে আর কার ভালো লাগে? তবে আমার বাঁ দিকেও কয়েকটা চেয়ার তখন পর্যন্ত শূন্য ছিল। ..... সে ক'টাকে ছেড়ে খানিক দূরে জনাকয় বসেছিল, অস্পষ্ট মনে পড়ছে। পায়ের কাছে ঘাসের উপর নামিয়ে রেখেছিলাম আমার পেটমোটা ব্যাগটা।.....ব্যাগ তো নয়, বলা যায় একটা হোলড-অল। ব্যাগের উপর আমার মেটেরঙের গুর্জরা শালটাও পাট করে রেখে দিয়েছিলাম.....গায়ে দেবার মতন ঠান্ডা তখনও পড়ে নি।

বসে থেকে-থেকেই হঠাৎ আমার ঘোর কেটে গিয়েছিল। অস্পষ্ট ঠুনঠান ধাতব একটা শব্দ শুনে সামান্য একটু ঘাড় বেঁকিয়েই টের পেয়েছিলাম যে আমার পিছনের সারি বেয়ে বাঁ-দিক থেকে কেউ যেন এগিয়ে আসছিল, ঠিক আমার পাশের চেয়ারটিকেই লক্ষ্য করে। অনেক সময় কিছু না ভেবেই মানুষ যেমন করে থাকে, আমি তেমনি নিজের চেয়ারটা কয়েক ইঞ্চি আরো ডাইনে সরিয়ে নিয়েছিলাম। আগন্তুকের মনে হতে পারত তার পথ একটু প্রশস্ত করে দেবার জনাই সরে গিয়েছিলাম। আসলে হয়তো নিজের দূরত্বটুকু সযত্নে সুরক্ষিত করার জনাই ওইরকম করেছিলাম। আমার পাশের চেয়ারের পিছনটিতে এসে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে

থেকে তারপর পিঠের দিক থেকে যখন এক-পা এক-পা করে নবাগত মানুষটি এগিয়ে এসে বসতে যাচ্ছিল তখন আমার চোখে পড়ে ছিল যে তার চলাটা স্বাভাবিক নয়.....একটা কাঠ-কাঠ ভাব.....কৃত্রিম পায়ের উপর হাঁটলে যেমন দেখায় আর কী! চেয়ারটাকে খানিক সুবিধাজনকভাবে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল সেই লোকটি.....স্বভাবতই আমার নজর চলে গিয়েছিল তার মুখের দিকে। এখন বুঝতে পারছি যে যতটা চমকে ওঠা উচিত ছিল ততটা কিন্তু চমকাই নি প্রথমে, একটু অবাক হয়েছিলাম মাত্র।

তাই যখন দেখলাম নবাগত মানুষটির মাথাটাই নেই কো মোটে... সেখানে একটা ছোট্টমতন ফ্যান ঘুরছে তখন কিন্তু ব্যাপারটা বিশেষ তেমন ভয়াবহ ঠেকে নি প্রথমে। নীচু সিলিঙওয়ালা ঘরে অনেক সময় ওইরকম ছোটো ফ্যান দেয়ালে গাঁথা থাকে। ব্লেডগুলি বিঘতখানেক লম্বা,কিন্তু কোনো তারের কেসিং ছিল না ওগুলিকে ঢেকে। দুষ্টু ছেলেপুলের কথা ভেবে বরং একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। মনে-মনে আমিও ওই চলন্ত পাখার কাছে একটা আঙুল বাড়াতে গিয়ে চট করে সরিয়ে নিয়েছিলাম। স্পীড কম হলে কী হবে! আঙুলের ডগাটা কুচ করে কেটে উড়িয়ে না দিক, অন্তত একটা জোড় মট করে ভেঙে ফেলবে ঠিক। তাই ভাবছিলাম বলি (মাস্টারনীর স্বভাব যাবে কোথায়) যে, হোক না কাঁধের উপর চাপানো, তবু ওইরকম আঢাকা রাখা উচিত নয় ব্লেডগুলি।

যাই হোক, কারুর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকাটা সভ্যতা নয়। তা ছাড়া, অন্যেরা কী মনে করছে ওকে দেখে সেটাও দেখবার জন্য চারদিকে নজর ঘুরিয়ে আনলাম একবার ! কী আশ্চর্য ! আর কেউই যেন অদ্ভুত কিছু লক্ষ করে নি মনে হল। করলে কি আশেপাশে সবাই এমন নির্বিকার হয়ে থাকতে পারত?

.....আমার মাথায় তখন নানারকম ভাবনা আসছিল।

.....হয়তো কোনো অ্যাকসিডেনটে মাথাটি হারিয়েছেন ভদ্রলোক।...হয়তো দেহকে চালু রাখার জন্য এটাই সার্জারির আধুনিকতম উদ্ভাবন। এদিকে কিন্তু খেয়াল ছিল যে দুর্ঘটনায় যারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারায় তাদের প্রতি ভয়, বিস্ময় কি বিরাগ প্রকাশ করা অমানবিক। তাই মুখের ভাব যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টায় একবার শুধু ঢোঁক গিলেছিলাম। তারপর আর কিছু ভাববার আগেই হাওয়ায় হিশহিশ করে কথা ভেসে এসেছিল আমাকে চমকে দিয়ে,

"এখানে বসতে পারি?"

"নিশ্চয়ই,নিশ্চয়ই"—না ভেবেই এরকম জবাব মানুষ দিয়ে থাকে সৌজন্য প্রকাশ করতে।

অমনি কাঠ-কাঠ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে 'মানুষ'টি এসে ধপ করে চেয়ারের উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। চেয়ারটাও ক্যাঁক করে ঘাসে দেবে গিয়েছিল একটু খানি, তখন একবার মনে হয়েছিল, এ কি মানুষ না একটা যন্ত্র! হালকা গোলাপি রঙের সুতি শ্যার্টের ভিতর থেকে কাঁধ-বুক-পিঠের ঋজুরেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, যেন একটা টিনের বাক্স কাপড় দিয়ে ঢাকা। কিন্তু মুখে আমি কৌতূহলের বদলে একটা সহানুভূতির ভাব ধরে রাখার চেষ্টা করছিলাম। অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য নড়েচড়ে বসেছিলাম নিজের চেয়ারেই.....একবার শাড়ির আঁচলটা কাঁধের উপর গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম....যদিও অবশ্য কটরি তসরের ভারী শাড়ি

মোটেই খসে-খসে পড়ে যাচ্ছিল না। বুঝতে পারছিলাম যে আমার মতন প্রবীণা একজন মহিলাও অস্বস্তিতে পড়লে তরুণীদের মতনই অর্থহীন চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে পারে।

নিজেকে একটু বাগে এনে ভাগ্যহীন মানুষটির সঙ্গে সামান্য সৌজন্য বিনিময় করার চেষ্টায় একটু হেসে আবার তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে আর একবার হোঁচট খেয়েছিলাম। ঘুরন্ত পাখার ডানার সঙ্গে কী করে স্মিতহাস্য বিনিময় করা যায় সে এক সমস্যা! পাখা অবশ্য খুব জোরে ঘুরছিল না.... মনে হচ্ছিল যেন এক নম্বরের চেয়েও কম স্পীড। কিন্তু পাখা তো পাখাই....চোখ নয়, ঠোঁট নয়। সেদিকে তাকিয়ে থেকে-থেকে শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আমার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গিয়েছিল।

তবু খানিক পরে মনে হয়েছিল যে আমার সৌজন্য প্রকাশের চেষ্টা যেন পাশের মানুষটির একেবারে অগোচরে থাকে নি। সেজন্যই সম্ভবত আবার ফিশ-ফাশ কথা ভেসে এসেছিল,

"বেশ গরম আজ,তাই না?"

হাঁ-সূচক অল্প একটু মাথা নেড়ে মাথাটা ঘুরিয়ে আশপাশটা দেখে নিয়েছিলাম চট করে। মনে হল না যে কেউ লক্ষ করছে আমার পাশেই ভীষণ অদ্ভুত কিছু ঘটছে একটা। এদিকে আমি কিন্তু ক্রমেই আরো ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। পাখার অভাবে কিংবা পাখার পাশে, এমন-কী পাখার তলায় বসেও মানুষ 'আহ কী গবম' বলে অহরহ অভিযোগ করে ঠিকই, কিন্তু পাখা নিজে কখনও গরম বলে অভিযোগ করে এমন কথা কেউ কখনও শুনেছে? আর এই ক্ষেত্রে পাখাটি পাশে এসে বসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমার তো বেশ মোলায়েম শীতই লাগছিল। তার পর থেকেই বরং ঘামতে শুরু করেছিলাম। একটু-একটু করে যতই ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিলাম ততই কানমাথা গরম হয়ে উঠছিল।

তবু উপর-উপর অবিচলতা বজায় রাখার জন্য নিজের নখের রঙ পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছিলাম ডাক্তারি নিষ্ঠার সঙ্গে। তা ছাড়া নার্সারি স্কুলের টিচারদের মতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নখ যথেষ্ট পরিষ্কার কিনা, শিগগিরই কাটা দরকার কিনা--- এসব প্রয়োজনীয় বিষয়েও অবহিত হওয়া দরকার মনে হচ্ছিল তখনই। কিন্তু তারই ফাঁকে আড়চোখে দেখতে পেয়েছিলাম পাশে-বসে-থাকা মানুষটির পা দুটি ধীরে-ধীরে সামনের দিকে প্রসারিত হচ্ছিল, তার ট্রাউজার্সের রঙ ছিল চীনেবাদামের খোলার মতন। গোলাপি পপলিনের আস্তিন দুটি হাঁটুর কাছে এগিয়ে এসে সযত্নে যেন চিমটি কেটে ট্রাউজার্সের কাপড় সামান্য তুলে ধরে একটু আলগা করে পা দুটিকে অবাধে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছিল। তখন তার হাত দুটির দিকে চোরা নজর পড়ায় আবার চমকে গিয়েছিলাম। দুটি হাত নয়, দশটি আঙুলও নয়। বলা যায় একধরনের দুটি স্টীলের চিমটে যেন। প্রত্যেকটি 'হাতেই' একটি করে স্টীলের বুড়ো আঙুল মতন ছিল, আর ছিল সব ক'টি আঙুল একত্র করলে যেমন দেখায় তেমনি একটি ইস্পাতের বাঁকানো পাত....হাতছানি দেবার সময় চারটা আঙুল জুড়ে গেলে যেমন হয় ঠিক সেইরকম। ওই 'হাত'-দুটিই হাঁটুর কাছে নেমে এসেছিল....আর পা'দুটি সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। তখন দেখতে পেয়েছিলাম পায়ের জুতোর রঙও ওই ট্রাউজার্সেরই মতন। কর্ডুরয়ের অমন আরামদায়ক জুতো-জোড়া এদেশী বলে মনে হচ্ছিল না।

এর পর হাওয়ায় যা ফিশফিশানি ভেসে এল তাতে আমার বুক হিম হয়ে গিয়েছিল। শোনা গেল,

'অনেকক্ষণ থেকেই তোমাকে দেখতে পেয়েছি, কিন্তু ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে পারছিলাম না।.... '

'তোমাকে!' আমি তো ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পাখার ব্লেডের বয়স বোঝা যায় না ঠিকই, কিন্তু পোশাক-আশাক দেখে তো তাকে ছোকরাই মনে হয়েছিল....তিন কুড়ি বয়সের লোক মোটেই মনে হয় নি। অবশ্য আজকাল বুড়ি-ছুঁড়ি বুড়ো-শুঁড়ো সবাই একই রকম পোশাক পরছে। তবু আমার মতন একজন প্রৌঢ়া আর ভীষণদর্শনা হেড্‌মিসট্রেসকে 'তুমি' বলার সাহস হবে প্রথম আলাপেই! এতে আমি বেশ বিমূঢ় বোধ করতে শুরু করেছিলাম। তা ছাড়া, আমার কাছে আসার জন্য এত ব্যগ্রতার কারণটাই বা কী?—সেটাও ভালো ঠেকছিল না মোটে। এতক্ষণ তো ঘামছিলাম— এবার মাথা ঝিম-ঝিম করতে লাগল।

সন্তর্পণে ঘাড়টা একটু কাত করে বাঁ পাশে ওর দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছিলাম ব্যাপারটা কী! কিন্তু ঘুরন্ত পাখাটাও ওই সময়েই নিজের বাঁ দিকে ফিরে কী যেন দেখছিল একটু ঝুঁকে। তারপর দেখলাম ওর বাঁ কাঁধে ঝোলানো একটা শান ব্যাগে হাত দুটো কী যেন খুঁজছিল। খানিক বাদে বাঁ-হাতে একটা নোটবই আর ঝকঝকে ক্রস পেনসিল উঠে এসেছিল....আরও খানিক খোঁজাখুঁজির পর ডান হাতে উঠেছিল একটা চকোলেটের বড়োসড়ো স্ল্যাব। আমি তখন তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। তাও কি অব্যাহতি পাওয়া গেল? মনে-মনে ভাবছিলাম, প্রেস রিপোর্টার নাকি কোনো কাগজের? কথাটা কিন্তু উচ্চারণ করি নি। অথচ উত্তর চলে এসেছিল,

"হ্যাঁ আমি এখন নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার।"

শুনে তো আমি জমে বরফ। কিন্তু কপালে যে ঘাম জমছিল তাও বুঝতে পারছিলাম— অথচ আঁচলটা তুলে যে ঘাম পুছব, তাও হাত সরছিল না। হাত পা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কাঠ হয়ে বসে ভাবছিলাম যে কিছু ভাবাও তাহলে চলবে না? 'ভাবব না ' কথাটা ভাবা চলবে কি? প্রচন্ড অস্বস্তিতে আমার তখন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ আমার দিকে সেই বিলিতি চকোলেটের যতটা এগিয়ে এসেছিল এবং সেই সঙ্গে আমার গলা শুকিয়ে-দেওয়া ফিশফিশ কথা,

"প্লীজ একটুখানি নাও--"

প্লীজই বটে। এমন প্লেজারের অভিজ্ঞতা যেন জীবনে আর কোনোদিন না হয়। কিছুক্ষণ যে নিতে ইতস্তত করছিলাম সেটা হাতখানা তুলতে পারছিলাম না বলেও। ভয়ে-জমে-যাওয়া তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে শেষে কোনোক্রমে কোল থেকে তুলে এনে চকোলেটের প্রান্তে ঠেকিয়েছিলাম, ভেঙে নেবার অনুৎসাহটা ব্যাখ্যা করে বলেও ছিলাম প্রায় ওইরকম ফিশফিশ স্বরে,

'এখন কি আর চকোলেট খাবার বয়স আছে?'

'আমার আছে আর তোমার নেই?---শুনে আমি চেয়ার থেকে উলটে পড়ি আর কী!

ঠকঠক করে হাত কাঁপছিল বলেই বোধ হয় ছোট্ট এক টুকরো চকোলেট আমার চেষ্টা ছাড়াই মট করে ভেঙে আমার দুই আঙুলের মাঝে উঠে এল.... এসেও কয়েক সেকেন্ড ধরে কাঁপতেই থাকল....আর আমি হাঁ করে বসে থাকলাম....ওটা মুখ পর্যন্ত তুলে আনতে পারছিলাম না।

চেয়ার থেকে যে পড়ে যাই নি তার একমাত্র কারণ, এই যে, কিশোর বয়স থেকেই ভয়কে জয় করবার চেষ্টা করতাম আমাদের প্রজন্মের কিছু মেয়ে। আমাদের ছিল সবলা হবার সাধনা। সেই সময়ে রেডিওতে "মহিলা মহল" অনুষ্ঠানের গোড়ায় গান হত 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরই অপমান,' শুনে সবল নারীত্বের অভিমানে আমাদের বুক ভরে উঠত।

তবু এই সবলার মুখে কোনো কথা জোগায় নি ওই মুহূর্তে। সবটুকু চেষ্টাকে একত্র করে বহুকষ্টে চকোলেটের টুকরোটা মুখে পুরে দিয়েছিলাম। তাতে বিশ্রী সিগারেটের গন্ধ পেয়েও অবিকৃত মুখে চুষতে চেষ্টা করছিলাম। এদিকে চোখে কিন্তু ঝাপসা দেখছিলাম, চোখের পাতাদুটি পর্যন্ত ঘামে ভিজে গিয়ে চশমার কাঁচে বাষ্প জমে উঠেছিল, গরমের দিনে রান্না করার সময় যেমন হয়।

যেন অনেক অনেকক্ষণ পর একটু-একটু করে ঘাড়টা সামান্য ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করছিলাম ও কী করছে। দেখা গেল, খুশখুশ করে স্টীলের মসৃণ পেনসিলটা নোট বুকের উপর হাঁটছে...হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একটা চিমটে। আমার চোখ সেখানেই আটকে রয়ে গিয়েছিল। সারা শরীরে ভীষণ অস্বস্তি ছিল....প্রায় অস্থিরতা, কিংবা বলা চলে অব্যক্ত কিন্তু তীব্র একটা ইচ্ছার তাড়না ছিল দেহের সবকটি পেশীতে। মনের অন্তঃস্থলেও ইচ্ছাটা উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ক্রমে সর্বাঙ্গে ঐ একটা ইচ্ছাই নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছিল...যে করেই হোক পালাতে হবে, অথচ এদিকে পা-দুটো তো মাটিতে এঁটে গিয়েছে...হয়তো সবুজ ঘাসও গজিয়ে গিয়েছে তার উপর।

তারপর এক সময়ে দেখতে পেলাম নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার লেখার স্পীড কমিয়ে ফেলছে। একটু সাহস পেয়ে তখন সন্তর্পণে আমার মাথাটা আরো একটু কাত করে ওর 'মুখের, দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম যে পাখার স্পীড আগের চেয়েও কমে গিয়েছে। মনে হচ্ছিল অপেক্ষা করে থাকলে বোধ হয় দেখতে পাব একটু-একটু করে দুটোই থেমে যাবে। গেলও তাই। আমি তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই ডানহাতের চিমটেটা কলমসহ কেমন যেন উলটে গেল হাত ওলটানোর ভঙ্গিতে। ভাবছে? না ঘুমিয়ে পড়েছে? মাথাটাও কাজ করছে না মনে হল.....পাখাটা যখন থেমে গেছে। একটু পরেই টের পাওয়া গেল বাঁ পাশ থেকে বাক্‌সর মতন কিছু একটা কাত হয়ে এসে আমার কাঁধে ঠেকছে একটু-একটু করে ... যেন ঘুমে ঢলে পড়ছিল আমার ওপর। কী ভারী আর শক্ত মনে হয়েছিল বাক্‌সটা...আমার কাঁধ ব্যথা করতে লেগেছিল।

আর না! কী করে কোথা থেকে যে আমার হাতে-পায়ে বল ফিরে এসেছিল জানি না, সাবধানে নিজেকে বাক্‌সর তলা থেকে সরিয়ে এনে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কী ভাগ্যি ঘাসের উপর চেয়ার ঠেললে শব্দ হয় না! কিন্তু তবু নীচু হয়ে ব্যাগটা তুলে নিতে-নিতেই টের পেয়েছিলাম যে বাক্‌সটাও যেন চটকা ভেঙে সোজা হয়ে উঠে বসেছিল নিজের

চেয়ারের উপর। আমার শালটা ব্যাগ থেকে গড়িয়ে ঘাসে পড়ে গিয়েছিল, সেটাও তুলে নেবার তর সইল না। কিন্তু হাওয়া খুব তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করে ছিল, 'কী ব্যাপার? হঠাৎ চললে কোথায়?

আর চললে কোথায়! আমি তখন উড়তে পারলে উড়ি। কে বলে আমার হাঁটুতে আর্থরাইটিস..... আমি প্রায় তখন রেসের ঘোড়া। পাগলের মতন একরোখা ছুটছিলাম কোনো দিকে না তাকিয়ে....মাঠঘাট পেরিয়ে ছুটছিলাম... অন্তত ছুটতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, ক্রমেই মনে হচ্ছিল আমি যেন আর পারছি না। স্বপ্নে যেমন পায়ে-পায়ে জড়িয়ে যায়, পা নড়বড়ে হয়ে যায়, আমারও তেমনি হয়ে যাচ্ছিল। হাঁটু দুটো লগবগে রবারের তৈরি বলে মনে হচ্ছিল। প্রাণের দায়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা পিচঢালা পথের কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। সেখানে এসে পৌঁছতে-না—পৌঁছতেই ভাগ্যক্রমে একটা বাসও এসে থেমেছিল একেবারে আমার সামনেই। আমি পড়িমরি করে উঠে পড়ে ছিলাম, বাসটা স্টেশানের দিকে যাচ্ছিল। আমি উঠতেই ছেড়ে দিয়েছিল।

'বাব্‌বাঃ বাঁচলাম' বলে আমার আঁচল তুলে কপাল ঘাড় মুখ মুছতে-মুছতে একবার মনে হয়েছিল, কী হাস্যকর ব্যাপার! এই বয়সে এই দেহ নিয়ে ত্রস্ত কিশোরীর মতন ছোটা! কী বেমানান দেখাচ্ছিল নিশ্চয়ই, দেখাক্ গে, কেই বা দেখছিল! চশমাটাও মুছে নিয়ে চোখে পরে বাসের জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাতেই ভরসাটা আবার ধসে পড়েছিল যেন। স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম একটা খটখটে মূর্তি খটাশ-খটাশ করতে-করতে ছুটে আসছিল লম্বা-লম্বা পায়ে, যেন রণপার উপর ছুটছিল। তার মাথাটা....না, পাখাটা বাঁই-বাঁই করে ঘুরছিল। হায়-হায়, এ তো আমার পিছু ছাড়বে না। অবশ্য তখনও বেশ দূরে ছিল.... আমার বাসটাকে ধরবার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। তবু বাসটা যদি আলোর বেগে ছুটতে-ছুটতে একেবারে পৃথিবীর বায়ুমন্ডল পার হয়ে যেতে পারত, তবেই হয়তো স্বস্তি পেতাম আমি।....

স্টেশানে এসে নেমেই একটা ট্রেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুব ভরসা পেয়েছিলাম, টিকিট কাটতে কিছুই প্রায় সময় লাগেনি। বেছে-বেছে একটা ভিড়ে ঠাসা কমপার্টমেনটে উঠেছিলাম। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। আলো জ্বলে উঠতেই মুখটা যথাসম্ভব আড়াল করবার জন্য মাথায় আঁচল তুলে দিয়েছিলাম। মিনিট তিন-চার পরে ট্রেনটা নড়ে উঠলে বুকের উপর থেকে একটা বোঝা নেমে গিয়েছিল। আমার ঠিক পরের বাসটাই যদি ধরতে পেরেও থাকে তবু এই ট্রেন ধরতে পারে নি কিছুতেই। এইটুকু সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছনো কিছুতেই সম্ভব নয়।

মনকে এইভাবে ভরসা দিয়ে কামরার এক কোণে ঠায় বসেছিলাম। ট্রেন সারারাত ধরে চলল। একটু তন্দ্রা, একটু জাগরণ, একটু স্বস্তি, অনেকটা ভয়---সব মিশিয়ে কেমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল আমার চৈতন্যে। তারপর ট্রেন যখন এসে টারমিনাসে থেমে গিয়েছিল তখন গা ঝাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছিলাম, গলা বার করে দেখে মনে হয়েছিল হাওড়া স্টেশান। যে যার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নামবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমিও আমার ব্যাগটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম.... তখন মনে পড়ল গুর্জরা শালটা হারিয়ে এসেছি..বুকের ভিতরটায় একটু হায়-হায় করে উঠেছিল....ভারি সুন্দর শালটা... সুশীলা

দিয়েছিল। যারা আগেভাগে নামবার জন্য ব্যস্ত তাদের পথ করে দিয়ে ধীরেসুস্থে নেমেছিলাম। কনুই দিয়ে ঠেলে পথ করে নিতে আমার ভালো লাগে না। নেমে হাতের ব্যাগটা দোলাতে-দোলাতে প্ল্যাটফর্মে যখন হাঁটছিলাম তখন চোখে অনিদ্রার জ্বালা থাকলেও মনটা হালকা লাগছিল! আর-একটা নতুন দিনের আলোয় আগের দিনের ভয়টা কেমন অলীক অবাস্তব লাগছিল। ভাবতে-ভাবতে চলেছিলাম যে ট্যাকসি নেব না বাস নেব।

কিন্তু স্টেশানের বাইরে এসেই সামনে একটা খালি ট্যাকসি দেখে খুশি হয়ে তাই নিয়ে নিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে স্নান করে একটু শুয়ে নিতে ইচ্ছা করছিল। ট্যাকসির দরজাটা বন্ধ করে তার শব্দে বেশ একটা স্বস্তি রোদ করছিলাম। কিন্তু যেই ড্রাইভারকে বলতে যাচ্ছি কোথায় যাব অমনি একটা তীক্ষ্ণ শিশ শুনতে পেয়ে সেই শব্দের দিকে তাকিয়েই আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল আর একবার....আবার সেই কবন্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম একটু দূরেই। ট্যাকসিটা চলতে শুরু করেই দিয়েছিল, ততক্ষণে স্টেশানের চত্বর পার হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। উলটো দিকের ভিড় ঠেলে একটা ঘূরন্ত পাখা মানুষের কাঁধে চড়ে ছুটে আসছিল আমারই ট্যাকসিটার দিকে।

.....তার হিশহিশ ডাকও শুনতে পেয়েছিলাম আমি,

...'শোনো,...শোনো,...থামো...থামো।' আমি থামি নি, আমি আর কিছু শুনতে চাই নি।

তখন আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। এতদূর পর্যন্ত কী করে পৌঁছাল? মনে তো হচ্ছিল যে আগেভাগেই ওখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল স্টেশনের বাইরে আমাকে ধরবে বলে। .....কিন্তু সেটা সম্ভব হল কী করে? এতটা পথ কি দূর পাল্লার বাসে চলে এসেছে সারা রাত ধরে? কী জানি, আমি আর ভাবতে পারছিলাম না শুধু ঠিক করে নিয়েছিলাম যে এই বিপদ পিঠে নিয়ে আর বাড়ি যাওয়া চলবে না....সেখানে তো কোনো শক্তসমর্থ পুরুষ নেই যে ওটাকে ঠেকাতে পারে। ট্যাকসিটাকে খানিক ঘুরপথে নিয়ে গিয়ে সমরদের হাউসিঙ কমপ্লেকসের একেবারে সামনে গিয়ে নেমেছিলাম। বিপদে আপদে ওরা তিন ভাই-ই আমার ভরসা। ট্যাকসির ভাড়া চুকিয়ে কোনোরকমে ছুটে গিয়ে লিফটে উঠেছিলাম। আবার ভেবেছিলাম লিফটম্যানকে বলি, একটা অদ্ভুত মতন লোক যদি এসে জিজ্ঞেস করে আমি কোন্ অ্যাপার্টমেনটে ঢুকেছি তবে যেন বলে না দেয়।..... কিন্তু বলি বলি করেও লজ্জায় বলতে পারলাম না.....আর কতক্ষণই বা সময় পেলাম বেসমেনট থেকে আটতলায় উঠে আসতে আসতে! এই বয়সে আমার মতন একজন প্রৌঢ়া মহিলার পেছন-পেছন একটা হতভাগা ছুটে আসছে কুকুরের মতন শুঁকতে-শুঁকতে....বলা যায় এই কথাটা কাউকে? আর ভয়ে গলা তো কাঠ হয়েই ছিল।.....কোনো ক্রমে "এইট্‌থ্ ফ্লোর" ছাড়া আর কিছু গলা দিয়ে বার হয় নি।

লিফট থেকে অ্যাপার্টমেনটের দরজা দশ হাত দূরেও নয়....মনে হচ্ছিল যেন অনেক-অনেক দূর। সর্বশক্তি দিয়ে বেলটা টিপে ধরে দরজায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম....এমন কাঁপছিল সারা শরীর যে ভয় হচ্ছিল পড়ে যাব।....শৈশবের মতন ভয়ে পিঠ কুঁকড়ে যাচ্ছিল। ওরা যে যেখানে ছিল সবাই হুড়মুড় করে ছুটে এসেছিল দরজায়...সমর অলক, মিনু...বাচ্চারাও বোধ হয় কেউ বাকি ছিল না। দরজা খুলতে ওদের তিন মিনিট লেগেছিল কিনা সন্দেহ অথচ তারই মধ্যে যেন একটা হইচই শব্দ উঠে এসেছিল অনেক নীচে সিঁড়ির গহ্বর থেকে।

এত সকালে ওইরকম সন্ত্রস্ত অপ্রকৃতিস্থ চেহারায় আমাকে দেখে ওরা যত ভয় পেয়েছিল ততই অবাক হয়েছিল। আমি কেবল বলেছিলাম,"বলছি সব....আগে দরজাটা ভালো করে বন্ধ কর্....কিছুতে খুলবি না।.....'

'কেন....কেন....কে.... কী?

'আগে জল দে...আর আমি একটু শোব....।' বলতে-বলতে কোনোরকমে ওদের একটা শোবার ঘরে ঢুকে নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় ফেলেছিলাম। মিনু জল এনে দিয়েছিল। খেয়ে একটু দম নিয়ে যেই কথা বলতে গিয়েছি....অমনি আবার বাইরের দরজার ঘণ্টা পাগলের মতো বেজে উঠেছিল। আমি আর্তনাদ করে উঠেছিলাম, 'খুলবি না, খুলবি না। কিছুতেই খুলবি না।.....

মিনু ছুটে গিয়েছিল শোবার ঘরের দরজাটাও বন্ধ করার জন্য। তার আগেই আমি শুনতে পেয়েছিলাম, বাইরের দরজার পাল্লায় স্টীলের চিমটের বেপরোয়া খটখটানি। আবার চিৎকার করতে গেলাম.....গলা দিয়ে আওয়াজ বার হল না।.....

আমার ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভেঙে হাত পা অসাড় লাগছিল অনেকক্ষণ। এদিকে ঘেমে বিছানা পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। আর গলা কাঠ। বোঝা গেল, ওটা স্বপ্ন। সত্যি জল খাই নি মিনুর হাত থেকে। তখন উঠে বসে পাশের টিপয়ের উপর ঢেকে-রাখা জলের গেলাশ থেকে জল খেলাম। তারপর বেডসুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেখলাম রাত প্রায় আড়াইটা। এমন একটা বিদ্‌ঘুটে স্বপ্নের কোনো অর্থ না খুঁজে পেয়ে ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। তবে সব দুঃস্বপ্নেরই তো একটা লাভের দিক থাকে—জেগে উঠে মনে হয়, 'আহ্ বাঁচলাম।' মনে হয় জীবনের সব অপ্রিয় অভিজ্ঞতার শেষেই যদি এমন পরম শান্তিময় জাগরণ থাকত।

কিন্তু মনের ওই শান্তিটা বেশিক্ষণ টিকল না। স্বপ্নটা আমাকে কেবলই কুরতে লাগল। অবশ্য কেউ হয়তো বলবে 'স্বপ্ন তো স্বপ্নই, তার আবার অর্থ হয় নাকি। মিছে মাথা ঘামানো।' কিন্তু না ঘামিয়েও পারছিলাম না। খানিকক্ষণ একটা বই পড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন লাগল না। একটা চাপা অস্থিরতা.....অদ্ভুত একটা অস্বস্তি লাগছিল।....ঠিক ভয় নয় কিন্তু প্রায় ভয়েরই মতন।

স্বপ্নটার কোনো যেন মাথামুণ্ডু নেই।....আর এরকম দম-আটকানো স্বপ্ন জীবনে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ল না।......আমার স্বপ্ন সাধারণত খুব সাদামাটা হয়। জাগরণে যে সমস্যার কোনো সমাধান পাই না, যে উদ্বেগ থেকে উদ্ধার পাই না, তারই একটা আপাত-সমাধান অনেক সময় ঘটে যায় স্বপ্নে। এইসব আটপৌরে স্বপ্নের মাঝখানে এমন একটা জটিল স্বপ্ন দেখে আমার খুব বিমূঢ় লাগছিল।

অবশ্য সাদামাটা স্বপ্নের অর্থ খোঁজার একটা ঝোঁক আমার আছে। ইউনিভার্সিটিতে আমার বন্ধু ছিল পদ্মিনী সরকার .....ও পড়ত সাইকোলজি, ড. হরিপদ মাইতির ছাত্রী ছিল। ওর কাছে একবার শুনেছিলাম যে, যে কোনো স্বপ্ন দেখার পরেই যদি সত্যিকারের অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা নিয়ে নিজেই মনের আনাচকানাচ খুঁজে দেখি তন্ন তন্ন করে, তাহলে আমরা বেশির ভাগ

স্বপ্নেরই একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নিজেরাই। হতে পারে সেই ব্যাখ্যার সবটা আমরা অন্যের কাছে স্বীকার করতে পারি না কিন্তু নিজে বেশ বুঝতে পারি স্পষ্ট, কোন্ অস্বস্তিকর ব্যাপারটা স্বপ্নে কোন্ চেহারা নিয়েছে। এমন-কী স্বপ্নের অনেক ঘটনা আর বস্তুর প্রতীকী চেহারাটাও ধরতে পারা যায় ওইভাবে তলিয়ে ভাবলে। ওর কাছ থেকে শোনা অবধি মনে-মনে স্বপ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করার একটা অভ্যাস আমার আছে। সব স্বপ্নেরই একটা বোধগম্য অর্থ খুঁজে বার করার চেষ্টা করি। এই পাখা-কাঁধে কবন্ধটার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলেই মহা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। অবচেতনের কোন্ কারিগরিতে ওই রোবটের মতন মানুষটার সৃষ্টি হয়েছে কিছুতেই ঠাহর করতে পারছিলাম না। অনেক হাতড়ে দেখলাম মনের গলিঘুঁজি অন্ধিসন্ধি।

তারপর এক সময়ে আবার ঘুম এসে গেল। ঘুম ভাঙল অন্য দিনের চেয়ে অনেক দেরিতে। ভাগ্যিস পবিবার। কিন্তু মুখে যেন বিস্বাদ লেগে আছে তখনও ছুটির দিনের পক্ষে বড়োই বেমানান।

চায়ের প্রথম কাপটা শেষ হতেই মনে পড়ল কাল সন্ধ্যায় ভেবেছিলাম সুরভিকে একটা চিঠি লেখা দরকার। ঠিক কী লিখতে চেয়েছিলাম ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল সুরভি একটা মনের মতন কাজ পেয়েছে তার অফুরন্ত অবসরকে ভরে তোলবার জন্যে। বস্তির ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ফ্রী ডে কেয়ার সেনটার করেছেন এক ভদ্রলোক। পড়াশোনা, ছবি আঁকা, গান-বাজনা, নাচ, নাটক করা....এসব তো আছেই। তা ছাড়াও আহার বিশ্রাম খেলাধুলোর ব্যবস্থাও আছে। ভোর না হতেই বাপ-মা দিয়ে যায় তাদের ছেলেপুলেদের .....আবার সন্ধ্যায় তাদের কাজের শেষে এসে বাড়িতে নিয়ে যায় ফিরিয়ে সুরভি তাদের পড়ায়, ছবি আঁকায়....নতুন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ পেয়ে তার ভারি ভালো লাগছে।

আমিও তার জন্য খুব খুশি হয়ে উঠেছিলাম। কতবার সুরভি বলেছে তাকে এমন একটা কাজ দিতে যা অর্থকর হবার দরকার নেই, তৃপ্তিকর হলেই হবে। আমি ভেবে পাই নি কী পরামর্শ দেব।....তবু সুরভির মনে একটা সংশয় আছে মনে হল।....'আনন্দলোক'-এর এই প্রতিষ্ঠাতাকে তার যেন কেমন অদ্ভুত লাগে....অনেকে নাকি খুব ভয় পায় তাঁকে....ভদ্রলোকের স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে থাকতে না পেরে একটি সন্তানকে নিয়ে দেশত্যাগ করেছেন। .....নানারকম গুজব শোনে তাঁর সম্বন্ধে।

গুজবে আমার অভিরুচি নেই। তাই সেসব শোনা হয় নি। আমি তাকে বলেছিলাম, 'তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাকবে.....যতটুকু নয় তার বেশি কাছে না ঘেঁষলেই হল।' এরপর আমাকে একটু অবাক করে দিয়ে সুরভি বলেছিল ভদ্রলোক নাকি আমাকে চেনেন। নাম জানতে চাইলাম। নামটা ঠন করে কানে বাজল। হ্যাঁ আমিও চিনি বইকি, অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, তবে ক্বচিৎ কদাচিৎ নাম দেখেছি কাগজে, ওইরকম জনহিতকর কাজের সূত্রেই বোধহয়। সুরভিকে সে কথা বলায় সে বলল, 'একদিন আমি খুব প্রশংসা করছিলাম আপনার, ভদ্রলোক শুনে বলেছিলেন, তাঁর কিন্তু ধারণা একেবারে অন্যরকম। কেন তা যদি আমি জানতে চাই তাহলে বলতে পারেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম না সে জানতে চেয়েছিল কিনা। কিন্তু বোঝা গেল চেয়েছিল, নইলে এরপর সে কেন বলল, 'আমি তাঁকে বলেছি, আপনি যতই যা বলুন, যাঁকে আমি এতকাল ধরে ঘনিষ্ঠভাবে জানি তাঁর সম্বন্ধে আমার মত পালটাবে না।'

আমি কিছুই বললাম না এর উত্তরে। সুরভি অন্য নানা কথা পাড়ল। তারপর বিদায় নেবার সময় একটু টিপ্পনী কেটেছিল, 'এদিকে আপনার সম্বন্ধে কত কথা যে জিজ্ঞেস করলেন। শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম।

তাই সকাল বেলাতেই চিঠি লিখতে বসলাম কাগজ কলম নিয়ে। আমারও কয়েকটা কথা বলা দরকার সুরভিকে। আবার কবে আসবে তার জন্য বসে থাকা ঠিক হবে না। তাকে বলতে চাই যে ওই ভদ্রলোককে আমি একজন ঈভিল জিনিয়াস বলে জানি। সুরভিকে ভর করে কোন্ দিন না তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতে চলে আসেন....ভাবতেই আতঙ্ক হচ্ছে।....মাথায় একটা যেন বিদ্যুতের আঘাত লাগল। এই তবে সেই কবন্ধ!

খোলা কলম বন্ধ করলাম। অনেকক্ষণ থুতনিতে হাত রেখে ভাবলাম। শেষকালে নিজেকে বললাম, 'থাক...আমি কেন নিজেকে ছোটো করব....ও নিজেই আবিষ্কার করুক কে কী!' কাগজকলম তুলে রাখতে রাখতে নিজের অহংকে ধন্যবাদ দিলাম, আমার অবচেতনার ভয়ের কাছে আমাকে হেঁট হতে দেয় নি।

রবিবারটা এবার রবিবারের মতনই লাগল।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৪৯/সংখ্যা ৮ : ১৩৯৫]

অবৈধ

মীনাক্ষী ঘোষ

[জন্ম ১৯৪৮সালে জামশেদপুরে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতাও করেছেন। ধ্রুপদী নৃত্য ও সংগীতের সাধনায় নিয়োজিত এই লেখিকার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: মরুৎচুম্বির মায়াপুরী।]

কবির সাথে আমার নাকি প্রেম আছে ; লোকে বলে। আমাদের দেশে তো অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্ব-সম্পর্ক স্বীকৃত নয়। নায়ক-নায়িকা বিবাহিত বলে তাদের সম্পর্ক বৈধ, অবিবাহিত হলে অবৈধ। ব্যাস, এর উপর আর কথা নেই। শ্রীরাধার আমল থেকে সেই একই ব্যবস্থা কায়েম। ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি আর প্রথা সবই তো প্রাচীনত্বের গৌরব দাবি করতে ব্যস্ত; পুরাতনীর গৌরবেই আমরা বাঁচতে ভালোবাসি। অতএব প্রথাসিদ্ধভাবে কবির সাথে আমার অবৈধ প্রণয়। তাতে জনতার মনে কোনো দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশই নেই। শুধু আমারই মনে যত ধন্দ। মাঝে-মাঝেই ভাবি প্রেম মানেটা কী? প্রেম মানে কি সঙ্গলাভের ইচ্ছা? তা , কবির সঙ্গলাভের ইচ্ছাটা আমার মধ্যে যথেষ্টই আছে। কবিকে ছাড়া দুটো দিন চলে না। কিন্তু তার মানেই কি প্রেম? নাকি প্রেম মানে বিছানা, নিদেনপক্ষে একটি চুমু? কিন্তু কোনোদিন যে কবির হাতটাও ধরে দেখা হয় নি— তাতে পৌরুষের অটল-উদার-বিস্তৃত সুগন্ধ আছে কিনা। এমনকী এ পোড়া মনের কোনায় সে ইচ্ছাটুকুও কখনো উঁকি মারে না। আসলে ওসব ধরাধরির সাধ একশ এক পার্সেনট পূর্ণ হয়ে গেছে বিবাহিত জীবনে। আমার যে বজ্রের মতো স্বামী আছে। লোকে বলে বজ্রের মতো স্বামী থাকতে মোহনার এ কেমন দুর্মতি? এমন স্বামী ছেড়ে ওরকম একটা ম্যাড়ম্যাড়ে পুরুষের প্রেমে ও পড়ল কেমন করে? প্রতিবেশিনীদের ভারি বিতৃষ্ণা আমার প্রতি। গতকাল সন্ধ্যায় আমাদের ব্যালকনিতে আমি আর কবি যখন চায়ের কাপে কবিতা দোলাচ্ছিলুম, তখন সামনের ব্যালকনিতে, একজোড়া দরজা সমুদ্রের গর্জনকে হার মানিয়ে সপাটে চোখ বন্ধ করে আমাদের সম্পর্কে আপত্তি জানাল। সেইদিকে চেয়ে আমি হেসে বললুম, 'কবি, বন্ধ দরজা নিয়ে একটা কবিতা বানাও।'

কবি অমনি বলল,

'জোয়ারি সমুদ্রের অবিরত উদ্দাম করাঘাত,

তবু বন্ধই থেকে যায় দোব।

বালির কাঁচুলি যেন দ্রৌপদী-আবরণ

হার মেনে ফিরে যায় ঢেউয়েদের নখ।'

---বাঃ বেশ। এখুনি বানালে?

---না, না। কালরাতে সমুদ্র দেখতে-দেখতে লিখেছিলাম। আমি কি তোমার মতো জাদুকবী, যে বলামাত্রই কবিতা বানিয়ে ফেলব?

—চটপট লিখতে পারলেই কি কবিতা হয়, কবি? আমার তো মনে হয় যেন কিছুই লিখতে পারি না।

—তোমার মধ্যে জাদু আছে মোহনা। তুমি লিখে যাও। সার্থক সাহিত্যিকের সম্মান তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

এই হল আমাদের প্রণয়ভূমি। সাহিত্যচর্চার মধুতে আমরা দুটি অনাত্মীয় স্ত্রীপুরুষ জমে থাকি প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই। বজ্র তার কর্মজীবন নিয়ে খুবই ব্যস্ত। তবু কদাচিৎ যোগ দেয় আমাদের আসরে। বজ্র কবিতা বোঝে না, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে বোঝে। প্রতিবেশীদের গাত্রদাহ তার মানসিক শান্তিতে কখনও আগুন ধরায় না। সে কারণে আমাদের এ বহু-আলোচিত অবৈধ প্রণয়টি কন্টকবিলাসবিহীন, ভারি সাদামাটা। একদিন বজ্রকে প্রশ্ন করেছিলুম,

—আমি যে নিত্যি কবির সঙ্গে রাত অবধি আড্ডা মারি, তোমার হিংসে হয় না?

—কেন হবে? তুমি কি কবির প্রেমে পড়েছ?

—প্রেম কাকে বলে?

—বোধহয় ভালোবাসাকে।

—ভালোবাসা কাকে বলে?

—সব সময় হেঁয়ালি।

—দেখো, কবিকে ভালোবাসি কিনা জানি না, তবে এখনও তাকে ঘৃণা করি নি।

—এখনও করি নি মানেটা কী? পরে ঘৃণা করবে?

—হ্যাঁ। কবি যেদিন বলবে, মোহনা, আমি তোমায় ভালোবাসি। প্রেম ব্যাপারটা যে কী, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথার অবধি নেই, সেই কৈশোর জীবন থেকেই। তখন বয়েস বোধহয় পনেরো। একপাল ছেলে-বন্ধুর সাথে বাড়ির লনে ক্রিকেট পিটে দিন বেশ হই-হই করে কেটে যাচ্ছে। সে সময় একবাব টানা সাতদিন ধরে বৃষ্টি। খেলাধুলো বন্ধ। বৃষ্টি-ঝমঝমে সবুজ পৃথিবী দেখতে-দেখতে আমার সব সময় নেশা লেগে যায়। সেদিন শুধু ভিজে বাতাসে চুল উড়িয়ে, বৃষ্টির গুঁড়োয় শরীরমন মেলে বসে আছি বারান্দার রেলিঙে, হঠাৎ উদয়ন এসে পিঠে হাত রাখল, যা আগে কখনই করে নি। আমি কিছু বুঝবার আগেই আমার শরীরের আকাশ চিরে এপার ওপার বিদ্যুৎ শিউরে গেল। তার নাম কি প্রেম ছিল? আমি শরীরের থরথর সুখ চেপে প্রশ্ন করেছিলুম,

—আজ খেলা নেই, তবু এসেছিস কেন?

—তোকে দেখতে, মোহনা।

—কেন?

—ভালোবাসি।

সেই পনেরো বছরেই ভারি চিন্তা জন্মাল, উদয়নকে আমি কি ভালোবাসি? বর্ষাবেলায় কই তার কথা তো আমার মনে পড়ে নি। তবে একটি আঙুলে সে আমার শরীরের সেতারে অমন ঝঙ্কার তুলল কেন? এখনও কেন বেশ ঝিমঝিম করে শিবায় শিরায়? কাকে বলে ভালোবাসা? এই যে তারপর থেকে কেবলই মনে পড়ছে উদয়নের মুখ—এ স্মৃতি তো

কালও ছিল না। ক্রিকেট খেলার চেয়েও অনেক সহজ ব্যাপার এই ভালোবাসা। শুধু একবার পিঠে হাত, একটুকরো কথা 'ভালোবাসি'। ব্যাস! এই! শুধু এমনি করে হীররঞ্জা, রোমিও-জুলিয়েট, লায়লা মজনুরা প্রাণ দিয়ে দেয়? আশ্চর্য, বড়োই আশ্চর্য।

নাঃ, এর পরেও উদয়নের সাথে তথাকথিত প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। কারণ উদয়ন যতবার নীল খামে কিংবা চোখের পরদায় প্রেমের ছবি বাড়িয়ে ধরেছে, ততবার আমার মনের সব সুখানুভূতিকে মাটি করে এক তর্কবীর উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছে—'তাহলে প্রেম মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে?' অঞ্জন, শুভময় কিংবা বীরেশ, কোনো ঘোরলাগা বরষায় পিঠে হাত রাখলে ঠিক একই ভাবে হৃৎপিণ্ডের রক্তস্রোত হয়ে উঠত নাকি নায়েগ্রা প্রপাত? অথবা বৃষ্টির মদে আওয়াজ ভিজিয়ে কেউ যদি বলত, 'ভালোবাসি' তবে? ইচ্ছে কি হত না আমার, সবকিছু উজাড় করে হয়ে যাই লায়লা, কিংবা আনারকলি? তবে অঞ্জন নয়, শুভময় নয়, বীরেশও নয়;উদয়ন কেন? ভালোবাসা কি একটা অভ্যাসমাত্র নয়? উদয়ন, শুভময়, অঞ্জন কিংবা অন্য কোনো জন—যে কোনো সময় কারুর সাথে,শুরু করলেই তো হল। বেশি তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই। বরং ভালোবাসা ব্যাপারটাকে ভালো করে বুঝে নিতে চাই। তা কি কেবল দুটো মানুষের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই জন্ম নেবে? কিন্তু আমার যে অনেক বিস্তৃত কিছু চাই। কিন্তু ঠিক কী আমার পথ বুঝে উঠতে পারি না, তবে খুব বড়ো একটা কিছুর জন্য আমার ভেতরটা ছটফট করে। তখন কলেজের বন্ধু-বান্ধবীরা অনেকেই প্রেমের কবিতা এবং গল্প লেখবার চেষ্টা করছে। আমি লিখে ফেললাম একখানা রম্যরচনা যার শিরোনাম 'সখি, ভালোবাসা কারে কয়।' লেখাটা আমাদের কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হতে, যেন অপ্রত্যাশিত হইচই পড়ে গেল। আমি হঠাৎ করে বেশি রকম প্রকাশিত হয়ে পড়লুম। হঠাৎ করে প্রেমপত্রের সংখ্যার হারও বৃদ্ধি পেয়ে গেল দেখলুম। কিন্তু আমার তখন প্রেমে পড়ার অবসরই নেই। আমি আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছি, জেনে গেছি লিখতে পারি। লোকে প্রশংসা করে। একটা যে বিস্তৃত আগ্রহ জীবন আর পৃথিবী সম্পর্কে আমার মধ্যে হুড়হুড় করে বেড়ে উঠছিল, এখন লেখার মধ্যে যেন সেই বন্যা আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেল। লেখার বাতিক অল্পস্বল্প অবশ্য আগেও ছিল, কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে ফেললুম,—আমি সাহিত্যিক হব।

সেই থেকে লেখার সাধনায় মেতে গেলুম একেবারে। একই লেখা বারে-বারে ফিরে ফিরে লিখে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলুম ক্রমাগত। খুব ভালো লেখা হওয়া চাই, তবেই তো বিস্তৃত পৃথিবীর বিস্তার তুলে ধরা যাবে। আমার বান্ধবীরা যখন জুবিলি পার্কে সহপাঠীদের সাথে প্রেম করতে ব্যস্ত, আমি তখন ভাবছি ওসব নয়, অনেক বড়ো দায়িত্ব নিয়ে আমি জন্মেছি। আমাকে সে দায়ভার পালন করতেই হবে, নইলে রেহাই নেই। এরই মধ্যে হঠাৎ শুনলাম অভিভাবকেরা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন।

দুই

বন্দরকে ঘিরে অতি ছোট্ট জনবসতি এই পারাদ্বীপ। এইখানে আমি বজ্রর ঘর করতে এলুম। সাহিত্য তো দূরস্থান, একখানা ফিল্মের ম্যাগাজিনও এখানে সহজলভ্য নয়। তবে বাড়িতে সকলেই মনে করেছে বজ্রর মতো স্বামী যখন পেয়েছি, তখন আর অন্য কিছুর দরকার থাকতেই পারে না। লোকে বলে আমার স্বামী-ভাগ্য দারুণ। আর আমি ভাবি, আমি ঠিক কেমন স্বামী

চেয়েছিলুম। কেমন মানুষকে একজন আদর্শ স্বামী বলা যেতে পারে। কী-কী যেন পাঁচখানা গুণ স্বামীর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন দ্রৌপদী? তা সবই তো পেয়েছিলেন তিনি, তবু লাঞ্ছনার একশেষ। অতএব স্বামীর গুণবিচারে কাজ কী? বজ্র যেমনই হোক, সে আমার স্বামী। ব্যাস, এই শেষ কথা। এর চেয়ে বেশি ভেবে লাভ কী? আজ যদি বজ্রকে পছন্দ না হয়, তবে কি স্বামী বদল করা যাবে? এদেশে এখনও কতটুকুই বা স্বাধীনতা মেয়েদের? কলেজের বান্ধবী সালমা বলেছিল,'তবু তোমরা হিন্দু মেয়েরা অনেক স্বাধীন। আমাদের মুসলিম সমাজে মেয়েদের কী অবমাননা দেখো। মসজিদে গিয়ে উপাসনার অধিকার পর্যন্ত নেই আমাদের।'

শুনে মনে-মনে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসেছিলাম। আহা, নারীর কত সম্মান হিন্দু সমাজে! তাই তো পুণ্য শাস্ত্রের বচন: 'নারী নরকের দ্বার'। মন্দিরের দোর খুলে দিয়ে স্বর্গের দোর বন্ধ রাখা হয়েছে। নারী তবে কি মন্দিরের দোর দিয়ে নরকে ঢুকবে? "রামকৃষ্ণ কথামৃত"-তে দেখি-- রামকৃষ্ণদেবের মতো মানুষও বারে-বারে বলেছেন কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করতে। অর্থাৎ টাকা-পয়সা -গোরু-বাছুরের সাথে নারীকে একই পাল্লায় দাঁড় করিয়েছে সমাজের সর্বকোটির পুরুষেরাই। রাজা এবং সন্ন্যাসীর চিন্তাধারায় সেখানে তফাত নেই কোনো। বজ্র বলে, 'মোটেই না, শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসলে নারীর প্রতি অন্ধ আসক্তিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। আসক্তি ছাড়া নারী তো মহাশক্তি। স্বয়ং সারদা-মা-ই তার নজির।'

বজ্রর কথা মানছি একশ-একবার । কিন্তু তবু আমার নালিশ স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে: এই যদি মনে ছিল ঠাকুর, কামিনী না বলে কামনা বলেন নি কেন,বাপু? তা হলে উভয় পক্ষের দাঁড়িপাল্লাটি সমান থাকত। যত দোষ কেবল কামিনীর! কই, নারীকে তো কখনও একই রকম মুক্তিমন্ত্রে উদ্বোধিত করে বলা হয় নি পুরুষেরা নরকের দ্বার, তাদের ত্যাগ করো। নারীকে ছাড়লে পুরুষ যাবেন স্বর্গে আর পুরুষকে ছাড়লে নারী তোমার গায়ে শতবার থু। কারণ পতি পরম দেবতা।

পরিস্থিতি যখন এই, তখন আমার পক্ষে বজ্রর পত্নীত্বই শেষ কথা। আমি বজ্রর বউ--- এই আমার একমাত্র পরিচয়। বিয়ে হয়ে যখন এলুম তখন নতুন পরিস্থিতিতে আমার নিজস্ব নামটাও লোপ হয়ে গেছে দেখলুম। পাড়ার মেয়েরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলে, 'বজ্রদার বউ এমন কিছু দেখতে হয় নি।' পিসিশাশুড়ি বলেছিলেন, 'তা আমাদের বজ্রর বউ রাঁধে বেশ।' পাড়ার সীতেশকাকা তো কোনোদিন নামই জিজ্ঞেস করেন নি আমার। এ বাড়িতে যখনই এসেছেন, দরাজ গলায় হাঁক দিয়ে বলেছেন, 'কই গো বজ্রর বউ, বজ্র বুঝি এখনও ফেরে নি?' আর অফিসের পার্টিতে? সেখানে তো মিসেস বাসু ছাড়া অন্য কোনো পরিচয়ই থাকতে পারে না।

আমি বজ্রর বউ। অতএব সকালবেলা চোখ মেলে প্রথমেই মনে হয় বজ্রকে সময়মতো পছন্দমতো ব্রেকফাস্ট দিতে হবে। ডিমের একই প্রিপারেশন বজ্র রোজ পছন্দ করে না। দুধের গেলাসে বোর্নভিটা গুলতে-গুলতে ভাবি যে ড্রেসটা বজ্রর জন্য রেডি করে রেখেছি তার বোতামগুলো তো চেক করা হয় নি। বজ্র অফিসে রওনা হলে ভাবি গতকাল তেতো চচ্চড়ি রান্না হয়েছিল, আজ করলার অন্য প্রিপারেশন করব, স্টাফড করলা করলে বজ্র ভালো খাবে। মুরগির স্টু প্রায়ই করি, আজ নার্গিস-ই কাবাব করলে কেমন হয়। বেলা পড়ে এলেই গা ধুয়ে নিত্য নতুন শাড়ি, গয়না, সাজ-গোজ। তারপর ব্যালকনিতে ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকা। যেন

বজ্র এখনই এসে নিয়ে যাবে বেড়াতে। জানি বজ্রর অত সময় নেই, তবুও পড়ন্ত বেলার ব্যালকনিতে একটি অপেক্ষার ছবি হয়ে গেছি বছরের পর বছর। অনেক রাতে মেকাপের জমি ফেটে সারা মুখে ক্লান্তির শেকড়বাকড়, চোখের পল্লব ঘুমের আঠায় চটচটে, তবু, যেই কলিংবেল ডাক দিয়েছে অমনি পরম অনুগত কুকুরটির মতো লেজ নেড়ে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি প্রভুকে স্বাগতম জানাতে। বজ্রর জন্য রান্না, বজ্রর জন্য সাজ, বজ্রর জন্যই বাঁচা। এইরকম বাঁচার চাকায় কখন পিষে হারিয়ে গেছে সাহিত্যচর্চা। বজ্রর বউ হয়ে বাঁচবার অভ্যাসে মোহনা হয়তো মরেই যেত, যদি না হঠাৎ কবিতার রীল নিয়ে কবি পৌঁছে যেত পারাদ্বীপের এই ব্যালকনিতে। যদি না বলত, ' মোহনা, তোমার মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা।'

আবার মহা উৎসাহে আমি কলম ধরলুম। কবি দু' এক জায়গায় আমার কবিতা-প্রবন্ধ গল্প ছাপিয়েও দিল। ভারি আশ্চর্য লাগল দেখে লেখাগুলোর মাথায় ছাপার অক্ষরে যে নাম লেখা আছে তা মিসেস বাসু নয়, শুধুই মোহনা। আমি কেবলমাত্র মিসেস বাসু নই, নই খালি বজ্রর বউ;আমি মোহনা, আমি মোহনা। হুড়হুড় করে আমার কলম চলতে লাগল। আঃ, এখন রোজ মনে হয় আমি মরে যাই নি, বেঁচে আছি। আমি লিখি, কবি শোনে। মাঝে-মাঝে সমালোচনা করে কঠোর ভাষায়, আবার কখনও বা বলে, 'লিখে যাও তুমি, তোমাকে আমি মানুষের কাছে তুলে ধরব। তোমার বই ছাপাব।' কোনোদিন বা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় হইহই করে ওঠে, 'কী দারুণ লিখেছ, মোহনা। তুমি জন্ম-লেখিকা। তুমি যদি না লেখ তোমার পক্ষে সেটাই বড়ো অন্যায়।'

সন্ধেগুলো এখন আর ভাঙাভাঙা পাখির মতো বারান্দায় পড়ে গুমরায় না; তার জুটে গেছে কবিতার অপার আনন্দময় আকাশ।

তিন।

কী সুন্দর তোমার চোখ, মোহনা। তোমার নাম দিলাম সুনয়না।' বছরখানেক বন্ধুত্বের পর আমার মুখের দিকে একদিন অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে বসল কবি।

'জানলে, কাল সুনয়না নামে একটা কবিতা লিখেছি, তোমারই কথা ভেবে।

'সুনয়না জোড়াদীঘি ভরা তরল বাসনা
পল্লবের অন্ধকার বনানী-রেখায়
বেঁধে কেন রেখেছ তুমি....'

'কবি থামো।' যদিও আত্মপ্রশংসা শুনতে ভালোই লাগছিল, তবুও থামালাম;কারণ কোনো গোলমাল পাকিয়ে তুলতে আমার উৎসাহ নেই। বললাম,

'সুনয়না ভাসায় না অন্য কোনো অপেক্ষিত ঘর
উজানি চাঁদনিতেও মাতাল জোয়ারি কেউ
বাঁধ ভেঙে ছাপায় না পার।'

'সাধু সাধু। এমন টপ করে কবিতা বানাতে কাউকে দেখি নি। কিন্তু সুনয়না, ঘর তুমি ভাসাও না জানি, তবু ঘরছাড়া পথিককে দু দণ্ড আশ্রয় দিলে এমন কী-ই বা ক্ষতি?'

'খামকা সেন্টিমেনটাল হোয়ো না, কবি। তাতে কখনও ভালো কবিতাও তৈরি হয় না, আর ভালো ঘরও গড়া যায় না। ঘর থাকতেও তোমার যে এমন ভ্যাগাবনড অবস্থা তার জন্য তুমিই দায়ী।'

বিবাহিত জীবনে কবি ভারি অসুখী। তার একদা প্রেম-বিবাহিত বধূ তার সাথে থাকতে নারাজ। সে অন্য শহরে চাকরি করে। ছুটিছাটায় পরস্পরের দেখা। তার বেশি তারা সহ্য করতে পারে না পরস্পরের সঙ্গ। কবির অভিযোগ—তার বউ তার কবিতা শুনতে নারাজ। আমার তো ধারণা—দিনরাত কবিতা শোনবার ভয়েতেই কবির বউ গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চায়। অ-কবি বউকে দিনরাত কবিতা শুনিয়ে যে অত্যাচার করা যায় তা বোধ হয় শত মারধোরের মাধ্যমেও সম্ভব নয়। আমার তো মনে হয়—মাতাল স্বামীর চেয়ে কবি স্বামী বেশি অসহনীয়।

কবি প্রায়ই বলে, 'মোহনা, তোমাদের জোড় বড়ো ভালো। তুমি কবিতা লেখ, বজ্রর তাতে কত উৎসাহ। তোমার কবিতাগুলো প্রথমে নিশ্চয়ই বজ্রই শোনে সব? আমার তো এমন কপাল যে বউ মোটে কবিতাই শুনতে চায় না।'

আমি শুধু একটুখানি হাসি। বলি না যে বজ্রর উপর এমন অত্যাচার কখনও করে দেখি নি। বলি না, গণতকারেরা রাজযোটক মিল ঘটাতে পারে না, জোড় বাঁধবার জন্যও সাধনা করতে হয়। শুধু বলি, 'কবিতা শোনাও, কবি। দেখি নতুন কী লিখেছ।'

কবির কবিতায় গভীর বিষণ্ণতা আর নিঃসীম একাকিত্ব জোরদার হয়ে বাজে। প্রায়ই অনুভব করি আমার আর বজ্রর সাজানো ঘরকরনার ওম কবির ভিতরটাকে তাতিয়ে তুলছে। বুঝতে পারি একটা সঙ্গিনীর অভাব থেকে-থেকেই যেন সামনের সমুদ্দুরটার আকার ধরে নিতে চায় ওর ভিতরে। এমনি এক সমুদ্দুর অভাববোধ নিয়ে কবি একদিন বলে বসল,

'মোহনা, একদিন আমার সাথে সিনেমায় চলো।'

'কবি, কবিতা শোনাও। সিনেমা বজ্রর সাথে দেখব।'

'তোমার মন কি কখনও দুর্বল হয় না, মোহনা? ক্বচিৎ এক-আধটা দিন?'

'দুর্বলতা মানে তো অভাববোধ, কবি। যেদিকে অভাববোধ নেই সেদিকে দুর্বল হই কোন্ পথে বলো'?

'মিথ্যে কথা। এতই যদি সুখী তুমি বজ্রকে নিয়ে তবে আমায় রোজ ডাক দাও কেন?'

'কবিতার জগতে তুমি আমার সমমর্মী। বজ্র কবিতা বোঝে না।'

'সমমর্মীব সঙ্গই তো লোকে কামনা করে। সমমর্মীই তো মনের মানুষ।'

'শুধু কবিতা ছাড়া আর কোনোখানে তুমি আমি মিলি নি। দোহাই তোমার, এই কথাটি মনে রেখো।'

কবি অভিমান করে অ-সময়ে উঠে চলে যায়। সমুদ্রের বাতাস অভুক্ত চায়ের পেয়ালায় বালি ফেলতে থাকে। আমি ভাবি, দাম্পত্য মানেটা কী? একটা সমঝোতা মাত্র নয় কি? ভালোবাসারও বুনিয়াদ কি একটা অভ্যাসমাত্র নয়? বজ্রর সাথে দাম্পত্য এবং ভালোবাসার একটা লাইসেন্স সমাজ আমাকে বানিয়ে দিয়েছে। অতএব আমি সেই লাইসেন্স হাতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। আমি বজ্রর সঙ্গে শুই, বজ্রর সাথে বেড়াতে যাই, বজ্রকে ছাড়া থাকতে আমি পছন্দই করি না। বহু বছর ধরে এইভাবে বাঁচবার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে আমার এবং সে অভ্যাসকে বদলাবার তাগিদ আমার মধ্যে নেই। সেদিন বজ্র হঠাৎ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিল, খালি ব্যালকনি দেখে বলল, 'কী ব্যাপার? আজ আসর বড়ো তাড়াতাড়ি ভেঙে গেছে?'

'ভালোই হয়েছে। তুমি এসে গেছ, চলো দুজনে সিনেমায় যাই।'

অনেকদিন হল। কবি আর আসে না। কবির কি অভিমান হয়েছে? অথবা হতাশা? কবি তো আসলে পুরুষমানুষ, তায় স্ত্রী-পরিত্যক্ত। সুতরাং একটু-আধটু টলমল অবস্থা তার পক্ষে হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমিই বা কী করি? কবির হাত ধরবার জন্য আমার মনে কোনো আগ্রহ নেই। কবি বলেছিল, 'মোহনা, তুমি ভীতু কনজারভেটিভ।'

কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। কবি জানে না, আমার আকাঙক্ষাহীন মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে ওইসব একক প্রেম-প্রস্তাবে। আমার গা ঘিন-ঘিন করে। বজ্রও বোঝে না ব্যাপারটা ঠিকমত। 'যার সম্পর্কে তোমার গা ঘিন-ঘিন, তাকে না হলেও তো তোমার চলে না দেখি। এ কেমন দ্বন্দ্ব তোমার মধ্যে, মোহনা, বুঝতে পারি না।'

হায়, কোনো পুরুষমানুষই বুঝতে পারে না যে শুধু বিছানা আর রান্নাঘরের মধ্যেই একজন মেয়ে সম্পূর্ণতা পেতে পারে না। শুধু পুরুষমানুষের আকাঙক্ষা কিংবা প্রেমলাভই একটি নারীর জীবনের শেষ কথা নয়। প্রেম ছাড়া আরও কিছু চায় সে, চায় আত্মবিকাশের জন্য আকাশ। অতএব আবার আমিই টেলিফোনে ডাক দিই কবিকে।

'রাগ করেছ? কতদিন আস নি। কবিতা লিখেছি অনেক। শুনবে না?'

কবিও যেন ডাকের অপেক্ষাতেই দিন গুনছিল। বলল, 'তুমি ডাকলে না যেয়ে পারি? তবে আজ ব্রত এসেছে, সঙ্গে নেব।'

ব্রত বয়সে ছোটো হলেও কবিতাসূত্রে কবির বন্ধু এবং আমারও। ব্রত আমার লেখা শুনতে খুব ভালোবাসে। বলে 'তোমার কলমটা একটা ম্যাজিক স্টিক।'

ওরা দুজনে চলে আসতে মনে হল যেন ঘরের আলোগুলোর ভোল্টেজ বেড়ে গেছে। আমি কবিতার খাতা বার করতে-করতে জিজ্ঞেস করলুম, 'হ্যাঁরে ব্রত, তোকে যেন রোগা দেখছি একটু। ভালো আছিস তো? লেখা-টেখা কেমন চলছে?'

'একদম ভালো নয়। তুমি আর কবিদা বেশ আছ। পরিবেশ নাহলে একা-একা কি কবিতা চলে? অন্তত একজনও সমঝদার চাই মোহনাদি, অন্তত একটি সঙ্গী।'

'ঠিকই বলেছিস, ব্রত। অন্তত একজনও চাই। নইলে শিল্পী বাঁচতে পারে না।'

গিরিডিতে কাজ করে ব্রত। প্রাণ হাঁপিয়ে গেলে মাঝে-মাঝে ছুটি নিয়ে চলে আসে কবির ফ্ল্যাটে। দুটো একটা দিন বাঁচার রসদ নিয়ে ফিরে যায় জাঁতাকলে। আমার নতুন লেখাগুলো শুনে ব্রত একেবারে লাফাতে লাগল—'মোহনাদি, লিখে যাও। তোমাকে কেউ আর রুখতে পারবে না। এবার একটা বই বার করবার চেষ্টা কবো।'।

সেদিন বিছানায় শুয়ে অনেক রাত অবধি ঘুম আসতে চায় না। সত্যিই কি ভালো কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছি আমি? নাকি ওরা এমনিই অমন বলে। কবি ব্রত দুজনেই যখন বলছে তখন একটু নিশ্চয়ই এগুতে পেরেছি। কিন্তু বই ছাপাবার মতো হয়েছে কি? পাঠকেরা নেবে কি আমার লেখা? এই অজ পারাদ্বীপে বসে বই ছাপাবার ব্যবস্থাই বা করব কেমন করে? নানা দুশ্চিন্তায়, উত্তেজনায় এপাশ ওপাশ করি কেবল, ঘুম আসতে চায় না। বজ্রর ঘুম ভেঙে যায়। বলে,

'কী হল? ঘুম আসছে না কেন তোমার?'

'বই বার করব। সে বিষয়ে ভাবছি।'

'সে চিন্তাটা তো কাল সকালেও করা যেতে পারে। কী যে লেখার ভূত মাথায় চেপেছে তোমার। এজন্য ঘুম মাটি করার কোনো মানে হয়!'

চার

কবি বদলি হয়ে গেল গিরিডিতে। আমার ব্যালকনির সান্ধ্য ছবিতে আঁকা থাকে এখন একখানি ঈজিচেয়ার, একটিমাত্র চায়ের কাপ। সামনের ফ্ল্যাটের দরজা এখন আর সপাটে বন্ধ হয় না। বরং মহিলাটি কাপড় তুলবার ছুতোয় রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অনেকক্ষণ আর মাঝে-মাঝে তির্যক দৃষ্টিতে উপভোগ করেন আমার ক্লান্ত একাকিত্ব। তখন আমারই ইচ্ছা করে দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে যেতে। ব্রতর চিঠি এসেছে—'মোহনাদি, কবিদা এখানে আসায় আমার যে কত উপকার হয়েছে লিখে প্রকাশ করা যায় না। আমি যেন বেঁচে গেছি।' কবিরও চিঠি এসেছে—'মোহনা, তোমায় ছাড়া যদিও খারাপ লাগছে তবু একটাই সুখের কথা দিনগুলো কবিতার আকাশ থেকে ছিঁড়ে পড়ে নি। কারণ এখানে ব্রত আছে।'

শুধু আমারই দিনগুলো বড়ো বেশি দুর্বহ হয়ে গেছে। রান্নায় মন লাগে না আজকাল; বজ্রর জামা কাপড় ঠিক থাকছে না প্রায়ই। অবস্থা দেখে বজ্র বলল,'আজকাল তুমি এমন হয়েছ কেন, মোহনা?'

'আমার যে কিছুই ভালো লাগছে না। কবি চলে যেতে ভয়ানক নিঃসঙ্গ হয়ে গেছি যেন।'

'তবে তো সত্যিই তুমি কবির প্রেমে পড়েছ মনে হচ্ছে।'

'তোমরা পুরুষমানুষেরা মেয়েদের জন্য কি অন্য কিছুই চিন্তা করতে পার না বজ্র?' বজ্র লজ্জিত বোধ করে নিজের কথায়, কিন্তু ওর মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারি আমার অবসাদের কারণও ওর মাথায় ঢুকছে না। আমি বজ্রকে বলতে পারি না, শুধুমাত্র মিসেস বাসু হয়ে বেঁচে থাকতে আমি পারি না। ভয়ঙ্কর হাঁপিয়ে যাই। বিশ বছর বজ্রর বউ হয়ে কাটিয়ে দেবার পর এই সবে গোটা দুয়েক বছর হল আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছি। এখনই আবার মৃত্যুর পরোয়ানা। কিন্তু বিশ বছর আগে যা পেরেছি এখন আবার একবার তা পারি না। আমি আমার আকাশকে চিনে ফেলেছি, খাঁচায় আর কিছুতে ঢুকতে পারব না। কবি বলেছিল, 'মোহনা, স্বনামধন্য সাহিত্যিকা হবে তুমি, সন্দেহ নেই।' কবির কাছে শুনে-শুনে যে স্বনামধন্য সাহিত্যিকাকে আমি আমার ভবিষ্যতের ঘরে এঁকে রেখেছিলাম তাকে বিসর্জন দেওয়া সহজ নয়। প্রতিদিনি একটু-একটু করে কবি আমার উচ্চাশাকে বিস্তৃত করে দিচ্ছিল আমার অজান্তেই, সেই সাথে আত্মপ্রকাশের অপার আনন্দকে চিনিয়ে দিচ্ছিল ওর সঙ্গ। এখন বোকার মতো মাঝে-মাঝে বজ্রকেই ধরে বসি:

'একটা কবিতা লিখেছি। শোনো না'।

'উ: মোহনা, দোহাই, কবিতা শুনিও না। তোমাদের ও আধুনিক কবিতার মাথামুন্ডু আমি একবর্ণ বুঝি না।' নিজের আচরণে কুঁকড়ে যাই আমি। কবির বউ পালানোর করুণ ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের ক্যাম্পাসের কোনো-কোনো পরিচিতা মহিলাকে সাহিত্যের জগতে টানবার চেষ্টা করে দেখেছি তাতে বন্ধুর সংখ্যা কমে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো প্রাপ্তি ঘটে নি। অতএব একলাই ছটফট করি অন্তত একটি সঙ্গীর জন্য।

কবি যাবার সময় আমার একগুচ্ছ কবিতা নিয়ে গেছে। বলেছে, 'মোহনা, তোমার কবিতার

বই বার করব। আমি চাই লোকে জানুক তোমাকে।' আমি আশায় আছি কবে বই বের হবে। একবার বই বের হলে জানলা খুলে যাবে নিশ্চয়ই। তারপর অবশ্যই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারব বাধাহীনভাবে। কিন্তু মাসের পর মাস অপেক্ষার যন্ত্রণা আমাকে তিল-তিল করে মারতে থাকে, কবি নিরুত্তর। কবিতার সাথে-সাথে আমার সমস্ত সত্তা যেন অপ্রকাশের কারাগারে গুমরাচ্ছে। কী হয়েছে কবির? মাস দুয়েক হতে চলল চিঠি পর্যন্ত দেওয়া বন্ধ করেছে। এমন তো কথা ছিল না। অবশেষে ব্রতর শরণাপন্ন হই। ব্রত জানায়,' মোহনাদি, কবিদার বউ প্রায় মাস দুয়েক হল অসুস্থ শরীরে চাকরি ছেড়ে কবিদার কাছে এসে বাস করছেন। তাঁর দারুণ ঈর্ষাবোধ, সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তোমার সাথে কবিদার অবৈধ প্রণয়ের অভিযোগে কবিদাকে প্রায় পাগল করে তুলেছেন। শুনলে তুমি খুবই দুঃখ পাবে, একদিন কবিদার অনুপস্থিতিতে তোমার কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করা হয়েছে। কবিদার পক্ষে তোমার সাথে আর যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির মৃত্যুসংবাদ কবিদা তোমাকে জানাবেন কোন্ মুখে বলো। লজ্জায় দুঃখে আমার কাছে একদিন কেঁদে ফেলেছিলেন কবিদা।'

হায় রে অবৈধতা। তোর চেহারাটা আসলে যে কী, তা তো আজও জানলুম না। শুধু সাজা পাওয়াই সার।

আমি কবিতার পর কবিতা লিখে চলেছি। মাঝে-মাঝে ছোটোগল্পও লিখছি। কিন্তু সেসব কেমন হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার বাড়ির সামনে সারি-সারি নারকেলপাতা সমুদ্রের বাতাসে অবিরাম ঝালর দুলিয়ে কী যে সব আশ্চর্য অনুভূতি জাগিয়ে তুলছে, আমার ভিতরে আমি কি তার এক অংশও প্রকাশ করে উঠতে পেরেছি আমার কবিতায়? ঝাউবনের নিঃশব্দ নরম হালকা ছায়ার মধ্যে দিয়ে চলে যাবার অনুভূতিকে যেন কোনো শব্দের সাজেতেই ঠিকমতো তুলে ধরা যাচ্ছে না। রাত্রিতে যখন এক আকাশ জোছনার টানে সমুদ্রটা মাতাল হয়ে ওঠে তখন আমারও রক্তস্রোতে জোয়ারের উথাল-পাথাল যেন শিরা-উপশিরার বাঁধ ছিঁড়ে ফেলতে চায়। আমি পাগলের মতো ভাষার মরাই হাতড়াতে থাকি এক মুঠো বীজের জন্য। বিস্ময়কর পৃথিবী, বিচিত্র মানুষজন আমার ভিতরে প্রকাশিত হবার জন্য ছটফট করছে। গর্ভযন্ত্রণার মতোই এ এক অসহনীয় যন্ত্রণা। আমার সমস্ত প্রাণবায়ু উৎকণ্ঠিত, অথচ আমি যেন যা চাই তা কিছুতেই করে উঠতে পারছি না। আমার এ কষ্ট আশেপাশে কেউই বুঝতে চায় না, এমনকী বজ্রর মতো সমঝদার স্বামীও নয়। আর সেই জন্যই যন্ত্রণা যেন প্রতিদিন দ্বিগুণতর হয়ে উঠছে। আমি ক্রমে ভীষণভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছি। অবশেষে একদিন লিখে ফেললাম ব্রতকে, 'কদিন ছুটি নিয়ে চলে আয় না ব্রত; আমাদের বাড়িতে। তীব্র জীবনবোধের চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছি যেন। তুই একটু আশ্রয় দে আমাকে।' সব চিঠিই আমি বজ্রকে পড়াই। অতএব এ চিঠিটা পড়ে এই প্রথম বজ্র আপত্তি জানাল—'তুমি অন্য কোনো পুরুষের কাছে মানসিকভাবেও আশ্রয় ভিক্ষা করছ, এ আমার পক্ষে অপমানজনক।'

বুঝলুম ওই একান্তই অবৈধ আশ্রয়ভিক্ষা. চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিলুম। আমি বজ্রর বৈধ স্ত্রী। তার অপমানে আমারই অপমান। তবে শিল্পীর এই অবৈধ সত্তা আমার মধ্যে কেন দিয়েছ, ভগবান? আমার ভিতরে কেন এ অবৈধ ভূকম্পন। এ ভূমিকম্পে আমি এবং আমার সাজানো সংসার যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। দয়া করো আমাকে, দয়া করো।'

'মোহনা, কাত হয়ে শোও। দুঃস্বপ্ন দেখছ।' বুঝতে পারলুম বিছানায় উপুড় হয়ে বিড়বিড়

করছিলুম,'দয়া করো, দয়া করো।'

পাঁচ

ক্রমেই আমার ঘরকরনায় বিপর্যস্ততা বাড়তে থাকে। এই বিশৃঙ্খল গৃহস্থালির সাথে বজ্রর পরিচয় ছিল না। সে কেবলই বিরক্ত হতে থাকে, কিন্তু আমিই বা কী করি। আমি যেন ক্রমেই আর আমাতে নেই। এখন আমার জীবনে লেখা ছাড়া আর অন্য কিছুই নেই। খাতার পর খাতা ভরে উঠছে। যদিও জানি না সেসব কোনোদিন ছাপাখানার আলো দেখবে কিনা। তবুও আমার কলমের সাথে জড়িয়ে থাকে দুরন্ত আকাঙক্ষা—একদিন নিশ্চয়ই আমার লেখা জনগোষ্ঠীর ঘরে ঘরে সমাদৃত হবে। আমি এত করে মানুষের কথা লেখবার সাধনা করে গেলাম, তা কি কোনোদিন মানুষেরা নেবে না? যদিও এই ক্ষুদ্র পারাদ্বীপে কোনোরকম সুযোগই নেই, তবুও কোনো না কোনো উপায়ে সন্তানের মতো এই লেখা অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পৃথিবীর আলো নিশ্চয়ই দেখবে।

ছয়

শ্বশুরমশাই হঠাৎ মারা যেতে নিঃসঙ্গ শাশুড়ি-মা দেশের বাড়ি ছেড়ে পারাদ্বীপের ফ্ল্যাটে চলে এলেন, এখন থেকে আমাদেরই কাছে থাকবেন।

এখানে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বেশি তাঁকে যে ব্যাপারটা অসন্তুষ্ট করল, তা আমার লেখবার নেশা। বউ মানুষ রাঁধবে বাড়বে, ঘর সাজাবে এবং অবসর সময়ে শাশুড়িকে সঙ্গ দেবে; তা নয়, কোনোরকমে ডালভাত নাবিয়ে বসে পড়ল কাগজ কলম নিয়ে।

'এমন অনাচ্ছিষ্টি বাপু বাপের জন্মে দেখি নি। বলি, এসব ছাইপাশ লিখে হবেটাই বা কী? তুমি কি ভাবছ রবিঠাকুর হবে?'

সেদিন সকালে কলম হাতে ভাবছি শরতের আকাশটা যে একটা আশ্চর্য রকমের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, তার স্বাদ গন্ধ খুবই আলাদা অন্য দিনের থেকে। শরতের রোদমাখা মনের আঙিনাটাকে কেমন করে পুরোপুরি তুলে ধরব খাতার পাতায়। এই এক যন্ত্রণা- কিছুতেই গোটাটার ছবি তুলতে পারি না। ডানার কিছু পালক খসবেই খসবে। শাশুড়ি এসে দাবি জানালেন,--এখন মোটেই বসা চলবে না লেখা নিয়ে। আজ বিকেলে জলখাবার কী দেবে বজ্রকে? কিছুই তো যোগান কর নি দেখছি। তাছাড়া আমার জন্য একটু পোস্তচচ্চড়িও রাঁধো দেখি। রান্না তো মুখে দেওয়া যায়না।'

প্রথম-প্রথম আপত্তির সুরটি মোটামুটি সহনীয় ছিল। কিন্তু ক্রমেই তা ভয়াল রূপ ধারণ করছে। কলম ধরলেই চেঁচিয়ে ওঠেন, 'তুমি গেরস্ত বউ। গেরস্ত-বিধিমত চলবে। কাজের সময় লেখা কিসের?'

গেরস্তবিধি কথাটা শুনে চমক খাই। তার মানে লেখাটা গেরস্ত বউয়ের পক্ষে বৈধ কাজ নয়। এতদিন তো কবির সঙ্গকেই অবৈধ শুনে এসেছি, এখন কলম সঙ্গও অবৈধ ঘোষিত হল। আমি খুবই কষ্ট পেলুম। আস্তে সরে এসে দেরাজ খুলে দাঁড়ালুম। সেখানে রাশি-রাশি লেখা জমে উঠছে---আমার অবৈধ সন্তানেরা। আমি হাত বুলাতে থাকি তাদের গায়ে। কী গভীর মমত্ব আমার ওদের প্রতি। অবৈধ সন্তানের জন্য মায়ার পরিমাণ কি বেশি হয়?

শাশুড়ি-নির্দেশিত বিধি অনুযায়ী চলতে চেষ্টা করি সারাটি দিন; নইলে অস্তিত্ব রক্ষা করাই

কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু রাত্রিটা একান্তই আমার নিজস্ব। মধ্যরাত অবধি কাটাই লেখা নিয়ে। রাতজাগা নিয়ে বজ্র আপত্তি জানায়—'এভাবে রাত জাগলে শরীর ভেঙে যাবে যে।' রাতজাগার খবরে শাশুড়িও গজগজ করেন সারাটি দিন। কিন্তু আমি তাদের কারুর কথা শুনি না বা শুনতে পারি না। আমাকে যে লিখতেই হবে। অবশেষে সত্যিই একদিন অসুখ এসে পড়ল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, 'পরিশ্রম না কমালে নিরাময়ের কোনো আশা নেই।' দাঁতে দাঁত ঘষে শাশুড়ি বললেন, 'লেখার ভূত কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে না পারলে ওর ব্যামো সারবে না।'

সাত

ব্যামো ক্রমেই বাড়ছে। দীর্ঘ দিন পরে ব্রত এবং কবি দুজনের কাছ থেকেই চিঠি পেয়েছি। অনেক দিনের চেষ্টায় গিরিডিতে ওরা একটা সাহিত্যসভার আয়োজন করছে। সেখানে বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা আসবেন কলকাতা থেকে। ব্রত লিখেছে, 'মোহনাদি, যে করেই পার তিনটে দিনের জন্য সে সময় অবশ্য চলে আসবে। তোমার ভালো লেখা কিছু সঙ্গে এনো। এই আসরে তুমি লেখা পড়লে, আমার বিশ্বাস, তোমার রাস্তা খুলে যাবে। তাছাড়া, সাহিত্যিকদের সাথে পরিচয় হওয়াটাও তো দরকার।'

এ চিঠি পাওয়ার পর দ্বিগুণ উৎসাহে কলম চলতে লাগল। শারীরিক অসুস্থতাটা অতি তুচ্ছ মনে হল আমার । সাহিত্য আসরের জন্য খুব ভালো কিছু লেখা তৈরি করবার জন্য আমি উঠে পড়ে লেগে গেলাম।

আজ ক্লিনিকে গিয়েছিলাম। ফিরতি পথে শরীরটা বড্ড বেশি ক্লান্তি জানান দিতে লাগল। অনেকগুলো নতুন লেখায় হাত দিয়েছি, শেষ করে উঠতে পারব তো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে? অনেক বিরোধিতার পর রাজি করিয়েছি বজ্রকে সাহিত্য আসরে সস্ত্রীক উপস্থিত হবার জন্য। এখন নাকি বজ্রর ভীষণ কাজ। এখন নাকি আমার শরীর ভীষণ খারাপ। এখন নাকি যাওয়া সম্পর্কে শাশুড়ির ভীষণ আপত্তি। কিন্তু সব ভীষণ অসুবিধার চেয়ে আমার ভিতরের তাগিদ ভীষণতর। অতএব বজ্রকে ছুটি নিতে হয়েছে। এতদিন পরে অবশেষে সুযোগ এসেছে। এ আমার জীবন-মরণ সমস্যা। এর সাথে আপোস চলে না। আমি নিজের শরীরকে বোঝাচ্ছিলাম ফিরতি-ট্যাক্সিতে বসে। স্থির হও, সতেজ হও। শুয়ে পড়লে চলবে না, শেষে কি তীরে এসে তরী ডোবাবে। মনে রাখো---তোমাকে লিখতেই হবে।

গাড়ি থেকে নামতেই দেহটা শোবার ঘরের জন্য আঁকুপাঁকু। কিন্তু লবিতে পৌঁছেই থামতে হল এ যেন থামা নয়, স্থাণু হয়ে পুঁতে যাওয়া মেঝের মধ্যে। আমার লেখাগুলো আগুনে পুড়ছে। আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী শাশুড়ি এই পথই উপযুক্ত মনে করেছেন। আমার জিভ একবারও চিৎকার করল না, দুচোখ একফোঁটা জল দিল না সে চিতায়। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। শুধুই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম আচ্ছা, শতপুত্র হারিয়ে গান্ধারী যে শোক পেয়েছিলেন, তার পরিমাণ কতটা ? আমার শতাধিক সন্তান দাউ-দাউ করে জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে; গান্ধারীর তবু সশ্রদ্ধ সমব্যথী ছিল কত। অথচ আমার কেউই নেই দুঃখকে ভাগ করে নিতে। আমার সন্তানেরা যে অবৈধ।

[প্রকাশকাল: ৫১ বর্ষ/১২ সংখ্যা: ১৩৯৭]

মানুষের দাম

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

[১৯৫৬ হাওড়া শহরে জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: মিশ্ররাগ, গন্ধ, ট্যাংকোসরাস, ছোটজীবন, বড় জীবন, এই সব দিনরাত্রি, ইত্যাদি।]

একদিন সকালে একটা মিছিল এসে হাজির হল রাজপ্রাসাদের সিংদরজায়। মিছিলের মধ্যিখানে একটা শকটের ওপর সাদা কাপড়ে ঢাকা এক মৃতদেহ।

মিছিলের লোকজন মনে হল,—খুবই উত্তেজিত। তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত উঠছে আর নামছে। সঙ্গে চলছে ঘন-ঘন সমবেত চিৎকার। সবাই একসাথে চিৎকার করছে বলে তাদের বক্তব্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শুধু একটা শব্দের ঢেউ কানে এসে আছড়ে পড়ছে।

রাজপ্রাসাদের সিংদরজা তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হল। সিংদরজায় একজন প্রাসাদ-নিরাপত্তা আধিকারিক কয়েকজন রক্ষীকে নিয়ে প্রহরারত। সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করার অনুমতি কে পাবে আর কে পাবে না—এই ব্যাপারটা নির্ভর করে এই আধিকারিকের বিবেচনার ওপর। কিন্তু কী ব্যাপারে এই বিক্ষোভ, যে মৃতদেহটি নিয়ে আসা হয়েছে এখানে—সেটি কার,—এসব কিছুই বুঝতে পারছে না সে। একজন লোক হাত তুলতেই সমবেত চিৎকার থেমে গেল। সম্ভবত সে-ই এই মিছিলের নেতা। কোত্থেকে একটা উঁচু কাঠের বেদি বয়ে নিয়ে এল কয়েকজন। সেই বেদির উপর দাঁড়িয়ে লোকটি চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করল। অপূর্ব বাচনভঙ্গি নেতার! সবাই মনোযোগ দিয়ে তার বক্তব্য শুনছে। আধিকারিক আর রক্ষীরাও মুগ্ধ হয়ে তা শুনতে লাগল:

বন্ধুগণ! আপনারা জানেন গত কুড়ি বছর ধরে লাগাতার এই রাজ্য শাসন করছেন অপদার্থ এক রাজা এবং তাঁর ততোধিক অপদার্থ অমাত্যবর্গ। এঁরা মোটেই প্রজাদরদি নন। তাদের সুখ-সুবিধের দিকে কোনো নজরই এঁদের নেই। শুধু নিজেদের খামখেয়ালিপনা আর বিলাসিতা নিয়ে মশগুল। গত কুড়ি বছরে এই রাজ্যের কোনো উন্নতি তো হয়ই নি; বরং অবস্থা দিনের পর দিন আরও খারাপ হয়েছে।

প্রশাসনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আজ দুর্নীতির চূড়ান্ত। কর্মচারীরা কাজ না করেও মাইনে পায়। চোর চুরি করলেও তার শাস্তি হয় না। এমনকী মানুষের জীবনও আজ মূল্যহীন এই রাজার কাছে। কিংবা যদিও বা কিছু মূল্য থেকে থাকে-- তা বৈষম্যমূলক। ব্যাপারটা আপনাদের ব্যাখ্যা করে বলছি... আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে, এই রাজ্যে একটা বিচিত্র নিয়ম চালু আছে। কোনো মানুষ যদি আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যায়, তাহলে মৃতের পরিবারবর্গকে রাজকোষ থেকে টাকার অঙ্কে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যেটা সবথেকে অদ্ভুত

মনে হয় আমাদের, সেটা হল এই যে, এই ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক সবার ক্ষেত্রে এক নয়। টাকার অঙ্ক কত হবে সেটা নির্ভর করে মৃত ব্যক্তি সমাজের কোন্ শ্রেণীর মানুষ তার ওপর। আমাদের সামনে এখন যে মৃতদেহটি দেখছেন সেটি একজন শ্রমজীবী মানুষের। সহজ করে বলতে গেলে—একজন মজুরের। গতকাল বিকেলে রাজারই একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে বেচারার মৃত্যু হয়েছে। কোনো দোষ ছিল না লোকটির। নিয়মমতো রাস্তার বাঁ-দিক ঘেঁষেই ও হাঁটছিল। সারাদিন কাজ করার পর ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছিল। পেছন থেকে গাড়িটা আসছিল ঝড়ের গতিতে। চালক সম্ভবত প্রচুর মদ্যপান করেছিল। দুর্ঘটনার মুহূর্তে চালকের গাড়ির ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। রাস্তায় একটা বাঁক নিতে গিয়ে অতর্কিতে গাড়িটা পেছন থেকে ধাক্কা মারে এই লোকটিকে। ঘটনাস্থলেই ওর মৃত্যু হয়। পথচারীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। উচ্চপদস্থ সেই রাজকর্মচারী যিনি গাড়িতে আসীন ছিলেন, একবারও গাড়ি থামাতে বলেন নি। মৃত লোকটির পরিচয় জানতে চান নি। এলাকার মানুষ ব্যাপারটা নিয়ে খুবই ক্ষুব্ধ। আজ ভোরবেলা মৃতের আত্মীয়স্বজন যখন শবদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করছিল, তখন ক্ষতিপূরণের আদেশ তাদের জানানো হয়। সেই আদেশে ঘোষণা করা হয়েছে যে, দুর্ঘটনায় মৃত ওই লোকটির জন্যে তার পরিবারবর্গকে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। টাকার অঙ্কটা শুনেই সকলের মাথায় আগুন জ্বলে যায়। কিছুদিন আগে একজন অধ্যাপক ওই এলাকায় প্রায় একইভাবে দুর্ঘটনায় মারা যান। তখন ওই অধ্যাপকের পবিবারবর্গের জন্য যে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়, তার টাকার অঙ্ক ছিল দশ হাজার। আমাদের প্রশ্ন হল,—অধ্যাপকের ক্ষেত্রে যদি দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়, তাহলে একজন মজুরের ক্ষেত্রে তা পাঁচ হাজার হবে কেন? দুজনেই তো মানুষ। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার ছিল দুজনেরই। নিজের-নিজের সংসারে প্রয়োজনীয়তা ছিল দুজনেরই। তাহলে কোন্ যুক্তিতে একজন অধ্যাপকের জীবনের দাম একজন মজুরের জীবনের দামের থেকে বেশি ধার্য হল? বন্ধুগণ! মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য আমরা কোনো মতেই মেনে নিতে পারি না। সৎকার না করে মৃতদেহ রাজপ্রাসাদ অব্দি বয়ে আনা হয়েছে। স্বয়ং রাজার সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই। তাঁর কাছে আমাদের প্রশ্ন---ক্ষতিপূরণের টাকায় এরকম বৈষম্যের কারণ কী? যদি রাজা আমাদের সঙ্গে দেখা না করতে চান, আমাদের কথা শুনতে না চান, তাহলে এই মৃতদেহ সামনে রেখে আমরা সবাই এখানে অনশন শুরু করব। যতক্ষণ না আমাদের প্রশ্নের জবাব স্বয়ং রাজার মুখ থেকে পাচ্ছি, ততক্ষণ আমরা এই অনশন ভাঙব না, কিছুতেই না। প্রয়োজন হলে আমৃত্যু অনশন চলবে. ....!

এখানে নেতা তার ভাষণ থামালে উপস্থিত জনমন্ডলী করতালিতে ভরিয়ে দিল আকাশ-বাতাস। আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সমবেত চিৎকার ধ্বনিত হল: মানুষের জীবন নিয়ে কোনোরকম বৈষম্য করা চলবে না! ক্ষতিপূরণের টাকায় কোনো রকম বৈষম্য করা চলবে না! আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে!...... চলছে, চলবে!

নিরাপত্তা আধিকারিক কী সিদ্ধান্ত নেবে বুঝতে পারছে না। এত মানুষের এই বিশাল মিছিলকে লাঠিপেটা ক'রে ছত্রভঙ্গ করে দেবে? নাকি সিংদ্বারের কপাট খুলে দেবে? কিন্তু

মিছিলকে কোনো মতেই প্রাসাদ-চত্বরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া যায় না। আইন অনুসারে বলতে গেলে এত মানুষের প্রাসাদ-চত্বরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অবশ্য প্রাসাদ-চত্বরে ঢোকবার অনুমতি মিললেই যে-কোনো ব্যক্তি রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারবে--তা নয়। ঠিকমতো বলতে গেলে, অভাব-অভিযোগ বা ক্ষোভের কথা রাজাকে জানাতে হলে তাঁর অনুমতি নেওয়া একান্তই প্রয়োজন। প্রথমে এই অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। কমপক্ষে দিন পনেরো আগে এই দরখাস্ত রাজার এজলাসে নির্দিষ্ট দপ্তরে জমা পড়া চাই। সেই দরখাস্ত পড়ে অনুমতি দেওয়া যায় কিনা এই ব্যাপারটা বিবেচনা করার জন্যে নিযুক্ত আছে একজন আধিকারিক। এই আধিকারিকের প্রথম কাজ হল---যে তারিখে রাজার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে, সেই তারিখে রাজা সত্যিই দেখা করতে পারবেন কিনা—এটা খতিয়ে দেখা। এরকম হতে পারে যে, সেই দিনই রাজার কোনো জরুরি অধিবেশন আছে। কিংবা বিদেশ থেকে অন্য কোনো রাজার দূত দু-দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ওই দিন আলোচনায় আসবেন। যেদিন এরকম ব্যাপার থাকে, সেদিন স্বাভাবিক কারণেই প্রজাদের সঙ্গে রাজার সবরকম সাক্ষাৎকার বন্ধ। সুতরাং সাক্ষাৎকারীর ওই দিনের দর্শনপ্রার্থনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

সিংদরজাব সামনে মিছিলের মানুযেরা ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছে। থেকে-থেকে সমবেত চিৎকার উঠছে—দরজা খুলে দিন! দরজা খুলুন! নাহলে দরজা ভাঙব আমরা! বেশ কয়েকজন উত্তেজিত হয়ে সিংদরজায় ধাক্কা দিতেও শুরু কবেছে। শক্ত লোহার সিংহদ্বার। সহজে ভাঙবার নয়। প্রাসাদেব চারিদিকে কারাগাবের মতো উঁচু পাঁচিল। কোনো মানুযের পক্ষে সেই পাঁচিল টপকানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেসব দিক দিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। কিন্তু অনেকে একসঙ্গে সিংহদ্বারে ধাক্কা দেওয়ায় ঝনঝন শব্দ উঠছে! এবং এরকম ধাক্কা দেওয়াও আইনবিরুদ্ধ কাজ। উত্তেজনা যেরকম বাড়ছে, তাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। এখনই এদের শান্ত করা দরকার। কিন্তু কী বলে এদের শান্ত করা হবে? নিরাপত্তা আধিকাবিক বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। যতদূব সে জানে---আজ রাজ্যের বাৎসরিক আয়ব্যয় এবং পবিকল্পনাব ব্যাপাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক অধিবেশনে রাজা সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন। এদের সঙ্গে আজকে দেখা করার কোনো প্রশ্নই নেই। রাজা সে সময়ই পাবেন না। কিন্তু উত্তেজিত এই বিশাল জনতাকে যদি সে কথা জানানো হয়, তাহলে উত্তেজনা বাড়বে বই কমবে না। জনতার যা চেহাবা এখন সে দেখছে--হয়তো মুহূর্তের মধ্যে এরা মারমুখীও হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে সে কিভাবে তা সামাল দেবে? সে কি রক্ষীদের বলবে লগুড়াঘাত করতে? কিন্তু প্রায় হাজার দুই মানুষ, ---আব তার সঙ্গে মাত্র ছ-জন রক্ষী। তাবা একসঙ্গে কতজনের ওপর লগুড়াঘাত করবে? আর যদি তাতেও কাজ না হয়? তাহলে? তাহলে তো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আদেশ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রাণহানি হতে পারে। মিছিলের জনতার ওপর যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ছিল- এ ব্যাপারটা পরে প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তাবে তারই ওপব। সে এক মহা ঝামেলা। তার থেকে ওইসব ঝামেলায় না গিয়ে সে তার ঊর্ধতন অধিকারিকের কাছে পরিস্থিতি জানিয়ে নির্দেশ চাইবে। যেমন নির্দেশ আসবে সেরকমই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং পরিস্থিতি জানাতে হলে তাকে নিজে মুখেই জানাতে হবে। যেতে হবে তার ঊর্ধতন আধিকাবিকের

কাছে। এরকম সাত-পাঁচ ভেবে নিয়ে নিরাপত্তা আধিকারিক সিংহদ্বারের সামনে উত্তেজিত জনতার ওপর কড়া নজর রাখার আদেশ দিল রক্ষীদের, এবং হন্তদন্ত হয়ে নিজেই গেল তার ঊর্ধতন আধিকারিকের কাছে।

এই আধিকারিকের নাম সংক্ষেপে পাইনমশাই। যেমন লম্বা, তেমনি মোটা। চলন্ত পাইনকে দেখলে মনে হয়, মাংস আর চর্বির একটা বিশাল পাহাড় যেন হাঁটছে। ঝক্‌ঝকে সামরিক পোশাক-পরিহিত পাইন ইংরাজি 'এল' আকৃতির একটা টেবিলের ওপারে পুরু গদিতে মোড়া এক আসনে বসেছিলেন। তাঁর টেবিলের একধারে পরপর সাজানো নানা রঙের পাঁচটা দূর-আলাপন যন্ত্র। আর একধারে অনেক নথির স্তূপ। টেবিলে একটা নথি খোলা পড়ে আছে। ওটা যে খুব পুরোনো তা পৃষ্ঠার ধূসর রঙ দেখলেই বোঝা যায়। নথিটা নিশ্চয়ই খুব জটিল, কেননা পাইনমশাই সেটা সামনে খুলে রেখে, দু-চোখ বন্ধ করে,---কপাল কুঁচকে সম্ভবত গভীর কোনো চিন্তায় ডুবে আছেন। নিরাপত্তা আধিকারিক ঘরে ঢুকেই মেঝেতে ভারী বুটের আওয়াজ তুলে এক জমকালো অভিবাদন জানাল। পাইনমশাই চক্ষু উন্মীলন করলেন।

-- কী ব্যাপার ? কোঁচকানো কপাল তাঁর আবও কুঁচকে গেল।

---আজ্ঞে, প্রাসাদের সিংহদ্বারে একটা গন্ডগোল বেধেছে......

---গন্ডগোল ? কেন ?

---অনেক মানুষের একটা মিছিল এসেছে আজ্ঞে,...মিছিলের মাঝখানে একটা মৃতদেহ....।

---মিছিল ? ...মৃতদেহ ?---কেন ?

---আধিকারিকদের মধ্যে কারুর একজনের গাড়িতে একটা লোক চাপা পড়ে মারা গেছে। প্রতিবাদ জানাতে প্রায় হাজার দুই মানুষের একটা মিছিল ..। ওরা আজ্ঞে, রাজার সঙ্গে দেখা করতে চায়....।

---রাজার সঙ্গে দেখা করতে চায় !... ভেংচে উঠলেন পাইনমশাই---রাজার সঙ্গে দেখা করা কি চা-পানের মতো সোজা ব্যাপার ? সিংহদ্বারের সামনে আইন করে জমায়েত বন্ধ করা আছে তুমি জান না ? ওদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে মিছিল হটিয়ে দাও ! জুলুমবাজি পেয়েছে নাকি ? রাগে পাইনমশাইয়ের থলথলে মুখ ক্রমশ লাল হয়ে ওঠে।

নিরাপত্তা অধিকর্তা মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে তিনি এবার ধমকে ওঠেন---যাও ! আর দেরি কোরো না..., মিছিল হঠিয়ে দিয়ে আমাকে খবর করো !

---তাহলে আজ্ঞে আপনার নির্দেশ কী ? ভয়ে-ভয়ে অধিকর্তা জিজ্ঞেস করে।

---মানে ?

---মিছিল কীভাবে হঠাব ? লাঠি চালিয়ে ? না গুলি করে ? পাইন আবার ধমকে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কী ভেবে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

---চলো তো, --ব্যাপারটা অলিন্দ থেকে একবার স্বচক্ষে দেখে আসি।

পাইন মশাইয়ের দপ্তরের অলিন্দ থেকে প্রাসাদের সিংদরজার দূরত্ব অনেকখানি। সুতরাং খুব যে স্পষ্ট করে সবকিছু দেখা গেল, তা নয়। দূর থেকে শুধু এটাই বোঝা গেল যে, পিঁপড়ের মতো অজস্র মানুষ সিংদরজার চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ভালোভাবে দেখার

জন্যে পাইন দূরবীন নিয়ে এলেন দপ্তরের আলমারি থেকে। সেটা চোখে লাগিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখলেন তিনি । বুঝলেন যে নিরাপত্তা আধিকারিকের আন্দাজ ঠিকই। মিছিলে মানুষের সংখ্যা দু-হাজার কেন, তারও বেশি, তিন হাজারও হতে পারে। এতক্ষণে রাগ বেশ কমছে পাইনের। বিবেচনা কাজ করতে শুরু করেছে। তিনি বুঝলেন—এত মানুষকে সিংদ্বারের কাছ থেকে হঠানো খুব সহজ নয়। তাতে দু-পক্ষে একটা খুন্ডযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। অনেকে আহত তো হতেই পারে। এমনকী প্রাণহানি ঘটাও অসম্ভব কিছু নয়। আর প্রাসাদের সিংদ্বারের সামনেই যদি এরকম রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে, তাহলে সুযোগের অভাবে ওত পেতে থাকা বিরোধী-পক্ষের লোকজনদের সুবিধেই হয়ে যাবে। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে—-এসব নিয়ে তারা মহা হইচই শুরু করে দেবে। বর্তমান রাজার পদত্যাগ দাবি করে হয়তো দেশ জুড়ে লাগাতার আন্দোলনও শুরু হয়ে যেতে পারে। সুতরাং চট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। মন্ত্রীর কানে ব্যাপারটা তোলা উচিত। কিন্তু তার আগে---। পাইনমশাই আধিকারিককে জিজ্ঞেস করলেন—এদের দাবিটা কী?

—আজ্ঞে,—একজন লোক গতকাল দুর্ঘটনায় মারা গেছে—

—সে তো শুনলাম। এক কথা বারবার বলছ কেন? খুব সংক্ষেপে বলো ওরা কী চায়।

—আজ্ঞে, ওরা রাজামশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। সে তো আগেই বলেছি। আধিকারিক ভয়ে-ভয়ে তাকায় পাইনের দিকে।

—কেন সাক্ষাৎ করতে চায়?

—যে লোকটি মারা গেছে তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ কিছুদিন আগে একজন অধ্যাপক দুর্ঘটনায় মারা গেলে ক্ষতিপূরণ দেওযা হয়েছিল--দশ হাজার টাকা। এরকম বৈষম্যের বিরুদ্ধেই ওদের প্রতিবাদ—।

—হুঁ। ...কিন্তু এ ব্যাপারটায় তো আমাদের কিছু বলার নেই হে! আমরা তো শুধু আইন-শৃঙ্খলা দেখি। কিন্তু মানুষ মরলে ক্ষতিপূরণের টাকা একরকম হবে না নানারকম হবে সেটা তো নীতি সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের গণ্ডিতেও পড়তে পারে। ও ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেটা জানতে হলে মন্ত্রীকেই ফোন করতে হবে। এসো,—ফোন করে দেখি—।

অধিবেশনকক্ষে তখন রাজার উপস্থিতিতে তুমুল বৈঠক চলছে। আগামী বছরের পরিকল্পনা -খাতে উন্নয়ন-খাতে কত কোটি টাকা ধার্য করা হবে—এই ব্যাপারটা নিয়ে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে মহা বিতর্ক বেধে গেছে। রাজামশাই সিংহাসনের নরম গদিতে পিঠ ডুবিয়ে এক একজনের অভিমত মন দিয়ে শুনছেন। সামনে লম্বা টেবিলের ওপর নানা ধরনের মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূল সুদৃশ্য সব রেকাবিতে সাজানো। সদস্যরা ইচ্ছেমতন আলোচনার ফাঁকে-ফাঁকে সেসব খাবার মুখে দিয়ে চিবোচ্ছেন। রাজা ভাজা কাজুবাদাম খুবই পছন্দ করেন। সেজন্যে তাঁর সামনে বেশ বড়ো একটা রেকাবিতে কাজুবাদামের ক্ষুদ্র একটা পাহাড়। তিনি প্রায়ই মুঠো-মুঠো বাদাম তুলে মুখে দিচ্ছেন। রাজার বাঁ-পাশে বসে আছেন মন্ত্রী। তাঁর সামনে প্রচুর

নথি। আলোচনার সুবিধার জন্যে যখন যেটা দরকার রাজাকে এগিয়ে দিচ্ছেন। মন্ত্রী যেখানে বসে আছেন তার কাছাকাছিই দূর-আলাপন যন্ত্র। পিঁ...পিঁ....পিঁ...যন্ত্রটা বাজল। ভুরু কুঁচকে গেল মন্ত্রীর । এ সময় আবার কে বিরক্ত করছে? বৈঠক চলাকালীন অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছাড়া কেউ যাতে এখানে দূর-আলাপন না করে সে ব্যাপারে কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের। তাহলে বাজছে কেন? কী এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটল? যন্ত্রটা নাছোড়বান্দার মতো বেজেই চলেছে। অগত্যা সেটা ধরতে হল মন্ত্রীকে। রিসিভার তুলে খুব নীচু গলায় উনি বললেন—

---হ্যালো---

—আজ্ঞে, আমি নিরাপত্তা দপ্তরের পাইন বলছি।

—কী ব্যাপার? এখন তো অধিবেশন চলছে।

—বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, আজ্ঞে—। কিন্তু একটা জরুরি ব্যাপারে বাধ্য হয়ে—

—ব্যাপারটা কী তাড়াতাড়ি বলুন।

—একটা মিছিল প্রাসাদের সিংহদ্বার অবরোধ করেছে।

---অবরোধ? কেন? ওখানে বাহিনী নেই?

—আছে আজ্ঞে। কিন্তু সমস্যাটা একটু অন্যরকম—। প্রায় হাজার চারেক মানুষের একটা মিছিল(পাইন ইচ্ছে করেই সংখ্যাটা বাড়িয়ে বললেন) সিংহদ্বারের সামনে জমায়েত হয়েছে। সঙ্গে একটা মৃতদেহ। ওরা মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে । ওদের প্রশ্নের জবাব চায়—।

—প্রশ্ন? রাজাকে আবার কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারে নাকি?

—আজ্ঞে, লোকগুলো ভীষণ বিক্ষুব্ধ। ওদের অভিযোগ হচ্ছে —দুর্ঘটনায় মৃত মানুষের পরিবারকে যে রাজকীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা, সেই অর্থের অঙ্কে একটা বৈষম্য আছে।

---বৈষম্য?

---আজ্ঞে! অধ্যাপক মারা গেলে দেওয়া হয়—দশ হাজার, আর মজুর মারা গেলে—পাঁচ হাজার!

তা তো হবেই! মন্ত্রী বলতে যাচ্ছিলেন। বুদ্ধিজীবী আর শ্রমজীবীর মধ্যে একটা বৈষম্য থাকবে না? মুড়ি আর মিছরির একই দর হবে? কিন্তু এখন অধিবেশন চলছে। এসব ব্যাপার বুঝিয়ে বলার এত সময় নেই। তাই তিনি পাইনকে উত্তর দিলেন—অত কথা শোনার এখন সময় নেই। যেভাবে হোক ব্যাপারটা সামলান।

কিভাবে সামলাব? ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশ কী আছে সেটা তো আমি জানি না। আমার নথিতে ওসব ব্যাপারে কোনো নির্দেশিকা নেই। আপনি বরং যদি প্রশাসনিক দপ্তরের সচিবকে এখানে পাঠিয়ে দেন। উনি ব্যাপারটা মিছিলের লোকজনদের বুঝিয়ে বলতে পারেন—।

প্রস্তাবটা পছন্দ হয় মন্ত্রীর।

---ঠিক আছে। সচিবকে আমি ঘটনাস্থলে যেতে বলছি।

একটু পরেই সচিবকে ফোন করেন তিনি। সংক্ষেপে ব্যাপারটা বর্ণনা করে ঘটনাস্থলে যেতে নির্দেশ দেন।

আধঘন্টাও কাটল না। সচিব হাঁফাতে-হাঁফাতে ফিরে এলেন অধিবেশনকক্ষে। মন্ত্রীর কানে-কানে বললেন--আজ্ঞে, পরিস্থিতি খুব খারাপ। উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। মিছিলে লোকজনও ক্রমশ বাড়ছে। সকালের দিকে নাকি তিন হাজার ছিল। এখন সংখ্যাটা বেড়ে পাঁচ হাজার হবে। এত লোককে আমি কী বোঝাব? কেউ কোনো কথাই শুনছে না। সকাল থেকে বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে ওরা ভীষণ অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

—সে কি, সচিব, আপনার কথাও শুনছে না?

—-আজ্ঞে, কারোর কথাই মনে হয় ওরা শুনবে না। ওদের দাবি একটাই---প্রাসাদের গেট খুলে দেওয়া হোক। স্বয়ং রাজাসাহেবকে ওরা ওদের বক্তব্য জানাবে-—।

সমস্যাটা সত্যিই বেশ পাকিয়ে উঠেছে। মন্ত্রী ভাবলেন। আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। গুরুতর কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই রাজার কানে তুলে দেওয়া ভালো। অনেক দিন চাকরি হয়ে গেল মন্ত্রীর। এই রাজার রাজত্ব যবে থেকে শুরু হয়েছে ততদিন থেকেই তিনি ক্ষমতায় আছেন। প্রথমে অবশ্য তত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পান নি। হিংস্র-পশু-সংরক্ষণ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ক্রমশ পদোন্নতি হয়। এখন তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক দিকের প্রায় সবটাই দেখেন। এখন তাঁর একাধিক দপ্তর। সে যাই হোক, অভিজ্ঞতা তাঁর কম হল না। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এটাই বুঝেছেন যে, যখন কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে, তখন সেই সমস্যা নিজের ঘাড়ে না রেখে অন্যের ঘাড়ে ফেলে দিতে হবে। নাহলে অনেক হ্যাপা সামলাতে হয়। এখন এই ঝামেলার খবরটা রাজাকে জানালে তাঁর দায়িত্ব খানিকটা লাঘব হবে। কিন্তু রাজা তো এখন গভীর মনোযোগ দিয়ে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা শুনছেন। তাঁকে কিছু বলতে যাওয়া মানেই তাঁর বিরক্তির উদ্রেক করা। কিন্তু কী আর করা যাবে। নিজের আসন ছেড়ে তিনি রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। গলা ঝাড়লেন কয়েকবার।

রাজা মুখ তুলে চাইলেন।

---কী ব্যাপার ?

—মহারাজ, একটা সমস্যা।

—সমস্যা? আমার রাজ্যে....?

---আজ্ঞে হ্যাঁ।

যতটা সম্ভব গুছিয়ে এবং সংক্ষিপ্তভাবে মন্ত্রী সমস্যাটার বিবরণ দিলেন। রাজার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভেবে নেওয়ার পর তিনি বললেন---এখন পরিস্থিতি কেমন আছে নিরাপত্তা-আধিকারিককে জিজ্ঞেস করুন।

মন্ত্রীর ফোন পেয়ে পাইন উত্তেজিত গলায় জানালেন-

আজ্ঞে, পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো। জনতা অধৈর্য হয়ে আমাদের রক্ষীদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করেছে।

---তাই নাকি? আচ্ছা দেখছি, কী করা যায়।

রাজাকে জানাতে খুবই রেগে গেলেন উনি। বললেন--আর আমার রক্ষীরা কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘাস চিবোচ্ছে? হোসপাইপে জল ছুঁড়ে এখনই মিছিলের লোকজনকে দূরে সরিয়ে দিতে বলুন!

মন্ত্রী আবার ফোনে সেরকমই পরামর্শ দিলেন পাইনকে। ইতিমধ্যে অধিবেশন শেষ। ফাঁকা হয়ে গেল পরামর্শকক্ষ। শুধু রাজা আর মন্ত্রী দুজনে মুখোমুখি বসে আছেন। রেকাবি থেকে একটা টকটকে লাল, লোভনীয় আপেল তুলে নিয়ে কামড় বসিয়ে রাজা অল্প হেসে বললেন---মন্ত্রী?

---আজ্ঞে?

—কিছু ভাবছেন?

---আজ্ঞে মহারাজ....না...।

---কিছু ভাবছেন না? সমস্যার সমাধানের কথা কিছু ভাবছেন না?

—সমস্যাটার কথা তো নিশ্চয়ই ভাবছি। কিন্তু সমাধানটা ঠিক মাথায় আসছে না। কুড়ি বছরেরও বেশি রাজত্ব চলছে আমাদের। কোনোদিন এরকম অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে নি। এত সাহস এ রাজ্যের মানুষের হয়নি যে—সিংহদ্বারের সামনে জোটবদ্ধ হয়ে গন্ডগোল শুরু করবে। আমার মনে হয় এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর পেছনে ষড়যন্ত্র আছে? বিরোধী পক্ষের ষড়যন্ত্র......!

---মন্ত্রী, আপনার অনুমান সত্যি হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। রাজত্ব চালাতে হলে, প্রশাসন চালাতে হলে কতকগুলো ব্যাপার বুঝে নেওয়া উচিত। যেমন---

যেমন মহারাজ?

---আমাদের যেমন অসুখ করে মাঝে-মাঝে,শরীরে ঘা হয়, ফোড়া হয়, তেমনি রাজ্যেও মাঝে মাঝে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ....এইসব মাথা চাড়া দিতে পারে। তাতে কিন্তু ঘাবড়ালে চলবে না। রোগের যেমন কড়া চিকিৎসা আছে, তেমনি এইসব বিক্ষোভ এবং আন্দোলনও দমন করবার উপায় আছে। কিভাবে দমন করবেন?

---আজ্ঞে, মহারাজ, বাহুবল দিয়ে। গুলি চালিয়ে। এ ছাড়া আর এসব ঠান্ডা করার উপায় কী?

---ঠিকই বলেছেন। তবে তার আগে ভালভাবে চিন্তা করে নিতে হবে.. । আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করি-- ক্ষতিপূরণের টাকার ব্যাপারে আজকের যে বিক্ষোভ --এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী। মানুষের জীবনের দামে সত্যিই কি কোনো তারতম্য থাকার কথা ?

---একটা কথা বলার আছে, মহারাজ। যদিও আমরা শ্রেণীহীন সমাজে বিশ্বাস করি, কিন্তু তা তো তৈরি করতে পারি নি এখনও! পুরোনো খোল-নলচে নিয়েই সমাজ চলছে। শ্রেণীহীন সমাজের জন্য আমরা প্রয়াস চালাচ্ছি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি। এখন যতদিন সমাজ শ্রেণীহীন না হচ্ছে, --ততদিন প্রচলিত কাঠামোকেই মেনে নিতে হবে আমাদের। একজন অধ্যাপক সমাজের যে শ্রেণীর মানুষ,---একজন মজুর তো সমাজের সেই একই শ্রেণীর মানুষ নয়। সুতরাং তাদের জীবনের দামও শ্রেণী হিসেবে বিভিন্ন হতে বাধ্য।

---বাঃ! মন্ত্রী, আপনি যথার্থই বলেছেন। ঠিক আমার মনের কথাটিই প্রকাশ করেছেন আপনি -।

আলোচনা আরও এগোচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আবার দূর-আলাপনযন্ত্র বেজে উঠল। মন্ত্রী লাফিয়ে গিয়ে সেটা ধরেন।

—হ্যালো?

—আজ্ঞে, পাইন বলছি। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে! হোসপাইপের জল ছুঁড়েও কাজ কিছু হচ্ছে না। কাতারে-কাতারে মানুষ এগিয়ে আসছে! সবই মিলে চাপ দিচ্ছে সিংহদ্বারের ওপর! সিংহদ্বার ভেঙে যেতে পারে!

—একটু ধরুন। রিসিভার নামিয়ে রেখে মন্ত্রী রাজাকে সব জানাতেই রাজার দুই চোখ রক্তবর্ণ হয়ে যায়। সিংহাসন ছেড়ে তিনি পায়চারি শুরু করেন। মুখে বিড়বিড় করছেন—এত স্পর্ধা? এত বাড়াবাড়ি?....তারপর একসময় পায়চারি থামিয়ে গম্ভীর গলায় ডাক দেন—মন্ত্রী... .!

—মহারাজ?

—গুলিবর্ষণের আদেশ দিন। দু-চারটে মৃতদেহ পড়লেই সব আন্দোলন থেমে যাবে?

—যথা আজ্ঞা, মহারাজ—।

মন্ত্রী ফোন তুলে পাইনকে রাজার নির্দেশ জানিয়ে দেন।

বিকেল গড়িয়ে ধীরে-ধীরে নেমে এসেছে গাঢ় সন্ধ্যা। আলোর সাম্রাজ্য কখন যেন দখল করে নিয়েছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে পরপর গুলিবর্ষণের শব্দ। ....একবার...দুবার ...তিনবার! উপর্যুপরি আরও অনেকবার! ...তারপর প্রবল ঝড় সহসা থেমে গেলে যেরকম নিখাদ নৈঃশব্দ্য নেমে আসে, সেরকম সব চুপচাপ....।

অনেকক্ষণ বাদে নৈঃশব্দ্যের গভীর থেকে রাজা ডাক দেন—মন্ত্রী—!

—মহারাজ?

—কাজটা কি ঠিক হল? অনেক মানুষ মরবে।

—আপনার নির্দেশ! তা তো ভুল হবার কথা নয়। এরকম উত্তরে রাজা খুশি হন। স্বস্তি বোধ করেন। তারপর আবার কিছুক্ষণ পর—

—মন্ত্রী!

—মহারাজ?

—এখনও কিছু ভাবছেন মনে হয়।

—একটা কথা অবশ্য ভাবছি। যদি অভয় দেন তো বলি—।

—বলুন।

—প্রাসাদের সামনে তো অনেক মৃতদেহ পড়ে থাকবে। তাদেরও পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপার আছে। মৃত মানুষেরা সকলেই যে একশ্রেণীর সেরকম নাও হতে পারে! আপনার নির্দেশ যা তাতে তো বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন রকম ক্ষতিপূরণ হবে। কিন্তু ব্যাপারটা তো সারা দেশের লোকই এবার জানবে। আন্দোলনটা যদি সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে যায়—তাহলে কী হবে? আমরা এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকব, না উন্নয়নে মন দেব?

বেশ গুছিয়ে বলতে পেরেছেন এই ভেবে মন্ত্রীর আত্মবিশ্বাস বাড়ল ।

রাজা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর একটু হেসে বলেন---আপনার সব ভালো, মন্ত্রী। আপনি পরিশ্রমী, বিশ্বস্ত, আইনের ব্যাখ্যা ভালো করতে পারেন। কিন্তু আপনার কূট বুদ্ধিটা একটু কম....

মন্ত্রী আহত হন। কিন্তু মুখে কিছু বলা সম্ভব নয়। মনে-মনে বলেন—সেটা যদি আরো একটু বেশি থাকত মন্ত্রী থাকতাম কি এতদিন? রাজাই হয়ে যেতাম হয়তো। বহুদিনের সাধ আমার রাজা হবার। আমার অর্ধাঙ্গিনীর সাধ আবার আমার থেকে অনেক বেশি।

মন্ত্রী আহত হন। কিন্তু মুখে কিছু বলা সম্ভব নয়। মনে-মনে বলেন—সেটা যদি আরো একটু বেশি থাকত মন্ত্রী থাকতাম কি এতদিন? রাজাই হয়ে যেতাম হয়তো। বহুদিনের সাধ আমার রাজা হবার। আমার অর্ধাঙ্গিনীর সাধ আবার আমার থেকে অনেক বেশি।

মন্ত্রীকে চুপ করে থাকতে দেখে রাজাই আবার শুরু করলেন—এই সহজ ব্যাপারটা নিয়ে এত মাথা ঘামাতে হচ্ছে? এতক্ষণে নিশ্চয়ই মিছিল ভেঙে গেছে। মৃতদের ফেলে রেখে গা-ঢাকা দিয়েছে সবাই। নিজের প্রাণের থেকে কি আর আন্দোলন বড়ো? এখন সারা রাত ধরে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে—ওই মৃতদেহগুলো সরিয়ে ফেলা গোপন জায়গায়। যাতে কেউ কোনোদিন না ওদের হদিশ পায়। এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে লোকগুলো! কী, পারবেন না সেই ব্যবস্থা করতে?

---পারব মহারাজ।

---আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার?

---আজ্ঞে, না মহারাজ। তবে —

---বাকিটাও বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি। জীবন্ত মানুষের দাম তো হয়ই—হয় না?

---নিশ্চয়ই, মহারাজ!

---মৃত মানুষের দামও হয়। ক্ষতিপূরণ বলতে তো এটাই বোঝায়? তাই না?

---আজ্ঞে, হ্যাঁ।

---কিন্তু হারিয়ে গেছে যে মানুষগুলো তাদের দাম আপনি ধার্য করবেন কিভাবে? কিসের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেবেন?

---রাজা থামেন। মন্ত্রী চুপ।

---সুতরাং যে মানুষগুলোর আর কোনো চিহ্নই নেই,—তাদের ব্যাপারে কিভাবে আন্দোলন হবে? এবার বুঝেছেন ব্যাপারটা? রাজা জিজ্ঞেস করেন।

---বুঝেছি মহারাজ। সেইসঙ্গে এটাও বুঝলাম।

---কী?

---যে,—আপনার তুলনা একমাত্র আপনিই....।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৫১/সংখ্যা ৬: ১৩৯৭]

ঘর

কামাল হোসেন

[জন্ম ১৯৫৬ সালে কলকাতায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: পরম বিশ্বাসের গন্ধ, বাণপ্রস্থ, দ্বীপভূমি, অন্য আকাশ, রূপকথার জন্মবৃত্তান্ত, মর্তে পরী, শীতঘুম, ইত্যাদি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার, সোমেন চন্দ পুরস্কার, প্রমা পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট সাহিত্যকার।]

শাঁখের আওয়াজ তুলে দ্রুত ছুটে আসে একটা রেলগাড়ি। মাথা ঘুরিয়ে দুজনে দেখেন। সাদা-সবুজ রঙের খেলনার মতো চলমান যন্ত্রযান। যেন রক্তের মধ্যে দোলা ছড়িয়ে দূরে কোথাও হারিয়ে যায়।

'রেলগাড়ি দেখলেই আমার খুব ভালো লাগে।' ছেলেমানুষের মতো মালতী বলেন।

অমরনাথ চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন। তখনো কানের পাশে ঝমঝম করে বাজে রেলগাড়ির ছুটন্ত আওয়াজ। চোখের সামনে উদাসীনভাবে বয়ে যায় বেলা। দিন। বছর। জীবন। বুকের ভিতরে সব সময় গম-গম করে একটা অদ্ভুত ধাতব প্রতিধ্বনি। সদ্য-চলে-যাওয়া এই রেলগাড়িটার সঙ্গে বুঝি তিনি মিলিয়ে দেখতে চাইছিলেন, সত্যি-সত্যি কোনো মিল আছে নাকি দু ধরনের আওয়াজের মধ্যে।

আকাশে ঘন বাদামি মেঘের আনাগোনা। একটা জমাট থমথমে ভাব চতুর্দিকে। সামনে একটা বড়ো সাদা রঙের জাহাজ নদীর জলের উপর দাঁড়িয়ে। আশেপাশে আরো কতকগুলো জাহাজ। নৌকা। মানুষজন। ঘাটে কয়েকজন স্নান করতে ব্যস্ত।

'এখানে নদীর জল কেমন যেন ঘোলাটে।' মালতী বলেন।

'আমাদের গাঁয়ের পাশে সেই রুপালি নদীটা ছিল বড়ো ছোটো। গরমকালে শুকিয়ে যেত।' অমরনাথ বলেন।

'সে নদীর জল ছিল আয়নার মতো। মুখ দেখা যেত।'

'তোমার সব মনে আছে নাকি?' অমরনাথের যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না।

'কেন, ভুলে যাব কেন? বুড়ি হয়ে গেছি বলে?' মুখ তুলে তাকান মালতী।

মাথার চুল সবটাই সাদা হয়ে গেছে। চোখমুখের চামড়ায় জরার নিপুণ প্রলেপ। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখলেই বোঝা যায় আজ আর কণামাত্র অবশিষ্ট নেই সেই আশ্চর্য যুবতী শরীরের অপার্থিব লাবণ্য।

অমরনাথের চোখের চাউনিতে কেমন অচেনা এক ধরনের বিষণ্ণতা লক্ষ করে অবাক হলেন মালতী।

'কী হল? হাঁ করে কী দেখছ?' কৌতুকের ঢঙে বলবার চেষ্টা করেন মালতী।

একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিলেন অমরনাথ। খানিক বাদে উদ্দেশ্যহীনভাবে চারপাশে তাকান। নদী। জাহাজ। বয়া। নৌকা। পুরুষ। রমণী....

'জবাব দিলে না?' কিছুটা ম্লান গলাতেই বুঝি মালতী আবার শুধান।

'কী আর বলব?' শুকনো মুখে একবার হাসবার চেষ্টা করেন অমরনাথ। তারপর হঠাৎ কী ভেবে একটু জোর দিয়েই যেন তিনি বলেন, ' তোমাকে অনেক কাল পরে এত কাছে মুখোমুখি দেখলাম, মালতী। অ-নেক দিন পরে!'

কথা বলার সুরে কোথায় যেন একটা দুঃখের বাষ্প ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশে।

'এতদিন বাদে বুড়ির মুখ দেখে কী মনে হচ্ছে বলবে না একটু?' মনে-মনে এরকম কিছু প্রশ্ন করবার ইচ্ছে থাকলেও মুখে কিছু বলতে পারেন না মালতী। এ ধরনের ছেলেমানুষি চিন্তা মাথায় আসাতে খুব অবাকও লাগছে তাঁর। নিজেকে নিয়ে এভাবে ভাবতে কবে থেকে যেন ভুলে গেছেন তিনি।

বার্ধক্যের ঘুনপোকা নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে অমরনাথের শরীরেও। একদিন ঘুম থেকে উঠে তিনিও যেন আবিষ্কার করলেন কবে যেন সেই অচেনা জাদুকর তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেছে এক আশ্চর্য ফ্যাকাশে রঙের ছাড়পত্র। এর সাহায্যে এখন তিনি সহানুভূতি, করুণা কিংবা দয়াও ভিক্ষা করতে পারেন সংসারের আর-পাঁচটা সক্ষম মানুষের কাছে। এবং কী আশ্চর্য, এক অদ্ভুত ষড়যন্ত্রের মতো তাঁর নিজস্ব পুরুষ-সত্তাকে কারা যেন কত সহজে কেড়ে নিয়ে গেল। এ ধরনের সব ভাবনা আজকাল মাথায় এলেই মনে-মনে হাহাকার করে ওঠেন অমরনাথ।

নদীর ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁরা।

হঠাৎ যেন কোনো মায়ামন্ত্রবলে এক রূপকথার রাজ্যে তাঁরা পালিয়ে এসেছেন। আজকে এতকাল বাদে এখানে আসার কথা ছিল না। তবু ইচ্ছে অনিচ্ছের বাইরেও তাঁদের মতো সাধারণ সাদামাটা মানবজীবনেও কত কিছু অবাস্তব ঘটনা ঘটে যায়।

দুটি অল্পবয়েসী ছেলে মেয়ে রেললাইন পেরিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছিল।

মেয়েটির পরনে জিনসের প্যান্ট, সাদা শার্ট। একবার তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায় বেশ সুন্দরী। ছোটোখাটো চেহারা। তুলনায় ছেলেটি বেশ ঢ্যাঙা। ছাই রঙের প্যান্ট, নানারকম ছাপওলা রঙিন শার্ট। মেয়েটির কাঁধে হাত দিয়ে সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে আসছিল ছেলেটি।

পৃথিবীতে এর থেকে সুন্দর দৃশ্য আর কী হতে পারে, মনে-মনে বিড়-বিড় করে বললেন অমরনাথ।

'ওমা, ওরা কোথায় হারিয়ে গেল বলো দেখি?'

সত্যিই তো, গাছপালার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে ছেলে-মেয়ে দুটি।

তার মানে মালতীও এতক্ষণ ওদের লক্ষ করছিলেন।

আর তখনই একটা সবুজ আর হলুদ রঙের রেলগাড়ি ঠিক যেন খেলনার মতো দুলতে-দুলতে নিজস্ব কক্ষপথ পরিক্রমার শব্দের আওয়াজ ছড়িয়ে হারিয়ে গেল কোন অপরিচিত ঠিকানায়।

মালতী আনমনা তাকিয়ে থাকেন নদীর দিকে। অমরনাথ অস্থিরভাবে একবার দেখছিলেন দূরে নদীর উপরে অর্ধসমাপ্ত সেতুর কঙ্কাল, এপাশে সবুজ বিশাল-বিশাল গাছ, নদীর ওপারে এই দ্বিপ্রহরের গনগনে উত্তাপে ধূসর কলকারখানা কিংবা বাড়িঘরের অলৌকিক অবস্থান।

'দেখো — দেখো, সেই ছেলে-মেয়ে দুটো!' মালতী বলেন।

যেন পাতাল ফুঁড়ে ওদের আবির্ভাব ঘটল জলের কিনারায়।

'তাই তো।' অমরনাথ বলেন। এসব জায়গার গলিঘুঁজি তাঁদের কাছে নতুন হলেও ওই ছেলেমেয়ে দুটি নিশ্চয়ই নিয়মিত এখানে আসে। ওদের কাছে সব চেনা।

একজন লুঙ্গিপরা মাঝবয়েসী মাঝি এসে দাঁড়াল তরুণ-তরুণীর কাছে। পাড় থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা নৌকা। দড়ি ধরেই সেটাকে পাড়ের কাছাকাছি টেনে নিয়ে আসল মাঝি।

খিলখিল করে হাসছিল সেই তরুণী। একলাফে উঠল নৌকার পাটাতনের উপরে। কোমরে হাত দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল চারপাশে। ছেলেটিও ততক্ষণে উঠে পড়েছে নৌকার উপরে।

তারপর দুজনে ঢুকে গেল ছইয়ের ভিতরে। মাঝি একটা চটের পরদা টেনে দিল।

'এই নদী শেষ পর্যন্ত চলে গেছে সমুদ্দুরে। ভাবতেও অবাক লাগে।' গালে হাত দিয়ে মালতী বলেন।

'তোমাকে কখনো সমুদ্র দেখাতে পারি নি। মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হয়, তোমাকে নিয়ে দীঘাতে যাই। শুনেছি, সেখানে যেতে-আসতে খরচপাতি কম।' সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে অমরনাথ বলেন।

শব্দ না করে সামান্য হেসে মালতী বলেন, 'আর কোনোদিন আমাদের কোথাও যাওয়া হবে না।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন দুজনে।

'জাহাজে যারা চাপে, তাদের কত বড়ো কপাল। জলের উপর ভাসতে-ভাসতে কত দূর দূর দেশে তারা যায়।' সামনে জলের উপরে অপেক্ষমান সাদা রঙের একটা জাহাজ দেখতে-দেখতে মালতী বললেন।

'হ্যাঁ, জলের জাহাজ — উড়োজাহাজ -- কোনো জাহাজেই কখনো তোমাকে চাপাতে পারলাম না।' হতাশামাখা গলায় অমরনাথ বলেন।

'আহা, তার জন্য দুঃখু করার কী আছে? নাই বা হল আমাদের জাহাজে চাপা। এই বুড়ো বয়সে আর নতুন করে সাধ-আহ্লাদের কথা ভেবে মন খারাপ করার কোনো মানে হয়? আমাদের ছোটো খোকা তো উড়োজাহাজে চেপেছে।' মালতী বলেন।

অমরনাথ কিছু বললেন না। বলবার মতো কীই-বা আছে। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। চারটে ছেলে-মেয়ে ঠিকমতো মানুষ করতেই জীবনটা কিভাবে খরচ হয়ে গেল, এখন আর ঠিকমতো হিসেব কষে বলতে পারা সম্ভব নয়। খুব বড়ো কিছু স্বপ্ন দেখার সাহস কিংবা সামর্থ্য তাঁর কোনোদিনই ছিল না। এখনো নেই।

আকাশে বাদামি মেঘের আচ্ছাদন এর মধ্যে বেশ ঘন হয়েছে, ওঁরা এতক্ষণ খেয়াল করেন নি।

একটা ঠাণ্ডা ঝাপটা কোথা থেকে এসে লাগল দুজনের শরীরে।

বৃষ্টি এল।

খুব জোরে নয়। হালকা ধরনের ঝিপঝিপ করে বৃষ্টি, শরৎকালের আবহাওয়ায় যেটা স্বাভাবিক।

মালতী বলেন, 'বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা যে ভিজে যাব গো!'

অমরনাথ বলেন, 'আজকে অনেক কাল পরে ভিজতে ভারি ইচ্ছে করছে।'

'বুড়ো বয়সে ভিজে অসুখ করবে।'

'মাত্র একটা দিন। আবার আমরা সেই দুটি আলাদা-আলাদা খোপে বসে বকম-বকম করব। একসঙ্গে মুখোমুখি দুজনে বসে-বসে কতকাল এরকম নিরিবিলি গল্প করি নি বলো তো?'

মালতীর বুকের ভিতরের সেই পাখিটা যেন খাঁচার মধ্যে মাথা কুটে মরে। অমরনাথের কথার মধ্যে কী একটা ছিল, তাঁকে অযথা আকুল করতে থাকে। জরাগ্রস্ত ঠোঁটে হালকা রসিকতার প্রলেপ টেনে তিনি বলেন, 'কথার কী ছিরি! আমি কি তোমার পরস্ত্রী, যে ওভাবে কথা বলছ?'

'আমরা দুজনে স্বামী-স্ত্রী -- এ খবরটা এতকাল বাদে তোমার হুঁশ হল?'

আর-একটা সবুজ আর সাদা রঙের খেলনার মতো রেলগাডি ঝিকঝিক করে চরাচরে শাঁখের আওয়াজ ছড়িয়ে চলে গেল পাশের রেললাইন দিয়ে।

বৃষ্টির ঠাণ্ডা অনুভূতি দুজনে তাঁদের স্নায়ুর কোষে- কোষে খুব তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন।

মালতী মুখ তুলে তাকালেন। সামান্য বেদনামাখা গলায় ব'লেন, 'তুমি বাপু মাঝে ক'দিন খুব পাগলামি করলে। কী দবকাব ছিল বলো তো?'

'পাগলামি? তুমিও তাই বলছ, মালতী'

'নয়? এই বুড়ো বয়সে!'

'বুড়ো বয়সে? কী বলছ তুমি নিজেও জান না। অবশ্য তোমাকে দোষ দিয়েই বা কী করব? নিজেদের নিয়ে ভাবতে কোন্‌কালে আমরা ভুলে গেছি।' অমরনাথেব গলা থেকে একটা চাপা হাহাকার বৃষ্টির সঙ্গে কাঁপা হাওয়ায় বুঝি ছড়িয়ে যায় চারপাশে।

বৃষ্টি ভিজিয়ে দিচ্ছিল দু'জনকে।

অনেকক্ষণ তাঁরা কেউ কথা বললেন না। বলতে পারলেন না। একটা শূন্যতা যেন চেপে ধরেছিল দুজনকে। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল; অসহ্য যন্ত্রণায় বুকে হাত দিয়ে দুজনে বুঝি ভীষণ ঠাণ্ডা একটা অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে থাকলেন অনন্ত সময় ধরে। পায়ের হাঁটু ব্যথায় টনটন করছিল। বাইরে কোথায় যেন অস্পষ্ট ফিসফিস করে কাবা কথা বলছিল। তাঁবা দুজনেই প্রাণপণে প্রবল আবেগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে চাইছিলেন। অথচ কী আশ্চর্য, এই

নির্জন অন্ধকার ঘরে শীতের ঠাণ্ডায় জমতে জমতে কবে থেকে যেন সত্যি-সত্যি তাঁরা পরস্পর-এর সঙ্গে কথা বলতে ভুলে গেছেন। হাজার চেষ্টা করেও কোনো মানবিক ভাষা তাঁরা স্মরণ করতে পারছিলেন না, যার সাহায্যে এতকাল বাদে দুটি মানুষ-মানুষী নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন।

কেন যে এমন হয়! কত কথা বলতে ইচ্ছে করে, অথচ কত কঠিন এই পরস্পরের বোধগম্য একটা সহজ ভাষা খুঁজে পাওয়া।

বহু দূর থেকে খুব ক্লান্ত গলায় অমরনাথ শুধান, ' নৌকায় গিয়ে বসবে?'

'ছি ছি, কী লজ্জার কথা! তোমার মাথাটা দেখছি' সত্যিই খারাপ হয়েছে!'

'কেন, এতে লজ্জা পাওয়ার কী হল?'

'যে বয়সের যা -- বোঝ না কেন?'

'বয়সের কথা বলছ?'

'আমরা তো এখন বুড়োবুড়ি। লোকহাসানোর কী দরকার?'

'এখানে চেনা লোক কোথায়?'

'তোমার বুঝি চেনা-অচেনা মানুষের জ্ঞান হয়েছে এতদিনে? তাহলে চেনা মানুষদের মধ্যে অত ছেলেমানুষি করার কী দরকার ছিল বলো তো?'

খানিকক্ষণ গুম হয়ে মনে-মনে কী যেন যুক্তি খুঁজে বেড়ান অমরনাথ। সেই ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়ার ঝাপটা এক অদ্ভুত কনকনে অনুভূতি এনে দিচ্ছিল মজ্জায়-মজ্জায়।

হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে অমরনাথ বলেন, 'অনেক কাল আগে একবার এরকম বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম জান। ঠিক এরকম শরৎকালে -- আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি দুপুরবেলায়। মাঠের মধ্যে দিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ সারা আকাশ কালো করে বৃষ্টি। সঙ্গে ছিল আমার বন্ধু শম্ভু। শম্ভুর কথা মনে আছে তোমার?'

'গত বছর পুজোর সময় মারা গেলেন।'

'গলায় ক্যানসার....।'

'বিয়ের পর থেকেই দেখেছি, দুজনে যখন গল্প করতে, কী জোরে-জোরে হাসতে তোমরা! এখনো কানের পাশে যেন সেসব হাসির আওয়াজ শুনতে পাই।'

'আমার ছেলেবেলার বন্ধু।' ঝাপসা চোখে অমরনাথ যেন দেখতে পাচ্ছিলেন, পনেরো ষোলো বছরের দুই কিশোর গঞ্জের ধারে রুপালি নদীটির পাড়ে বটগাছের তলায় বসে গল্প করছে....

'আড্ডা মারতে খুব তখন।' কৌতুকমাখা গলায় মালতী বলেন।

' সে এক বয়স। যা বলছিলাম -- '

'মাঠের মধ্যে দুজনে হাঁটছিলে। বৃষ্টি হচ্ছিল।'

'হুঁ।'

'আমাকে কত বার শুনিয়েছ তোমাদের এসব ছেলেবেলার গল্প।'

'কবে শুনিয়েছি, মালতী? আমার তো মনে পড়ছে না।'

'কতবার। বিয়ের পর তো দিন-রাত নিজেদের অল্প বয়সের গল্প শোনাতে। তোমার বন্ধুও বাপ্‌ খুব আমার পেছনে লাগত। শুধু ঠাট্টা আর রসিকতা। ওর বউ কমলাও ছিল ভারী মিশুকে। আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছল। সে বেচারাও কম বয়সে কী একটা অসুখে মারা গেল। বাচ্চাকাচ্চা ছিল না। বউ মারা যাওয়ার পর মানুষটা কেমন একা হয়ে গেল। এত করে আমরা বলতাম। তবু সে আর বিয়েই করল না।'

'সব ভুলে গেছি। মাঝের পঁচিশটা বছর একটা দিনও কি তোমাকে এরকম একলা কাছাকাছি পেয়েছি, মালতী?' বিড়বিড় করে বলে যান অমরনাথ। কান পেতে চুপচাপ শুনতে থাকেন মালতী। একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন অমরনাথ, 'পঁচিশ বছর আগের দিনগুলোতে তোমার সঙ্গে কী গল্প করেছি, কীভাবে জীবন কাটিয়েছি, সব আমি কবে ভুলে গেছি, মালতী...'

ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন মালতী। বিশ্রী কর্কশ গলায় বলেন, 'করার কিছুই তো ছিল না আমাদের।'

প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারিটা হঠাৎ চলে যাওয়ার পর গঞ্জের মহাজনের কাছে খাতা লেখার কাজ নিয়েছিলেন অমরনাথ। বড়ো ছেলে সমব কলেজ শেষ করে ততদিনে কলকাতা কর্পোরেশনে কেরানির চাকরি পেয়েছে। দুই মেয়ে অঞ্জু, মঞ্জু আর ছোটো ছেলে বিমল তখন স্কুলে পড়ছে। কষ্টেসৃষ্টে মোটামুটি চলে যাচ্ছিল। সমস্যা হল মহাজন হঠাৎ মারা যাওয়ার পর। তার ছেলের পছন্দ হল না অমবনাথের কাজ। সুতরাং চাকরিটা গেল।

খবর পেযে গ্রামে গিয়ে সমর বাবাকে বোঝাল শুধু-শুধু গ্রামে মায়া বাড়িয়ে পড়ে থেকে লাভ নেই। অঞ্জু, মঞ্জু, বিমলের পড়াশুনো আর ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে।

অতএব চলো কলকাতায়। চাটি-বাটি-গুটিয়ে আরো অনেক ভাগ্যসন্ধানী মানুষের মতো এই স্বর্ণনগরীর এক অন্ধকার ছায়া-ঢাকা কোণে অমরনাথ আশ্রয় নিলেন প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছে।

পুরোনো ড্যাম্প-লাগা স্যাঁতসেঁতে বাড়ি। দুটো মাত্র ঘর। এক ফালি বারান্দা। একটা ঘরে সমর বিমল। অন্য ঘরে অঞ্জু-মঞ্জুকে নিয়ে মালতী। বারান্দায় তক্তপোশের ওপর অমরনাথ।

এবং এভাবেই দেখতে-দেখতে যেন চোখের পলকে কেটে গেল পঁচিশটা বছর।

এই বছরগুলোতে অমরনাথের সাদামাটা মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্পও মোটামুটিভাবে একই রকম একঘেযে এবং নিরুত্তাপ। সম্বন্ধ করে সরকারি অফিসের কেরানির সঙ্গে অঞ্জুর বিয়ে দিলেন। বছর দুয়েক বাদে বিধবা হয়ে নিঃসন্তান অবস্থায় মেয়েটা ফিরে এল। সমর কাকে যেন ধরে পাকড়িয়ে তাকে একটা প্রাইমারি স্কুলে ঢুকিয়েছে। মঞ্জুটা কিছুতেই বিয়ে করতে চাইল না। এখন মেয়েদের হাইস্কুলের দিদিমণি। দু বোনেই প্রচুর টিউশনি করে। সমর আর বিয়ে করল না। বিমল চার ভাইবোনের মধ্যে সব থেকে উচ্চাশী। কয়েকটা চাকরি পালটিয়ে এখন একটা ভালো চাকরি পেয়েছে। আর একটু গুছিয়ে নিয়ে ও নিশ্চয়ই বিয়ে করবে।

ছোটোবেলা থেকেই চার ভাইবোন নিজেদেব একটা নতুন বাড়ির স্বপ্ন দেখে এসেছে। স্যাঁতসেঁতে ছোটো দুখানি ঘরে বাস করতে-করতে ভাড়াটে বাড়ির নানাবিধ অসম্মান সারা জীবন ধরে গায়ে মাখতে ইচ্ছে করত না তাদের।

পরিকল্পনাটা প্রথম এসেছিল বিমলের মাথায়। কলকাতায় চারিদিকে এখন ওনারশিপ ফ্ল্যাটের ধূম পড়ে গেছে। সুতরাং আমরাও সবাই মিলে একটা নিজেদের ফ্ল্যাট কিনব। বিমলের এক বন্ধু প্রোমোটারের কাছে পাওয়া গেল যাদবপুরের এইট-বি বাস স্ট্যানডের পাশেই একটা নতুন ফ্ল্যাটের সন্ধান। তারপর এল টাকার প্রশ্ন। সমর, অঞ্জু, মঞ্জু, বিমল --- ওরা ওদের সবটুকু সঞ্চয় একসঙ্গে জমা করল। কিন্তু সে আর কতটুকু। কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাপার। বিমল তার অফিস থেকে অনেক টাকা লোন জোগাড় করল। এল.আই.সি. এবং আরো কত জায়গা থেকে কীভাবে সব টাকা সংগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত তারা একটা নতুন ঝকঝকে ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছে, এটা ভাবলে সত্যিই এখন ভারি অবাক লাগে নিজেদের কাছে।

তিনখানা বড়ো শোবার ঘর। আলাদা বসার ঘর। খাবার জায়গা। সাজানো রান্নাঘর। চকচকে-টাইলস-বসানো শাওয়ার-কমোড-বেসিনের রূপকথার মোহ ছড়ানো স্নানঘর। গত পঁচিশ বছরের নিম্নমধ্যবিত্ত অভাববোধ কোনো জাদুমন্ত্রে যেন এক নিমেষে কোথায় হারিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর কী রকম আচ্ছন্ন গলায় মালতী বলেন, 'ঠাকুর আমাদের এতকালের সব কষ্ট ধুয়েমুছে দিয়েছেন।'

বোধহয় ঠাট্টার সুরে অমরনাথ বলেন, 'নতুন তিন তলার ফ্ল্যাটের গর্বে যে মাটিতে পা পড়ছে না দেখছি।'

' কেন, গর্ব হবে না কেন? আমার নিজেব পেটের ছেলেমেয়েরা কত কষ্ট করে কিনেছে।'

' সে গর্ব করতে পার। কিন্তু ঠিক করে ভেবে দেখো তো, আমাদের দুজনের কি সত্যিকারের কোনো ঠাঁই আছে ওদের নতুন ফ্ল্যাটে?' বিমর্ষ গলায় অমরনাথ বলেন।

গালে হাত দিয়ে অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে মালতী বলেন, 'বুড়ো বয়সে তুমি কী রকম হিংসুটে হয়ে যাচ্ছ গো! ছি, ছি কী লজ্জার কথা, সেদিন অঞ্জু প্রথম আমাকে চুপিচুপি বলল, তুমি নাকি বলেছ, নতুন ফ্ল্যাটের একটা পুরো ঘর ছেড়ে দিতে হবে আমাদের বুড়ো-বুড়ির জন্য। শুনে আমিও খুব রাগ দেখাতে শুরু করলাম তোমার উপর। বুড়ো বয়সে এ কী ভীমরতি হল তোমার বলো তো?'

'জীবনের এই শেষ দিনগুলোতে তোমাকে একটু কাছে পাব, এরকম চিন্তা করাকে তুমি ভীমরতি বলতে পারলে, মালতী?' ক্লিষ্ট গলায় অমরনাথ বলেন।

'ছি, ছি, কটা দিন ধরে কী পাগলামিই না করলে। বড়ো-বড়ো ছেলেমেয়েদের সামনে মাথাটা হেঁট করে দিলে গো!'

'হ্যাঁ, দুই মেয়ের কাছে বসে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো তুমিও সমানে আমাকে গালমন্দ করে গেলে।'

বাষ্পাকুল চোখে তাকিয়ে থাকেন মালতী। বলেন, 'কী করব বলো, এই বুড়ো বয়সে তুমি এমন করে আমাকে লজ্জায় ফেলবে, কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবি নি।'

'আমার কোন্ কথাটা তোমাদের কাছে দোষের হল শুনি? বললাম -- দুই মেয়ে এক ঘরে থাকুক। দুই ছেলে এক ঘরে। আমরা বাপ-মা বুড়ো-বুড়ি এক ঘরে থাকি। এর মধ্যে কোথায় আমার ভুল হল, আমি এখনো বুঝতে পারছি না।'

'তোমার কোথায় ভুল হচ্ছে বলব?'

মালতীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন অমরনাথ।

ফ্ল্যাট তোমার পয়সায় কেনা নয়। ছেলেমেয়েরা কষ্ট করে নিজেরা তৈরি করেছে। ওরা ওদের নিজেদের সুবিধামতো সাজিয়ে গুছিয়ে থাকবে না?'

কিছুটা বিভ্রান্ত গলায় অমরনাথ শুধান, 'আমি ছেলেমেয়েদের মানুষ করি [illegible]

'হ্যাঁ, করেছ। কিন্তু ওইটুকুই। বলো তো নিজের সামর্থ্যে কোনোদিন পে[illegible] একখানা চালাঘর তৈরি করতে?' [illegible]

অপমানে কালো হয়ে যায় অমরনাথের বলিরেখা-অঙ্কিত তামাটে [illegible] তাকিয়ে মালতীর চোখে জল এসে যায়। এভাবে তো মানুষটাকে অপমান ক[illegible] নি।

ধীরে-ধীরে অবসন্ন গলায় অমরনাথ বলেন, 'না – তা অবশ্য পারি নি। কীভাবে মানুষ অনেক টাকা হাতে পায়, সে রহস্যের উত্তর কোনোদিন ভালোভাবে জানা হল না।' কত কথা মনে ভেসে আসছিল। বাবা-মা মারা গেছলেন ছোটোবেলায়। জ্যাঠাকাকার একান্নবর্তী সংসারে মানুষ। উপেক্ষা, অনাদর আর অপমান মুখ বুজে সহ্য করে বড়ো হতে হয়েছে। অল্প কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। একটা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকের চাকরি পেয়ে গঞ্জে চলে আসেন। অল্প মাইনে। তো সে আমলে তাই অনেক। বামুনপাড়ায় একখানি ছোট ঘর ভাড়া নিলেন। সহকর্মী মালতীর বাবার পছন্দ হয়েছিল এই নবীন শিক্ষককে। অমরনাথের সংসারে একে-একে এল অমর, অঞ্জু, মঞ্জু আর বিমল। আত্মমগ্ন ভঙ্গিতে অমরনাথ বলেন, ' ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া, ঘরভাড়া, কাপড়-চোপড় — আমার সামান্য রোজগারে সব দিক সামলিয়ে কীভাবে সংসার চালিয়েছি, তা কি আজ তোমাকে নতুন করে মনে করাতে হবে, মালতী?'

'না- গো, তোমাকে আমি ছোটো করতে চাই নি। রাতদিন কত কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছ, সেসব কি আমি জানি না?' মালতী সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলেন।

'তবু ভালো, ছেলেমেয়েরা নিজেদের জন্য একটা নতুন ঘর তৈরি করতে পেরেছে।' নিরুত্তাপ গলায় অমরনাথ ঠিক যেন টিভির সংবাদপাঠকের ভঙ্গিতে একই সংবাদ শেষবারের মতো আবার পাঠ করলেন।

'আমার ছেলেমেয়েরা সবাই খুব পরিশ্রমী।' শান্ত গলায় বলেন মালতী, 'তুমি ওদের ভুল বুঝো না। ওরা আমাদের কতখানি ভালোবাসে, সেটা তুমি বুঝতে পার না? আমাদের কারোর এতটুকু কিছু অসুখ-বিসুখ হলে চারজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডাক্তার-কবিরেজ ডেকে যতক্ষণ না সুস্থ হচ্ছি ওদের স্বস্তি হয় না। আজকালকার কটা বাপ-মা এতটা যত্ন-আত্তি পায় বলো তো ছেলেমেয়েদের কাছে?'

'ঠিক আছে, আমাদের না দিক, বড়ো খোকাকেই একটা ঘর ছেড়ে দেওয়া উচিত। বেচারা সারাটা জীবন কীভাবে পরিশ্রম করল। চোখের সামনে বুড়িয়ে গেল। ও একটু শান্তি পাক।'

'কী যে পাগলের মতো কথা বল। তুমি তো জান, ফ্ল্যাটটার যোগাড়যন্ত্র থেকে শুরু করে সবকিছু ছোটো খোকার কেরামতি।'

'হুঁ।' আনমনা গলায় অমরনাথ বলেন। মালতীর কথা তিনি মন দিয়ে শুনছেন কিনা ঠিক বোঝা যায় না।

'এই শোনো, আমি কিন্তু এবার ভেবে রেখেছি, ছোটো খোকার বিয়ে দেব। একটা ছেলে তো সংসার সামলাতে গিয়ে আইবুড়ো থেকে গেল।'

[illegible]খোকা রাজি আছে?'

[illegible]মনে হয় না। অঞ্জু বলছিল, ছোটো খোকার একটা পছন্দের মেয়ে আছে। [illegible]চাকরি করে। তবে বাপু বলেই রাখি, তখন আবার পাগলামি করবে না, [illegible]ন।'

[illegible] সব ঠিকঠাক হয়ে আছে ভিতরে-ভিতরে। আমাকে তুমি তো একটা কথাও কোনোদিন বল নি।'

'কখন বলার সময় পাব বলো?' মনে-মনে প্রতিদিনের রুটিনটা বোধ হয় ঝালিয়ে নিতে চাইলেন মালতী। সকাল থেকে তাঁকে রান্নায় ব্যস্ত থাকতে হয়। সংসারের কত কাজ। ভোরবেলায় অঞ্জু যায় স্কুলে। নটা বাজতে না বাজতেই বাকি তিনজনের কাজে যাবার তাগাদা। ওরা বেরতে না বেরতেই অঞ্জু ফিরে আসে। দুপুরে বিকেলে রাত্রে ছাত্রীরা আসে টিউশনি পড়তে। ছেলেমেয়েদের সময়মতো খাওয়া-দাওয়া, সুবিধা-অসুবিধা সবকিছুর দিকে অষ্টপ্রহর নজর রাখতে হয় মালতীকে। মুখ টিপে হেসে তিনি বলেন, ' জোয়ান ছেলেমেয়েদের সামনে বুড়োবুড়ির নিজেদের ইচ্ছেমতো গল্প করা সম্ভব নাকি!'

' সেজন্যই তো আমি একটা আলাদা ঘর চেয়েছিলাম, মালতী। কতকাল আমরা একসঙ্গে বসে মুখোমুখি গল্প করি নি। কতকাল আমরা এক বিছানায় পাশাপাশি শুই নি। কতদিন তোমাকে ছুঁয়ে দেখি নি, মালতী!'

'আমার এই বুড়ি শরীরে আর কিছু বাকি আছে নাকি?' ঠাট্টা করে মালতী হাসেন, 'নিজেকে আর মেয়েমানুষ বলে চিনতেই পারি না। বুক-পাছা সব ল্যাপাপোঁছা হয়ে গেছে। এ বয়সে এরকম দূরে-দূরে থাকাই ভালো। খুব কাছে এলে শুধু-শুধু দুঃখ বাড়ানো।'

'তুমি আমাকে কিছুই বুঝলে না, মালতী। পুরুষের ক্ষমতা আমার দেহেও তো এখন কিছু অবশিষ্ট নেই। কিন্তু দুজন পুরুষ আর নারীর সম্পর্ক কি শুধু শরীরের হিসেব মিলিয়েই চলতে থাকে? তার বাইরে আর কিছু নেই?'

মালতী কাঁদতে থাকেন।

'জান, তোমার ছোটো ছেলে আমাকে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে বলেছে।'

'অ্যাঁ।'

'হ্যাঁ গো, সত্যি। আমি নিজের কানে শুনেছি। কাল রাত্তিরে ছোটো খোকা বলছিল বড়ো খোকাকে -- বাবা বড়ো বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছে। এবার সত্যি-সত্যিই একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে।' কাঁদতে-কাঁদতে বলতে থাকেন অমরনাথ, 'বলো মালতী, তুমিও বলছ পাগল, ওরাও বলছে পাগল। জান, দরজার ওপাশ থেকে ছোটো খোকার কথা শুনে আমার বুকের ভিতরটা কেমন আতঙ্কে হিম হয়ে গেল। যদি ওরা আমাকে রাঁচিতে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়। এখানে তবু তোমাকে, ছেলেমেয়েদের সকলকে চোখের সামনে

দেখতে পাচ্ছি। সেখানে পাগলদের মধ্যে একা-একা কীভাবে থাকব মালতী? ক'দিনই বা আর বাঁচব বলো তো?'

'তোমাকে তো তাই বার-বার করে বোঝাচ্ছি, আলাদা ঘরে থাকার ওসব উলটোপালটা চিন্তা আর মাথায় এনো না।'

'আনব না। সত্যিই তো, এ বাড়ি আমার পয়সায় তৈরি না। এখানে আমি কোন্ অধিকারে একখানা ঘর চাইব, যেখানে তোমাকে নিয়ে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে পারব।'

দুজনেই নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। ঝিপঝিপে বৃষ্টি তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ এর মধ্যেই বেশ ভিজিয়ে দিয়েছে।

ব্যগ্রভাবে হঠাৎ অমরনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি একবার বুকে হাত দিয়ে বলো তো মালতী, তোমার মনেও এতটুকু ইচ্ছে হয় না আমার সঙ্গে এক ঘরে বাস করতে? নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলো না, মালতী।'

মালতী কাঁদতেই থাকেন। যেন নতুন করে আর কীই বা স্বীকারোক্তি করবেন।

'যদি সত্যি এখনো আমার দেহে বাড়তি ক্ষমতা থাকত, সেরকম কিছু উপার্জন করতে পারতাম, তাহলে তোমাকে নিয়ে চলে যেতাম আমার ছেলেবেলার গ্রামে। সেখানে আমাদের বাপ-ঠাকুদ্দার ভিটের পাশে একটুকরো জমি কিনে ছোট্ট একটা খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর বানাতাম। উঠোনের একপাশে কয়েকটা ফুলের গাছ। হাসনুহানা, কামিনী, জুঁই, গন্ধরাজ। বাড়ির পেছনে কয়েকটা ফলের গাছ। আম। কাঁঠাল। কলা। মাঝে-মাঝে জ্যোৎস্নার রাত্তিরে উঠোনে মাদুর পেতে বসে আমরা আমাদের অল্প বয়সের গল্প করতাম।' অমরনাথ বলেন।

'কেন দুঃখ পাচ্ছ? এসব তো কিছুই কোনোদিন হবে না আমাদের জীবনে।' মালতী বলেন।

'সত্যি, নতুনভাবে কিছু করার ক্ষমতা আর নেই আমাদের।'

বড়ো অদ্ভুত আর ভয়াবহ সেই শূন্যতা আবার গ্রাস করে দুজনকে। বাইরে চারদিকে বুঝি দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। এক ভয়ংকর জতুগৃহের মধ্যে দুজনে দাঁড়িয়ে খুব নিশ্চিতভাবে তাঁরা বুঝি অপেক্ষা করে শুনছেন আড়ালে দূরে ভেসে আসা জীবনের ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি....

অনেকক্ষণ পর অমরনাথ বলেন, 'ভাগ্যিস আজ জোর করে তোমাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছলাম।'

'আর ডাক্তার দেখানোর পর তোমার মাথায় ভূত চাপল, একা-একা দুজনে নদীর ধারে পালিয়ে গিয়ে বসব!' মালতীর ঠোঁটের কোনায় সেই বহু পরিচিত অথচ হারিয়ে-যাওয়া তরুণীর হাসি আবিষ্কার করে শিহরণ বোধ করেন অমরনাথ।

ব্যগ্র গলায় তিনি বলেন, 'মালতী, একবারটি কথা শোনো, কিছুক্ষণের জন্য নৌকায় গিয়ে বসবে? কবে বাঁচি-মরি আর হয়তো কোনোদিন কাছে পাওয়ার এরকম সুযোগই আসবে না আমাদের জীবনে।'

রহস্যময়ী চোখে মালতী তাকিয়ে থাকেন। কিছু প্রতিবাদ করার ভাষাই বুঝি খুঁজে পেলেন না।

একজন মাঝিকে ডাকেন অমরনাথ। পঞ্চাশ টাকা ঘণ্টা। দরদস্তুর করে দুজনে কোনো রকমে উঠে বসলেন নৌকার মধ্যে।

ছইয়ের ভিতরে যেন প্রাগৈতিহাসিক আলোআঁধারি।

'পরদা নামিয়ে দেব?' অমরনাথ শুধান।

'কী দরকার। খোলা থাক। ঠাণ্ডা হাওয়া আসবে।' লজ্জা-পাওয়া গলায় মালতী বলেন।

'একটু প্রাইভেসি পাব বলে পয়সা খরচ করে এক ঘণ্টার জন্য এখানে এসেছি, মহারানী।' সমর্থ পুরুষ মানুষের মতো ছইয়ের পরদা নামিয়ে দিলেন অমরনাথ।

বাইরে থেকে কে যেন ঠাট্টা করে বলে, 'আজকাল শালা বুড়ো-বুড়িরও কম রস নেই।'

[illegible] কে কী বলল সেদিকে কান পাতার প্রয়োজন মনে করেন না দুজনে।

'তোমার হাতখানা একটু দেবে মালতী, বড়ো ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।'

জরাগ্রস্ত হাতখানা বাড়িয়ে দেন মালতী।

খুব শান্তভাবে মালতীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ধরে কাঁদতে থাকেন অমরনাথ।

তারপর চরাচরে জ্যোৎস্না নামে। ফুল ফোটে। হরিণের পায়ের শব্দ হয় শুকনো পাতায়। দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সেই স্নিগ্ধ ছায়ায় পরস্পরকে নিঃশেষ করে জীবনের উত্তাপ খুঁজতে থাকেন দুজনে।

মালতীর মাথার সাদা চুলের মধ্যে মুখ গোঁজেন অমরনাথ। সম্ভবত কোথায় কোনো পাখি ডাকে।

আস্তে-আস্তে গঞ্জের গাছপালাগুলো স্পষ্ট হতে থাকে অমরনাথের চোখের সামনে।

'তোমার মনে আছে মালতী, সেই যেবার পাঁচ বছরের ছোটো খোকার জল-বসন্ত হয়েছিল, এরকম নৌকায় করে নদী পেরিয়ে মহাদেবগঞ্জে গিয়ে গাজীবাবার মাজারে মানত করে এসেছিলাম।'

অমরনাথের বুকের মধ্যে মুখ রেখে মাথা নাড়েন মালতী।

নৌকার পাটাতন দুলতে থাকে। বৃষ্টির ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস একটা অলৌকিক শান্তি ছড়িয়ে দিতে থাকে নৌকার ভিতরে।

আর তখনই, বাইরে সেই রূপকথার রেলগাড়িটা শাঁখের আওয়াজ ছড়িয়ে বুঝি দূরে কোথায় চলে যায়। চোখের সামনে তাঁরা দেখতে থাকেন, সেই খেলনার মতো রেলগাড়ির একটা ছোটো কামরায় মুখোমুখি বসে আছেন দুজনে। হাসেন। গল্প করেন। রসিকতা করেন। জানলা দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে মালতী হয়তো দূরে কী যেন একটা দেখান -- নদী কিংবা হ্রদ কিংবা পাহাড়...

ছইয়ের মধ্যের ঘেরাটোপে বসে এই দুই আদিম পুরুষ আর রমণী কান পেতে শোনার চেষ্টা করেন সেই দূরাগত অস্পষ্ট ধ্বনিপুঞ্জ।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৫২/সংখ্যা ৭ : ১৩৯৮]

অপহরণ

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

[জন্ম ১৯৫৬ সালে । শৈশব আর কৈশোরের প্রায় পুরোটাই কেটেছে বাঁকুড়া জেলায়। রাঢ় বাঁকুড়ার মাটি আর মানুষ তাঁর গল্পের মুখ্য উপাদান। এ পর্যন্ত প্রকাশিত বই ছ'টি। 'পরিক্রমা' গল্পগ্রন্থের জন্য ২০০০ সালের বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত সোমেন চন্দ পুরস্কার পেয়েছেন । সাহিত্য আকাদেমির আঞ্চলিক সচিব।]

সন্ধে ছ'টা পনের মিনিটে জানা গেল দেড় দিনের শিশুটি চুরি গেছে। বেসামাল সরকারি হাসপাতাল থেকে নয়, অপহরণ করা হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত নার্সিং হোম থেকে। ষোল হাজারি নিরাপত্তার জ্যাকেট ভেদ করে তের নম্বর কেবিনের শিশুটি পাচার হয়ে গেছে। ষোল হাজারের মধ্যে সমস্ত রকম নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ছিল—গাইনির কাঁচি শিশুর পায়ে কামড় দেবে না, স্টিচ পেটের চামড়াকে খামচে ধরবে না, এইড্‌সের জীবাণু ঢুকবে না ঐ নারী কিংবা শিশুর শরীরে। কথা ছিল রাত্রে বা দিনে শিশুর চিৎকার প্রসূতিকে উত্ত্যক্ত করবে না। প্রসূতি বা শিশুর ওষুধ কিংবা রক্তের জন্য হাসব্যান্ড কিংবা বাড়ির অন্যান্য লোকদের ছোটাছুটি করতে হবে না। উদ্বিগ্ন সিগারেটে টান দিতে দিতে লেবার রুমের সর্বশেষ সংবাদের জন্য পাক খেতে হবে না। দারোয়ানের হাতে টিপস গুঁজে দিয়ে খুচরো খবরের প্রতীক্ষা করতে হবে না। তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না কখন সন্টু ওপর থেকে ফিরে মন্টুকে কার্ড দেবে। পিসিমা, নাতনির খবর নিতে গিয়ে, নিজের তেরটি সন্তানের জন্ম-ইতিহাস শুনিয়ে কখন নিচে ফিরবেন তার অপেক্ষা থাকবে না। ষোল হাজারে অনেক কথা দেওয়া ছিল---নার্স ছুটে আসবে মুখের কথা খসলে, সিজারের সমস্ত ঝক্কির পরেও ডাক্তারের মুখে ভেসে থাকবে হাসি, রিসেপসনিস্টের গলায় ফুটে উঠবে রেওয়াজি মধুর স্বর।

সবই মিলেছে। শুধু হারিয়ে গেছে সুমিতা-অনুপ চ্যাটার্জির শিশুটি। শিশুটির জন্মের সংবাদ টেলিফোনে পৌঁছে গিয়েছিল অনেকের কাছেই। সুমিতার বাবা-মা এসেছিলেন। সুমিতার কাকা-কাকিমা এসেছিলেন। এসেছিলেন অনুপের জ্যাঠাইমা এবং তাঁর ছেলে। খবর গিয়েছিল অনুপের মা-বাবার কাছে দুর্গাপুরে। এসেছিল অনুপের কিছু সুদূর আত্মীয়-আত্মীয়া। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হলে এরকম কিছু প্রশাখার আপনজন তিনপুরুষ আগের স্মৃতি-রোমন্থনে মাতে। তারা অতীতের গিঁট দিয়ে বর্তমানের সুতোকে শক্ত করে বাঁধতে চায়। কেউ ভাবে পিসতুতো দাদার খুড়তুতো আই.এ.এস. ভাইয়ের কলমের আঁচড়ে নেপা হগ মার্কেটের লাল বাড়িতে চেয়ার পেয়ে যাবে। কারও আশা জেঠতুতো দাদার শালা লালবাজারে ফোন করলে ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে পালাবে। কেউ এটুকুই দাবি নিয়ে আসে যে তার মেয়ের বিয়ের ফাইন্যালের দিন আই এ.এস. অনুপ উপস্থিত থাকবে। বংশ পরিচয়, বিয়ের বাজারে, খুব কাজে লাগে। আবার কারো কারো উপস্থিতি নেহাৎই নিষ্কাম। দুর্গাপুরে একবাড়িতে ভাড়া থাকত। কেউ ছিল

অনুপের মেস-মেট। তাদেরই আনা নানা উপহার আয়ার জন্য নির্দিষ্ট বেঞ্চ জুড়ে সাজানো ছিল। ছিল শুভেচ্ছাবার্তাও। দিল্লি থেকে অনুপ ফ্যাক্স মেসেজ পাঠিয়েছে। তিন কোটি টাকার গ্রান্ট সাড়ে তিন দিনে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। কালই কলকাতায় ফিরবে প্রাইভেট এয়ারলাইন্সে।

তার আগেই শিশুটি হারিয়ে গেল।

নার্সিং হোমের এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার মিস্টার দত্ত অবসরপ্রাপ্ত মেজর। প্রশাসনে দক্ষ। জানেন এই শিশু অপহরণের প্রতিক্রিয়া কতখানি। খবরের কাগজগুলি ছুটে আসবে। ওয়ার্ল্ড কাপের পর খবর বাড়ন্ত। নির্বাচন কমিশনার ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত। মিস ইউনিভার্স টিভি স্ক্রিনের বাইরে চলে গেছে। যুবনেত্রী এবং যুবনেতারা উপস্থিত খেলা আর নানা উৎসবে ব্যস্ত। প্লেন ঝরে পড়ছে না। ইন্দ্রপতন ঘটছে না। নেতিয়ে গেছে খবরের কাগজগুলো। নার্সিং হোমে শিশু অপহরণের ঘটনায় মুহূর্তে ছুটে আসবে। নেতিয়ে পরা শরীর তাতিয়ে নেবে। সুমিতা বারবার বলা সত্ত্বেও মিস্টার দত্ত ঘটনাটা অনুপকে জানান না। হয়ত সামান্য চাপ দিলে এই ফ্লোরেই মিলে যাবে শিশুটি।

মেলে না। ধমকে মেলে না। কাজ চলে যাবে সে ভয়েও মেলে না। তের নম্বর কেবিনের আয়া শেফালীর স্বরগ্রামটি শুধু চড়ে। কেবিনে দিদিমণির বাড়ির লোকজন আছে দেখে কাপড়চোপড় কাচতে গিয়েছিল। দিদিমণি গিয়েছিলেন বাড়ির লোকজনদের খানিক এগিয়ে দিতে। সেই ফাঁকে... । শেফালী কান্না জোড়ে।

তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয় নার্সিং হোমের সমস্ত ফ্লোর। ডাস্টবিন ওল্টানো হয়। ডেটল ক্রিমের ফাঁকা টিউব, স্যানিটারী ন্যাপকিনের খালি প্যাকেট, চল্লিশ সেন্টিমিটারের ইনফ্যান্ট ফিডিং টিউব, রেক্টিফায়েড স্পিরিটের শিশি, ক্রমিক জনসনের '০' নম্বরের ক্যাডগাট, ড্যাবসিলক্স এবং রেরিক্যাপের খালি স্ট্রিপ, ভি.ডি.আর.এল.--এর রিপোর্ট--এসব ছড়িয়ে পড়ে।

সব আছেস শিশুটি নেই।

খবর দেওয়া হয় অনুপকে । পাঁচ-মিনিটের ভেতর লালবাজারে ঝনঝন করে ওঠে টেলিফোন। রিলে পদ্ধতিতে বেল বেজে যেতেই থাকে। অবশেষে লোকাল থানা। আই এ এস অফিসারের কেস। আই.এ.এস অফিসারের মাল চুরি গেছে। কী চুরি গেছে তখনও সবার কাছে স্পষ্ট নয়। জরুরিও নয়। তিনটি অক্ষরই যথেষ্ট—আই.এ.এস । অন্য কিছু জুড়ে দিলে যেন শব্দদূষণ ঘটে যাবে। লঘু হয়ে যাবে কেসের ঘনত্ব। প্রতিমুহূর্তে কত কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। কতকিছুই চুরি যাচ্ছে। সে সবের মতো এ চুরিও সাধারণ হয়ে যাবে। কী চুরি হল এবং কত দাম তার---এ হিসাবের গুরুত্ব কতটুকু? ব্রিফকেস, হাতঘড়ি এবং ছাগল সে সবও অমূল্য হয়ে যেতে পারে ব্যক্তি বিশেষের পদের কারণে। আই এ.এস. অফিসার অনুপ চ্যাটার্জির চুরির কেস। এটাই জরুরি, এটাই জরুরি অবস্থা।

ফল-অন করানো হয় আটচল্লিশজন আয়াকে। তাদের মুখোমুখি নার্সিং হোমের মালিক চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য। আগে নামের পাশে বি.এস.সি (বায়ো) লেখা থাকত। তখন প্যাথলজিকাল ল্যাব চালাতেন। নার্সিং হোম করার পর ডিগ্রি তুলে দিয়েছেন। চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্যের পাশে

দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার দত্ত, মেজর (রিটায়ার্ড)। নার্সিং হোমের লেটার প্যাডের নিচে এরকমই তথ্যসমৃদ্ধ রাবার স্ট্যাম্প। ওপরে নার্সিং হোম -এর -'হোম' -এবং নিচে মিস্টার দত্তের 'মেজর (রিটায়ার্ড)---এ দুয়ের ভেতর যেন গৃহের সুখ এবং দুর্গের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি থাকে।

সবকিছু থেকেও কিছুই নেই। শিশুটি হারিয়ে গেছে।

আটচল্লিশজন আয়ার শরীরে হালকা নীল পাড়ের সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ গায়ে। যেন আটচল্লিশজন যুদ্ধবন্দী। তাদের সামনে মেজর (রিটায়ার্ড) দত্ত এবং প্রোপ্রাইটার ভট্টাচার্য, তাদের দুপাশে পিস্তলধারী চার অফিসার, তাদের পেছনে বন্দুকধারী ছজন পুলিশ।

সুমিতার হুইল চেয়ারটিকে গড়িয়ে আনে দুই নার্স। তাদের পেছনে স্টেথো-গলায় দুই ডাক্তার। জরুরি অবস্থার সমস্ত বন্দোবস্ত। সুমিতা চিনিয়ে দেবে গত চারদিনে, তার নির্দিষ্ট আয়ারা ছাড়া, কে বা কারা ঢুকেছিল তার কেবিনে। এক কাঁপে, দুই কাঁপে---কাঁপে পুরো আটচল্লিশ। যদি ভুল করে দেখিয়ে দেয় তাকে? জেল গরাদে বাস, চাকরি থেকে বাদ। দিনের দিন পঁচিশ টাকা রোজগার বন্ধ। ক্যানিং-এর নমিতার বুকের ভেতর ঢেউয়ের উথালপাথাল। মনসাদ্বীপের চামেলির কপালের ওপর জলদেবীর ফণা। সন্দেশখালির পিয়াসীর কানে বাঘের হুঙ্কার। চেতলার ছ' নম্বর বস্তির দীপুর মায়ের মনের উঠোনে বোমাবাজি। কসবার আঙুরমাসি দ্বিতীয় ছেলের লাশের প্রতীক্ষা করে। হুইলচেয়ার গড়ায়। হুইল চেয়ার থামে। যেখানে থামে তার কাছাকাছি মুখের চাঁই বিবর্ণ হয়ে যায়। সুমিতার আঙুল, মেজর(রিটায়ার্ড) দত্তের চোখ, চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্যের ভুরু, পুলিশ অফিসারদের হুড-দেওয়া টুপি আর পিস্তল ওবং সাধারণ পুলিশদের বন্দুক---সব মিলে এক ফায়ারিং স্কোয়াড।

হুইল চেয়ার গড়ায় আর আটচল্লিশের সমবেত আতঙ্ক থেকে খসে যেতে থাকে এক একটা শরীর। আতঙ্কের সমবেত শরীর থেকে একটি একটি করে আনন্দের শরীর বেরিয়ে আসতে থাকে। আটচল্লিশটা শরীর তখন আতঙ্ক আর আনন্দের দুই স্পষ্ট সীমারেখায় বিভাজিত। সুমিতার আঙুলের ছুরিতে আইসক্রিম বার এর জমাট শীতল শরীর থেকে আনন্দের খন্ডগুলি খসে যেতে থাকে। খসে যায় সমস্ত শরীর। সুমিতা, পুলিশ অফিসার, নার্সিং হোমের কর্মকর্তাদের সমবেত আতঙ্কের বিপরীতে আটচল্লিশটা আনন্দের, আটচল্লিশটা খুশির মুখ। হুইলচেয়ার ঘোরে। আবার ফিরবে মুখ খুঁজতে খুঁজতে। খুশির আটচল্লিশটা মুখ আবার সমবেত আতঙ্কে জমাট বাঁধে। হুইল চেয়ার গড়ায়। হুইল চেয়ার গড়িয়ে চলে। হুইল চেয়ার শেষ আয়াটিকে পেরিয়ে যায়। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সুমিতা।

পরের দিন অনুপ ফেরে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা নার্সিংহোম। পুলিশ জানায় ওদের প্রাথমিক তদন্ত শেষ। শিশুটি নার্সিং হোমে নেই। তদন্তের গণ্ডী বিস্তৃত করতে হবে। ক্লু দরকার। কে চুরি করতে পারে এবং কেন? অনুপ সুমিতার সঙ্গে আলোচনায় বসে। কে বা কারা দু-পরিবারের শত্রু হতে পারে। সুমিতাদের কলেজের সহকর্মীদের কাউকে তেমন সন্দেহ হয় না। মতভেদ ঘটেছে নানা সময়ে কারো কারো সঙ্গে কিন্তু তাঁরা কেউ এ কাজ করবেন না। শিক্ষাজগতের মানুষ। কেউ পড়ানো, কেউ গবেষণা, কেউ বক্তৃতা দেওয়া, কেউ নোটবই

লেখা, কেউ বা টিউটোরিয়াল হোম নিয়ে ব্যস্ত। শিশুচুরির ঘটনায় জড়াবেন না তাঁরা। অনুপ ইতিমধ্যে বার তিনেক বদলি হয়েছে। মতবিরোধ ঘটেছে কারো কারো সঙ্গে। কিন্তু যে স্তরে অনুপের মেলামেশা সেখানে এক-দুয়ের কোন ব্যাপার নেই। তাদের কাজকর্ম লক্ষ মানুষের ভালমন্দ নিয়ে। একটি শিশু চুরি তাদের কাছে দশ হাজার টাকা সরিয়ে ফেলার মতোই হাস্যকর।

হঠাৎই মনে পড়ে গৌতম চক্রবর্তীর কথা, সুমিতা এবং অনুপ দুজনেরই। সুমিতাদের পাড়াতেই থাকত ছেলেটা। এম.বি.বি.এস. ডাক্তার। ওর সঙ্গেই বিয়ে হওয়ার কথা সুমিতার। কার্ডও ছাপতে চলে গিয়েছিল। দুপক্ষেরই আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবেরা পেয়েছিল বিয়ের খবর মুখেমুখে। হঠাৎই অনুপের খবর নিয়ে আসে পিসতুতো দাদা। গলফ্ ক্লাবের বন্ধু ওরা। এমন সুপাত্র ছাড়তে চাননি সুমিতার মা-বাবা। হয়ত একটু অস্বস্তিতে পড়তে হবে কিন্তু বিয়ে মানে একটি মেয়ের সারা জীবনের সুখ-দুঃখ। অমত ছিল না সুমিতারও। গৌতমের সঙ্গে বিয়েটা ছিল সামাজিক, প্রেমের নয়। বিয়ে যখন সামাজিক তখন সামাজিক সুযোগ সুবিধে যে যার মতো বুঝে নেবে। একটা সাজানো যুক্তি দেখিয়ে বিয়ে বাতিল করেন সুমিতার বাবা। গৌতম চক্রবর্তী অপমানিত হয়েছিল। শাসিয়ে গিয়েছিল পাড়ার ছেলেদের নিয়ে বিয়ের দিন হুজ্জুৎ করবে। কিছুই হয়নি শেষ পর্যন্ত। বিয়ের পর অনুপকে সুমিতা শুনিয়েছিল ডাক্তার গৌতম চক্রবর্তীর ঘটনা। অনুপ আত্মতুষ্টির বিপরীতে মুখটা ভারী করে বলেছিল—'ডাক্তার' গৌতম চক্রবর্তী বোল না। এম.ডি. করলে ডাক্তার হয়। ডাক্তারিতে গ্র্যাজুয়েসন করলে ফিজিশিয়ান বলতে হয়। শর্ট অক্সফোর্ড দেখো।

গৌতমের খবর নিতে অসুবিধে হয় না সুমিতার বাবার। পাশের পাড়াতে ফ্ল্যাট কিনে ওরা উঠে গেছে বছর দুয়েক। গৌতমের খবর দেয় ওরই এক বন্ধু। গৌতম কলকাতাতেই নেই, বছর চারেক। আলিগড় থেকে এম.এস. করে লন্ডনে গেছে এফ.আর.সি.এস. করতে। নাতি হারানোর শোকের সঙ্গে এফ.আর.সি.এস. জামাই হারানোর দুঃখ বুকে নিয়ে নার্সিং হোমে ফেরে সুমিতার বাবা।

শিশুটি কাগজের খবর হয়ে গেছে। সমস্ত দায় এখন পুলিশের। কে এবং কেন তার হিসেবনিকেশ চলে। সুমিতার কেবিনের সমস্ত উপহার পর পর সাজানো হয়। পুলিশী তদন্ত এবার নিজস্ব পথে চলে। উপহারটি কী, কে দিয়েছে, থাকে কোথায়, কী করে, বাড়িতে ছেলেমেয়ে কটি? প্রথম বোকে—সুমিতার বাবা মা—গড়িয়াহাট—রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার ও হাউসওয়াইফ যথাক্রমে-- একমাত্র মেয়ে সুমিতা। কমপ্ল্যান---সুমিতা কাকা-কাকীমা---শ্যামবাজার---অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা—দুই ছেলে, বড়টি ব্যাঙ্কের অফিসার আর ছোটটা পটেটো চিপসের হোলসেলার। তাদের ছেলে অপ্রাপ্তবয়স্ক। সন্দেশ ও মুসাম্বী---অনুপের জ্যাঠাইমা এবং জেঠতুতো ভাই—নাকতলা---যথাক্রমে হাউসওয়াইফ এবং পি সি ও বুথ। অনুপের বাকি দুই জেঠতুতো ভাই যথাক্রমে কানপুর এবং পিলানীতে। বেবি সোপ, ক্রিম ও পাউডার সেট---পিসতুতো বৌদি—আরকেডিয়া (বেহালা)— ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষিকা---দুই মেয়ে---ইয়েট টু বি ম্যারেড। ক্যাডবেরি--মেসের একসময়ের বন্ধু অনিমেষ---হাজরা---আই.টি.ও.---প্রেমিকার প্যানেলে নাম আছে,চাকরি হলেই বিয়ে। আপেল ও রসগোল্লা---প্রসূন---দূরতম আত্মীয়-- রাজাবাজার --পেতল-কাঁসার ব্যবসা—দুই ছেলে। ফুটপাথের ফ্রক,

ল্যাংচা এবং পটল বিস্কুট—মাসতুতো ভাই—শেয়ালদা...। পুলিশ থামিয়ে দেয় অনুপকে।

— শেয়ালদার কোথায়?

— শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে?

— কী করেন?

— ব্যবসা।

— কিসের ব্যবসা?

— কাপড়ের।

— দোকান কোথায়? ঠিকানা?

— ফুটপাথে বসে।

— নিজের মাসতুতো ভাই? আপনার নিজের?

— হ্যাঁ। মানে আগে চাকরি করতো একটা মালটিন্যাশনাল কোম্পানিতে।

— কী পোস্টে ?

— ঠিক জানি না।

সুমিতার দিকে ফেরেন অফিসার। —আপনি জানেন?

— ঠিক জানি না।

— ওঁদের বাড়ি যাননি কখনো?

— গিয়েছিলাম, মাস আষ্টেক আগে। অনুপ উত্তর দেয়। রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল মাসিমার সঙ্গে। যেতে হয়েছিল।

— কোথায় দেখা হয়েছিল? কোন্ জায়গায়?

— মৌলালীর কাছে।

— রাস্তার ওপর?

— না, একটা নার্সিং হোমে।

— ওখানে কি মাসিমা ভর্তি ছিলেন?

— না। ওখানে মাল সাপ্লাই দিত বরুণ।

— বরুণ কে?

— বরুণ মাসিমার ছেলে।

— বরুণবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই কি আপনারা ওখানে গিয়েছিলেন?

— না আমরা জানতাম না বরুণ ওখানে মাল সাপ্লাই করে। গিয়ে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল মাসিমার সঙ্গে।

— আপনারা গিয়েছিলেন কেন?

— সেটা কি তদন্তের পক্ষে জরুরি? অনুপ কিছুটা উত্তেজিত।

— খুব গোপনীয় কিছু হলে এখনই বলতে হবে না।

— সুমিতার অ্যাবরশনের কথা ভেবেছিলাম। তখন বিদেশে আমার একটা ট্রেনিং এর কথা চলছিল। সুমিতার পি.এইচ.ডি...

--- ডিটেলসের দরকার নেই।

---না। ইউ মাস্ট নো। যে শিশুটি চুরি গেছে---দ্য বেবি ওয়াজ এ সন। আমরা কোনও সেক্স টেস্ট করাইনি। আপনি নিশ্চয় সাসপেক্টদের তালিকায় আমাদের ইনক্লুড করছেন না।

---না করছি না। আপনারা মাসিমার বাড়ি গেলেন?

--- জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। সুমিতা উত্তর দেয়।

--- বরুণবাবু বাড়ি ছিলেন?

--- না।

--- বরুণবাবুই আমাদের প্রাইম সাসপেক্ট। মিসেস সেন, বরুণবাবু কারখানায় কী কাজ করতেন একেবারেই আন্দাজ করতে পারেন না? ----বেবিটিকে খুঁজে পেতে এসব তথ্য খুব জরুরি।

--- বোধ হয় সাপ্লাই ভ্যান চালাতো। অনুপ আর আমাকে দেখে বছর তিনেক আগে রবীন্দ্রসদনের সামনে একবার গাড়ি থামিয়েছিল। খাকি ইউনিফর্ম ছিল গায়ে।

--- নার্সিং হোমের মীল দেওয়া বন্ধ হল কেন?

--- তা জানি না। অনুপ উত্তর দেয়।

--- ড্রিঙ্ক করে? দিদি কখনো বলেছে কিছু?

--- না।

--- ড্রাগস?

--- শুনিনি।

--- আমাদের বরুণবাবুর কাছে যেতে হবে। চলুন মিস্টার চ্যাটার্জি। পুলিশের জিপ দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসে। মৌলালির জ্যাম পেরিয়ে শিয়ালদা ফ্লাইওভারে। বাঁদিকে ঘুরে কলেজ স্ট্রিটের দিক। ওয়ারলেসে মুচিপাড়া থানাতে খবর দেওয়া হয়। জিপ শ্রদ্ধানন্দ পার্কের গা দিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিটে পড়ে। লেডি ডাফরিন হসপিটালের কয়েকটা বাড়ি আগে রাস্তার ওপর জাপান-আমেরিকার জামা-গেঞ্জি নিয়ে বসে আছে বরুণ। চিনতে অসুবিধে হয় না অনুপের। কয়েকবারই গাড়িতে যেতে যেতে দেখেছে।

পুলিশের জিপ খানিকটা আগেই থেমে যায়। নেমে হাঁটতে থাকে অনুপ। একটু এগিয়েই বরুণকে দেখতে পায়। খদ্দেরদের সঙ্গে দর কষাকষি করছে। বরুণও দেখে অনুপকে। চোখ দুটো ঘষে। বোধ হয় বিশ্বাস হয় না। ভুল দেখছে না তো?

ছুটে আসে বরুণ। কোথায় যাবে দাদা?

--- তোর কাছেই এলাম।

মাথাটা ঝাঁকায় বরুণ। স্বপ্ন দেখছে নাকি? ঘরে চল। এখানে কেন? বৌদির কিছু হয়নি তো? নেপা, দুটো চা।

-না। বেবির ব্যাপারে।

-কী ব্যাপার? বরুণের চোখেমুখে বিস্ময়।

অনুপের উত্তরের আগেই এগিয়ে এসেছে পুলিশের জিপ। সেটা দেখে উঠে দাঁড়ায়

ফুটপাথের হকাররা। চিৎকার করে---হল্লা, হল্লা। যে যার মাল গুটিয়ে ছুটে গলির ভেতর আশ্রয় নেয়। বরুণও চাদরের চার খুঁটে বেঁধে ফেলেছে মালপত্র। হাতটা চেপে ধরে অনুপ। চারজন পুলিশ চারদিকে দাঁড়িয়ে যায়। বরুণ কিছু বলার আগেই তার মাল গাড়িতে ওঠে। নেপা চায়ের গ্লাস দুটো অন্য খদ্দেরদের দিয়ে বলে-- বরুণ ভেবেছিল চায়ে ম্যানেজ করবে। একি তোর এন.ভি.এফ.!

বরুণকে ইন্টারোগেট করতে বিশ মিনিট দেরী হয়ে যায়। তুই, তুমি নাকি আপনি--- এটাই ঠিক করে উঠতে পারেন না পুলিশ অফিসাররা। হকাররা 'তুই' পর্যায়ে পড়ে কিন্তু এ হচ্ছে আই.এ.এস.--এর মাসতুতো ভাই। অনেক ভেবে সম্বোধনের পরিবর্তে ভাববাচ্যে চলে যান। স্কুলে শেখা সেই বাচ্য যে এতদিন পরে এমন কাজে লাগবে ভাবতেই পারেননি।

---আগে কী কাজ করা হোত? তার আগে? নার্সিং হোমের সংবাদ কোথা থেকে পাওয়া গেল? মা যেতে বলেছিলেন না নিজের ইচ্ছেয়? কখন নার্সিংহোমে ঢোকা হয়েছিল? কখন বেরনো হোল? নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে কোথায় যাওয়া হল? তারপর কোথায়? রাতে কখন বাড়ি ফেরা হল? গতকাল কী করা হল? আজ সকাল থেকে? নার্সিং হোমে কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

বরুণের উত্তরের ভেতর একটি নতুন নাম মেলে তের নম্বর কেবিনের সেদিনের ভিজিটারদের মধ্যে।

---দাদা, মনে আছে মানবদাকে? দারুণ ঘুড়ি ওড়াতো! বিশ্বকর্মা পুজোর দিন একান্নটা ঘুড়ি কেটেছিল! ফুটবল খেলতো। ফার্স্ট ডিভিসনে খেলেছে। খেলার জন্যে এফ.সি.আই.-এ চাকরি হল। মানবদার বউ সেদিন মানবদার বোনকে দেখতে গিয়েছিল নার্সিংহোমে। বেরোবার মুখে বড়দির সঙ্গে দেখা। বললুম তোমার কথা। বলল মায়ের মুখে তোমার কথা কত শুনেছে। আমিই বৌদিকে নিয়ে গেলুম ছেলে দেখাতে।

---তারপর? পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করেন।

---নার্সিংহোমে তো নো স্মোকিং। আমি কেবিনে বৌদিকে ঢুকিয়ে বাথরুমে ঢুকলুম।

---ফিরে? অনুপ জিজ্ঞেস করে।

--- বৌদি ততক্ষণে চলে গেছে।

---বৌদির ক' ছেলে-মেয়ে? পুলিশ অফিসারের প্রশ্ন।

---নেই। ডাক্তার টাক্তার অনেক করেছে। ঠাকুর দেবতাও।

- থাকেন কোথায়?

---নারকেলডাঙায়।

--বাড়ির নাম্বার?

---তা জানি না তবে বাড়ি চিনি। দুবার গেছি। মানবদার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল। ধরে নিয়ে গেসল।

--ওখানে যেতে হবে। পুলিশ অফিসারের নির্দেশ।

---কেন? বরুণের প্রশ্ন।

—নো কোয়েশ্চেন।

—আমার মাল?

—কিছু হবে না। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। অনুপ বলে।

জিপ চলে নারকেলডাঙায়। পুলিশ অফিসার যেন রহস্যের কিনারা খুঁজে পেয়েছেন। ওখানে মিলবে বেবিটিকে। কিন্তু তার আগে একজন মহিলা পুলিশ অফিসারকে ফুলবাগান থানায় অপেক্ষা করতে বলতে হবে। সে নির্দেশ যায়। বরুণকে পুলিশ অফিসার নির্দেশ দেন তাকে কী কী করতে হবে। দরজার বেল টেপা। ভেতরে ঢোকা। মিস্টার অনুপ চ্যাটার্জির সঙ্গে মানববাবু এবং বৌদির পরিচয় করে দেওয়া। নানা জিনিসপত্রের প্রশংসা করা। যেমন ফ্রিজ, টিভি। অন্য যা কিছু করার করবেন মিস্টার চ্যাটার্জি। এর বাইরে মিস্টার চ্যাটার্জির নির্দেশ ছাড়া একটি কাজও করবে না বরুণ।

তিন বাই বি ফ্ল্যাটটি পুরোপুরি অন্ধকার। বেল টেপে অনুপই — একবার, দুবার, তিনবার। কোন সাড়া নেই। বাটনটা বুড়ো আঙুলের চাপে আটকে রাখে অনুপ। বেল বেজে যায় নিরন্তর। পাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে যায় বেল বেজে যাওয়ার অস্বাভাবিকতায়। এক সময় ভেতরের আলো দরজার নিচে দিয়ে ছিটকে আসে বাইরে। দরজা খোলে। ভেতরে ঢোকে বরুণ। বরুণকে দেখে সোফায় বসে পড়েন মানবদা। কোন আবাহন নেই। অনুপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় বরুণ। কোন উত্তর নেই। বৌদি কোথায় জিজ্ঞেস করে বরুণ। কোন কথা নেই। বরুণ বেড-রুমে ঢোকে। কোন বাধা নেই। অনুপ ব্যালকনিতে গিয়ে দেশলাই জ্বালে। সাদা পোশাক এবং সাদা ইউনিফর্মের পুলিশ ফ্ল্যাটে উঠে আসে। মানব বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো। হঠাৎ শিশুর আওয়াজ ভেসে আসে। কান্নার শব্দ। আঁলমারির গায়ে পিঠ দিয়ে আত্মরক্ষার শেষ প্রচেষ্টা মানবের স্ত্রীর। শিশুটিকে ঢুকিয়ে নিয়েছে বুকের ভেতর। দুগ্ধশূন্য স্তনের বোঁটা শিশুটির মুখে। যদি কান্না থামায়। যদি ওরা চলে যায়।

সাদা পোশাকের মহিলা পুলিশ অফিসারটি সামনে এসে দাঁড়ান। তাঁর হাতে শিশুটিকে তুলে দেয় মানবের স্ত্রী।

পুলিশের একটি ভ্যান এবং দুটি জিপ রাতের কলকাতায় পাড়ি দেয় উত্তর থেকে দক্ষিণে। প্রিজন-ভ্যানের ভেতরে মানবের স্ত্রী মাথা ঠোকে গাড়ির তারের জালে। স্বামীকে খামচায়, কামড়ায়। দোষারোপ করে ওর ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল, কিছু বলল না কিছু করল না সে। দ্বিতীয় জিপে মহিলা পুলিশ অফিসার পরম মমতায় বুকে করে বহন করে নিয়ে চলেন অচেনা অজানা এক শিশুকে। তৃতীয় জিপে অনুপ চ্যাটার্জি মানবের অদ্ভুত আচরণের বর্ণনা দেন পুলিশ অফিসারকে।

রক্ত একটি তরল পদার্থ। সমপরিমাণ মিনারেল ওয়াটার কিংবা সফট ড্রিঙ্কসের চেয়ে দাম কিছুটা বেশি। জমাট রক্ত আঠালো। একেই বলে রক্তের টান। তবে রক্তের চেয়ে যে কোন এ্যাডহেসিভ এমনকি সাধারণ গামের টান বেশি, জোড়ার ক্ষমতা অধিক। দামেও অনেক সস্তা।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৫৫/সংখ্যা ৪: ১৪০২]

আমরা কি ঠিক বলছি

মধুময় পাল

[জন্ম ১৯৫২ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: সাহেবগলি, রাত্রির পরিধি, আলিঙ্গন দাও রানি, প্রাচীন রাত্রির কন্যা, মধুময় পালের গল্প। সাংবাদিকতা ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ বিহরণ।]

তোর কপাল জ্বালা করছিল। আমরা মজা পাচ্ছিলাম। গম্ভীর মুখে বসেছিল হীরেন, নিখিল, সত্য, যে আমাদের পয়সা ডবলের যাদু দেখাত, আর, রেল কোয়ার্টারের সেই ডবল ফসফুসের সাঁতারু পার্থ। মনে আছে, ক্লাসে আমরা এই পাঁচজন, টিফিন ফুরনোর ফার্স্ট বেল বাজল। আমরা তোকে তাড়াতাড়ি হাত চালাতে বললাম। ভগবান দেখবি বলে দুই ভুরুর মাঝখানে তখনও তুই আঙুল ঘষছিস। সত্য বলল, জাস্ট ইঞ্চেস্ টু রিচ ইয়োর প্রেয়ার। তোর বন্ধ চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে। হীরেন বলল, ভগবান নামছেন। আ লিটল মোর ডেডিকেশন, তুই পারবি। পার্থ বলেছিল, তোকে পারতেই হবে। আরেকটু জোরে রাব কর। তোর মুখে তীব্র যন্ত্রণা আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি কপালের ছাল উঠে গেছে। আমাদের মধ্যে তুই-ই সেরা, বিহান। আমি বলি, হালকা কোনও ছায়া দেখতে পাচ্ছ? কোনও দাড়িওলা মুখ? এত কষ্ট বৃথা যেতে পারে না, বিহান। জটাওলা কোনও মাথা? কিংবা কালো আলখাল্লা? তুই বললি, আমি আর পারছি না। ভীষণ জ্বলছে। তবু তুই চোখ খুলিসনি। আমি বললাম, নিজের কষ্ট ভুলে যা, তোর সরলতা, তোর ভক্তি এই ক্লাসরুমে ঈশ্বর নামাবেই। তুই আমাদের গর্ব। হীরেন বলল, ইউ রিচ্ড় দা ফাইনাল মোমেন্ট, বেল বিংস্। গড ডিসেন্ড্স্। সিঁড়ি ভেঙে ছেলেরা উঠে আসছে। শেষ ঘন্টা বাজিয়ে দিল বিপিনদা. আমরা প্রশ্ন করি, তুমি কী দেখছ বিহান? তুই জবাব দিলি, কিছু না! অন্ধকার। আমরা বলেছিলাম, জাস্ট ওয়েট। আমরা দেখতে পাচ্ছি। ছাদ ফুঁড়ে দুটো সাদা পা নেমে আসছে। করিডরে ছেলেদের কথাবার্তা স্পষ্ট হতেই আমি তোর ওপর ঝুঁকে পড়ে বলি, আঙুল সরিয়ে নে, তোর চামড়া উঠে-যাওয়া কপালের লাল জায়গাটা আমার বুড়ো আঙুল দিয়ে সমস্ত জোরে ঘষে দিলাম। রক্তে আঙুল পিছলে গেল।

শোভন থামে। হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসেছিল বিহান।

দীপা হিসহিসিয়ে বলে, তু মি এ ত বো কা।

খানিক বাদে বিহান বলে, শোভন, তুমি আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে। বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলে। এক সপ্তাহ তোমাকে সাসপেন্ড করা হয়, তুমি কারও নাম বলনি।

বিহানকে থামিয়ে দীপা একইভাবে শোভনকে বলে, তুমি এত হিংস্র। ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে শোভন। গান গায়। উই শ্যাল ওভারকাম সামডে. ও ও ও ডিপ ইন মাই হার্ট....। হাসতে হাসতে গড়াতে থাকে।

এখন দিনাবসানের আলো। দূরে দূরে গাছ। পাখিদের দ্বীপপুঞ্জে মুখরতা, শূন্যে দলবদ্ধ ওড়াউড়ি, এখানে বাংলোর বাইরে অসীম শান্তি পুষ্পিত হয়ে আছে, দক্ষিণ আকাশে পাহাড়ের রেখা, পৃথিবীর কিছু উদাসীনতা জমাট বেঁধেছে, সবুজ মাঠের উপর অবসরপ্রাপ্ত পাতারা নেচে বেড়ায়, নিজস্ব গাছের সঙ্গে তাদের আর সংলাপ নেই। এখানে এমন কিছু কথা বেরিয়ে যায় যা অনেকদিন বলতে চাওয়া হয়নি, কিংবা এটাও হতে পারে, চাওয়া হল বলেই জায়গাটা এত ভাল।

দীপা ও শোভন এটুকুই মনে করতে পারে গত বিকালে তারা তিনজনে কী করেছিল। এভাবেই যে মনে পড়ে তা নয়, স্মৃতির বিবরণে মনের নিজস্ব চলনের ছায়া যে পড়েই।

দীপার মনে পড়ে; শোভন আসার আগে একটা দলছুট সময় সে কাটিয়েছিল বিহানের সঙ্গে, দৃশ্যত চুপচাপ বসে ছিল বিহান।

দীপা জিজ্ঞাসা করে, আপনি এত তর্ক করেন কেন?

ঘাসের রঙ-লাগা চোখেই বিহান জবাব দেয়, আমি যে প্রার্থী নই। আমার দাঁত কারও জুতোর ফিতে ছোঁয়নি।

তাহলে আপনি এলেন কেন? অন্যদের দাঁত মেজে দিতে, নাকি সততার খালি পেটের ঢেকুর তুলতে?

পুরনো শোভনের ভগ্নাবশেষ আছে কিনা জানতে লোভ হল।

কী লাভ।

তাই! কৃষিবিপ্লবের হাঁকদাররা জমিখোর-ভেড়িখোর হয়ে গেছে। সশস্ত্র বিপ্লবের ইজারাদাররা নানা ধরনের দুর্বৃত্ত হয়েছে। মহাকরণ-থানা-বিশ্ববিদ্যালয়-পঞ্চায়েত তক্ দখল করে আরও একটা পার্টি প্রতারকের ভূমিকায় দেখা দিল। সমাজবদলের বইপত্তর এখন আর পুজোয়ও বিক্রি হয় না।

এইসব বাস্তবতার মধ্যে আরও অনেকের সঙ্গে দীপাদের বেঁচে থাকতে হয়। তারা জানেই না অন্যরকম বাস্তব কী হতে পারত। কীভাবে মানুষ এর চেয়ে ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারে। বিহানকে সে বলে, আপনি বড্ড রাজনীতি করেন। সকালে সীতেশবাবুকে চটিয়ে দিলেন। ঝগড়া করে সেই যে খিল তুলল, এখনও খোলেনি। ট্যুরটা মাটি করার জন্যে অমিত আপনাকে যাচ্ছেতাই বলেছে।

দীপার কথা যেন শুনতেই পায়নি, বিহান বলে, তুমি তখন সম্ভবত খুব ছোট, একদল যুবক-তরুণ নতুন সমাজ গঠনের যে স্বপ্ন দেখে তাতে দেহোপজীবিনীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শুধু সামাজিক স্বীকৃতির দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকা নয়, পৃথিবীর আদিম জীবিকা থেকে বেরিয়ে এসে এইসব মেয়ে সামাজিক উৎপাদনে অংশ নিয়ে মানুষের মন নতুন ভাবে গড়তে সাহায্য করবে। ফাজলেমি মনে হচ্ছে কি তোমার? আমারও মনে হয়। আমাদের যাঁরা এসব বলেছিলেন, তাঁরা জানতেন না কীভাবে হবে। আমরা প্রশ্ন করিনি, করলে দু-একটা দেশ ও দু-চারজন বড় মানুষের নাম শুনতে পেতাম। আজ সেইসব শিক্ষকদেরই শাসনকালে তোমাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে নিজের মাংস দিয়ে খেয়ে।

শেষটা ভালভাবে নিতে পারেনি দীপা, বলেছিল,কথা বলতে জানেন না, ছিঃ।

বিহান বলে, তোমাকে আঘাত করতে চাইনি, দীপা! তোমার অপমানে আমার মান বাড়ে না। সত্যিটা তো স্বীকার করতেই হবে। মোসাহেব প্রচুর আছে। ইতিহাসের নৃশংসতম শাসকেরও মোসাহেবের অভাব হয়নি, আমার জীবিকা তোমার চেয়ে ভিন্ন নয়, কিন্তু তাই বলে বিরোধিতা করব না?

দীপা বুঝতে পারে, বিহানের আক্রমণ ব্যক্তিগত নয়, সে প্রশ্ন করে, কী করা যায় বলুন? প্রত্যেকে ভালভাবে বাঁচতে চায়। একটা জীবনে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় না। বারবার ভুল করে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

বিহান জিজ্ঞাসা করে, বাঁচা সম্পর্কে তোমাদের ভাবনাটা ঠিক কি?

দীপা জানায়, অত কিছু আমি বুঝি না। আমার ভাইয়ের একটা চাকরি দরকার ছিল। কবে দাদামশায় উদ্বাস্তু কলোনির নেতা, বাবা শ্রমিক নেতা ছিলেন, কিন্তু আমাদের বাড়িটাই ছিল পাড়ার সবচেয়ে দুঃস্থ। ভগবান আমাকে রূপ দিয়েছেন। ব্যবহার করলাম। সব হয়ে গেল। প্রতিবেশীর সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলা যায়। ভাল থাকা মানে কি গরিব হয়ে বাঁচা, অপমানিত হয়ে বাঁচা? আমার বরটা বোকা আর জেদি। আমাদের ঊর্মিদি, মানে নারী সমিতির বেগমসাহেবা, পার্টির রাজ্য কমিটির সঙ্গে শুয়ে-বসে সন্টলেকে নার্সিংহোম করবে বলে জলের দরে কুড়ি কাঠা জমি বের করে নিল। তা কী ক্ষতি হল ঊর্মিদির ? ন্যায়নীতি নিয়ে তার স্বামী তো তাকে কাঠি করেনি। না-খেয়ে, চিকিৎসা না-পেয়ে মৃত্যুর পাকা ব্যবস্থা যারা কবতে চায় করুক, আমি সেই বোকাদের সঙ্গে নেই।

দীপা মনে করতে পারে, বিহান ওর দিকে তাকিয়েছিল। কিছু বলেনি। দীপাই বলেছিল, ভুল-বিলাস তোমাদের মানায় বিহান। ইচ্ছে করেই 'তুমি' বলে দীপা। বিহানকে আক্রমণ কবার এটাও একটা অস্ত্র। বিহান তাকে অবজ্ঞা করেছে। লাইনের মেয়েদের দলে ফেলেছে। ভুল-বিলাস থেকে তোমরা আত্মহত্যার আনন্দ পাও। কেউ যদি জীবনটাকে ভালবাসে তাকে দোষ দেবে?

নিরুত্তর বিহানের কাছে সরে দীপা। তোমারও কি ইচ্ছে করে না? এখানে নদী নেই, নৌকো নেই। তবু কি আমরা ভাসতে পারি না, বিহান? চাইলেই পারি। চাওয়াটাই বড়।

সে সময় দূর থেকে চিৎকার করে উঠেছিল শোভন, মারছে! বিহানটা আলুবাজি করতাছে! কাইল রাতে আইসক্রিম হইয়া কাটাইলি ক্যান? রিয়েলি বিহান ইউ আর পুয়োর অ্যান্ড উইক। আই কান্ট বাট ফিল ফর ইউ।

দীপা এ পর্যন্ত মনে করতে পারে, যা হুবহু এরকম হয়ত নয়, সময় ও বুদ্ধি কিছু মুছে তো দেবেই।

বিহান সম্পর্কে অদিতির জমাট ধারণা নেই। লোকটা এদের সঙ্গে এসেছিল। শোভনের ছেলেবেলার বন্ধু বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। কথাবার্তা হয়নি বললেই চলে। সীতেশের সঙ্গে ঝগড়া হয়। এরপর সীতেশ বিহান সম্পর্কে কয়েকটা মন্তব্য করে, যা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস

কোনওটাই করার প্রয়োজন বোধ করেনি অদিতি, মাঝরাতে সবাই মিলে যখন শিকারে যাওয়া হল, যতদূর মনে পড়ে, প্ল্যানটা দীপার, ও নাকি শুনেছে ঝরনার জল খেতে আসে হরিণ, এবং এই ঝুপঝুপ জ্যোৎস্নায়, শব্দটাও দীপার, জ্যোৎস্না যেন বৃষ্টি, হরিণ না এসে পারে না। 'শোভন, আমাকে হরিণ দিতে হবে' বলে এমন গা ঘষতে লাগল যে যেতেই হল সবাইকেই দল বেঁধে শিকারে। ঝরনাটা আদৌ আছে কি নেই কেউই তা ঠিক জানে না। চৌকিদার নাকি দুপুরে দীপাকে বলেছিল। এই চৌকিদারের অস্তিত্বটাও রহস্যময়। সন্ধে নাগাদ ওরা বাংলোয় পৌঁছলে চৌকিদার সব ঘরের দরজা জানালা খুলে দেয়। বিদ্যুৎ ছিল না। হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়ে দেওয়ালে ছায়া হেঁটে সে অন্ধকার হয়ে যায়। বলে, বাবুরা দরকার পেলেই ডাকবেন। রাতে ডাইনিং রুমে খাবার সাজানো ছিল; চৌকিদার ছিল না। দিনমানে চৌকিদারকে অদিতি দেখেনি। দেখলে অন্তত ওর একটা আবছা চেহারা অনুমান করতে পারত। আজ দুপুরে তাদের ঘরের দরজায় যে দুমদুম ধাক্কা মেরেছিল, সবাই বলছে, সেটা চৌকিদার, অদিতির কিছু মনে পড়ে না। এই চৌকিদারের চেয়ে সামান্য বেশি স্পষ্ট বিহান। অদিতি মনে করতে পারে, হরিণ শিকারে বিহান হাঁটছে, শিকার-সঙ্গীত গাইছে। সবার পেছনে, একা।

প্রয়োজনের খাতিরে আরও মনে করতে হয় এবং কয়েকটা মুহূর্ত উঠে আসে যা এভাবেই টুকরো যে জোড়া দিলে ফোকর থেকে যায়।

১. বিহানের পরনে ছিল ব্লু জিনস। হোয়াইট শার্ট। কভার্ড বুক পকেট দুটো, বাঁ পকেটে কোনাকুনি পড়ে ছিল কলম।

২. টুথব্রাশ কিনতে গাড়ি থেকে নেমেছে, পায়ের টোকায় সরিয়ে দিল কলার খোসা।

৩. চায়ের গ্লাস নামিয়ে কারও ঠিকানা লিখে নিল শোভনের কাছ থেকে।

৪. সীতেশকে বলে,অনাথ দত্তকে চেনেন? ট্রেড ইউনিয়ন করার দায়ে যাঁকে নুলো করে দেওয়া হয়।

. ৫. গড়ানদহের কালীবাড়ি যায়নি। শোভনের গাড়ির পেছনের সিটে শুয়ে ঘুমোল।

৬. অমিতের সঙ্গে ঝগড়া করছে।

৭. বাংলোর গেটে দুটো ফুল গুঁজে দিল।

৮. অন্ধকার বারান্দায় একা বসে আছে। অদিতি যেন কথা বলার যোগ্য নয়।

৯ সীতেশকে বলে, রুগ্ন কারখানার জমি বেচে ইউনিয়ন লিডাররা কত কমিশন পায়?

১০.ডাইনিং টেবিলে কয়েক ফোঁটাজল ফেলে টুথপিক দিয়ে লিখল বি বি।

১১. দীপাকে বলল,সীতেশবাবুরা গানকে ভয় পান।

১২. মদ খেতে খেতে কোনও এক দিলীপের কাটা পাঞ্জার কথা বলেছে।

বিহান সম্পর্কে এ ছাড়া অদিতি যা জানে, তা সীতেশের ভয়-ধরানো ডায়ালগ। যেমন, বুকে পা দিয়ে লতি ফাঁক করে যোল ইঞ্চি ভরে দেব। অত্যাচারটা অস্পষ্ট বলেই যেন আরও ভয়াবহ। রুগ্ন ও বন্ধ কারখানার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইউনিয়ন নেতাদের সমৃদ্ধি বাড়ছে এ ধরনের মন্তব্য করেছিল বিহান। মন্তব্যে মিথ্যে নেই, অদিতি জানে। সবাই জানে। কিন্তু আপত্তি

এখানেই যে বেড়াতে এসে এসব বলা কেন? দু-রাতের জন্য ফুর্তি করতে আসা। শোভন-সীতেশ অমিত দুটো মেয়েমানুষ নিয়ে এসেছে। দীপা ও অদিতির কিছু বাধ্যতা আছে। দুজনেই যে স্থিতিশীলতা ও মর্যাদা পেয়েছে, তা এদেরই দয়ায়। সুতরাং এখানে যা হবে, সেটা জেনেই আসা। বিহান এই দলে দুখিয়া হয়ে এল কেন? অদিতির কাপড়-চোপড় খুলতে খুলতে সীতেশ শোভনের পেটি-বুর্জোয়া মেন্টালিটির বাপান্ত করে, বলে যে চাঁদা তুলে কারখানা চালানো যায় না, মড়া পোড়ানো যেতে পারে, এবং একটা তীব্র ক্রোধ ও অপমান ও হতাশা সীতেশের মধ্যে যে বিকারগ্রস্ততা সৃষ্টি করে, তার মোকাবিলা অদিতি করতে পারেনি, সে শুধু যন্ত্রণায় কয়েকবার চিৎকার করেছিল,আর কিছু মনে নেই।

ট্যুরের স্পনসর জুটিয়েছিল অমিত। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্ব উদ্বোধনের বিজ্ঞাপন দেয় যারা, সেই দ্রুত উন্নয়নশীল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোম্পানি, যার মালিককে বিরোধী রাজনীতির নেতা 'সরকারের কুনকি হাতি' বলে থাকেন, তারাই সব ব্যবস্থা করে দেয়। শোভনের সঙ্গে চলা অমিতের আদর্শগত দায়। সে আদর্শে রাজনীতি নেই, আছে ব্যক্তি-সম্পর্ক, আছে কৃতজ্ঞতা। 'নবজীবনের গান' নামে যে বিরাট জলসা হল স্টেডিয়ামে, স্বদেশি যুগের লোকজনও পিঠ-খোলা নাচ দেখতে হামলে পড়েছিল, যে অনুষ্ঠান শোভনের পোলিটিকাল কেরিয়ারে ব্রেক থ্রু, গোঁড়ারা শোভনকে প্রায় ফিনিস করে দিয়েছিল, সেই জলসার টিকিট ব্ল্যাক করে অমিত! শোভনই সুযোগটা দেয়। কোনও স্কুলে আর মাস্টারি নেই, সুতি-খাদি-কালচাবাদি সব ঠেসে গেছে, অমিত দু' মাস চরকি-হাঁটার পর মাত্র ৬ দিনে ২৫ হাজার টাকা রোজগার করে, ভাবা যায়! শোভন বলেছিল, বাজে খরচ করিস না। মায়ের চিকিৎসা করা, বোনের নামে ফিক্সড করে দে। আজ যারা মক্কায় ভিক্ষে করতে অন্ধ-পঙ্গু বাচ্চা পাঠায়, তারাও অমিতকে বাড়িতে টাকা দিয়ে যায়। এতটাই সে নিজেকে ছড়াতে পেরেছে। শোভনের প্রতি কৃতজ্ঞতা তার সব স্মৃতির কথামুখ হয়ে আছে। সেই অমিতও শোভনদার বন্ধু বিহানের উপর চটেছিল। তোমার বন্ধু না হলে মালটাকে কখন নামিয়ে দিতাম। তোমার কন্‌ট্রিবিউশন নিয়ে মজাকি করে! কী করে যে অ্যালাউ করো?

অফিস থেকে বিহানকে আনতে গিয়েছিল অমিত। শোভনদার নির্দেশ, বেশি কথা বলবি না, অন্যরকম লোক। চটে গেলে আসবেই না। অমিতের অভিজ্ঞতায়, পার্টির লোকজনকে টাকল করার একটা সুবিধা আছে, তা চরম বিরোধী পার্টির হলেও, তর্ক করে না, বুঝে নেয়, ভাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, এমন কথা কখনোই হয় না যা পরে অস্বীকার করা যায় না, সব কথাই ক্যাজুয়াল অ্যান্ড হার্মলেস, আসলে মঞ্চে যা যা বলা হয়, উষ্ণ পরিবেশে সেসব ভুলেও কেউ তোলে না। কিন্তু বিহান কোনও পার্টিতে নেই।

ঝাড়া দু' ঘন্টা অফিসের রিসেপশনে বসিয়ে রেখে মালটা এল। তারপর বাহানা কিনা আমি যাব না। অমিত বলেছিল, সে কি হয় বিহানদা! দরকার হলে আপনাকে তোলা হবে। শোভনদার কাছে কথার খেলাপ করা যাবে না। অসুবিধে হচ্ছিল অমিতের, এভাবে সে কথা বলে না। কত কার্যকর ভাবে সে বলতে পারে, উঠে পড়ো বদ্‌না। হাড়ে লাগবে! ফলা চুলকে দেবে। তাকে বলতে হল, একবার হাজির হয়ে শোভনদার রাগ থেকে আমাকে বাঁচিয়ে বাড়ি

ফিরবেন, এর বেশ কিছু আমার বলার নেই, গালাগাল ছাড়া এতটা লম্বা বাক্য বলে ফেলার পর অমিত বিস্মিত হয়। সে-ও পারে!

বিহান জিজ্ঞাসা করে, কী নাম তোমার?

অমিত জানায়, অমিতাভ।

ফের বিহান,পদবি?

অমিতাভ বলে,বসু।

এক মিনিট ঘন চোখে অমিতের পা থেকে মাথা শুঁকে বিহান বলেছিল, তুমিই সেই বিখ্যাত অমিত বসু! ভেড়ি-মাফিয়ারা আধমরা করে ফেলে রেখেছিল। বাইপাসে রিসর্টগুলো থেকে মাসোহারা নাও। বিজয়া কটনে ধর্মঘট ভাঙতে গিয়েছিলে। তুমি 'সংস্কৃতির অন্যধারা'র সম্পাদকমন্ডলীতে আছ তো! তৈরি ছেলে! তোমাদের সঙ্গে যেতেই হচ্ছে।

মাথার ভেতর শিরায় শিরায় যখন আগুন দাপায়, জৈবিক নিয়মে হাত-পা বরফ করে বসে থাকা যায় না। কিন্তু শোভনদার মুখ অমিতের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া জ্যাম করে দেয়। গাড়ি থেকে নেমেই শোভনকে বিহান বলেছিল, কুড়ি বছরে কতটা সমাজবিরোধী হয়েছ দেখতে এলাম।

অমিতের চোখের দিকে একবার তাকিয়েই শোভন তাকে সরে যাওয়ার ইশারা দেয়।

লোকটা সম্পর্কে অমিত আর যা মনে করতে পারে তা হল, লোকটাকে বেঁচে থাকতে দেওয়া। শোভনদা যখন লোকটাকে গাড়িতে তার পাশে ডেকে নেয়, অমিত নেমে যায়। বাংলোয় লোকটার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে বলেছিল শোভনদা। অমিত সরাসরি অস্বীকার করে।

সীতেশ বিহানকে আগে দেখেনি। এর কাজকর্ম সম্পর্কে শুনেছে। একবার জয়দুর্গা কটনে ইউনিয়ন করতে যায়। কলেজের ছেলেপুলে এনে কারখানায় গেট মিটিং করে। কাগজের অফিসে ওকে-তাকে ধরে দু লাইন খবর ছাপে। তাতে কী হল? ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর শ্রমিকরা কখনও ভরসা রাখে? অর্থনৈতিক অবস্থান থেকেই সেটা সম্ভব নয়। বিহানকে সীতেশ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিল, ছাত্রদের মধ্যে একটা কেরিয়ারিস্ট ঝোঁক থাকেই। ইন প্র্যাকটিকাল পোজিশন ওরা কখনোই ডিক্লাসড্ হতে পারে না। তা ছাড়া, ছাত্রদের অবস্থানটা ভাসমান। একটা আন্দোলন যখন রিপ্রেশনের মুখে পড়েছে, ওরা নিজেদের সরিয়ে নিতেই পারে। কারণ, ওদের অস্তিত্বে ঘা পড়েনি। বরং তখনও আন্দোলনে জড়িত থাকলে বিপদ ডেকে আনা হতে পারে। মোদ্দা কথা, একটি শ্রমিকের জীবনের সমস্যায় একটি ছাত্রের নাড়ির যোগ থাকতে পারে না।

বিহান স্বীকার করেছিল যে ইমোশনের ব্যাটারি বেশিদিন কাজ করে না। ওকে ঠেকে-ঠুকে বাস্তববাদী ধরে নিয়েছিল সীতেশ। এখন এরকম প্রচুর আছে, যারা তাদের পুরনো কাজকর্মের জন্য অনুতপ্ত। এবং ফলে যে প্রগতিশীল আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে কথাও মানে। বিহান সম্পর্কে শোভনের একটা দুর্বলতা আছে। শোভনের মতে, বিহান জেনুইন ছেলে। কোনওরকম হিপোক্র্যাসি নেই। কথাটা মনে পড়েছিল সীতেশের। সে জিজ্ঞাসা করে,

আচ্ছা, বিহানবাবু, আপনারা তো বিশ্বাস করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুর্জোয়াদের একটা আশ্রয়। তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিস ঢুকলে আপনারা চেঁচিয়ে পাড়া মাত করতেন কেন? আপনারা স্কুলের ছাদ থেকে বোমা ছুঁড়বেন, আর পুলিস মালা জপবে তা কি হয়? আপনারা থাকলে স্কুল বিপ্লবী ঘাঁটি, আর পুলিস ঢুকলেই বুর্জোয়াদের, এটা কি হিপোক্রেসি নয়? আপনারা যে বিপ্লবী সে-কথা কে বলল, আপনারাই! বিহান জবাব দেয়নি।

ওকে কোণঠাসা করতে আরেকটা প্রসঙ্গ তোলে সীতেশ। ধরা যাক, চিকিৎসার জন্য আপনাকে একটা ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। ভাল পরিবেশ, পরিচ্ছন্ন। ডাক্তার, নার্স অ্যাক্টিভলি আছে। তবু আপনার পাশের বেডের রোগিরা পরপর মরছে। সকালে শুনলেন, আট নম্বর বেড গেছে। বিকেলে বার নম্বর। সন্ধের মুখে তের যাই-যাই। মাঝরাতে ষোল কেটে গেল। আপনি কী করবেন? এখানে পড়ে থাকবেন, না পালাবেন?

বিহান জবাব দেয়, পালাব—

এই তো পথে আসুন। বুদ্ধিজীবীদের মতো শ্রমিকশ্রেণী মৃত্যুর বিলাস এনজয় করতে পারে না। যখন দেখা যায় কোনও আন্দোলনের চোটে যখন অনেক কারখানার কাজকর্ম বিপন্ন, তখন একটি সচল ও অপেক্ষাকৃত সুস্থ কারখানার শ্রমিকরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেবেই। সেই ওয়ার্ড থেকে সে পালাবে। সে বাঁচতে চায়, মৃত্যু নয়।

এরপর বিহান বলে, আচ্ছা, কারখানা মরছে, অথচ মালিক আর ইউনিয়ন লিডাররা ফুলছে কীভাবে? মৃতদেহ খেয়ে?

বিহান ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছিল সীতেশকে। অর্ধশিক্ষিত লোকের সঙ্গে সীতেশ কোনও দিনই কথা বলা অর্ধশিক্ষিত লোকের ঘনিষ্ঠতা সীতেশ কোনো দিনই পছন্দ করে না। কোনও স্যাক্রিফাইস নেই। কবেকার বাতকর্মের মতো একটা বিস্ফোরণের হ্যাংওভার নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিল। বয়স বাড়ছে, মাথা আটকে আছে মায়ের পেটে। শোভন নিজে একটা ফালতু এলিমেন্ট। তাই এসব টলারেট করে। ফালতু তো বটেই। ঠান্ডা ঘরে লড়াইয়ের নাটক করে কী হবে? গরিব মানুষ নিয়ে গল্প, কবিতা লিখে নাম কামানোর ধান্দা কি লোকজন বোঝে না? সীতেশের সন্দেহ হয়, শোভন এই লোকটাকে ইচ্ছে করে ঢুকিয়েছে। নিজে যা বলতে পারে না, এই লোকটাকে দিয়ে বলাবে। সীতেশকে ডিসটার্ব করতেই ওকে এখানে আনা হয়েছে। এক প্রস্থ ঝগড়াঝাটির পর সীতেশ অদিতিকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। অদিতি চমৎকার কোঅপারেটিভ, হবে নাইবা কেন, এত দ্রুত এত সমৃদ্ধি কোনও দিন ভাবতে পেরেছিল, বিহান প্রসঙ্গ ভুলিয়ে দিল।

সন্ধের পর ক্লান্ত অদিতি বাইরে বসতে চাইল বলেই সীতেশ বেরল। শিকারে যেতে চায়নি। অদিতির জন্যই যাওয়া। লোকটার মতলব ভাল ছিল না। পেছনে হাঁটছিল।

বিহানের সঙ্গে তর্ক করতে ভাল লাগে শোভনের। দুটো কারণে, বাস্তবতা থেকে ও দূরে থাকতে পারে এবং কবেকার একটা স্বপ্নের টিলায় দাঁড়িয়ে বিচ্যুতিগুলোকে আক্রমণ করতে পারে। বিহানের মুখোমুখি হওয়া মানে নিজেরই মুখোমুখি হওয়া, অন্যভাবে। বাকি সব তো ফাঁকি। ধর, শিল্পে বেসরকারি ও বিদেশি লগ্নি, শ্রমিক ছাঁটাই এসব নিয়ে সীতেশকে প্রশ্ন

করলে কী জবাব মিলবে, শোভন তা জানে। ওইসব জবাব কিছু লোক পার্টিকে সাপ্লাই করে। পার্টি জনতাকে বিলি করে। আসলে ওগুলো জবাব নয়, প্রতিটি জবাবের পেছনে প্রশ্ন আছে। বিহান সেগুলো তুলে ধরতে পারে। বিহান পারে, কেননা ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে, নষ্টস্বপ্ন ঘিরে ও আরও স্বপ্ন দেখতে পারে। আসার পথে, একটা চমৎকার যাত্রায়, দুটি বেপরোয়া রাতের সম্ভাবনা যখন এগিয়ে আসছে, পথের দু' পাশে আনমনা নিসর্গ যখন ব্যাপ্তির ইশারা দিচ্ছে, দীপা জানালায় স্থির হয়ে আছে, স্বাভাবিকই, পার্টি ক্লাস করতে তো আর এতদূর আসা হয়নি, শোভনের মনে হয় তারা দুজন একটু বেশি সততার মধ্যে, প্রৌঢ়তার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। গড়ানদহের কালীতলা থেকে ফেরার পথে দীপা বলেছিল, বিহান এখনও বিশ্বাস করে পৃথিবীতে গরিব মানুষ থাকবে না, অসৎ থাকবে না, লোভ থাকবে না, পৃথিবীটাই এরকম থাকবে না, তাই না?

বিহান: অমিতের মতো অ্যান্টিসোশ্যালকে কীভাবে তোমরা আশ্রয় দাও:

শোভন: আমরা না দিলেও অমিতের জায়গার অভাব হত না। অমিতরা এভাবেই বাঁচে, সম্মিলিতভাবে অমিতদের সঙ্গে কিছু পার্টি। থিয়োরিতে এসব কথা নেই, ইতিহাসেও থাকে না।

বিহান: নিজেদের সুবিধামতো তোমরা সবকিছু ব্যাখ্যা করতে চাও।

শোভন: সোশ্যালিস্ট স্কুলিং থেকে বেরনো টেকনোলজিকাল প্রোডাক্টগুলো দ্রুত কনডেমড় হয়ে যায়। ক্যাপিটালিস্ট স্কুলিঙের প্রোডাক্টরাব বেটাব। আশি বছরের সমাজতান্ত্রিক দেশের মেয়েরা, ফ্রম সিক্সটিন টু সিক্সটি, একজন মার্কিন বা অস্ট্রেলিয়ান বা সুইডিশ মেল ট্যুরিস্টের সঙ্গ পাওয়ার প্রত্যাশায় লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে বিপুল পয়সা খরচ করে চান্স ডেটিংয়ে নাম লেখায়। এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে?

বিহান: তোমরা কিন্তু সোশ্যালিস্ট সিস্টেমকে কনডেম করোনি।

শোভন: একদমই নয়। চোদ্দপুরুষের ভিটেমাটির টানের আর্থিক মূল্য কম নয়।

বিহান: দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন দিয়ে কয়েক দশক দিব্যি কাটিয়ে দিলে।

শোভন: তুমি যদি কোনও বইয়ের নাম করে থাক, হয়ত জান, একদা অনুরাগীরাই ওই বইয়ের সত্যতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছে।

বিহান: অন্ধ অনুরাগীরাই পরে সংশয়ী হয়।

শোভন: একে তুমি অপবিজ্ঞান বলে ঠাট্টা করবে?

বিহান: সমস্ত প্রশ্নহীনতার মধ্যে ভুলের ঘাঁটি গড়ে ওঠে। তবু তোমরা প্রশ্নহীনতাকেই লালন করতে চাও।

শোভন: প্রশ্ন তুললে যে বেরিয়ে যেতে হবে। এখন তবু একটা লোককে কথা দিতে পারি, রিটায়ারমেন্টের আগেই পেনশন পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাইরে থাকলে কী করতাম? এখন একজনকে হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে পারি। কিছু ছেলেকে রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তোমার মতো নিরাপদ জায়গায় থেকে প্রশ্ন তুলে নিজেকে মহৎ ভাবাই যেত। কারও জন্য কিছু করা সম্ভব হত না।

বিহান: ভাল বলেছ, শোভন, জনসেবার স্বার্থে অন্ধকার পালন।

শোভন: তুমি কোন বাস্তবেব কথা বল জানি না, কোনও কিছু না পাওয়ার বাস্তবতাকে আমি ঘৃণা করি। সেই বাস্তবতা আমি কখনও দেখিনি যেখানে একটি লোক দাঙ্গা বাধিয়ে বা খুন-খারাবি করে বিধায়ক হলে মানুষ তাকে বর্জন করে। ক্ষমতাই শেষ কথা। বাকি কথা ক্ষমতাহীনদের জন্য।

এভাবে মীমাংসাশূন্য এক ধারাবাহিক তর্ক যা ক্রমে খেউড়ের দিকে নিয়ে যায়, যা বিপক্ষকে বিপর্যস্ত করার জন্য হিংস্র হয়ে ওঠে, শোভন জানে, সুতরাং সে থেমে যায়, থেমে যাওয়ার আগে বন্ধুকে বলেছিল, মেয়েমানুষে তোমার লজিকহীন আপত্তি শুধরে নিয়ে মদ্যপান করতে পারো।

ওরা মদ্যপান করে। ওরা গান গায়। বাংলোর বাগানে জ্যোৎস্না ওড়ে। জ্যোৎস্নার শরীরে লাগে নিমফুলের গন্ধ। নিমফুলের গন্ধের ভেতর ঢুকে পড়ে জ্যোৎস্না। কবেকার বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। কবেকার তারা আসে। দেওয়ালে সেঁটে দেয় আন্দোলনের খবর। খবরের কাগজে লাল-নীল কালির হরফ। প্রতিটি হরফে সততা, শপথ, রক্তের অনুলিখন। পেয়ারার ডাল ভেঙে থেতো করা তুলির টানে বিশ্বাস ও স্বপ্ন ছবি পায়। মা যেভাবে পেতলের লক্ষ্মীনারান, নাড়ুগোপালের ছোট ছোট মূর্তিকে নাইয়ে গা মুছিয়ে দিত।

সেই জ্যোৎস্না ও মাদকতার ভেতব শিকারের প্রস্তাব দিয়েছিল দীপা।

চৌকিদাব বলেছে, একটা নদী আছে, ঝুম রাতে তারাদের নিয়ে কুলকুল কথা বলে;ঝুপঝুপ জ্যোস্নায় হরিণ জল খেতে আসে, নদীর গায়ে লেগে থাকা ছোট্ট পাহাড়ে ফুল ফোটে, তো আপনাবা পাহাড়ে বসে একমনে হরিণ দ্যাখেন, ঈশ্বরের দান,অধর্মে নাই, অহিতে নাই, গায়ে কী সুন্দর চিত্র, গাছপালা আঁকি দিছে, তো রঙের হাট বুকে পিঠে, জোস্নায় দ্যাখেন আর গান শোনেন।

শিকারেব গানটা তোমার মনে আছে? শোভন জিজ্ঞাসা করে দীপাকে। দীপা গায়, চলো চলো বনে যাই/বনেব পাহাড়ে নদীর কিনারে/ রাজা ব্যাসদেব কালো ঘোড়া চড়ে/ গেদা ঘেন ধেগে নাটা/ কেবে ব্যাটা কেবে ব্যাটা....। দীপা হেসে ফেলে। এবং হাসতেই থাকে। শোভনের মনে পড়ে, গুলা কাঁপে গুলি কাঁপে আকাশে ইন্দ্র কাঁপে দেবদেবীসুর। তারপর? তারপর? বল না অমিত। অমিত মাথা নাড়ে, শোভন বলে, বিহান থাকলে ঠিক বলে দিত। ব্যাটা যে কোথায় গেল। জানো, ও আমাদের সঙ্গে চমৎকার গাইছিল। শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিল। কী হবে মিছে তর্ক করে। সব ভোগে যা। সব খাগে যা। পাহাড়ে ওঠার মুখে ওকে শেষ দেখি, টলতে টলতে দীপাব হাত ধরে হাঁটছে। দীপা আপত্তি জানায়, বিহান আমার কাছেই আসেনি। শোভন বলে, আমরা কি এখন ঠিকঠিক মনে করতে পারি, কে কার কাছে ছিল, কে কার নয়? হয়ত সীতেশকেই দীপা মনে হয়েছে। কিন্তু, এটা তো ঘটনা যে বিহানকে আমবা হাবিযেছি। সীতেশ বলে, পাহাড়ে ওঠার আগে আপনার বন্ধুকে আমার পেছনে ছিল। অদিতিকে টার্গেট করেছিল। অমিত জানায়, লোকটার নাম মুখে আনতে ঘেন্না করে,

ভদ্দরলোকের ছানা বাংলোয় অম্বুবাচি করল। ফাঁকা জায়গা দেখেই ঠেটে গেল। শোভন আবার প্রশ্ন করে, আমরা সবাই কি ঠিকঠাক বলছি? অদিতি বলে, বিহান আমাদের পেছনে ছিল। সীতেশের কাঁধে ভর দিয়ে আমি হাঁটছিলাম। সীতেশ আবৃত্তি করে, মনতে হাংকিনু মনতে পাংকিনু/এই বন হেলিবো, এই বন পেলিবো/চড়হাবো ঘাও/ মোর বাড়ি বনকচু মোর বাড়ি হাণ্ডিছু / মুছিবে দুই পাও। একজ্যাক্টলি সীতেশবাবু! শোভন চিৎকার করে ওঠে, হাত পা মুড়মুড় ন্যাংগুড় চালাও/আলিকাঠ পালিকাঠ মুখেতে জ্বালাও। অদিতি বলে, সীতেশ আমাকে শেষ করে দিয়েছে। দীপা গুণগুণ করে, চলো চলো বনে যাই। শোভন বলে, পাহাড় থেকে আমরা হরিণ দেখলাম। অমিত বলে, স্পষ্ট দেখলাম। জল খাচ্ছিল। হঠাৎ গুলির শব্দ। দীপা বলে, আমাদের কারও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। শোভন বলে, আমরা হরিণটাকে টেনে বাংলোয় নিয়ে আসি। দীপা গায়, হুলা কাঁপে হুলি কাঁপে, আকাশে ইন্দ্র কাঁপে। অমিত বলে, কাঠ তৈরী রেখেছিল চৌকিদার। সীতেশ জানায়, অনেক সময় লেঘেছে ঝলসাতে। অদিতি বলে মাংসের কথা অস্পষ্ট মনে পড়ছে। সীতেশ বলে, উম্ হরিণের মাংস। শোভন বৃত্তাকার বন্ধুমন্ডলীর কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তোলে, আমরা কি বিহানের মাংস খেয়েছি?

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৫৮/ সংখ্যা ১ : ১৪০৫]

কলাপাতা

অভিজিৎ সেন

[জন্ম ১৯৪৫ সালের ২৮ জানুয়ারি বরিশালে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: হলুদ রঙের সূর্য, বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, অন্ধকারের নদী, রহু চণ্ডালের হাড়, ছায়ার পাখি, আঁধার মহিষ, দেবাংশী, ইত্যাদি। বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছেন।]

আমি ব্যাংকে চাকরি করি। আপাতত আঞ্চলিক অফিসের অফিসার। শহর থেকে আটত্রিশ কিলোমিটার দূরের শাখা রাঘবপুরের ম্যানেজার ছুটিতে যাওয়াতে মাস খানেকের জন্য আমি সেখানে ডেপুটেশনে যাচ্ছিলাম। জমি নিয়ে সংঘর্ষে একজন কৃষক নিহত হওয়ায় রাঘবপুরে পরপর দুদিন বন্‌ধ্ ডাকা হয়েছিল। বিবদমান দুইপক্ষই একদিন একদিন করে বন্‌ধ্ ডেকেছিল। [illegible] আমি বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে নিঃসংশয় হলাম যে সত্যিসত্যিই রাঘবপুরে সেদিনও বাস যাচ্ছে না। বাসস্ট্যান্ড থেকে বিফল হয়ে আমি আঞ্চলিক অফিসে এসে হাজিরা দিলাম। রাজনৈতিক বা অন্য যে কোনও কারণে বন্‌ধ্ ডাকলে, আমরা যদি অফিস করতে না পারি, ছুটির দরখাস্ত করে ছুটি নিতে হয়। কাজেই ছুটি বাঁচাতে শহরের অফিসেই এলাম।

আঞ্চলিক অফিসে দৈনন্দিনের কাজ কম, গল্পগুজব করার অবসর একটু পাওয়া যায়। সেই গল্পগুজবের মধ্যেই কথাটা উঠল।

আঞ্চলিক ম্যানেজার প্রিয়তোষ বলল, নতুন ডি.এম.লোকটি আগেরজনের থেকে কাজের হবে বলে মনে হচ্ছে। বয়সও কম, সমস্যা বোঝেও খুব দ্রুত। একদিন মিটিং করেই ব্যাপারটা বোঝা গেছে। সমীর বলল, ভাল তো বুঝলাম কিন্তু জেলাটা তো সরকার বাংলাদেশকেই দিয়ে দেবে মনে হচ্ছে।

আমাদের আঞ্চলিক অফিসের কর্মচারিদের মধ্যে কেউ মুসলমান ধর্মাবলম্বী নেই। কাজেই এখানে 'খোলামনে' কথা বলতে কেউ কোনও অসুবিধা বোধ করে না। সমীরের কথাবার্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, বোধবুদ্ধি সবসময়ই একটু তির্যক। ও কখন যে কী বলে, অনেক সময় আমরা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারি না। আবার অনেক সময় মনে হয়, ওর কথার আগে যে অর্থ ধরেছিলাম, ও বোধহয় তার উল্টো ইঙ্গিতই করেছিল।

ওর কথার উত্তরে নির্বিরোধ প্রিয়তোষ বলল, তা কেন, মুসলমানদের মধ্যেও ভাল লোক আছে। ডি.এম. মুসলমান তো কী হয়েছে?

সমীর চোখ পিট পিট করে বলল, তাই? কিন্তু জেলার তিন কর্তাই যদি মোছলমান হয়?

আমি বললাম, তাতে কী হয়েছে? এদ্দিন কি ব্যাপারটা কারু নজরে পড়েছিল? কোনও অসুবিধা হয়নি তো! বীরেন্দ্র বলল, অসুবিধা হয়নি! আমাদের পাড়ায় গিয়ে দেখুন। মসজিদে নতুন করে চুনকাম করা হয়েছে। মিনারের চারদিকে চারখানা মাইক লাগিয়েছে। সারাদিনের চার পাচবার চেল্লানো তো আছেই। তাছাড়া মোল্লারা মাঝে মাঝে এলে সভা করে বাণী শোনায়, নানারকমের লিফলেট দিয়ে যায়।

দিল্লি অনেক দূর।

আমাদের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিরা শিখ হোক বা মুসলমানই হোক, তাতে আমাদের এই ছোট শহরটার মানুষদের বিশেষ কিছু আসে না। আমাদের এই শহরটা উত্তরের একটা জেলা সদর। গ্রহ-নক্ষত্রের চক্রান্তে ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে সেলিম সাহেব যখন এ জেলার শাসক হয়ে এলেন, জেলাবাসী বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল যে জেলার দুই সর্বোচ্চ কর্তার অন্যজন অর্থাৎ এস.পি. সাহেবও মুসলমান! মাসখানেকের মধ্যে আদালত চত্বরের উকিলবাবুরা শহরের অনেককেই জানিয়ে দিল যে ডিস্ট্রিক্ট জজ সাহেব, যিনি বৎসরাধিক কাল ধরেই আছেন এবং একই সঙ্গে পাশের জেলার বিচারবিভাগেরও দায়িত্বে, তিনিও মুসলমান!

আমাদের সবার কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টার মৌলিকত্ব একেবারে উল্টোভাবে অর্থাৎ অবরোহ পদ্ধতিতে ধরা পড়ল। হওয়া উচিত ছিল এই রকম;

১। জজ সাহেব এলেন,ধর্মে মুসলমান।

২। পুলিস সাহেব এলেন, ধর্মে মুসলমান!

৩। কালেক্টর সাহেব এলেন, ধর্মে মুসলমান!!

কিন্তু জেলার কর্তাদের মধ্যে তৃতীয় জন মুসলমান ধর্মাবলম্বী হওয়ার পর আমরা সচেতন হলাম যে আগের দুজনও মুসলমান।

এই বিষয়টা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার কারণ একটাই। আমরা বাঙালিরা ধর্ম সম্পর্কে উদার। আমাদের মনোভাব ভারতীয় অন্য প্রদেশবাসীর থেকে অনেক বেশি সেকুলার বা ইহলৌকিক। অনেক বেশির প্রমাণ এই উদাহরণটি। আমি নিঃসন্দেহ যে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের যে-কোনও জেলা সদরে প্রথম মুসলমান কর্তা কাজে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা সবার চোখে পড়ে যেত। আমাদের ক্ষেত্রে চোখে পড়েছে পরপর তিন তিন জন ধারাবাহিকভাবে কাজে যোগ দেবার পরেই। সুতরাং এ বিষয়ে গর্ব আমাদের হতেই পারে।

সমীর প্রিয়তোষের কথার খেই ধরে বলল, ভাল ডি.এমের দরকার কী? কোনও গন্ডগোল নেই, কোনও ঝামেলা নেই, আমাদের এ জেলা কালেক্টরেটের বড়বাবুরাই চালাতে পারে। আর চালায়ও তাই।

আমাদের শহরে একঘর স্থায়ী মুসলমান গৃহস্থ না থাকলেও একটি বেশ বড় মসজিদ আছে, যার ভিতরের চাতালেই অন্তত শ'দেড়েক লোক দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে। হয়ত, কোনও এককালে এই শহরেও মুসলমান বাসিন্দা ছিল। নতুন জজ সাহেব আসার পর তারই উদ্যোগে মসজিদ সংস্কার হয়। নতুন করে নামাজ পড়াও শুরু হয়। বীরেন্দ্রর অস্বস্তির আর একটা কারণ হল, মসজিদের জমি, যা এখনও দখল হয়ে যায়নি, উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। সেই পাঁচিলের সঙ্গে টিনের চালা জুড়ে ভিতর দিকে কয়েকটি খুপরি ঘরও তোলা হয়েছে। শহরে মুসলমান গৃহস্থ না থাকলেও, জেলার গ্রামাঞ্চলে যথেষ্টই আছে। শহরের স্কুল কলেজের হস্টেলে তাদের ছেলেমেয়েদের স্থান সংকুলান হওয়ার নানারকম সমস্যা আছে। জজ সাহেবের সহায়তায় এসব খুপরি ঘর পড়ুয়া ছেলেদের বাসস্থানকল্পেই নির্মিত।

আমি বললাম, তবুও এসব কথাবার্তা হালেই উঠেছে। তিন তিনজন সরকারি কর্তা মুসলমান, এটা ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশে ভাবাই যেত না।

টেরা সমীর এ জেলারই লোক। পাশের জেলা মালদার লোকদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং

শিক্ষাসংস্কৃতি নিয়ে এ জেলার লোকদের সঙ্গে রেষারেষি আছে। সেই মর্মে প্রচলিত একটা রসিকতা সে খুব জুতসইভাবে শুনিয়ে দিল। সে বলল, হামাকে ঠকাবে! এক ঢোক খেলাম, দু'ঢোক খেলাম, তিন ঢোক খেয়ে ঠিক বাতলে দিলাম মদ লয়, মুত! হামি মালদার ছেল্লে!

আমরা সবাই হাসলাম, মায় বীরেন্দ্রও। তা সত্ত্বেও একথা সমীরকেও মানতে হল যে এক ঢোক দু'ঢোক অব্দি জেলার লোকদের মধ্যে কোনও বিরূপভাব ছিল না। কেবল তিন ঢোকের পরেই---

পরদিন আমি সময়মতো গিয়ে রাঘবপুরের শাখা খুললাম। দু'জন লোকের শাখা। ম্যানেজার এবং ক্যাশিয়ার। এ ছাড়া একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রাবণ মার্ডি অবশ্য আছে। ক্যাশিয়ার শিবু একটু গন্ডগোলের মানুষ। কখন যে তার মাথায় ভূত চাপবে, কেউ জানে না। সিন্দুকের চাবি ভাইয়ের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকবে সে। জানিয়ে দেবে অসুখ হয়েছে তার। কখনও কখনও মাসাধিক কালও সে এভাবে অসুস্থ থাকে। তারপর একদিন আবার এসে হাজির হয়। হাতের রেশন ব্যাগের ভিতর থেকে মাংস বা মাছ, সুগন্ধী তুলাই পাঞ্জা চাল, ঘি, কিসমিস, কাজু, পেস্তা, গরমমশলা, আরও সব বাছাই খাদ্যবস্তু এবং সে সব প্রস্তুত করার জন্য নানা ধরনের তেল মশলা বের করে সে। শুধু খেতে নয়, খাওয়াতে এবং সুচারুরূপে রান্না করতেও ভালবাসে সে। ছোট শাখা অফিসে কাজ কম। সারাদিনে পনেরো-বিশখানা ভাউচার হয় কি না সন্দেহ। নামমাত্র হাড়ি কড়াই এবং দু'একখানা বাসন সম্বল করে চমৎকার সংসার করে শিবু। তার রন্ধন-তালিকার মধ্যে থাকে খিচুড়ি, ভাত-মাছের ঝোল, মাংস-ভাত, ফ্রায়েড রাইস, পোলাও, এমনকী তিনমাসে একবার বিরিয়ানিও খাওয়ায় সে অফিসের সবাইকে। কিন্তু মাঝে-মাঝেই কী যেন হয় তার।

মাঝেমধ্যেই কামাই দেয় সে, অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার অসুস্থতা কী ধরনের, তা সত্যি, না মিথ্যা, আমাদের পরিষ্কার ধারণা নেই। অফিসে লোকের খুব অভাব। এই রাঘবপুর শাখায় শিবুর অনুপস্থিতির কারণে ডেপুটেশনে লোক পাঠাতে পাঠাতে আঞ্চলিক অফিসে আমরা হিমসিম খেয়ে যাই। শিবু কামাই দিয়েই যায়, শো-কজ হয় তার বিরুদ্ধে, মাইনে কাটা যায় তার। কিন্তু চাকরি যায় না , আজকাল চাকরি হওয়া খুব কঠিন, যাওয়া আরও।

শিবুর রোগটাকে রাবণ বলে বোঙায় ধরা। আজও তাই বলল। বলল, শিবুদাকে বোঙায় ধরেছে ফের । ভাই এসে চাবি দিয়ে গেল।

যাঃ বাবা! দু'দিন ব্যাংক বন্ধ ছিল। আজ তো একটু ভিড় হবেই। তা ছাড়া আগে থেকে খবর নেই। অন্য জায়গা থেকে লোকের বন্দোবস্ত করা হয়নি। এখন বে-আইনিভাবে দুই চাবির দায়িত্ব নিয়ে আমাকে একা ব্যাংক চালাতে হবে।

রাবণ ও শিবুর মধ্যে একটি বিশেষ বিষয় ছাড়া আর সব ব্যাপারেই অমিল। প্রতিবছরই সরকারি নানা প্রকল্পে ব্যাংককে যেন কিছু অনিচ্ছাকৃত ঋণ দাদন করতে হয়। রাবণ এবং শিবু এইসব প্রকল্পের উপভোক্তাদের মধ্যে মুসলমানদের নানা অছিলায় বঞ্চিত করার পক্ষপাতী. এসব নিয়ে একবার পঞ্চায়েত থেকে লিখিত অভিযোগ পাঠালে আঞ্চলিক অফিস থেকে আমাকেই পাঠানো হয়েছিল অনুসন্ধান করতে। রাবণ ভারত সেবাশ্রম সংঘের অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়ে প্রবল হিন্দু হয়ে উঠেছে। শিবু অযোধ্যায় মন্দির তোলার জন্য এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে। অনুসন্ধানে আমি এসবও জেনেছিলাম।

বারোটা পর্যন্ত স্বাভাবিকের থেকে বেশ বেশিই লোকজন এল। তারপর হঠাৎই লোক

আসা বন্ধ হয়ে গেল। রাবণ শিবুর সরঞ্জাম নিয়ে চা করার চেষ্টা করতে লাগল। রাঘবপুর একটা পকেট অঞ্চল। যে বড় রাস্তাটা পৃথিবীর সঙ্গে সদর শহরের যোগাযোগ রাখছে, সেই রাস্তা থেকে ভেতরে কুড়ি বাইশ কিলোমিটার ঢুকে যাওয়া একটা রাস্তার মাঝামাঝি জায়গা রাঘবপুর। রাবণ স্থানীয়। তার কাছ থেকে গত দুদিনের বন্‌ধের বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে শুরু করলাম। বাস থেকে নেমেই একটা পুলিশ ক্যাম্পের অস্তিত্ব চোখে পড়েছিল।

রাবণের বিবরণ শুনে মনে হল ব্যাপারটা ভারি স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বুঝতে বেশ কঠিন লাগল। সুরেশ সরকার নামে এক ব্যক্তির দশ বিঘা জমির একটা দাগ দিন পাঁচ ছয় আগে জবর দখল হয়ে গেছে । জবর দখলের নিয়ম অনুযায়ী জমির রোয়া ফসলের উপর সবাইকে জানান দিয়ে হাল মই নামিয়ে ফের নতুন করে বীজ গেড়ে দেওয়া হয়। এরপরে পুলিশ জমিটার উপরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে। সেটাও নিয়মের মধ্যে । এই জমি দখলের সময় সংঘর্ষ হয় এবং তাতে তীরবিদ্ধ হয়ে একজন খুন হয়েছে।

সমস্ত বিরোধে দুই বা ততোধিক পক্ষ থাকে। সুরেশ সরকার আজ বছর দশেক হল তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিয়ে বাংলাদেশ থেকে এসে রাঘবপুরে বসতি করেছে। অতি ধীরে সুস্থে হিসাব করে একটু একটু করে সে ও দেশের সম্পত্তি বিক্রি বাট্টা করেছে এবং এদেশে সম্পত্তি কিনেছে, বাড়িঘর করেছে। এদেশি স্বজাতের মধ্যে ছেলেমেয়েদেব্র বিয়ে দিয়ে নিজের প্রতিরক্ষা দৃঢ় করেছে। জ্ঞাতিদের বসতি করিয়ে নিজেকে আরও শক্তিশালী করেছে। আর এসব করার জন্য সবথেকে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সঙ্গী হয়ে এদেশের মাটির গভীরে শিকড় চালাতে চেষ্টা করেছে।

একাত্তর সালের পরে যারা বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছে তাদের মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ মোটামুটি গুছিয়ে বসার পর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পক্ষে ক্রমশ বেশি বেশি করে ঝুঁকে পড়ছিল। সুরেশ প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্যে এদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে শুরু করল।

রাঘবপুরের চাষিদের তেভাগার লড়াই করার ঐতিহ্য ছিল। সে নিয়ে বিস্তর উচ্ছ্বাস আছে। সুরেশ পুরোপুরি বেহাত হয়ে যাবে বুঝতে পেরে তার এতদিনের আশ্রয়দাতা দল এই দশ বিঘা জমির দাগটি নিয়ে ছোট একটা চাল দিল। জমিটির প্রাক্তন মালিকের দু'ঘর আধিয়ার ছিল। সুরেশ যখন জমি কেনে তখন টাকা দিয়ে তাদের সঙ্গে রফা করেছিল। এ ব্যাপারেও তার আশ্রয়দাতা দল তার সহায় ছিল। এখন সেই আধিয়ার হঠাৎ তাদের দাবি নতুন করে নিয়ে এসে হাজির হল। ফলে সুরেশ সরকারের সংঘর্ষে যাওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। জমির গাড়া ফসল ভেঙে দিয়ে অন্য কেউ নতুন করে গেড়ে দিলে পুলিশের কাছে গিয়ে লাভ নেই। পুলিশ বিরোধের জমিটির উপরে একশো চুয়াল্লিশ জারি করতে পারে। কিন্তু জমির ফসল কাটবে যে শেষে গেড়েছে সে-ই। আইন তারপরে চলবে ধীরেসুস্থে। বছরের পর বছর গড়িয়ে যাবে। সুতরাং দখল থাকাটা একান্ত আবশ্যক।

বেলা একটা নাগাদ সুরেশের সই করা উইথড্রয়াল স্লিপ নিয়ে মোটর সাইকেল দাবড়ে একজন যুবক এল দশ হাজার টাকা তুলতে। রাবণের চেনা লোক। সুরেশের নামে ফিকস্‌ড্ এবং সেভিংস আমানতে লাখ দুয়েক টাকা আছে। কাজেই এই গ্রাম্য ব্যাংক শাখায় সে খাতির পাওয়ার উপযুক্ত। উইথড্রয়াল স্লিপে অন্যাকে টাকা দেওয়ার নিয়ম নেই। গ্রাম বলে এবং সব গ্রাহকেরই মুখ চেনা বলে অনিয়ম হলেও ব্যাপারটা চলে। কিন্তু পরিচিতি যেহেতু আমার

সঙ্গে নেই, আমি আপত্তি করলাম। রাবণ আগন্তুককে জিজ্ঞেস করল, সুরেশদা কোথায়? আগন্তুক একটু গম্ভীর হয়ে বলল, আছে, তবে তার আসতে একটু অসুবিধা আছে।

আমি বললাম, এত টাকা আমি বেয়ারারকে কীভাবে দেব?

লোকটি অধৈর্য বিরক্তিতে বলল, আরে! আগে কতবার নিয়ে গেছি! রাবণ বলল, চেনা লোক, দিয়ে দিন।

আমি একটু অস্বস্তি নিয়ে উইথড্রয়াল স্লিপটা হাতে দিলাম। ফিরিয়ে দেওয়ার একটা ছুতো পাওয়া গেল। উইথড্রয়ালের পিছনে সই নেই। ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, পিছনে সই করিয়ে নিয়ে আসুন।

যুবক একটু সময় বিমূঢ় হয়ে কাগজটার দিকে তাকিয়ে থেকে, পরে বিরক্ত হয়ে 'ধ্যাত্তেরি' বলে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, এক্ষুনি আসছি।

বাইরের দিক থেকে তার অসহিষ্ণু মোটর সাইকেলের আওয়াজ ছিটকে মুহূর্তে দূরবর্তী হল।

---সুরেশ সরকারের লোক। রাবণ বলল।

কে সে?

---যার জমির গণ্ডগোলের কথা এতক্ষণ বললাম।

---আর তুমি টাকা দিয়ে দিতে বললে!

---উইথড্রয়াল স্লিপে দিই তো আমরা।

---তা বলে এই সব ঝামেলার সময়? যদি তার একটা কিছু হয়ে থাকে? পুলিশ নিশ্চয়ই খুঁজছে তাকে? যদি সে এখন হাজতে থাকে?

—কিছু এখনও হয়নি তার। টাকা না দিলেই ঝামেলা হবে। কিছু হলে আমি জানতাম। রাবণ বেশ কর্তৃত্বের সুরে এসব কথা বলল। আমি একটু অস্বস্তিতেই পড়লাম। এ ব্রাঞ্চের দায়দায়িত্ব আমার নয়। বেকার কাজ সামলাতে এসে ঝামেলায় পড়ে না যাই। যাই হোক, তবুও একটু স্বস্তি লাগল এই ভেবে যে কাগজের পিছনের সইটা প্রমাণ করবে যে সে ব্যক্তি আছে এবং কাছে পিঠেই আছে। রাবণকে সে কথা বললামও।

রাবণ বলল, তা তো বটেই।

আসলে রাবণের কাছ থেকে সমর্থন চেয়ে আমি একটু আশ্বস্ত হতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, অন্তত রাবণই তো এ ব্রাঞ্চের একমাত্র কর্মী যে এখন উপস্থিত।

বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে লোকটি পুনরায় মোটর সাইকেল দাবড়ে এসে টাকা নিয়ে গেল। পিছনের সই, সামনের সই সব ভাল করে মিলিয়ে নিলাম আমি। নিঃসন্দেহ হবার জন্য কাগজখানা রাবণের দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, ঠিক আছে, না? কাগজের দিকে না তাকিয়েই রাবণ বলল, ঠিকই আছে। তবে ওই উইথড্রয়ালখানাই কি ও আগে নিয়ে এসেছিল? উরিববাস! হারামির হাত বাক্‌সো। আমি বললাম, মানে?

রাবণ বলল, সুরেশদা ওরকম উইথড্রয়াল বাড়িতেও দু'চারখানা সই করে রেখে যায়। খুঁজলে হয়ত আমার ড্রয়ারেও এক আধখানা পাওয়া যেতে পারে। মানেটা আমার মাথায় পরিষ্কার হল। অর্থাৎ রাবণ আমাকে নিয়ে একটু মজা করল। সে জানত লোকটির হাতের কাগজখানা আগের কাগজ নাও হতে পারে। ওদের জাতে এমন হিসেবি বজ্জাত আমি আর দুটি দেখিনি।

জাত তুলে ওকে গাল দেওয়ার ইচ্ছাটা খুব কষ্টে দমন করে গম্ভীরভাবে বললাম, ড্রয়ার খুলে দেখ এরকম কোনও উইথড্রয়াল তোমার ড্রয়ারে আছে কি না। থাকলে ইমিডিয়েটলি আমাকে দাও। পার্টির সই করা উইথড্রয়াল ব্রাঞ্চের লোকের কাছে থাকাটা ফ্রডের পর্যায়ে পড়তে পারে, তা জান?

আরও তিনদিন থাকার পর রাঘবপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে পুলিশ উঠিয়ে নিল প্রশাসন। ইতিমধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য চার পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সকাল দশটায় আমি যখন ব্রাঞ্চ খুলছি তখন চোখে পড়ল একটা গাড়ি এসে পুলিশ পার্টি নিয়ে চলে যাচ্ছে। সেদিন শিবুও এসেছিল। সে কেমন গম্ভীর, অন্যমনস্ক। তার আড়ালে রাবণ এক ফাঁকে আমাকে বলল, শিবুদার বোঝা মাথা থেকে নামেনি এখনও।

দুপুর দুটোর পরে যখন ক্যাশের হিসাব মিলিয়ে শিবু সিন্দুকে তুলছে, তখন রাস্তার দিক থেকে একটা মিছিলের আওয়াজ পেলাম। জানালা দিয়ে তাকিয়ে সে মিছিল দেখব ভেবেছিলাম, তা দেখলাম না। লাল ঝাণ্ডা ছিল, কিন্তু সে ঝাণ্ডা তেকোণা। এ ছাড়া গেরুয়া ঝাণ্ডাও ছিল। ধনুর্ধর রামের সংহারক মূর্তির ছবি আঁকা ব্যানার ছিল। ঢাক, ঢোল, কাঁসি ছিল। শঙ্খ আর ঘন্টার মুহুর্মুহু ধ্বনিও ছিল, অসম্ভব প্রাণবন্ত চার পাঁচশো মানুষের মিছিলের মধ্যে হিন্দুধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংগঠনের পরিচিতিসহ বর্ণোজ্জ্বল ব্যানার ছিল আরও কয়েক রকমের। মিছিলকারীদের স্লোগানে রামজন্মভূমি উদ্ধার এবং রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার জঙ্গি আস্ফালন ছিল। মিছিল যাচ্ছিল বড় রাস্তার দিকে। শিবু সেই মিছিলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তার এক হাতে ক্যাশের ব্যাগ, এক হাতে সিন্দুকের চাবি। কি এক নিদারুণ স্বপ্ন তার চোখে। মিছিল জানালার সামনে থেকে সরে যেতে সে পিছন ফিরে বলল, আজ একটু তাড়াতাড়ি যাব। আমার কার্যকারণ সম্পর্ক মনে পড়ল। সদরে একটা সভা আছে আজ। এই মিছিল এখন ট্রাকে চেপে সেখানে যাবে। শিবুও সেখানে যাবে। রাবণ রাস্তায় গিয়ে মিছিলের সঙ্গে বেশ খানিকটা এগিয়ে, পরিচিতদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ব্যাংকে ফিরে এল।

একটু বাদেই হানিফ মাস্টার নামে এক ব্যক্তি অফিসে এল। এই লোকটির সঙ্গে আগেই বার দুয়েক দেখা হয়েছে আমার। খোঁচা-মারা কথা বলে লোকটি এবং তা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগও করে। নিষ্ঠাবান কিনা জানি না, তবে তাকে আমার অত্যন্ত দাম্ভিক মানুষ বলে মনে হয়েছিল। আর এই দম্ভ তার ধর্মকে কেন্দ্র করেই।

আমার সামনের চেয়ারে বসে হানিফ বলল, মিছিল দেখলেন ম্যানেজারবাবু?

আমি কাজ করতে করতে বললাম, হ্যাঁ দেখলাম।

তা এই অসময়ে?

-- পাশ বইটা নিতে এলাম, সে বলল। আমাকে চুপ করে কাজ করতে দেখে ফের বলল, আপনি দেখছি আজ খুব ব্যস্ত। না হলে একটা কথা-- --

আমি বেশ মাতব্বরি ভঙ্গিতে বললাম, বলে ফেলুন। সে যেন অনুমতির ভণিতা করে বলল, বলি তা হলে? এই যে মিছিল গেল না, এতে সব আছে---ভারত সেবাশ্রম, হিন্দুমিলন, বালক ব্রহ্মচারী, বিশ্বহিন্দু, ইস্কন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব, আনন্দমার্গী, রামকৃষ্ণ---এরা সবাই তো হিন্দু?

আমি কলম থামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে তাকে বুঝতে চেষ্টা করলাম। বললাম, হ্যাঁ হিন্দুই তো। হানিফ বলল, কত রকম হিন্দু।

আমি বললাম, হ্যাঁ হিন্দু বহু রকম। যে তুলসী গাছে, অশ্বত্থ গাছে, মনসা গাছে সিঁদুর লেপে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজো করে সেও হিন্দু আবার যে মন্দিরে গিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ মূর্তি পুজো করে, সেও হিন্দু। সারাজীবন যে গুরুর দেওয়া মন্ত্র জপ করে সেও হিন্দু।

হানিফ ইতর ভঙ্গিতে বলল, আবার গান্ধী, রামা রাও কিংবা রামচন্দ্রনকে যারা পুজো করে তারাও হিন্দু। তাহলে হিন্দুর ডেফিনশেনটা কী হবে? আমি একটু ভেবে বললাম, হিন্দুর কোনও ডেফিনেশন হয় না, সব মিলিয়েই হিন্দু।

আমি বুঝতে পারিনি হানিফ আমাকে তার পক্ষে সুবিধাজনক কোনও একটা দিকে ঠেলতে চেষ্টা করছে। তাতে সে সফলই হল। বলল, আমি একটা ডেফিনেশন দিতে পারি---যে অহিন্দু নয় সে-ই হিন্দু। হাঃ -----হাঃ---

আমি সব সময়ই বিরোধ এড়াতে চাই। বিশেষত এই ধরনের বিষয়ে। কিন্তু হানিফের শেষ কথাটা এবং তার হাসির মধ্যে যে শ্লেষ এবং স্বধর্ম সম্পর্কে যে অহঙ্কারের প্রদর্শন ছিল তা আমাকে বিদ্ধ করল। আমি নিজে কোনও ধরনের ধর্ম আচরণ করি না। আমার স্ত্রী সন্তানরাও এসবের বাইরে থাকে। তবুও হানিফের এহেন উক্তিতে আমি কেন ভীষণ আহত হলাম সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম না। তবে মাথার মধ্যে হঠাৎ কেমন ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। এই ব্যক্তির মস্তিষ্কের ভিতরটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। নিজের ধর্মের সত্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ত্ব তার কাছে যেমন প্রশ্নাতীত, তেমনই অন্যের ধর্মের সম্পর্কে তার ধারণাগুলি ঠিক এর বিপরীত, এ কথা বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। এমন ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এমন দুঃসাহসিক ধর্মাভিমানী আমার অভিজ্ঞতায় আর ছিল না।

শিবু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে তার বিষণ্ণ চোখ জোড়া তুলে হানিফকে জিজ্ঞেস করল, আর মুসলমানের ডেফিনেশনটা কী, মাস্টারমশাই?

হানিফ বলল, ম্যানেজার সাহেব রাগ করবেন না, এই ডেফিনেশনটা পণ্ডিতরাই দিয়েছে।

তীর যে ঠিক জায়গায় বিঁধেছে, রক্তপাত না দেখেও সে নিশ্চিত হয়েছিল এবং তার গলার তৃপ্তির উদগারও যেন টের পাচ্ছিলাম আমি।

শিবু আবার বলল, মুসলমানের ডেফিনেশনটা বললেন না মাস্টারমশাই?

হানিফ, আল্লার এক ও অভিন্নতা, সম্পূর্ণ নিরাকার অবস্থা এবং পয়গম্বরকে প্রেরিতপুরুষ হিসাবে যারা মেনে নেয়, তাদেরকেই মুসলমান অভিধায় চিহ্নিত করলে, শিবু অসম্ভব ত্যাঁদোড়ের মতো বলল, এটা আপনাদের পণ্ডিতদের ডেফিনেশন। আমাদের পণ্ডিতেরা মুসলমানদের সম্পর্কে আরেকটা ডেফিনেশন দিয়েছে, শুনবেন?---বেশ তো শোনা যাক। হানিফ বেশ উদার। একবারও চোখের পাতা না ফেলে শিবু বলল, কলাপাতার উল্টোদিকে যারা ভাত খায়, তাদের মুসলমান বলে।

হানিফের গর্বিত মুখটা নিমেষে কলাপাতার উল্টোদিকের মতোই ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আঞ্চলিক অফিসের খোলামেলা আলোচনায় এ ধরনের কথাবার্তা আমিও শুনেছি। হিন্দুদের মধ্যে এ ধরনের একটা রসিকতা চালু আছে। হিন্দুরা যা করবে, কট্টর মুসলমান ঠিক তার উল্টোটা করবে। না হলে কিসে প্রমাণ হবে সে মুসলমান? লুঙ্গির কাছা না থাকা, পশ্চিম দিকে ফিরে ঈশ্বরের আরাধনা, মেঝে কিংবা টেবিলের বদলে বিছানায় বসে খাওয়া, পাতেই হাতমুখ ধোয়া এবং একেবারে মোক্ষম কলাপাতার তলার দিকে ভাত খাওয়া এবং এ রকম

আরও অনেক কিছু হিন্দুদের থেকে একেবারে বিপরীত আচার আচরণ এই তত্ত্বের সপক্ষে দেখানো হয়।

হানিফের গোপন রক্তপাত আমাকেও তৃপ্তি দিল। বজ্জাত রাবণ শিবুর প্রত্যাঘাত একটু দেরিতে বুঝতে পেরে দেরিতেই খ্যাক খ্যাক করে হাসল। হানিফ হাসির সঙ্গে সুর মিলিয়ে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বলল, এটা কিন্তু শিবুবাবু দারুণ বলেছেন!

তারপর আপোসের ভঙ্গিতে কলাপাতার তলার দিকে খাওয়ার সপক্ষে দু'একটা যুক্তি দেখাল। আমি হানিফের মুসলমান সম্পর্কীয় অতি সরল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দু'একটা কথা বলতেই পারতাম, কিন্তু বললাম না। ধর্ম নিয়ে আলোচনাতে আমার উৎসাহ কম। তাছাড়া এ রকম দুই বিরুদ্ধ এবং প্রবল ধর্মাভিমানীর সঙ্গে আমার মতো নাস্তিকের কোনও আলোচনা হতে পারে না, এমন কান্ডজ্ঞান আমার ছিল। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, মাস্টার মশাইয়ের পাশ বইটা দিয়ে দাও শিবু, আর তাড়াতাড়ি করো, সাড়ে চারটার বাসটা ধরতে হবে।

হানিফ পাশ বই নিয়ে চলে গেল। ফিরে যাওয়ার সময় তার চোখমুখের চেহারা আর আগের মতো সপ্রতিভ ছিল না। আমি আর ওসব না দেখার ভান করে হিসাবপত্রের দৈনিকের খাতা বই চেক করে উঠে বললাম, বন্ধ করো।

বাসে করে আসতে আসতে রাস্তায় বহু জায়গায় ট্রাকে সভায় যাওয়ার লোকজন দেখলাম। স্লোগান এবং রঙিন পতাকা ফেস্টুনে সমৃদ্ধ মিছিল এখানে সেখানে। বাসের লোকের মধ্যেও এই মিছিল, এই আন্দোলন এবং তাদের নেতাদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও আবেগের প্রকাশ দেখতে দেখতে শহরে এলাম।

মানুষের উৎসাহ দেখে আমি অবাক হচ্ছিলাম। বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মাঠে বিশাল সভা হচ্ছে! শহরটা বামপন্থীদের, সাংসদ তাদের, বিধায়ক তাদের, পৌরসভা তাদের। মানুষের বেশির ভাগই তাদের সমর্থক। কিন্তু 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে এইসব মানুষের বেশ বড় একটা অংশের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করছিলাম। সবাই তেমন ধার্মিক না হলেও বিদ্বেষের ইন্ধন নতুন করে যেন চাগিয়ে উঠল। তাদের অনেকেরই একসঙ্গে মনে হল শহরটা -- এ জেলাটা মুসলমানের দখলে চলে গেল নাকি? শালাদের কিছু শিক্ষা এবার দেওয়া দরকার ! শালারা খুব বেড়ে গেছে!

পরদিন থেকে শিবু আবার অফিসে আসা বন্ধ করল। সকালে অফিসে আসার আগে তার ছোট ভাই বিব্রত মুখে কেশিয়ারের চাবি আমার কাছে দিয়ে গেল। শিবু নাকি ফের অসুস্থ হয়ে পড়েছে অথবা আদৌ সুস্থই হয়নি। আগের দিন এসে সে অসুস্থতাকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল বোধহয়, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। দিন তিনেক পরে রবিবার, আমি শিবুর খোঁজ নিতে তার বাড়ি গেলাম। শিবু বিছানায় শুয়ে ছিল। আমাকে দেখে উঠে বসল।

---কী হয়েছে তোমার ? অফিসে যাচ্ছ না কেন?

---শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

---জ্বর হয়েছে? পেট টেট খারাপ ?

---না ওসব কিছু নয়।

---কিন্তু তোমার তো মাইনে কাটা যাবে! ছুটি তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

---কাল থেকে যাব ভাবছি।

অন্যমনস্কের মতো উত্তর দিচ্ছিল শিবু। থেমে থেমে। দেয়ালের দিকে দৃষ্টি রেখে। আচমকা মেঝে থেকে একপাটি চটি তুলে দেয়ালের একটা টিকটিককে লক্ষ করে ছুড়ে মারল। নির্ঘাত লক্ষ্যে আহত টিকটিকিটা মেঝেতে পড়ে ছটফট করতে থাকলে শিবু উঠে চটি দিয়ে ওটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে এল। বলল, টিকটিকি, ছুঁচো, আরশোলা আমি একদম সহ্য করতে পারি না জানেন?

আমি খুব বিস্মিত হলাম।

শিবু বলল, ওরাও আমাকে দেখে ভয় পায়।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

শিবু বলল, সেদিন একটা ছুঁচো আমাকে দেখে পালাবার পথ না পেয়ে ভয়ে দেয়াল বেয়ে সোজা ওই লাইন অবধি উঠে গেল, জানেন?

আমি তার মুখ চোখের চেহারা লক্ষ করছিলাম, কিন্তু শিবু কিছুই লক্ষ করছিল না।

পরদিনও শিবু অফিসে এল না। আরও দিন সাতেক পরে সকালে অফিস যাওয়ার জন্য রাঘবপুরের বাসে উঠে দেখি শিবু আগে থাকতেই উঠে বসে আছে। আমার জন্য জানালার পাশে জায়গাও রেখেছে সে। তাকে দেখে একটু স্বস্তি পেলাম। কেননা আঞ্চলিক অফিস থেকে কোনও লোকের ব্যবস্থা না করতে পারায় আমাকে একাই ব্যাংক চালাতে হচ্ছিল। আগের দিন মহরমের ছুটি ছিল। রাস্তায় কুমারপাড়া মোড় থেকে চারপাঁচজন স্ত্রীপুরুষ এবং শিশুর একটা পরিবার গাড়িতে উঠল। প্রচন্ড ভিড় বাসে। অনভ্যস্ত স্ত্রীলোক এবং শিশুরা এ ওর গায়ে পড়তে পড়তে, ঘোমটা এবং কোলের বাচ্ছা সামলাতে নাজেহাল হয়ে গেল। পরিবারটি যে মুসলমান, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি আমাদের। আমি আর শিবু দুজনে একটা সিটে বসেছিলাম। আমি জানালার দিকে, শিবু বাসের ভিতরের দিকে। দলটির স্ত্রীলোকেরা খুবই অনভ্যস্ত। ওই ভিড়ের মধ্যেও তারা বাসের মেঝেতে বসে পড়ে নিজেদের সামলে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। তাদের তিন চার বছরের একটি ফুটফুটে শিশু শিবুর সিটের কাঠের ফাঁকায় হাত আটকে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার পাশে বসা শিবু দু-তিনবার নানা কায়দায় তাকে একটু দূরে সরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। শিশটির সংস্পর্শে তার শারীরিক অস্বস্তি চোখে পড়ার মতো, সে ফিসফিস করে আমাকে বলল, উঃ, হাত মুখ থেকে মাংসের গন্ধ বের হচ্ছে।

আমি তার বাতিক জানতাম। তাই ঈষৎ হেসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কোনও এক 'বাঙালকে' কলকাতার 'ঘটি' জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার বাসা কোথায়? বাঙাল সামান্য সময় চিন্তা করে উত্তর দিয়েছিল, হকুন তোর বাফে! অর্থাৎ তোর বাবা শকুন! শিবুর অস্বস্তিতে অনেককাল আগে শোনা গল্পটা আমার মনে পড়ল। বাঙালের যুক্তিটা এরকম, বাসা! বাসায় তো পাখি থাকে (মানুষ থাকে বাড়িতে)! তাহলে এ কলকাত্তাইয়া ঘটি আমাকে মনুষ্যেতর(বাঙাল মানুষ নয়) সাজিয়ে রগড় করতে চায়! সুতরাং চার্জ!

শিবুও এই যুক্তিধারায় মাংসের গন্ধ/মুসলমানের ছেলে /দাওয়াত খেয়ে এসেছে/মহরম/নির্ঘাত গোমাংস! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল।

---তোরা কোথায় যাবিরে?

---আশফাকপুর।

—কোথায় গেছিলি? দাওয়াত খেতে?

—হুঁ।

কার বাড়ি?

—শশর বা—

শিশুটি কথা শেষ করার আগেই ওয়াক তুলে বমি করে ফেলল। শিবুর হাতের উপরে এবং আশপাশের দু-একজনের গায়ে বমি পড়ল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শিবু ছিটকে উঠে দাঁড়াল।

—ইস্—ইস্—বমি—

পরিবারটির তরফে পুরুষদের একজন ভিড়ের ভিতর থেকে কষ্ট করে এগিয়ে এসে পকেট থেকে একখানা রুমাল বের করে শিবুর হাত এবং জামার উপর থেকে বমি ঝেড়ে এবং মুছে দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে বলল, চেংড়া ছাওয়াল, কেছু মোনেত নেন না বাহে।

শিবু নিজের সিটে কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে থাকল। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও যেন নিজের ভাবতে পারছিল না সে। কী ঘেন্না-- কী ঘেন্না ! বমির অংশবিশেষে মাংসের টুকরোর মতো ছিল না? সেগুলো কিসের মাংস! সম্ভবত এরকমই ভাবছিল সে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, তার যেন বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবে। সে আমাকে দেখছিল না, অন্য কাউকেও নয়। বিস্ফারিত চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

রাঘবপুরে নেমে শিবু এমনভাবে হেঁটে ব্যাংকে এসে ঢুকল যেন মনে হচ্ছিল সে নিজে হাঁটছে না। কেউ তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঢুকে সোজা সে পিছনের কলপাড়ে গেল। জামাকাপড় এবং গেঞ্জি খুলে শুধুমাত্র নীচের অন্তর্বাস পরা অবস্থায় প্রথমে সে কয়েক বালতি জল গায়ে ঢালল। তারপর সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচল। গায়ে সাবান দিয়ে অন্তত বিশ-পঁচিশ বালতি জল দিয়ে স্নান করল। আমি ঘরে বসে দীর্ঘসময় ধরে জল ঢালার শব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে বাইরে এসে বললাম, ঢের হয়েছে শিবু,এবার বন্ধ করো। না হলে অসুখে পড়বে।

ভিজে প্যান্ট জামা পরে চেয়ারে এসে বসল শিবু। সম্পূর্ণ ভেঙে-পড়া পাগলাটে চেহারা চোখমুখের। আমি বললাম, কী হল? তুমি ও রকম করছ কেন? শিবু বলল, যদি গোরু খেয়ে এসে থাকে? যদি কেন, আমার হাতের মধ্যে একটা মাংসের টুকরো ... সে দ্রুত উঠে পিছনের ড্রেনের কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল। প্রাণপণে ওয়াক দিয়ে বমি করতে লাগল। তারপর আরও কিছুক্ষণ ভূতগ্রস্তের মতো বসে থেকে বলল, আজ আমি আর জয়েন করব না। আমি বাড়ি চলে যাব।

শিবু চলে যাবার পর রাবণ বলল, শিবুদাকে আবার বোগুয় ধরল।

দিন তিনেক পরে শিবুর ছোট ভাই আমার বাসায় এসে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে গেল। তার কাছ থেকে শুনলাম শিবু শয্যাশায়ী, অসুস্থ, ডাক্তারের চিকিৎসায় আছে। এ ছাড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত এনে মাথা নেড়া করে, গোবর খেয়ে শাস্ত্র মতে প্রায়শ্চিত্ত করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্বাভাবিক হতে পারছে না। এক অজানা আতঙ্ক তাকে তাড়িত করছে এবং কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই সে কেঁদে ফেলছে।

দশবারো দিন এভাবে কেটে যাওয়ার পর একদিন তাকে দেখতে গেলাম আমি। তার দিকে তাকিয়ে যে-কোনও লোক বুঝতে পারবে যে সে আর অন্য দশজনের মতো স্বাভাবিক মানুষ ছিল না। সে আর এ জগতের লোকও নয় যেন। আমি তবুও তাকে বললাম, অফিসে

যাও। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারো, গল্পগুজব করো। একা ঘরের মধ্যে এভাবে বসে থাকলে এমনিতেই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কাল পরশু থেকে অফিস যেতে শুরু করো, কেমন? শিবু একইভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ কাল থেকেই যাব।

পরদিন শনিবার। আমি যথাসময়ে রাঘবপুরের শাখায় গেলাম। শিবু আজও অনুপস্থিত। আমরা ভাবলাম শনিবার বলে বোধহয় সে আসেনি। একবারে সোমবারে আসবে। ছুটির পরে বাড়ি ফেরার পথে যখন শহরের বাস স্টপে এসে নেমেছি, দেখি আঞ্চলিক অফিসের সুশান্ত আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বলল, শুনেছেন কিছু?

আমি বললাম, কী শুনব?

---শিবু আত্মহত্যা করেছে।

---অ্যাঁ!

---সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল অফিস যাবে বলে। অফিসে না গিয়ে সে নদীর পারের শালবনে ঢুকে গিয়েছিল।

---শালবনে?

-- হ্যাঁ, ওখানে বসেই এক বোতল পেস্‌টিসাইড পুরোটা গিলেছে।

---তারপর?

---তারপর বেরিয়ে এসে একটা রিকশ ডেকে তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেছিল।

---তারপর?

---হাসপাতালে ঘন্টাখানেক ছিল। তারপরে সব শেষ।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে শহরের মাঝখানে কালেক্টরের অফিসের সামনে এলাম। শিবুরা স্থানীয় লোক। কাজেই মৃতদেহ মর্গ থেকে বের করবার জন্য আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু তার বাড়িতে এবং শ্মশানে তো যাওয়া কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সুশান্ত বলল, এখানেই দাঁড়ান। এখানেই সবাইকে আসতে বলেছি।

আমরা কালেক্টরেটের উল্টো দিকে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়ালাম।

কালেক্টরেট চত্বর থেকে একদল লোক স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়াল তারা। সামনের দুজনের হাতে ব্যানার। ঠিকাদারদের সমিতি জেলা শাসকের কাছে গিয়েছিল কোনও দাবিদাওয়া নিয়ে। সম্ভবত ব্যর্থ হয়েছে। ঠিকাদারেরা "জয় শ্রীরাম" তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করেছে, এ তথ্য জানা ছিল: তাদের চোখে মুখে ক্রোধের ছাপ, গালাগাল এবং জেলাটা 'মুসলমান রাজত্ব' হয়ে যাওয়ায় প্রকাশ্য ও ক্রুদ্ধ আক্ষেপ। তাদের একজন একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে শুরু করল। তাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত করা হচ্ছে। তাদের দাবি মানা না হলে তারা মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত যাবে। আদালতে যাবে! ডি.এম. তুমি দূর হটো! এস.পি. তুমি দূর হটো! মুসলমান তোষণ চলবে না! ইত্যাদি।

সোমবার এবং মঙ্গলবার সারাদিন চেষ্টাচরিত্র করার পর শিবুর জায়গায় একজন বদলি ক্যাশিয়ার পাওয়া গেল। নতুন ক্যাশিয়ার ববিউল এ জেলারই লোক। এতদিন মুর্শিদাবাদে ছিল। এবারে সুযোগ পেয়ে নিজের জেলায় এল।

বৃহস্পতিবার টিফিনের পরে হানিফমাস্টার এল। ব্যাংকে ঢুকেই সে সোজা রবিউলের টেবিলে গিয়ে বসল। —শিবুবাবুর মৃত্যু খুবই দুঃখজনক ম্যানেজারসাহেব। রবিউলের সামনে বসলেও সে আমার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

—শিবুবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে সুখ ছিল। আমি চুপ করে থাকলাম। হানিফমাস্টার একটু সময় উশখুশ করে বলল, আপনি নীল আরমস্ট্রংয়ের নাম শুনেছেন, ম্যানেজারসাহেব? আমি বললাম, কে?—ও—না—সেই চাঁদে যাওয়া লোকটা?

হানিফ বলল,হ্যাঁ, নীল আরমস্ট্রং মুসলমান হয়েছে, জানেন না? আমি এ ধরনের একটা বিচিত্র প্রসঙ্গে আচমকা ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, নীল---মুসল—মানে কেন?----কেন? হানিফ সর্বজ্ঞের মতো হাসল। বলল, সে যে-সব জিনিস সেখানে দেখে এসেছে, তাতে তার মুসলমান না হয়ে আর উপায় ছিল না।

আমি কবে যেন কার কাছে হজরত মহম্মদের অলৌকিক ক্ষমতার মধ্যে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করার একটা গল্প শুনেছিলাম। আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে নিজের কাজে মন দিলাম।

হানিফ তাতে আদৌ নিরুৎসাহিত না হয়ে বলল, ম্যানেজারসাহেবের বোধহয় কথাটা বিশ্বাস হল না। কিন্তু এ ঘটনার লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কী আসে যায়? বলে সাব-ক্যাশ বইটা মেলাতে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সাব-ক্যাশ মিলল না। .মাথা থেকে হানিফের চিন্তাটা কিছুতেই যাচ্ছিল না। একজন অতিসাধারণ গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষকের চেতনায় এত অহঙ্কার কীভাবে আসে? আগের দিন শিবুর ঠ্যাটামির কাছে পর্যুদস্ত হওয়া লোকটি নিজের এবং নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে ফের আজ এসেছে। তার ভিতরের তাড়না তাকে শেষ নিষ্পত্তির জন্য যেন খালি খোঁচাচ্ছে। আমি জানি না, একজন কৃষক খুন, রাঘবপুরের মিছিল, আঞ্চলিক অফিসে আমাদের খোলামেলা আলোচনা, শিবুর সর্বাঙ্গ বিষাক্ত-হয়ে-যাওয়া অশুদ্ধতা, ঠিকাদারদের ক্রুদ্ধ স্লোগান, হানিফমাস্টারের নীল আরমস্ট্রং বিষয়ক গল্প, এসবের মধ্যে কোনও সাধারণ যোগসূত্র আছে কি না।

হানিফ রবিউলের সামনে বসে আছে কিন্তু তার দৃষ্টি আমার দিকে। আমিও এসব ভাবতে ভাবতে তার দিকে মুখ তুলে তাকালাম। রবিউলের সামনে বসে থাকা লোকটির মুখ আমার অন্যমনস্ক চোখের সামনে বদলে আস্তে আস্তে শিবুর মুখের মতো হয়ে যাচ্ছিল।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৫৮/সংখ্যা ৩: ১৪০৫]

কিছু হাসি, কাশি আর ঘামের গন্ধ

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

[জন্ম ১৯৩১ সালের পুরীতে। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর লেখক এবং কিছুকাল এর সম্পাদনাও করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: সহবাস, কথা ছিল, আশ্রয়, রেল কামরার যাত্রী, নির্বাচিত গল্প, ইত্যাদি।]

আজ আমার সাতষট্টি নম্বরের জন্মদিন। আমি যখন জন্মাই, তখন সেই দিনটার কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না। আমার জন্মাবার ফলেও সেই দিনটার কোনও উজ্জ্বলতা বাড়েনি। তবে অন্য একটা কারণে, কাকতালীয়ভাবে, পরবর্তীকালে, বছরের সেই বিশেষ তারিখটা সর্বভারতীয় ছুটির দিন বলে গণ্য হচ্ছে। লোকে ছাদের ওপর উঠে সেদিন প্রাতঃকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে, তারপর জাতীয় সংগীত গায়। আমার কথা কেউ বলে না। আসলে এ-সব ব্যাপারে আমার কোনও হাত ছিল না , এখনও নেই।

আমি জন্মদিন মানি না। বছরের প্রত্যেকটা দিন, আমার মতে, আমার বাকি জীবনের প্রথম দিন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দিনটা ভোলাও যায় না। যতদিন মা বেঁচে ছিল, ততদিন ঠিক মনে করে আলাদা দুধ আনা হত, পায়েস রান্না হত বাড়িতে। ভাই-বোন বাড়িসুদ্ধ লোক আমার কল্যাণে সেদিন এক বাটি করে পায়েস খেতে পেত। নানা সময়ে আমাদের পরিবারে অভাব অনটন দেখা গিয়েছে, বাবার রোজগার কমে গেছে, তখনও পায়েসটা বাদ পড়েনি। মা মারা যাওয়ার পর প্রতি বছর জন্মদিনে পায়েস খাওয়াবার দায়িত্ব পড়েছে আমার স্ত্রীর ওপর। তার কখনও ভুল হয় না কিন্তু পায়েসের পরিমাণ সম্পর্কে সে বড় কৃপণ। এক বাটি এখন এক হাতায় এসে ঠেকেছে । না হলে হয়ত এতদিনে মরেই যেতাম। পায়েস যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এ খবর মায়েরা রাখে না।

জন্মদিনে নতুন জামা পাওয়া যায়। সেই জামা পরে, একদিনের জন্য সকলের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকার আনন্দই আলাদা। জাতীয় উৎসবের সামগ্রিক হট্টগোলের মধ্যেও আমি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। যেখানে আর সকলে অবহেলিত, উপেক্ষিত হচ্ছে। সারা জীবন এই দিনটিতে তাই পরম কৃতজ্ঞতায় আমার সমস্ত গুরুজনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে এসেছি। তাঁরা আমার দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন।

তাঁদের শুভকামনার ফলেই হোক বা কখনও সচেতনভাবে কোনও অন্যায় কাজ না করার জন্যই হোক, আমি দীর্ঘজীবন পাওয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছি ক্রমে ক্রমে। সকলকে সুখী করতে পারিনি আমি জানি, কেননা প্রতারণা না করলে সকলকে সুখী করা যায় না। এ নিয়ে আমার মনে কোনও অনুশোচনা নেই।

দীর্ঘজীবনের ফল, আজ অনুভব করছি, আমার গুরুজনের সংখ্যা কমতে কমতে প্রায়

শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রণাম করার যোগ্য প্রাচীন পা এক জোড়া দু'জোড়ায় নেমে এসেছে। আমার মায়ের ছোট বোন—আমার ছোট মাসি—তাদের একজন। একাশি বছর বয়সে ছোট মাসির পা দুটো বাতে বেঁকে গেছে, তবে প্রণাম করা যায়। ছোট মাসি একমাত্র আমায় ডাক নাম ধরে ডাকে যখন দেখা করতে যাই।

আমার জন্ম পুরীতে। যাকে অনেকে জগন্নাথধাম বলে, যেখানে শ্রীচৈতন্য ইহলীলা সাঙ্গ করেছিলেন। ভক্তলোকে বলে, নীল আকাশ আর সমুদ্রের মাঝখানে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। মৃদু গুঞ্জন শুনি, তাঁকে নাকি খুন করা হয়েছিল। ওই জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যেই তাঁকে পুঁতে ফেলা হয়েছে। কী সাংঘাতিক কথা—আমি ভাবি, এ নিশ্চয় সত্য নয়। অমন মহাপুরুষকে কেউ হত্যা করে? আবার ভাবি, মহাপুরুষকেই তো লোকে হত্যা করে। তাঁরা যে সত্যের স্বরূপ দেখান, তাতে আমাদের চোখ ঝলসে যায় না। আমার জন্ম পুরীতে তার কারণ সেখানে আমার মায়ের বাপের বাড়ি। আর, তখনকার দিনে মেয়েদের সন্তানসম্ভাবনা হলেই বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হত। আপনারা দিকপাল সব বাঙালিদের জীবনীগ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখবেন, তাঁদের অধিকাংশের জন্ম মাতুলালয়ে। ভিতরের সত্য হল, নারী যখন সাংসারিক কাজে অপারগ, তখন তাকে শ্বশুরালয় থেকে বিদায় দেওয়া হত। আমার মাতামহের সাত-সাতটি মেয়ে, তাই তাঁর পুরীর দোতলা বাড়ির পেছন দিকে উঠোনের কোণে একটা পার্মানেন্ট আঁতুড়ঘর ছিল। অসংখ্য শিশুর জন্ম হয়েছে সেই ঘরে। আজ তারা, তাদের সন্তান-সন্ততি এবং তাদেরও সন্তান-সন্ততি সারা ভারতের কোণে কোণে ছড়িয়ে রয়েছে—থিকথিক করছে। উপার্জন করছে, ভোগ করছে, পরিবেশের মধ্যে দূষণ ছড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত। পোকাদের মতো, নির্বিকারভাবে।

একটি পুত্রসন্তান লাভ করার আশায় আমার মাতামহ চারবার বিবাহ করেছিলেন। প্রথম দু'জন অকালে গত হন। পারের দু'জন টিকে যান। চতুর্থজন ঠাকুরের কৃপায় একটি পুত্রসন্তান উপহার দিতে পেরেছিলেন মাতামহকে, তৃতীয়জন তখন পঞ্চম কন্যাকে গর্ভে ধারণ করে অপেক্ষমান। অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার পর মাতামহ আর কাম-ক্রোধে লিপ্ত থাকেননি। দীক্ষা নিয়ে গুরুদেবের চরণে নিজের সংসারের ভবিষ্যৎ সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। একজন প্রবাসী অসফল আইনজীবীর পক্ষে আর কী-বা করার ছিল। উক্ত পঞ্চম কন্যাই আমার ছোটমাসি। আমার মা তাঁর চতুর্থ কন্যা।

লিখতে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা কেমন আজগুবি, অস্বাভাবিক ঠেকছে। কিন্তু তখন এসব খুব মসৃণভাবে গ্রহণ করা হত। আমার দুই দিদিমার নাম নিভাননী আর ননীবালা। দাদু কারুর প্রতি পক্ষপাত না দেখাতে দুজনকেই 'ননী' বলে ডাকতেন। যে সাড়া দিত, তাকেই পান সেজে দিতে বলতেন। ওঁদের সংসারে সতিনদের মধ্যে কলহ ছিল না, বোঝাপড়া ছিল। কীরকম বোঝাপড়া, আমি কল্পনা করতে চাই। পাখিদের মতো?

আমার মাতামহের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন জানকীনাথ বসু। তিনি রাজধানী কটকে ওকালতি করতেন, পুরীতেও তাঁর একটা নিজস্ব বাড়ি ছিল। ছুটিছাটায় প্রায়ই পুরীতে আসতেন বেড়াতে। তাঁর অনেকগুলি পুত্রসন্তান ছিল। ইচ্ছা করলে তিনি হয়ত আমার মাতামহকে কন্যাদায় থেকে

সম্পূর্ণ না হোক কিছুটা উদ্ধার করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা কায়স্থ, অসবর্ণ, সুতরাং এ প্রশ্ন কখনও ওঠেনি। তা ছাড়া তাঁরা কত ধনী।

কলাগাছের মতো মেয়েরা একে একে বড় হয়ে উঠতে লাগল। কী করে তাদের বিবাহ দেওয়া হবে সেই চিন্তায় দাদু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ঠাকুরকে ডাকতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরই পথ বলে দেন। এক, বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দাও আর দুই, চেঞ্জারদের দিকে নজর রাখো। চেঞ্জার মানে এখনকার ভাষায় টুরিস্ট। পুরী বরাবরই বাঙালি টুরিস্টদের কাছে প্রধানতম আকর্ষণ। সেখানে তীর্থক্ষেত্রের পুণ্য আছে আবার সমুদ্রসৈকতের মুক্তবায়ু আছে। সেই উনিশশো পঁচিশ সালে যক্ষ্মারোগের কোনও নিশ্চিত নিরাময় ছিল না। লোক পুরীতে শরীর সারাতে যেত। এই তিন রকমের যাত্রীদের জন্য পুরীর সমুদ্রতীরে তখনই একাধিক হোটেল গড়ে উঠেছিল। সবচেয়ে অভিজাতটির নাম বি.এন.আর.হোটেল। এ ছাড়া বাঙালি বাসিন্দারা নিজেদের বাসগৃহের ঘরও চুক্তিতে ভাড়া দিত। দাদু তাঁর দুই স্ত্রী এবং সাত কন্যাকে নিয়ে সমুদ্রকিনারে বেড়াতে যেতেন মাঝে মাঝে। এক চেঞ্জার পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাওয়ায় তারা আমার এক মাসিকে বরণ করে নিয়ে যায়। বর্ধমান জেলার কালিকাপুর গ্রামে আমার সেই মাসির শ্বশুরবাড়ি। সেখানে বেড়াতে গিয়ে আমি প্রথম কাঁঠাল খেয়ে ছিলাম।

বাংলা কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এবং বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আর সব মাসিদের বিয়ে হয়েছিল বলে শুনেছি। কেউই শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকেনি। ওই বিজ্ঞাপনে পাওয়া মেজো জামাই ছিল ধনী ঠিকেদার। তাই সে ভদ্রলোক এমন ঈশ্বরানুরাগী ও নিরাসক্ত শ্বশুরকে দেখে অত্যন্ত চমৎকৃত হয় এবং কালক্রমে সকল কন্যার বিবাহের আর্থিক দায়িত্ব বহন করে। এ-ও ঠাকুরেরই কৃপা। কেবল ছোটমাসিকে গ্রহণ করে সেজো জামাইয়ের অধস্তন সহকর্মী। ঘরে ঘরে সম্বন্ধ। তখন সোনার দাম একুশ টাকা ভরি, বেনারসি শাড়ি পঞ্চাশ টাকা। একটা মেয়ের বিয়েতে খরচ পড়ত তিন হাজার টাকা মাত্র।

অনেকদিন আগে, মা বেঁচে থাকতে, ছোটমাসির কাছে শুনেছিলাম যে বিয়ের আগে একজন চেঞ্জার যুবক মাকে গান শেখাতে আসত। দাদু সব মেয়েকেই অল্পবিস্তর গান-বাজনা শিখিয়েছিলেন। তাঁর নিজের গানের গলা ছিল। ঠাকুরদেবতার গান গাইতেন, ব্রহ্মসংগীত তখন খুব জনপ্রিয় বাঙালি মহলে। কিন্তু মায়ের বেলা দাদুর আর সে ক্ষমতা ছিল না। ওই চেঞ্জার ছেলেটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গান শেখাতে রাজি হয়। এবং এই কাজের জন্য সে কোনও বেতন নিত না।

ছোটমাসির এই কথার মধ্যে অন্য কোনও ইঙ্গিত থাকতে পারে। কারণ ছোটমাসির গান শেখা হয়নি।

বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দাদু উত্তর-বিহারের পাত্রপক্ষকে চিঠি লেখেন বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। তারপর বাবার সঙ্গে আমার মায়ের বিয়ে হয়ে যায়। তখন মায়ের বয়স পনেরো। মায়ের ষোলো বছর বয়সে আমার জন্ম। তফাতটা খুব বেশি না। আমার যখন পঞ্চাশ বছর বয়স, মায়ের তখন ছেষট্টি। ছোটমাসির চৌষট্টি। ছোটমাসি ঠাট্টা করে বলতেই পারে, ছোড়দি, ওই লোকটার কী যেন নাম ছিল? আমি সেখানে উপস্থিত। এই কলকাতা শহরের এক বাঙালি পল্লিতে।

মা বলেছিল, 'কোন লোকটার ?'

---'ওই যে, তোকে গান শেখাত পুরীতে?'

---'অতশত আমার মনে নেই'।

---'আমার মনে আছে' ছোটমাসি বলেছিল, 'ওর নাম ছিল তারক। রোগা চেহারা। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।'

---'আর কী মনে আছে তোর?'

মা স্পষ্টত অপ্রসন্ন।

কলকাতা শহরে আমার সামনেই এই সব সংলাপ আদান প্রদান হয়। আমার মেয়ের বয়স তখন সতেরো। সে অবশ্য উপস্থিত ছিল না, সে তার প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরছিল কোথাও। ছোঁড়াটা ওর সহপাঠী, আমি বাধা দিইনি।

ছোটমাসি বলে, 'ও ছিল আইবুড়ো।'

---'ভাগ্যিস'। মা একটু রেগে গিয়ে বলে, 'শোন খোকন, একটা নির্দোষ লোকের নামে কেচ্ছা রটাসনি। লোকটা টিবি থেকে সেরে উঠে স্বাস্থ্য ফেরাতে পুরীতে এসেছিল। বাবার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে আলাপ। বাবা বলে, আমার মেয়েদের একটু গান শেখান না, এখানে তেমন মাস্টার নেই। তো তিন-চার মাস---'

---আমাকে তো শেখায়নি। শুধু তোকেই শেখাত। বাবা বলত, আমার গলায় গান নেই, আমি যেন লেখাপড়া শিখি। দাদার কাছে আমি ইংরিজি পড়তাম। বাবার মনে মনে নিশ্চয়---

মা বলে, 'যাই থাক, ওই চোদ্দ বছর বয়সে আমার মনে কোনও পাপ ছিল না। গান-জানা লোক, আমায় কয়েকটা গান শিখিয়ে দিয়ে গেছে। ব্যস। তারপর তো আমার বিয়ে হয়ে গেল। ডাকু পেটে যখন, আবার এলাম। শুনলাম, সে চলে গেছে। তারপর বাবা মারা গেল।'

ডাকু আমার ডাক নাম। আগেই বলেছি, দুই বোনের কথোপকথনের সময় তখন আমার বয়স পঞ্চাশ, মায়ের ছেষট্টি, ছোটমাসির চৌষট্টি আর আমার মেয়ে ঝুমকির সতেরো। এখন আমার সাতষট্টি হল। দাদু, দিদিমারা কেউ বেঁচে নেই। বাবাও মারা গেছে। মা নেই, ছোটমাসি একাশি বছর বয়সে বাত নিয়ে টিম টিম করে জ্বলছে। তার দুই ছেলে, তিন মেয়ে। ছোটমাসি ইংরেজিতে নাম সই করতে পারে। মা পারত না। বাবা যতদিন বেঁচে ছিল, মায়ের চিঠিতে বাংলা বানান ঠিক করে দিয়েছে। ওই তারক যদি আমার বাবা হত, সে--ও দিত নিশ্চয়। আমি তো আমিই থাকতাম।

ছোটমাসি সেদিন প্রায় প্রতিহিংসাবশত বলেছিল,'তোমাকে গান শেখাতে আমার ভাল লাগে, লোকটা তোকে বলেনি?'

---'তাতে কী বোঝায়?' বলে হঠাৎ কেঁদে ফেলেছিল মা। হ্যাঁ, কেঁদে ফেলেছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল,'ইয়ার্কির একটা সীমা আছে।'

আমরা সেদিন উঠে এসেছিলাম। তারপর মা কিছুদিন ছোটমাসির বাড়ি যায়নি। আবার সব মিটমাট হয়ে গেছে। অনেক বছর ঘুরে গেছে তারপর। সধবা মাসিরা বিধবা হয়েছে।

বিধবা মাসিরা মারা গেছে একজন একজন করে। আমার মাসতুতো ভাইবোনেরা এবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সবাই তারা মুঠো মুঠো ক্যাপসুল খায় আর ঠাকুরঘরে বসে গুরুদেবের পুজো করে। তিনি হাত ধরে বৈতরণী পার করে দেবেন। ওই বিশ্বাস নিয়ে স্বস্তিতে আছে।

আজ সাতষট্টি বছরের জন্মদিনে ভাবছি একবার ছোটমাসির বাড়ি যাব। নিজের ডাকনামটা শুনে আসব। আর জেনে আসব, কে কোথায় আছে, কেমন আছে , কে আর নেই। আমার সঙ্গে কারুর যোগাযোগ নেই তেমন। ছোটমাসিই গেজেট।

না। তারক মাস্টারের কথা আমি তুলব না। ও প্রসঙ্গ চুকেবুকে গেছে। সেইদিনই, ছোটমাসির বাড়ি থেকে ফেরার পথে রিকশায় বসে মা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বল তো ডাকু, 'তোমাকে গান শেখাতে আমার ভাললাগে, এটা কি কোনও খারাপ কথা?'

আমি বলি, 'তুমি হঠাৎ কেঁদে ফেললে কেন?' ছোটমাসি ঠাট্টা করছিল।

—'ঠাট্টা না। হিংসে।' তারপর মা চুপ করে যায়। আমি, বাবার প্রতিনিধি, মায়ের কৈফিয়ত তো শুনলাম। অন্তত বুঝলাম, এই ঘটনার কথা মা কখনও বাবাকে বলেনি।

আমার শোবার ঘরে মা-বাবার জোড়া ফটো বাঁধানো আছে দেয়ালে। আমার শ্বশুর-শাশুড়ির ফটোও দেয়ালে ঝোলে। এরা সবাই এক জীবন করে পোকার মতো বেঁচে তারপর স্বাভাবিক ভাবে মারা গেছে। আর কিছুদিন পর ছোটমাসিও যাবে। মেসোমশায়ের ছবির পাশে জায়গা হবে তার। সেখানে দাদু আর দুই দিদিমার ছবি আছে। তারপর আমি যাব। পোকার মতোই। কিছু হাসি, কাশি আর ঘামের গন্ধ রেখে যাব। [illegible]পার বাড়ি থেকে কেচে আসবে।

কিছু তো থাকে না। আত্মা-ফাত্মা সব বুজরুকি । আমি বুঝে গেছি। শুধু দুটো একটা কথা, আলটপকা বলা কথা, যেমন, 'তোমাকে গান শেখাতে আমার ভাল লাগে', থেকে যায়।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৫৯/সংখ্যা : ১৪০৬]

যেখানে সীমান্ত নেই

প্রফুল্ল রায়

[*বর্তমানের অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়ের জন্ম ১৯৩৪ সালে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: পূর্ব পার্বতী, কেয়াপাতার নৌকো, সিন্ধুপারের পাখী, রামচরিত, ধর্মান্তর, ইত্যাদি। ভুয়ালকা ও বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত।*]

একান্ন বছর পর ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরা থেকে আলতাফ যখন ভয়ে ভয়ে আজিমাবাদ স্টেশনে নামল, শীতের সূর্য আকাশের ঢাল বেয়ে পশ্চিমদিকে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদে এখন বাসি হলুদের ম্যাড়মেড়ে রং। উল্টোপাল্টা উত্তুরে হাওয়া চারদিকে বেপরোয়া ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

পুরো নাম আলতাফ হোসেন। বয়স ষাট। মাঝারি উচ্চতা তার, রোগাটে গড়ন। চোখের তলায় কালির পোঁচ, হনদুটো গজালের মতো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে, তাই চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। চামড়া কুঁচকে খসখসে হয়ে গেছে। সারা শরীর জুড়ে ক্ষয়ের ছাপ। চুল এবং মুখ-ভর্তি দাড়ির বেশির ভাগটাই সাদা।

আলতাফের পরনে প্রচুর কুঁচি-দেওয়া ঢোলা পাজামা আর শেরওয়ানি। তার ওপর রোঁয়াওলা উলের পুরো-হাতা পুলওভার। উত্তর ভারতের দুর্জয় ঠাণ্ডা ঠেকাবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। তাই পুলওভারের ওপর মোটা পশমি চাদরও জড়িয়ে নিয়েছে। পায়ে ভারী চপ্পল।

আলতাফের ডান হাতে একটা চামড়ার ঢাউস স্যুটকেশ, আরেক হাতে হোল্ড-অল। হোল্ড-অলটার ভেতর রয়েছে তার বালিশ, তোষক, একজোড়া কম্বল এবং বেড-কভার ছাড়াও টুকিটাকি অজস্র জিনিস।

দেশভাগের দু'বছর বাদে যখন তার বয়স নয়, আলতাফেরা আজিমাবাদ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। উঠেছিল করাচি শহরে। পুরনো করাচির ঘিঞ্জি এলাকায় তারা থাকে। জায়গাটা ভারত থেকে চলে-যাওয়া উর্দুভাষী মুসলিম উদ্বাস্তুদের একটা কলোনি। ওখানে তাদের বলা হয় মোহাজির।

একান্ন বছর পর সে যে ইন্ডিয়ায় এল তার কারণ দুটো। এক, আজমীড় শরিফে যাওয়া। দুই, আজিমাবাদে এসে বড় বোন ফতিমার সঙ্গে দেখা করা। দেশভাগের পর তারা পাকিস্তানে চলে গেলেও ফতিমারা এখানেই থেকে গেছে। অনেকেই ওদের বুঝিয়েছিল, ইন্ডিয়ায় তাদের নিরাপত্তা নেই, ভবিষ্যৎও অন্ধকার। এই অবস্থায় প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে এখানে পড়ে থাকার মানে হয় না। কিন্তু ফতিমার শ্বশুর শেখ বদরুদ্দিন খান ভীষণ একবগ্গা ধরনের মানুষ। তার এক কথা, নিজের দেশ নিজের জন্মভূমি ছেড়ে পরিবার নিয়ে কোথাও যাবে না। এতে যা হবার হবে।

দেশভাগের আগে এবং কিছু পরেও আজিমাবাদে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে বেশ কয়েকবার বড় আকারের দাঙ্গা বেধেছিল। যার পরিণতি আগুন, রক্তপাত আর হত্যা। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। পরস্পরের প্রতি তখন শুধুই ঘৃণা, বিদ্বেষ আর সন্দেহ। মুসলমানদের মধ্যে যখন চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, তারা দলে দলে চলে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে, তখনও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারায়নি শেখ বদরুদ্দিন। তার ধারণা, সবাই অমানুষ হয়ে যায়নি।

আলতাফের মতো একজন সামান্য মানুষের পক্ষে মুখের কথা খসালেই পাকিস্তান থেকে ফুট করে ইন্ডিয়ায় চলে আসা সম্ভব নয়। দিনের পর দিন ছোটাছুটি করে, প্রচুর হয়রানি সয়ে যখন সে আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে সেই সময় পনেরো দিনের ভিসা পেয়ে গিয়েছিল। করাচি থেকে প্লেনে তাকে দিল্লি হয়ে ট্রেনে আজমীড় শরিফ যেতে হবে। সেখান থেকে আজিমাবাদে এসে ফতিমার সঙ্গে দেখা করে ফের দিল্লি গিয়ে প্লেনে করাচি। অর্থাৎ যে রুটে এসেছিল সেই রুটেই তাকে ফিরতে হবে।

দিন সাতেক আগে ইন্ডিয়ায় এসেছে আলতাফ। আসার সময় তাদের মহল্লার লোকজনেরা বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, ইন্ডিয়া মুসলমানদের, বিশেষ করে পাকিস্তানিদের পক্ষে নিরাপদ নয়। ইন্ডিয়ায় আসার পর ট্রেনে বাসে ট্যাক্সিতে এই সাতদিন প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আলতাফের একবারও মনে হয়নি, তার বিপদের কোনও কারণ আছে। এই বিশাল দেশ, লাখ লাখ মানুষ। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় নি। তবু যে ক'দিন এখানে আছে তাকে সতর্ক হয়েই চলাফেরা করতে হবে। করাচির পড়শিদের হুঁশিয়ারিটা সে ভুলে যায়নি।

ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়েছিল আলতাফ। দু'চোখে অসীম আগ্রহ নিয়ে চারদিকে তাকাল। সে একাই নয়, ট্রেনটা থেকে আরও অনেক প্যাসেঞ্জার নেমেছে। তা ছাড়া বেশ কিছু লোক নানা দিকে যাবার জন্য প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে। পুরো স্টেশন চত্বরটা এখন সবগরম।

করাচিতে চলে যাবার পর গোড়ার দিকে আজিমাবাদের জন্য ভীষণ মন খারাপ হয়ে থাকত আলতাফের। কয়েক বছর বাদে এখানকার কথা সেভাবে আর ভাবেনি সে। ইন্ডিয়া থেকে তাদের সঙ্গে হাজার হাজার মুসলিম ফ্যামিলি সীমান্তের ওপারে চলে গেছে। নতুন দেশ, নতুন নতুন বন্ধু, স্কুল, পড়াশোনা -- সব মিলিয়ে উত্তরপ্রদেশের এক প্রান্তে পড়ে থাকা নগণ্য আজিমাবাদ টাউন বহুদূরের আধ-চেনা কোনও সিতারার মতো অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শীতের এই বেলাশেষে পুরনো স্মৃতি একটু একটু করে যেন ফিরে আসছে।

আলতাফের মনে পড়ছে, স্টেশনের একতলা লাল বিল্ডিং আর সুরকি-বিছানো প্ল্যাটফর্মটা একান্ন বছর আগের মতোই রয়েছে। নতুন যা যোগ হয়েছে তা এইরকম। প্ল্যাটফর্মটা ছিল ন্যাড়া, এখন সেটার মাথায় জবরদস্ত টানা একটা শেড। চড়া রোদ এবং বৃষ্টির ছাট থেকে প্যাসেঞ্জারদের মাথা বাঁচানোর জন্য এই ব্যবস্থা। স্টেশনের টিকেট-কাউন্টারের গা ঘেঁষে একটা বড় চায়ের স্টল চোখে পড়ছে। সেখানে চা তো পাওয়া যায়ই, তা ছাড়া কাচের শো-কেসে রয়েছে কত রকমের মিঠাই-লাড্ডু, গুলাবজামুন, প্যাঁড়া, বড় দানার বুন্দিয়া। শো-কেসের মাথায় বড় বড় কাচের বয়েমে নানা ধরনের বিস্কুট, চানাচুর, গাঠিয়া। বয়েমগুলোর পাশে পাউরুটির স্তূপ। এই টি স্টলটা আগে ছিল না।

দেশভাগের সময় এখানে সিঙ্গল লাইন দিয়ে আপ এবং ডাউন ট্রেনগুলো যাতায়াত করত। এখন দেখা যাচ্ছে, আরও একজোড়া লাইন পাতা হয়েছে। ওধারের লাইনের পর শেডওলা নতুন একটা প্ল্যাটফর্মও করা হয়েছে।

একান্ন বছর আগে আজিমাবাদ ছিল খুব নগণ্য এক স্টেশন। সারাদিনে মাত্র দু'জোড়া আপ আর দু'জোড়া ডাউন ট্রেন জায়গাটাকে ছুঁয়ে যেত। ট্রেন আসার সময় এখানে যা একটু চাঞ্চল্য দেখা দিত। বাকি দিনটা গোটা স্টেশন চত্বর নিঝুম পড়ে থাকত। মনে হত, সব কিছু গভীর ঘুমের আরকে ডুবে আছে।

স্টেশনে দাঁড়িয়েই টের পাওয়া গেল, দেশভাগের পর এখানে প্রচুর মানুষ বেড়েছে, বেড়েছে তাদের ব্যস্ততা এবং নানা দিকে অবিরত ছোটাছুটি। করাচির কথা মনে পড়ল আলতাফের। দেশভাগের পর তারা যখন সেখানে যায়, কত আর মানুষ! আর এখন? একান্ন বছরে ওই শহরটার জন-বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। চারদিকে সারাক্ষণ থিকথিকে ভিড়। দুনিয়ার সব জায়গাতেই মানুষ ক্রমাগত পোকার মতো বেড়ে চলেছে। আজিমাবাদই বা বাদ থাকবে কেন?

স্মৃতির ভেতর থেকে নিজেকে একসময় টেনে তোলে আলতাফ। কয়েক পলক প্ল্যাটফর্মের প্যাসেঞ্জারদের লক্ষ করে। কিন্তু একটা চেনা মুখও নজরে পড়ছে না। হঠাৎ খেয়াল হল, করাচিতে যাবার সময় আজিমাবাদে যাদের দেখে গিয়েছিল তাদের চেহারা কি আর সেরকমই আছে যে দেখামাত্র চিনে ফেলবে? তা ছাড়া, সেই পরিচিত মানুষগুলোর কত জন বেঁচে আছে তা-ই বা কে জানে। থাকলেও তারা দল বেঁধে এই মুহূর্তে স্টেশনে চলে এসেছে, তা ভাবার কারণ নেই। তার নিজের কথাই যদি ধরা যায়, সেই বচপনের চেহারার সঙ্গে এখনকার চেহারার আদৌ কি কোনও মিল আছে? পবিচয় না দিলে আজিমাবাদের কেউ তাকেও চিনতে পারবে না।

আলতাফ আর দাঁড়িয়ে থাকে না। লোকজনের জটলার ভেতব দিয়ে পায়ে পায়ে গেটের দিকে এগিয়ে যায়।

দিন সাতেক আগে যখন সে ইন্ডিয়ায় আসে, দিল্লির এক ডাকঘর থেকে পোস্ট কার্ড কিনে আজিমাবাদে তার বড় বোন ফতিমাকে চিঠি লিখেছিল, খুব শিগগিরই এখানে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কিন্তু আজই সে আসতে পারবে, সে সম্বন্ধে নিজেই নিশ্চিত ছিল না। আজকের কথা জানিয়ে দিলে ফতিমা নিশ্চয়ই তার ছেলেদের কাউকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু পাঠালেও তাদের কি চিনতে পাবত আলতাফ? যখন তারা পাকিস্তানে যায়, ফতিমার বড় ছেলের বয়স সবে এক। এক বছরের সেই বাচ্চাটিকে এখন কেমন দেখতে হয়েছে, কে বলবে। যাই হোক, কেউ স্টেশনে তাকে নিতে না এলেও, উঁচা মহল্লায় ফতিমাদের বাড়ি খুঁজে বার করতে তার অসুবিধা হবে না। এখানে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য এক জাদুতে পুরনো আজিমাবাদের রাস্তাঘাট, নানা মহল্লা চোখেব সামনে ফুটে উঠছে।

গেটের মুখে কালো কোট পরা টিকেট কালেক্টর দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে টিকেট জমা দিয়ে কয়েক পা এগুলেই পাথরে-বাঁধানো সিঁড়ি। পায়েব ঘষায় ঘষায় খানিকটা করে ক্ষয়ে গেলেও সেগুলো দেশভাগের সময়কার মতোই রয়েছে। নামতে নামতে আলতাফের মনে পড়ল, সবসুদ্ধ পঁচিশটা ধাপ ছিল। গুণে গুণে দেখল, সংখ্যাটা একই আছে। স্মৃতি এক অদ্ভুত ব্যাপার, অদৃশ্য গোপন সিন্দুকে কত কিছু যে ধরে রাখে!

নীচে নামতেই তাজ্জব বনে গেল আলতাফ। চারপাশ একেবারে গম গম করছে। দেশভাগের সময় এখানে ছিল সুরকির সরু একটা রাস্তা, সেটার একধারে তেরপল কি ফুটোফাটা টিনের চালার তলায় তিন চারটে চা কি পানবিড়ির দোকান। আরেক ধারে ক'টা টাঙ্গা সওয়ারির আশায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু কোথায় সওয়ারি? টাঙ্গাওলারা এবং তাদের ঘোড়াগুলো প্রায় সারাদিন ঝিমাত। এই নির্জন এলাকার অন্তহীন, গভীর ঘুম এবং আলস্য তাদের ওপর ভর করে থাকত যেন।

কিন্তু এখন জায়গাটার চেহারা আগাগোড়া বদলে গেছে। পুরনো সুরকির রাস্তাটা দশগুণ চওড়া হয়েছে, তার ওপর কালো মসৃণ পিচ। দু'ধারে যতদূর চোখ যায়, লাইন দিয়ে দোকান। প্রতিটি দোকানদার রাস্তার চার পাঁচ ফুট করে জায়গা দখল করে তাদের মালপত্র সাজিয়ে রেখেছে। দোকানগুলোতে ভনভনে মাছির কাঁচের মতো খদ্দেরের ভিড়। পাকিস্তানের যে কোনও মফস্বল শহরে স্টেশনের গায়ে অবিকল এই দৃশ্য চোখে পড়ে। এ ব্যাপারে ইন্ডিয়া-পাকিস্তানে কোনও তফাত নেই।

আলতাফ লক্ষ করল, ডান পাশে ঝাঁকড়া-মাথা চার পাঁচটা পিপুল গাছের তলায় সারি দিয়ে টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে। দেশ-ভাগের সময় তিন চারটের বেশি দেখা যেত না। এখন টাঙ্গার সংখ্যা কম করে তার দশ গুণ।

টাঙ্গার সারি যেখানে, তার উল্টো দিকে ক'টা রেন-ট্রির তলায় অনেকগুলো অটো রিকশা চোখে পড়ল। এই যানগুলো কবে এসেছে, কে জানে। ইন্ডিয়া ছেড়ে আলতাফরা যখন চলে যায়, আজিমাবাদে অটো ছিল না।

ওল্ড করাচিতে ঝাঁকে ঝাঁকে অটো রিকশা চলে। কিন্তু অটোয় চড়া খুব একটা পছন্দ করে না আলতাফ। সে পিপুল গাছগুলোর তলায় টাঙ্গা স্ট্যান্ডে চলে এল। একটা টাঙ্গা ঠিক করে স্যুটকেস আর হোল্ড-অল নিয়ে উঠে বসতেই মাঝবয়সী টাঙ্গাওলা তার গাড়ি চালিয়ে দেয়।

মানুষের ভিড়, গৈয়া গাড়ি, অটো, টাঙ্গা, ভ্যান, ঠেলা গাড়ি ইত্যাদি মিলিয়ে রাস্তা জুড়ে জটপাকানো, দমবন্ধ-করা অবস্থা। আলতাফের টাঙ্গার চালক হাওয়ায় সাঁই সাঁই চাবুক হাঁকাতে হাঁকাতে গলার শির ছিঁড়ে সমানে চেঁচাতে থাকে, 'হট যাও, হট যাও --' শুধু সে-ই না, অন্য টাঙ্গাওলা, অটোওলা, ভ্যানওলারাও একইভাবে চিৎকার করতে করতে চলার মতো পথ করে নিচ্ছে।

স্টেশনের এলাকাটা পেরুতে মিনিট পনেরো কুড়ি লেগে যায়। তারপর রাস্তা অনেকটাই ফাঁকা।

শহরের নামেই এখানকার স্টেশনের নাম। আজিমাবাদ টাউন স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আলতাফের পরিষ্কার মনে পড়ে, সুরকির একটা রাস্তা শহরের সঙ্গে স্টেশনটাকে জুড়ে রেখেছিল। সেটা ধরেই এখন সে চলেছে। কিন্তু রাস্তাটা আর আগের মতো নেই, পিচ ঢেলে পাকা করে ফেলা হয়েছে। একান্ন বছর আগে এটার দু'ধারে ছিল ধু ধু কাঁকুরে মাঠ, সেখানে ঝোপঝাড় এবং আগাছার জঙ্গল। এখন জঙ্গল উধাও। দু'পাশেই অগুনতি বড় বড় বাড়ি, ফাঁকে ফাঁকে মন্দির।

সূর্য পশ্চিমদিকে উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর আড়ালে নেমে গেছে। ফিকে, মলিন যে লালচে আলোটুকু এখনও আকাশের গায়ে লেগে আছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে তাও থাকবে না।

ঝপ করে নেমে আসবে শীতের সন্ধে। তার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। বেলা ফুরোতে না ফুরোতেই চারদিকে মিহি হিম ঝরে চলেছে। উত্তুরে হাওয়ায় এখন ছুরির ধার, শরীরের খোলা জায়গাগুলোতে যেন কেটে কেটে বসে যাচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশের এই মফস্বল শহরে শীতের দিনটা কীভাবে ফুরিয়ে যাচ্ছে সেদিকে লক্ষ নেই আলতাফের। হঠাৎ সে টাঙ্গা-ওলাকে ডাকে, 'এ ভাইয়া --'

ধূসর কম্বলজড়ানো টাঙ্গাওলা ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'জি—'

আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'টাউনটা অনেক বদলে গেছে, না?'

'জি, হাঁ —'

হাত বাড়িয়ে রাস্তার দু'দিক দেখতে দেখতে আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'এক সময় ওখানে ফাঁকা জমিন ছিল।'

টাঙ্গাওলা লোকটা যথেষ্ট বিনয়ী। সওয়ারিকে ইজ্জৎ দিতে জানে। সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেয়, 'জি, হাঁ। এখন এই টৌনে দো অংলি (দু আঙুল) ফাঁকা জায়গা পাবেন না। স্রিফ মকান আউর মকান।' একটু থেমে বলে, 'আমার আঁখের সামনে টৌনটা কত বড় হয়ে গেল!' লোকটা খুব সম্ভব লেখাপড়া করেনি, টাউনকে বলে টৌন।

আলতাফ বলল, 'মানুষ বাড়লে টাউন তো বাড়বেই।'

'জি—'

যে-তেজি ঘোড়াটা টাঙ্গা টেনে নিয়ে চলেছে সেটার গলায় এক থোকা পেতলের ঘুন্টি বাঁধা। চলার তালে তালে সেগুলো থেকে মিঠে, সুরেলা আওয়াজ আসছে।

কাঠের পাটাতনের ওপর পুরু চটের শক্ত, ঠাণ্ডা সিটে বসে আলতাফের মনে হল, আদ্যিকালের এই যানটা তাকে একান্ন বছর আগের পূর্বজন্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাজ্জবের ব্যাপাব, যে ফতিমাকে দেখার জন্য সুদূর করাচি থেকে এতদূরে চলে এসেছে, তাকে সরিয়ে দিয়ে রামু, লছমন, বৈজু আর ধনুয়ার মুখ চোখের সামনে ফুটে উঠছে। আরও অনেকের কথাও মনে পড়ছে যাদের নাম সে ভুলে গেছে। এরা সবাই ছিল তার বন্ধু, খেলার সাথী, আজিমাবাদ প্রাইমারি স্কুলে তারা একই ক্লাসে পড়ত।

ধনুয়ার কথা ভাবতেই হঠাৎ মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে আলতাফের। যতদূর মনে আছে, ওর বাবা লাজপত সিং এবং তার সঙ্গীরা দেশভাগের আগে আগে আজিমাবাদে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছিল। ছেলের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আলতাফেরা রেহাই পায় নি, তাদের মকানেও ওরা আগুন লাগিয়েছিল। লাজপত সিং বেঁচে আছে কি না, কে জানে। থাকলে পাকিস্তান থেকে আজিমাবাদে তাব আচমকা চলে আসাটা কীভাবে নেবে, কে জানে। ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে আলতাফ।

এতকাল পর জন্মভূমিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক থেকে উল্টোপাল্টা নানা ভাবনা তার মস্তিষ্কে হানা দিতে থাকে। একটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই আরেকটা এসে হাজির হয়। লাজপত সিংয়ের চিন্তাটা বেশিক্ষণ তাকে উদ্বেগের মধ্যে রাখে না। হঠাৎই দুই টাঙ্গাওলা ফকিরা আর হানিফের কথা মনে পড়ে যায়। ফকিরা ছিল বেজায় ভালমানুষ। সওয়ারি না পেলে মাঝে মাঝে আলতাফ এবং তার বন্ধুদের টাঙ্গায় তুলে আজিমাবাদের রাস্তায় রাস্তায় এক চক্কর ঘুরিয়ে আনত। কিন্তু ফকিরা ছিল দারুণ রগচটা আর খিটখিটে। তার মাথায় সারাক্ষণ

খুন চড়ে থাকত যেন। নিজের টাঙ্গার ধারেকাছে আলতাফদের ঘেঁষতে দিত না। সামনে গেলে তোড়ে গালাগাল দিত। কিন্তু আলতাফ এবং তার বন্ধুরা ছিল নাছোড়বান্দা। ফকিরা সামনের দিকে তাকিয়ে হয়ত গাড়ি চালাচ্ছে, ওরা নিঃশব্দে টাঙ্গার পেছন দিকের পাটাতন ধরে ঝুলতে ঝুলতে যেত। কিন্তু ফকিরার ছিল দশ জোড়া চোখ। মুখ না ফিরিয়েও সব কিছু টের পেয়ে যেত সে। টাঙ্গা চালাতে চালাতে পেছন দিকে সে সমানে চাবুক হাঁকাত।

আলতাফ ডাকে, 'ভাইয়া---'

টাঙ্গাওলা তক্ষুনি সাড়া দেয়, 'জি--'

'ফকিরা আর হানিফকে চেন? বেঁচে থাকলে তাদের উমর এখন অনেক।'

'তারা কারা?'

'বহুৎ সাল আগে এই টাউনে টাঙ্গা চালাত।'

টাঙ্গাওলা কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়। বলে, 'হাঁ হাঁ, ইয়াদ হ্যায়। পুরানা টৌলিতে হানিফ চাচা আর ফকিরা চাচা থাকে। লেকেন দশ বার সাল আগে দু'জনেই মারা গেছে।'

ছেলেবেলার পরিচিত দুটি মানুষের মৃত্যুসংবাদে মনটা খারাপ হয়ে যায় আলতাফের। তারা যখন পাকিস্তানে চলে গেল, হানিফ আর ফকিরা, দু'জনেরই বয়স ছিল চল্লিশের নীচে। দশ বারো বছর আগে তাদের মৃত্যু হলে কম করে ওরা চুয়াত্তর পঁচাত্তর বছর বেঁচে ছিল। আয়ুটা খুব কম নয়। বেশির ভাগ মানুষই এতদিন বাঁচে না। তবু সেই আমলের দুই টাঙ্গাওলার জন্য বুকের ভেতবটা ভারী হয়ে ওঠে।

আজিমাবাদ শহরটার মাঝখান দিয়ে ছোট একটা নদী বয়ে গেছে। নাম মোতিয়া। সেখানে এসে অবাক হয়ে যায় আলতাফ। তার ছেলেবেলায় নদীব ওপর একটা মজবুত কাঠের পুল ছিল। সেটা শহরের দুই অংশকে জুড়ে বেখেছিল। মানুষজন, টাঙ্গা, সাইকেলরিকশা, গৈয়া কি ভৈসা গাড়ি, সামান্য দু-চারটে মোটব ওটা দিয়েই এপার ওপার কবত। কিন্তু সেই পুরনো পুলটার এক টুকরো কাঠও এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই জায়গায় উঠেছে কংক্রিটের তিনগুণ চওড়া পুল। সেটার দু'ধারে ফুটপাত এবং সাবি সাবি ল্যাম্প পোস্ট।

পুল পেরুতে পেরুতে আলতাফ বলে, 'আচ্ছা ভাই, পুরনো পুল ভেঙে এখানে ব্রিজ কবে বানানো হয়েছে?'

টাঙ্গাওলা বলে, 'কবীব তিশ পয়তিশ সাল।'

আলতাফ আর কোনও প্রশ্ন করে না। অসীম আগ্রহে পুলটা দেখতে থাকে। আজিমাবাদ শহরে তার ছেলেবেলার অনেক কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

টাঙ্গাওলা ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'এক বাত পুছুঙ্গা?'

সামান্য চমকে উঠে আলতাফ বলে, 'হাঁ হাঁ, পুছো না -'

'আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, বহুৎ সাল বাদ আপনি এই টৌনে এলেন?'

'হাঁ।'

'আপনি কি এখানে থাকতেন?'

'হাঁ।'

'এখন কোথায় থাকেন?'

টাঙ্গাওলার কৌতূহলটা খুবই নিরীহ ধরনের। যে-প্রশ্নটা সে করেছে তার ভেতর সন্দেহজনক কিছু নেই। তবু চকিত হয়ে ওঠে আলতাফ। করাচি থেকে আসার সময় পড়শিরা বার বার তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। সে যে পাকিস্তানি, এটা পারতপক্ষে কাউকে যেন না জানায়।

আলতাফ মুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ন' বছর বয়স পর্যন্ত সে ইন্ডিয়ায় ছিল। তার মধ্যে একবার আগ্রা এবং দিল্লি যাওয়া ছাড়া আজিমাবাদের বাইরে কখনও পা ফেলেনি। করাচিতে যাবার পর এ দেশের সঙ্গে যে সম্পর্কটুকু ছিল, চিরকালের মতো তা ছিন্ন হয়ে যায়। এখানকার কিছুই সে প্রায় জানে না। কয়েকটা বড় বড় শহরের নাম অবশ্য শুনেছে। দিল্লিতে তো ছেলেবেলায় গিয়েছিলই, এবার পাকিস্তান থেকে আসার সময় সেখানে নেমেছেও। দিল্লি বাদ দিলে কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, কটক, বাঙ্গালোর ইত্যাদি নামগুলোও তার জানা। প্রায় মরিয়া হয়েই আলতাফ বলে, 'কলকাত্তায় থাকি।' টাঙ্গাওলা যাতে কোনওরকম সন্দেহ না করে, সে জন্য প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছে।

টাঙ্গাওলা বলে, 'কলকাত্তা তো খুব বেশি দূরে নয়। তবু এত সাল বাদে এলেন!' গলা শুনে বোঝা যায়, সে বেশ একটু অবাকই হয়েছে।

হঠাৎ আলতাফের মনে হল, লোকটা খুব গায়ে-পড়া। যেভাবে ভকিলদের মতো জেরা শুরু করেছে তাতে অসাবধানে ওর কোন প্রশ্নের কী জবাব দেবে, এবং তার ফলে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে, কে জানে। লোকটাকে এখনই থামিয়ে দেওয়া দরকার। নিস্পৃহ সুরে আলতাফ বলল, 'কামকাজ নিয়ে এত ঝামেলায় থাকতে হয়, তাই ---' শেষ না করেই সে থেমে যায়।

টাঙ্গাওলা এবার আন্তরিক গলায় জিজ্ঞেস করে, 'এখানে আপনার কে কে আছে -- পিতাজি, মাতাজি, কোই রিস্তেদার?'

মা, বাবা বা অন্য কোনও আত্মীয়স্বজন আজিমবাদে থাকে কি না সেটাই টাঙ্গাওলার জিজ্ঞাস্য। সঠিক জবাব দিতে হলে অনেক কথা এসে পড়বে যা আলতাফের পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। সে অস্পষ্টভাবে, নিচু গলায় কিছু একটা বলে যা প্রায় বোঝাই যায় না।

টাঙ্গাওলা আন্দাজ করে নেয়, তার এই প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া যাবে না। সে আর কিছু বলে না।

পুল পেরিয়ে ওপারে চলে আসে টাঙ্গাটা। নদীর এপারে রাস্তার দু'ধারে আজিমাবাদের সবচেয়ে বনেদি এলাকা। বিশাল বিশাল কমপাউন্ডের ভেতর পুরনো আমলের প্রকাণ্ডপ্রকাণ্ড হাভেলি, যেগুলোর সামনের দিকে ফুলের বাগান, লন, নুড়ির রাস্তা। পঞ্চাশ বছর আগে প্রতিটি বাড়িতেই ছিল তেল চুকচুকে, স্বাস্থ্যবান ঘোড়ায় টানা ফিটন। কচিৎ কোনও হাভেলিতে মোটর চোখে পড়ত।

একমাত্র জানকীনাথজি ছাড়া এই সব বাড়ি কাদের ছিল, এতকাল পর আর মনে পড়ে না। জানকীনাথজির নাম ভুলে না যাবার কারণ, দেশভাগের দু'বছর আগে তাঁর হাভেলিতে ডিস্ট্রিক্ট টাউন থেকে ইংরেজ ডি.এম এসেছিলেন। আব্বাজানের কাছে আলতাফ শুনেছে, গোরা সাহেব নাকি ছিলেন মস্ত অফিসার। এত বড় অফিসার নাকি আগে আর কখনও আজিমাবাদে

আসেননি।

শান্ত, নগণ্য, ম্যাড়মেড়ে টাউনটায় একেবারে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সে যে কী চাঞ্চল্য, বলে বোঝানো যাবে না।

জানকীনাথজি স্বয়ং দামি কোট প্যান্ট পরে, মাথায় পাঁচ গজি কাপড়ের পাগড়ি বেঁধে, আজিমাবাদের মান্যগণ্য লোকেদের নিয়ে সোজা স্টেশনে চলে গিয়েছিলেন। শুধু তাই না, এই শহরের ধুলো যাতে ডি.এমের জুতোয় না লাগে সেজন্য পুরো প্ল্যাটফর্ম এবং নীচের রাস্তায় নামার সিঁড়িগুলো পর্যন্ত জুটের তৈরি লাল কার্পেট দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন। এমন একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে আজিমাবাদের মানুষজনের স্মৃতিতে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য ইলাহাবাদ থেকে চারটে ব্যান্ড পার্টি আনিয়েছিলেন জানকীনাথজি। আববাজান আরও জানিয়েছিল, ব্যান্ড পার্টিই না, ডি.এমের খানাপিনার জন্য ইলাহাবাদের নাম-করা হোটেল থেকে বাবুর্চিও আনা হয়েছে।

মনে পড়ে, ছ'টা ঘোড়ায় টানা একটা হুড-খোলা গাড়িতে করে ডি.এম-কে নিজের হাভেলিতে নিয়ে গিয়েছিলেন জানকীনাথজি। জমকালো উর্দি-পরা এক বেয়ারা গাড়ির পেছন দিকের স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ ডি.এমের মাথার ওপর রঙিন সিল্কের ছত্রি ধরে রেখেছিল।

দৃশ্যটা এখনও মনে আছে আলতাফের। কেননা, সে আমলে কোনও ছোট শহরে ইংরেজ ডি.এমের আগমন একটা বিরাট ঘটনা। আজিমাবাদের লোকজন তাঁকে চোখে দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আলতাফের আববুও তাকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিল।

প্রথমে ছিল দুটো ব্যান্ড পার্টি। তারপর গাইড হিসাবে জানকীনাথজির ফিটন, মাঝখানে ডি.এমের গাড়ি, তার পেছনে আজিমাবাদের বিশিষ্ট নাগরিকেরা। এই জমকালো শোভাযাত্রার একেবারে ল্যাজের দিকে বাকি দুটো ব্যান্ড পার্টি।

সেই যে ডি.এম এসেছিলেন তার তিন মাসের মধ্যে রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছেন জানকীনাথজি। এক দিন রাত্তিরে বাড়ি ফিরে বেশ গর্বের সুরে, উত্তেজিত ভঙ্গিতে খবরটা দিয়েছিল আববু। আজিমাবাদে এর আগে আর কেউ নাকি রায়বাহাদুর হননি। এই খেতাবটার ওজন কতটা, কতখানি ইজ্জৎ এর সঙ্গে জড়িত, ছেলেবেলায় বুঝতে পারেনি আলতাফ। তবে মনে হয়েছিল, এটা বিরাট ব্যাপার।

জানকীনাথজি কি এখনও বেঁচে আছেন? টাঙ্গাওলাকে প্রশ্নটা করতে গিয়েও থেমে গেল আলতাফ। কেননা এ নিয়ে কৌতূহল দেখালে পাল্টা অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, যা তার পক্ষে অস্বস্তিকর।

বনেদি এলাকাটা মোটামুটি আগের মতোই আছে। তবে তার জেল্লা বহুগুণ বেড়ে গেছে।

কখন সন্ধে নেমে গিয়েছিল, খেয়াল করেনি আলতাফ। দু'ধারের বাড়িগুলোতে এবং রাস্তার সারি সারি ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলে উঠেছে। হিম আরও ঘন হতে শুরু করেছে।

এক সময় আজিমাবাদের উত্তর দিকের শেষ মাথায় উঁচা মহল্লায় পৌঁছে গেল আলতাফরা। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই এলাকা। এটার একদিকে মুসলমানদের বসতি, আরেক দিকে থাকত হিন্দুরা।

মহল্লাটা পঞ্চাশ বছর আগের মতোই রয়ে গেছে। তাই চিনতে অসুবিধা হল না। সুটকেস আর হোল্ডঅল নিয়ে টাঙ্গা থেকে নেমে পড়ল আলতাফ। টাঙ্গাওলাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে

চারদিক ভাল করে লক্ষ করতে লাগল।

পুরো এলাকাটা জুড়েই ছিরিছাঁদহীন বাড়ির জটলা। হিন্দুদের টোলাটার তুলনায় মুসলমানদের টোলাটা অনেক বেশি ম্যাড়মেড়ে।

এই শীতের সন্ধ্যাতেও রাস্তায় বেশ লোকজন রয়েছে। আলতাফের মনে আছে, ফতিমার শ্বশুরবাড়িটা খুব কাছাকাছিই। বড় রাস্তা থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলে সেখানে পৌঁছনো যায়। এই মহল্লাতেই, আরও অনেকটা ভেতর দিকে ছিল তাঁদেরও বাড়ি।

অনেকগুলো সরু সরু গলি মুসলিমদের টোলাটায় ঢুকে গেছে। কোনটা দিয়ে ঢুকলে ফতিমাদের বাড়িতে যাওয়া যাবে, এতকাল বাদে চট করে খেয়াল করতে পারল না আলতাফ। তার জিজাজি অর্থাৎ ফতিমার স্বামীর নাম ছিল জিয়াউল খান। তার নাম বললে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ওদের বাড়িটা দেখিয়ে দেবে। রাস্তার একটা লোককে ডাকতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই বাঁ ধারের গলিটা থেকে দু'জন বেরিয়ে এল। একজন তারই বয়সী। ভারী চেহারা, মাঝারি ধরনের লম্বা, মোটা গোঁফ, পরনে ধুতি আর ফুলসার্টের ওপর গরম চাদর, মাথায় কম্ফোর্টার জড়ানো। বোঝা যায় লোকটা হিন্দু। তার সঙ্গীর বয়স চৌত্রিশ -পঁয়ত্রিশ। পাতলা রোগা চেহারা, লম্বাটে মুখ, বড় বড় চোখ, চোখা নাক, সযত্নে ছাঁটা দাড়ি। পরনে পাজামা আর লম্বা ঝুলের কুর্তার ওপর মোটা উলের সোয়েটার, মাথায় গোল টুপি। আন্দাজ করা যায়, সে মুসলমান।

লোক দুটো সোজা আলতাফের সামনে চলে আসে। বয়স্ক ভারী লোকটি অর্থাৎ যে হিন্দু একদৃষ্টে তার দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'আপ কিয়া আলতাফ হোসেন হ্যায়?'

আলতাফ অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বলে, 'জি, হাঁ। লেকেন আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।'

লোকটা আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে, 'উল্লু, পাঠ্‌ঠে, আমি ধন্নো রে -- ধনুয়া --'

ছেলেবেলায় রোগা দুবলা চেহারা ছিল ধনুয়ার। সে যে একান্ন বছরে শরীরে এত বিপুল পরিমাণে মাংস আর চর্বি জমিয়ে ফেলেছে, কে ভাবতে পেরেছিল। সেদিনের সেই বালকটির সঙ্গে আজকের মধ্য বয়স পেরিয়ে যাওয়া ধনুয়ার বিন্দুমাত্র মিল নেই। তবে একটা ব্যাপার সেদিনের মতোই আছে। আনন্দ বা দুঃখের প্রকাশটা তার তীব্র। চিৎকার করে ছাড়া কথা বলতে পারে না। সমস্ত কিছু ধনুয়ার চড়া তারে বাঁধা।

অল্প বয়সের বন্ধুর সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে, ভাবতে পারেনি আলতাফ। ধনুয়ার আন্তরিকতাটুকু তার খুব ভাল লাগে। সে যেন এক লহমায় তাকে তার বচপনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আলতাফ দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'কত সাল বাদে তোর সঙ্গে দেখা হল ধন্নো!'

'হাঁ। বহুৎ সাল।' ধনুয়া, অর্থাৎ ধনপত বলে, 'কত উমর হয়ে গেল! এই জিন্দেগিতে ফের যে তোকে দেখতে পাব, কে জানত!'

একটু চুপ।

তারপর ধনপত পাশের যুবকটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'একে জরুর চিনতে পারিসনি। ও হল লতিফ, ফতিমা বহিনের ছোট বেটা, তোর ছোট ভাঞ্জা --'

দেশভাগের পর আলতাফরা যখন পাকিস্তানে চলে যায়, লতিফের জন্ম হয়নি। জীবনের লম্বা বাজি যখন শেষ হতে চলেছে, হঠাৎ ইন্ডিয়ায় না এলে বোনের এই ছেলেটার সঙ্গে তার পরিচয়ই হত না।

লতিফ ঝুঁকে মামার পা ছুঁতে যাচ্ছিল, তাকে তুলে বুকের ভেতর টেনে নেয় আলতাফ। বলে, 'বেটা, তোমার উমর শও সাল হোক।'

কিছুক্ষণ পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লতিফ আলতাফের সুটকেসটা তুলে নেয়, আর ধনপত নেয় তার হোল্ড-অলটা। আলতাফ আপত্তি করতে যাচ্ছিল, ধনপত ধমকে ওঠে, 'উল্লু, তুই হলি ইন্ডিয়ার মেহমান। থোড়া কুছ খাতিরদারি তো করতে দে। চল —'

সামনের গলিটায় তারা ঢুকে পড়ে। আগে আগে চলেছে লতিফ। পেছনে পাশাপাশি হাঁটছে আলতাফ আর ধনপত।

ধনপত বলে, 'ফতিমা বহিনকে যে চিঠিটি লিখেছিলি সেটা পাওয়ার পর রোজ লতিফ আর আমি স্টেশনে দু'তিন বার করে যাচ্ছি। লেকেন ইলাহাবাদ থেকে দিনে সাত আটটা ট্রেন এখানে আসে। কোন ট্রেনে আসবি বুঝতে পারছিলাম না। এখনও দু'জনে যাচ্ছিলাম, চোখে পড়ল তুই টাঙ্গা থেকে নামছিস। কবে আসবি চিঠ্‌ঠিতে লিখে জানাবি তো —'

আলতাফ বলল, 'আজমীড় শরিফে ক'রোজ লাগবে, বুঝতে পারছিলাম না। ওখান থেকে কোন তারিখে আজিমাবাদে আসতে পাবব, কী করে জানাই?'

আস্তে মাথা নাড়ে ধনপত, 'ঠিক বাত।'

আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'তোর মতো আমার চেহারাও বিলকুল বদলে গেছে। এত সাল বাদ চিনলি কী করে?'

'চিনিনি তো। স্রিফ আন্দাজ করেছিলাম।' ধনপত তোড়ে বলে যায়, আজিমাবাদের সব মানুষই তার চেনা। যে কোনও দিন যে কোনও সময় আলতাফের এসে পড়ার সম্ভাবনা। টাঙ্গা থেকে বয়স্ক একটি লোককে নামতে দেখে ধনপতের মনে হয়েছিল তার আলতাফ হোসেন হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা আশি ভাগ।

আলতাফ সামান্য হাসল।

ধনপত এবার বলে, ' তোর খবর বল। পাকিস্তানে কী কামকাজ করছিস? ছেলেমেয়ে ক'টা? তোর বিবি —'

বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে আলতাফ বলে, 'আমার কথা পরে শুনিস। আগে তোর কথা বল —'

শুধু নিজের কথাই না, তড়বড় করে দু'মিনিটের ভেতর আজিমাবাদ টাউনের নানা তথ্য জানিয়ে দেয় ধনপত। আলতাফরা চলে যাবার পর খুব বেশি পড়াশোনা এগোয়নি তার। এইট ক্লাসে দু'বার ফেল করে স্কুল ছেড়ে দেয় সে। ক'টা বছর বেকার আড্ডা দিয়ে, এখানে সেখানে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াবার পর পিতাজির দাবড়ানিতে এটা সেটা করে শেষ পর্যন্ত মোটর মেকানিকের কাজ শিখে একটা গ্যারাজ খুলেছে। রোজগার ভালই। তার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে বি.এ পাশ করে সরকারি নৌকরি করে। থাকে লখনউতে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তার শ্বশুরবাড়ি ইলাহাবাদে। সংসারে বড় রকমের সমস্যা নেই। তবে স্ত্রী এবং পিতাজির স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। দু'জনেই কোনও না কোনও রোগে ভুগছে।

বহুকাল পর ছেলেবেলার বন্ধুকে দেখে, তার সহৃদয় ব্যবহারে আলতাফ এতটাই অভিভূত যে ধনপতের পিতাজি যে রাজপুত ক্ষত্রিয় লাজপত সিং এবং সেই লোকটা স্বাধীনতার আগে আগে দাঙ্গার সময় তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, সেটা খেয়াল থাকে না। তারা যে পাকিস্তানে চলে গেছে তার একটা বড় কারণ লাজপতের মতো আজিমাবাদের বেশ কিছু মানুষ। মুসলমানদের প্রতি তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্রোধ। দাঙ্গার সময় যে হিংস্র, মারাত্মক চেহারা তাদের দেখা গিয়েছিল, সেটা তার স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। সেদিন মনে হয়েছিল ওরা তাদের ছিঁড়ে খাবে। খোদা মেহেরবান, তাই কোনও রকমে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু করাচিতে যাবার পরও বহুদিন আতঙ্ক কাটেনি।

লাজপত সিং যে এখনও বেঁচে আছে, এই খবরটা আলতাফকে চকিত করে তোলে। অদ্ভুত চাপা ভয় তার বুকে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

ধনপত তার দিকে তাকাচ্ছে না। একটানা বলে যাচ্ছে। সে আমলের মান্যগণ্য লোকেদের মধ্যে কেউ আর বেঁচে নেই। রায়বাহাদুর জানকীনাথজি, বড় কারবারি মহাবীরপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, সরকারি ভকিল বাবুরাম গুপ্তা, এ রকম সবারই মৃত্যু হয়েছে। আলতাফের বচপনের ঘনিষ্ঠ দোস্তরা সবাই জীবিত। রামু ঠিকাদারি করে এখন ক্রোড়পতি। লখনউতে বিরাট হাভেলি বানিয়ে সেখানেই থাকে। এক সাল দু'সাল বাদে আজিমাবাদে এসে হয়ত এক আধ সপ্তাহ কাটিয়ে যায়। লছমন বি.এসসি পাশ করে একটা নাম-করা ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গেছে। বৈজু অবশ্য আজিমাবাদেই আছে। মোতিয়া নদীর ধারে ওদের ধান চাল গেঁহু তিল তিসি সর্ষের অনেকগুলো আড়ত। আড়তদারি বৈজুদের পারিবারিক ব্যবসা, সেটাই এখন দেখাশোনা করে সে।

ধনপত আরও জানায়, জমানা একেবারে বদলে গেছে। সেই দাঙ্গার সময়টা ছাড়া আজিমাবাদে বহুদিন কোনও হাঙ্গামা হয়নি। শহরটা ছিল খুবই শান্ত, উত্তেজনাহীন। জীবনের স্রোত এখানে ঢিমে তালে বয়ে যেত। কিন্তু ক'বছর ধরে খুনখারাপি, রাহাজানি, ব্যাঙ্কডাকাতি অনেক বেড়ে গেছে। এর জন্য অনেকটাই দায়ী স্বাধীনতার পরবর্তী কালের রাজনৈতিক নেতারা। তারা গুন্ডা বন্দুকবাজ খুনিদের আশ্রয়দাতা। ক্ষমতা দখলের জন্য এদের কাজে লাগায়। ভোটের সময় এই সব হারামজাদাদের দিয়ে জালি ভোট দেওয়ায়, পিস্তল দেখিয়ে বোমা ফাটিয়ে আসল ভোটারদের বুথে ঘেঁষতে দেয় না। যারা তাদের এম.এল.এ বা এম.পি. বানাবে তারা মার্ডার করুক, ডাকাতি করুক, লিডাররা একটা অংলি তুলবে না। পুলিশ যদি তাদের পোষা খুনি বা গুন্ডাদের ধরে, থানায় ফোন করে তক্ষুনি ছাড়িয়ে আনবে। লিডাররা এদের হাতে যা খুশি করার লাইসেন্স তুলে দিয়েছে।

ধনপতের একটানা বকবকানির মধ্যে একসময় ফতিমার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে যায় আলতাফরা।

পুরনো ধাঁচের দোতলা বাড়ি। সদর দরজা পেরিয়ে শান-বাঁধানো চবুতর। একধারে গোসলখানা, রসুইঘর। চবুতরটার তিন দিক ঘিরে একতলা এবং দোতলায় অনেকগুলো ঘর।

আলতাফের স্মৃতিতে বাড়িটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। এখন সব মনে পড়ে গেল। ফতিমার শাদির আগে আগে তার শ্বশুর এটা তৈরি করিয়েছিল। বাড়িটার রং ছিল গোলাপি, দরজা জানালা সবুজ। নতুন বাড়ির চেহারায় একটা ঝকঝকে ভাব থাকে। বড়ি বহিনের শাদির পর মাঝে মাঝে যখন সে এখানে আসত, কী ভাল যে লাগত! কিন্তু সাবেক সেই বাড়িটা ঠিকঠাক

আগের মতো নেই। দেওয়ালের নানা জায়গায় পলেস্তারা খসে নোনা-লাগা ইট বেরিয়ে পড়েছে, ছাদের কার্নিস ভাঙা, সেখানে বটের চারা মাথা তুলে আছে। সামনের চবুতরটায় কত যে গর্ত! অনেকদিন বাড়িটা সারানো হয়নি। ওটার আয়ু বেশিদিন নেই। বড় জোর আর দশ বার বছর।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলছিল। চবুতর পেরিয়ে ওরা মূল বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

চারদিক আশ্চর্য রকমের নিঝুম। আগে এ বাড়িতে কত যে মানুষ ছিল! সারাক্ষণ হইচই, বাচ্চাদের হুটোপাটি। একতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত গম গম করত।

এখন তারা তিনজন ছাড়া অন্য কেউ নেই। রসুইঘর থেকে ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ আসছে। রান্নাটান্না চলছে সেখানে।

ভেতরে বেশ চওড়া একটা প্যাসেজ। সেটার বাঁ দিকে পর পর তিনটে ঘর। ডান পাশে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সেগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে এবড়ো খেবড়ো হয়ে গেছে। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে লতিফের পিছু পিছু ওপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে আলতাফের। কতকাল বাদে ফতিমার সঙ্গে তার দেখা হতে চলেছে! সেই ন'বছর বয়সে পাকিস্তানে চলে যাবার আগে শেষ এ বাড়িতে এসেছিল। তাবপর এই। মাঝখানে লম্বা একান্ন বছর।

লতিফ তাকে এবং ধনপতকে একটা বিশাল ঘরে নিয়ে এল। আলতাফ জানে এটা ছিল ফতিমা এবং তার স্বামী শেখ জিয়াউলের শোবার ঘর।

দু'ধারের দেওয়ালে দুটো চড়া পাওয়ারের আলো জ্বলছিল। আলতাফের যতদূর মনে আছে, ঘরেব সাজসজ্জায় বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। আগের মতোই দেওয়াল ঘেঁষে তিন চারটে ভারী আলমারি, সেকেলে ডিজাইনের ড্রেসিং টেবল, কয়েকটা কুশন, দুটো চেয়ার ইত্যাদি। ঠিক মাঝখানে কারুকাজ-করা প্রকাণ্ড খাট, সেটার পাশে ছোট ছোট তিন চারটে নিচু সাইড টেবল। একটু দূরে একটা উঁচু স্ট্যান্ডে টিভি।

আসবাবগুলো কালচে, ম্যাড়মেড়ে। পুরু হয়ে সেগুলোর ওপর ময়লা জমেছে। বোঝা যায়, বহুকাল পালিশ টালিশ করানো হয়নি।

খাটেব মাঝখানে একফুট পুরু গদির ওপর আধময়লা বিছানায়, কম্বল গায়ে শুয়ে আছে একজন বয়স্কা মহিলা। ভাঙা-চোরা শীর্ণ মুখ, ধবধবে সাদা চুল, চওড়া কপাল, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। তিনজনকে দেখে পাশ ফিরে হাতড়ে হাতড়ে বালিশের পাশ থেকে চশমা খুঁজে নিয়ে চোখে লাগাতে লাগাতে ক্ষীণ গলায় বলে, 'ধন্নো আর লতি এসেছিস!' বোঝা যায় লতিফের ডাকনাম লতি।

লতিফ বলে, 'হাঁ আম্মি।'

চশমা পরা হয়ে গিয়েছিল। মহিলা, অর্থাৎ ফতিমা জিজ্ঞেস করে, 'তোদের সঙ্গে আরেক জনকে দেখছি। কে?'

ধনপত সামান্য মজার গলায় বলে, 'বড়ি বহিন, তুমিই বল তো কে? চিনতে পারছ?'

ফতিমা হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসে। তার নজর আলতাফের মুখের ওপব কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে। একাগ্রভাবে কী যেন খোঁজে সে তারপর শ্বাসটানা গলায় বলে, 'ও কি মুন্না? তার তো পাকিস্তান থেকে আসার কথা আছে।'

কত বছর বাদে নিজের ডাকনামটা শুনল আলতাফ! মা-বাবার মৃত্যুর পর এই নাম আর কারও মুখে শোনেনি। না শুনে শুনে ওটা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু ফতিমা ঠিক মনে করে রেখেছে।

আলতাফ একদৃষ্টে ফতিমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এ কাকে দেখছে সে। ইন্ডিয়া থেকে চলে যাবার সময় তাদের মালপত্রের মধ্যে একটা অ্যালবামও ছিল। সেটাতে আটকানো ছিল ফতিমার শাদির সময়কার কিছু ফোটো। তার এই বোনটিকে স্বপ্নের পরমাশ্চর্য কোনও ছবি বলে মনে হত। আর সামনের এই বৃদ্ধ, শয্যাশায়ী, রুগ্‌ণ মহিলাটি যেন ধ্বংসস্তূপ।

একই মা-বাবার খুন তাদের দু'জনের ধমনীতে বয়ে চলেছে, কিন্তু কত অচেনা এই মহিলা। তাদের একজন পাকিস্তানি, আরেকজন ইন্ডিয়ান। তাদের মাঝখানে একান্ন বছরের ব্যবধানই শুধু নয়, রয়েছে সীমান্তের দুর্ভেদ্য দিওয়ার।

জরাজীর্ণ মহিলাটিকে দেখতে দেখতে মনে হল হঠাৎ তীব্র আবেগে কলিজা উথালপাথাল হয়ে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ডের অতল স্তর থেকে কান্নার মতো কিছু উঠে এসে গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাস আটকে আটকে আসছে। বুঝিবা কোনও অলৌকিক প্রক্রিয়ায় সে দেশকালের দূরত্ব পেরিয়ে আরও একবার তার ছেলেবেলায় ফিরে গেল।

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল আলতাফ, প্রথমটা পারল না। গলা বুজে গেছে। প্রায় ছুটে এসে ফতিমার পাশে বসে স্বরটাকে অনেক কষ্টে মুক্ত করতে পারল সে, 'আপা, আমি তোমার মুন্নাই।

কাঁপা কাঁপা রোগা দুই হাতে আলতাফের মাথাটা আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ফতিমা। ঝাপসা গলায় বলে, 'এত কাল পর আমার কথা তোর মনে পড়ল! উমর শেষ হয়ে এসেছে। আর কিছুদিন পরে এলে দেখা হত না। মাটির নীচে চলে যেতাম।' উতরোল কান্নায় তার শরীর দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে।

ফতিমার আবেগ আলতাফের মধ্যেও চারিয়ে গিয়েছিল। মাঝখানের একান্নটা বছরে তার ওপর দিয়ে কম ঝড় বয়ে যায়নি। দাঙ্গা, খুন, আগুন, দেশভাগ, ইন্ডিয়া থেকে চলে যাওয়া, পাকিস্তানে যাবার পর বেঁচে থাকার জন্য একটানা লড়াই -- সব মিলিয়ে তাকে কঠোর, রুক্ষ, কর্কশ করে তুলেছে। সহজে সে কাঁদে না। কিন্তু এই মুহূর্তে আলতাফ টের পেল তার দু'চোখ জলে ভরে গেছে। ধরা ধরা, ভাঙা গলায় সে বলে, 'রো মাত আপা, রো মাত --'

কিন্তু কান্না থামে না ফতিমার, বরং আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর ফতিমা খানিকটা শান্ত হলে ভাইয়ের গলা থেকে হাত নামিয়ে নেয়। কান্নার ধকলে জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল তার। আলতাফ বলে, 'তোমার খুব তখলিফ হচ্ছে আপা। শুয়ে পড় --'

ফতিমা কিছুতেই শোবে না। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'এত সাল বাদে তোকে দেখলাম। আমি শুয়ে থাকব!'

'আমি তো তোমার পাশেই বসে আছি। শুয়ে শুয়ে কথা বল।' পরম মমতায় বড় বোনের কাঁধ ধরে তাকে ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়ে দেয় আলতাফ। ফতিমার একটা রুগ্‌ণ হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, ' তোমার শরীরের এই হাল হল কী করে?'

এই প্রশ্নটার উত্তরে লতিফ জানায়, তিন বছর আগে ফতিমার একটা স্ট্রোক হয়েছিল।

তার ওপর লিভারের দোষ, হাঁফানি। মায়ের অশক্ত শরীরে কত রকমের রোগ যে কায়েম হয়ে বসে আছে তার হিসাব নেই।

লতিফের পাশ থেকে ধনপত বলে ওঠে, 'ওই দিকে দ্যাখ' --- বলে খাটের পাশে একটা টেবিল দেখিয়ে দেয়। সেটার ওপর রয়েছে নানা ধরনের ওষুধের শিশিবোতল। ক্যাপসিউল আর ট্যাবলেটের অগুনতি মোড়ক।

ধনপত বলে যায়, 'বড়ি বহিন ডাক্তার আর দাওয়ার ওপর বেঁচে আছে।'

বিষণ্ণভাবে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে আলতাফ। উত্তর দেয় না।

ধনপত এবার বলে, 'আলতাফ, আমি এখন আর থাকতে পারছি না। একবার গ্যারেজে যেতে হবে। কাল সুবে সুবে চলে আসব।' ফতিমাকে বলল, 'চলি বড়ি বহিন। ভাইকে এত সাল বাদে পেয়েছ। আর কান্নাকাটি করো না। শরীর খারাপ হবে।'

ধনপত বেরিয়ে যাবার পর আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'ধন্নো কি এ বাড়িতে রোজই আসে?'

লতিফ বলে, 'রোজ না। সপ্তাহে দু'দিন জরুর আসে। আমাদের খোঁজখবর নিয়ে যায়। দেখভাল করে।'

ফতিমা বলে, 'আমার যেবার কলিজার ব্যাবাম হল, ধন্নো হাসপাতালে নিয়ে গেল। তিন রোজ বেহোঁশ হয়ে ছিলাম। দিন রাত ও সেখানে পড়ে থাকত। লতিফের কারবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কত যে উপকার করে, বলে বোঝাতে পারব না। ধন্নো আমাদের বড় ভরসা। ওর মতো আদমি হয় না।'

আলতাফ অবাক হয়ে যায়। যে লাজপত সিং আজিমাবাদে দাঙ্গা বাধিয়েছে, তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়েছে, তার ছেলে কিনা ফতিমাদের ভরসা! আলতাফ কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে ফতিমা বলল, 'বহুৎ দূর থেকে ট্রেনে করে এসেছিস, জরুর থকে গেছিস। এখন আর কথা নয়। হাতমুখ ধুয়ে, নোংরা জামাকাপড় বদলে এখানে আয়। আমার কাছে বসে চা খাবি।' লতিফকে বলল, 'মামার ঘরের বিছানা পাতা আছে তো?'

লতিফ মাথা হেলিয়ে দেয়, 'হাঁ'।

'বানোকে বলে আয়, গোসলখানায় গরম পানি দিয়ে চা আর পুরি বানিয়ে ওপরে নিয়ে আসে। মিঠাইও দিতে বলবি।'

বানোকে আলতাফ জানে না। এ নিয়ে সে কোনও প্রশ্ন করল না। এ বাড়িতে যখন এসেছে, নিশ্চয়ই বানোর পরিচয় জানতে পারবে।

লতিফ ঘর থেকে বেরিয়ে মিনিটখানেকের মধ্যে ফিরে আসে।

ফতিমা ছেলেকে বলে, 'মামাকে ওর ঘরে নিয়ে যা। ওকে নয়া সাবান, আর তোয়ালে দিবি। গোসলখানাটা দেখিয়ে দিস।'

দুই হাতে আলতাফের সুটকেস আর হোল্ডঅল তুলে নিয়ে লতিফ তাকে ডানপাশের ঘরটায় নিয়ে যায়। তারপর মালপত্র মেঝেতে নামিয়ে আলো জ্বালিয়ে দেয়।

ফতিমার মতো না হলেও এই ঘরটাও বেশ বড়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক ধারে ভারী খাটে ধবধবে বিছানা ছাড়াও রয়েছে আলমারি, গদি-মোড়া ক'টা কুশন, দেওয়াল-আয়না, টেবিল চেয়ার ইত্যাদি।

লতিফ বলল, 'এটা আপনার ঘর।'

আলতাফ আন্দাজ করল, সে আসবে বলে ঘরটা ফিটফাট করে রাখা হয়েছে। একটা চেয়ারে বসে জুতো মোজা খুলে এক পাশে রাখল সে। তারপর সুটকেশ খুলে ঘরে পরার পাজামা, শার্ট বার করতে করতে নতুন করে তার খেয়াল হল, বাড়িটা বড় বেশি নিঝুম। এখন পর্যন্ত লতিফ আর ফতিমা ছাড়া অন্য কাউকে সে দেখেনি। তবে বানো নামে কেউ একজন আছে, তার পরিচয়টা আলতাফের অজানা।

দেশভাগের পর বেশ কিছুদিন ফতিমাদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। তারপর সেটা অনিয়মিত হতে হতে বন্ধ হয়ে যায়। তার মধ্যেই জানা গিয়েছিল, ফতিমার দুই ছেলে, দুই মেয়ে। অবশ্য আলতাফরা ইন্ডিয়ায় থাকতে থাকতেই প্রথম ছেলে নিয়াজের জন্ম হয়েছিল। পরে আর তিনটি সন্তান জন্মায়। ফতিমার শ্বশুর শেখ বদরুদ্দিনের মৃত্যুর খবরও চিঠিতেই পেয়েছিল আলতাফ। তবে তার স্বামী শেখ জিয়াযুলের মৃত্যু-সংবাদ করাচিতে কীভাবে পৌঁছেছিল এখন আর মনে নেই। ভাগনে ভাগনিরা কে কেমন আছে, কী করছে, সবই তার অজানা।

লতিফ দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বসতে বলে আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'আপা আর তুমি ছাড়া আর কেউ এ বাড়িতে থাকে না?'

লতিফ বলে, 'না।' সে জানায়, তার বড় ভাই নিয়াজ শাদির পর মুঙ্গের চলে গেছে। সেখানেই থাকে। আজিমাবাদের বাড়িতে আসে না। অমানুষ, স্বার্থপর। দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় নুরবানু থাকে রায়বেরেলিতে, ছোট মমতাজ শাহারানপুরে। সংসার ছেলেমেয়ে নিয়ে দু'জনেই এমন ঝালাপালা যে ক্বচিৎ কখনও এখানে আসতে পারে।

একটু চুপচাপ।

তারপর আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কতদূর পড়াশোনা করেছ?

লতিফ বলে, 'ম্যাট্রিক পাশ করেছি।'

'কামকাজ কী করো — নৌকরি, না বিজনেস?'

'ছোটখাট বিজনেস। ইলাহাবাদের এক বড় শেঠের কাছ থেকে স্টেনলেস স্টিলের বর্তন কিনে এনে এখানে বেচি। ফাইভ পারসেন্ট কমিশন থাকে।'

একটু চিন্তা করে লতিফ ফের বলে, 'ধন্নো মামা শেঠের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। সে আমার জামিনদার। বোনেদের শাদিতে সব টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। ধন্নোমামা কিছু ক্যাপিটাল দিয়েছে। তাই বিজনেসটা দাঁড় করাতে পেরেছি। অবশ্য তার টাকা আমি শোধ করে দিয়েছি।'

ফতিমার শ্বশুরবাড়ি এবং আলতাফদের বাড়িতেও পর্দার তেমন কড়াকড়ি ছিল না। ছেলেবেলায় আলতাফের সঙ্গে প্রায়ই এখানে চলে আসত ধনপত। শেখ বদরুদ্দিন থেকে শুরু করে এ বাড়ির সবাই তাকে খুবই পছন্দ করত। বন্ধু পাকিস্তানে চলে যাবার পরও ধনপত শুধু এ বাড়িতে যাতায়াতটাই বজায় রাখেনি, বিপদে আপদে সব সময় ফতিমাদের পাশে আছে, লতিফকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অথচ তার সঙ্গে ফতিমাদের রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই, ধর্মও তাদের আলাদা। ধনপতের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আলতাফের মন ভরে যায়।

আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'শাদি করনি?'

'করেছিলাম। লেকেন --'

'লেকেন কী?'

মুখ নামিয়ে লতিফ বলে, 'শাদিটা টিকল না—'

আলতাফ চকিত হয়ে ওঠে, 'কেন?'

লতিফ জানায়, পয়সাওলা ঘরের মেয়েকে শাদি করেছিল সে। তার ভীষণ বড়লোকি চাল। এটা চাই, সেটা চাই। বিবির খাঁই মেটানো লতিফের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সব চেয়ে যেটা বড় সমস্যা, শাশুড়ির সঙ্গে সে থাকতে চায় না। এ ব্যাপারে লতিফের শ্বশুরবাড়ির যথেষ্ট উসকানি ছিল। কিন্তু মাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেও পারে না লতিফ। ফলে অশান্তি, খিটিমিটি, প্রচণ্ড তিক্ততা। সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত আর টিকিয়ে রাখা গেল না।

একটু চুপ করে থাকার পর আলতাফ বলে, 'তোমার কত আর বয়েস। সামনে লম্বা উমর পড়ে আছে। ভাল ঘর, আচ্ছা লেড়কি দেখে আবার সাদি করে ফেল —'

লতিফ জানায়, নতুন আর একটা মেয়ে এলেই যে সংসার সুখশান্তিতে ভরে যাবে, সেবা যত্নে মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আরও বড় আকারের ঝঞ্ঝাট বাধবে কিনা তাই বা কে বলবে। তার চেয়ে এই ভাল আছে সে।

আলতাফ বুঝতে পারছিল, প্রথম বিয়ের অভিজ্ঞতাটা লতিফকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। তাই আর সেদিকে পা বাড়াতে চায় না। ভাগনে সুখী এবং সংসারী হলে খুশিই হত আলতাফ। কিন্তু কী আর করা যাবে? ক'দিনের জন্য এদেশে এসেছে সে। করাচিতে ফিরে যাবার পর এখানকার স্মৃতি ফিকে হয়ে যাবে। লতিফের জন্য যে চিন্তাটা তার মাথায় দেখা দিয়েছে তার অস্তিত্বও হয়ত থাকবে না।

একতলা থেকে কোনও মেয়েমানুষের গলা ভেসে আসে, 'লতিফ ভাই, গোসলখানায় গরম পানি দিয়েছি।'

চোখে না দেখলেও, আলতাফ আন্দাজ করল, আওরতটি নিশ্চয়ই বানো। কেননা খানিকক্ষণ আগে ফতিমা তাকে গরম জল দেবার জন্য লতিফকে পাঠিয়েছিল।

ডান পাশের একটা আলমারি খুলে সাবান, নতুন তোয়ালে বার করে লতিফ বলল, 'মামা চলিয়ে—'

হাতমুখ ধুয়ে, পোশাক পালটে লতিফের সঙ্গে ফের ফতিমার ঘরে চলে আসে আলতাফ। তখনকার মতোই বড় বোনের খাটের একধারে উঠে বসে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্টেনলেস স্টিলের বড় একটা কাঠের ট্রেতে আটার পুরি, হালুয়া আর গুলাবজামুন এনে একটা ধবধবে ছোট তোয়ালে আলতাফের পাশে খাটের ওপর বিছিয়ে তার ওপর ট্রেটা রাখে বানো।

তার বয়স চল্লিশের কিছু বেশিই হবে। শক্ত, কর্মঠ চেহারা। পরনে খেলো ছিটের সালোয়ার কামিজের ওপর মোটা চাদর। তামাটে রং, ভারী মাংসল মুখে চেচকের দাগ।

ফতিমা উঠে বসেছিল। আলতাফকে দেখিয়ে বানোকে বলল, 'মামা --- পাকিস্তান থেকে এসেছে।' আলতাফকে বলে, 'ও আমার বেটি বরাবর। চার সাল এখানে আছে। ঘরের সব ঝামেলা সামলায়। ও ছাড়া একটা রোজও আমাদের চলে না।'

বানো যে কাজের মেয়ে, ফতিমা সেটা বুঝিয়ে দিল। তার স্বভাব নম্র, সহবত জানে। ঝুঁকে আদাব জানিয়ে আলতাফকে বলল, 'লতিফভাই আর আম্মির কাছে আপনার কথা শুনেছি। কবে আসবেন, সে জন্যে আমরা সবাই ইন্তেজার করে ছিলাম।'

আলতাফ একটু হাসল।

ফতিমা বানোকে বললেন, 'মামাকে রাতে কী খাওয়াবি?'

বানো বলে, 'গোস্ত আছে, মছলি আছে, সবজি আছে।'

'ভাল করে খানা পাকা। আর হাঁ, সিমাইয়ের ক্ষীর বানাবি। রসুই চড়াবার আগে মামাকে চা দিয়ে যাস —' বলে একটু থামে ফতিমা। তারপর বিষণ্ণ গলায় স্বগতোক্তির মতো বলে যায়, 'ভাইটার সঙ্গে এত সাল বাদে দেখা হল, কোথায় নিজের হাতে খানা পাকিয়ে খাওয়াব —' গলা বুজে আসে তার।

বানো চলে গিয়েছিল।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে খাওয়ার পর আলতাফ বলে, 'লতিফের কাছে তোমাদের সব খবর শুনলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল আপা। মেয়েরা তোমাকে দেখতে আসতে পারে না, তার কারণ বুঝি। শাদির পর কোনও লেড়কিই আর আজাদ থাকে না। লেকেন নিয়াজ নাকি ওর শাদির পর আর আজিমাবাদে আসেনি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ফতিমা। তারপর কপালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বিষণ্ণ সুরে বলে, 'ওকে দোষ দিই না। সবই আমার নসিব।'

আলতাফ লক্ষ করল, বড় ছেলে সম্পর্কে এতটুকু নালিশ নেই ফতিমার। একটু ভেবে বলল, 'লতিফের শাদিটাও তো বরবাদ হয়ে গেছে। ওর সংসারী হওয়া দরকার।'

'অনেক বার বলেছি। রাজি হয়নি। আমি আর কী করব?'

'তুমি যখন থাকবে না, ওর দিন কাটবে কী করে?'

'আমি আর কী করব, বরাতে যা আছে তাই হবে।'

অর্থাৎ অদৃষ্টের ওপর সব সঁপে দিয়ে বসে আছে ফতিমা। বয়স বাড়লে, অসুস্থ পঙ্গু হয়ে পড়লে এরকমই খুব সম্ভব হয়। সব উদাম, উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়।

আলতাফ কী বলতে যাচ্ছিল, ফতিমা ফের বলে ওঠে, 'আমাদের কথা তো সব শুনেছিস। মায়ের পেটের ভাইবোন হলেও তোদের সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানি না। আব্বু আর আম্মির এন্তেকালের খবর পেয়েছিলাম। আসমা, নাজ্জু আর তোর কথা বল ---' আসমা, আর নাজ্জু অর্থাৎ নাজিম হল আলতাফের দুই ভাইবোন। মা-বাবার সঙ্গে একান্ন বছর আগে তারাও পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল।

আলতাফ খেতে খেতে বলে যায়। দেশভাগের পর হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে ,সীমান্তের ওপারে সোজা করাচিতে চলে যায় তারা। তার বাবা নবাব হোসেন এবং তাঁর মতো লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মুসলমানের ধারণা ছিল, পাকিস্তান নামে নতুন স্বপ্নের দেশটিতে পৌঁছুতে পারলে হাতে আসমানের চাঁদ পেয়ে যাবে। সুখের আর শেষ থাকবে না। তাদের থাকার জন্য ওখানে বড় বড় হাভেলি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু করাচিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গ হতে শুরু করেছিল। তাদের রাখা হয়েছিল উদ্বাস্তু ক্যাম্পে।

নবাব হোসেন কিন্তু দমে যায়নি। সে ছিল অত্যন্ত সৎ, উদ্যোগী এবং পরিশ্রমী মানুষ। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে থাকতে থাকতেই নতুন দেশে ফের জীবনকে গড়ে তোলার কাজে হাত লাগিয়েছিল। সরকারি লোন জোগাড় করে পুরনো করাচির বাজারে কাপড়ের ছোট একটা দোকান খোলে সে। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে পড়ে থাকতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। আয়ের যখন ব্যবস্থা হয়েছে তখন একটা ব্যারাক টাইপের পুরনো বাড়িতে দুটো কামরা ভাড়া করে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে যায়। আলতাফের তিন ভাইবোনকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়।

কয়েক বছরের মধ্যে ব্যবসা বড় হতে থাকে। আয়ও যথেষ্ট বাড়ে। ছোট দোকান ছেড়ে বড় দোকান নেয় নবাব হোসেন। কিছু টাকা জমেছিল। তাই দিয়ে একটা বাড়িও কিনে ফেলে।

সংসারটা যখন গুছিয়ে এনেছে সেই সময় হঠাৎ কয়েক দিনের জ্বরে নবাব হোসেনের মৃত্যু হয়। আলতাফ তখন সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। আসমা নাইনে পড়ছে। নাজিম সেভেন। সবাই একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।

আলতাফ খুব ভাল ছাত্র ছিল। ভেবেছিল, এম.এ. পর্যন্ত পড়বে। কিন্তু ইচ্ছাপূরণ হল না। আব্বার মৃত্যুশোক কাটিয়ে ওঠার পর সংসারটাকে বাঁচানোর জন্য তাকে নবাব হোসেনের দোকানে গিয়ে বসতে হল। একটা দোকান থেকে আরও দুটো দোকান করেছে সে। আসমা ম্যাট্রিক পাশ করার পর তার শাদি দিয়েছে। নাজিম বি.এ. পাশ করে সরকারি নৌকরি করছে। তারও শাদি হয়েছে। সে থাকে সরকারি কোয়ার্টারে।

অবশ্য আসমার বিয়ের পর নিজেও বিয়ে করেছিল আলতাফ। তার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে এম.এসসি পড়ছে, মেয়ে এ বছর বি.এ ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষাটা শেষ হলেই তার শাদির ব্যবস্থা করবে।

আলতাফের শাদির বছর খানেক আগে আরও একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে। সেটা হল তাদের আম্মাব মৃত্যু।

মা-বাবার মৃত্যুসংবাদ পেলেও ভাইবোনদের জীবনের এত সব খবর প্রায় কিছুই জানা ছিল না ফতিমার। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে সে। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'নাজ্জু আর আসমা করাচিতেই আছে তো?'

আস্তে মাথা নাড়ে আলতাফ, 'হাঁ।'

'ওদের সঙ্গে দেখা হয়?'

'হাঁ। ছুটির দিনে ওরা চলে আসে। আমিও ওদের কাছে যাই।'

'সবাই ভাল আছে?'

'হাঁ।'

'ওদের বড় দেখতে ইচ্ছে করে। লেকেন এ জিন্দেগিতে তো তা আর হবে না। বলিস, যদি পারে ওরা একবার যেন এখানে আসে।'

'জরুর বলব।'

কী ভেবে ফতিমা বলে, 'আখবরে প্রায়ই বেরোয় করাচিতে নাকি খুব হাঙ্গামা হয়।'

আলতাফ জানায়, করাচি বিরাট পোর্ট সিটি। খুনখারাপি, বন্দুকবাজি লেগেই আছে। শিয়া-সুন্নি সমস্যা তো রয়েছেই, তা ছাড়া ওখানকার আদিবাসিন্দারা ভারত থেকে চলে যাওয়া

উর্দুভাষী মুসলিমদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না। পাকিস্তান হবার পর এতগুলো সাল কেটে গেলেও ওরা মনে করে, উড়ে এসে জুড়ে বসা এই ইন্ডিয়ানরা তাদের রুটিতে ভাগ বসাচ্ছে। ফলে সারাক্ষণ উত্তেজনা, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং অশান্তি। এর ওপর রয়েছে রাজনৈতিক গণ্ডগোল, কথায় কথায় বন্ধ, ধরপাকড়, পুলিশের গুলি, উত্তেজনা।

ফতিমাকে উদ্বিগ্ন দেখায়, 'তোদের ওপর হামলা হয় না তো?'

আলতাফ বলে, 'চিন্তা করো না আপা। ওখানে যখন চলেই গেছি, এ সব নিয়েই থাকতে হবে।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা।

একসময় আলতাফ ফের বলে, 'করাচিতে হরদম শুনতে পাই, ইন্ডিয়ায় মুসলমানদের ওপর ভীষণ জুলুম হচ্ছে। যে কোনও সময় যে কেউ খতম হয়ে যেতে পারে। তোমাদের তেমন কোনও ভয় নেই তো?'

লতিফ কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে পড়েছিল। সে জানায়, বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় আজিমাবাদে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। বোম্বাই বিস্ফোরণের পর আবহাওয়া এমনই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে যে এখানে দাঙ্গা বেধে যেত। মুসলিম মহল্লাটাই ছিল টার্গেট। কিন্তু ধনপত আর তার মতো অনেকে তা থামিয়ে দেয়। দু'তিনটে পলিটিক্যাল পার্টি শান্তি মিছিল বার করে। সেই সময় বেশ কয়েকদিন ধনপতরা মুসলিম টোলা পাহারা দিয়েছে।

লতিফ বলে, 'তবে ---'

আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'তবে কী?'

লতিফ বলে, 'মুখে না বললেও অনেকেই চায় না আমরা ইন্ডিয়ায় থাকি। পাকিস্তান কায়েম হয়েছে — মুসলিমদের জন্যে আলাদা স্টেট, আমরা যেন সেখানে চলে যাই।'

লতিফদের জন্য হঠাৎ ভীষণ উৎকণ্ঠা বোধ করে আলতাফ। ফতিমাকে বলে, 'আপা, এতদিন তোমাদের দেখিনি। সেভাবে চিন্তাও করিনি। যদি বল, করাচিতে ফিরে গিয়ে তোমাকে আর লতিফকে আমার কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি --' কোন প্রক্রিয়ায়, কীভাবে, কাকে ধরে দু'জন ভারতীয়কে সীমান্তের ওপারে বরাবরের জন্য নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তার জানা নেই। তবু যে বলল সেটা ভয়ে এবং উদ্বেগে।

ফতিমা বলে, 'এই যে একটু আগে বললি ইন্ডিয়ার মুসলিমদের ওরা পছন্দ করে না। তোরা ওখানে এত কাল আছিস, ঠিক আছে। আমরা আচানক গিয়ে উঠলে ওরা কি খুশি হবে?'

আলতাফ বিব্রত বোধ করে। কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

ফতিমা বলে, 'ভয় নেই। এখানে খারাপ আদমি যেমন আছে, সাচ্চা ভালো আদমিও তেমনিই আছে। তারাই বেশি। ওদের বিশ্বাস করি।' একটু থেমে ফের শুরু করে, 'আজাদির পর আমার শ্বশুর, তোর জিজাজি, কেউ দেশ ছেড়ে যায়নি। যতদিন বেঁচে আছি, আজিমাবাদেই থাকব।'

ফতিমার বলার ভঙ্গিতে এমন দৃঢ়তা ছিল যে তার ওপর বলার কিছু থাকে না। শ্বশুর আর স্বামীর জেদটা যেন তাকে পেয়ে বসেছে। দেশ ছেড়ে কোথাও যাবে না সে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আলতাফ বলে, নিয়াজ ছাড়া অন্য ভাগনে ভাগনিদের তো আগে দেখিনি। আন্দাজে আন্দাজে কিছু সালোয়ার কামিজ দোপাট্টা, পাঠান কুর্তা, শার্ট আর প্যান্টের পিস নিয়ে এসেছি। কাল তোমাকে দেব। তুমি ওদের দিও।'

করাচির পড়শিদের হুঁশিয়ারি মাথায় রেখে আলতাফ ঠিকই করে ফেলেছিল, চুপচাপ ইন্ডিয়ায় এসে আজমীড় শরীফ সেরে এবং বড় বোনকে দেখে পাকিস্তানে ফিরে যাবে। কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর বিপুল এক আবেগ তার ওপর ভর করে যেন। এই শহরে তার জন্ম, জীবনের প্রথম ন'টা বছর এখানেই কাটিয়ে গেছে। সে-ই শুধু না, তার আব্বা, দাদা, তার দাদা, পাঁচ পুরুষের প্রতিটি মানুষের জন্ম, বেড়ে ওঠা, লেখাপড়া, কাজকারবার সবই আজিমাবাদে। কত কাল পর এখানে এসেছে আলতাফ, জীবনে আর কখনও আসা সম্ভব হবে কিনা, কে জানে। সে ঠিক করে ফেলল, শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখবে। একবার তাদের ছেড়ে যাওয়া হাভেলিতেও যাবে।

হাতমুখ ধুয়ে চা এবং নাস্তা সেরে, আলতাফ লতিফকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আজ খুব জরুরি কোনও কাজ আছে?'

লতিফ বলে, 'কেন বলুন তো?'

'তোমাকে নিয়ে আমাদের পুরনো বাড়িটায় একবার যেতাম।'

'বেশখ। যে ক'রোজ আছেন, আমি আপনার সাথ সাথ থাকব।'

'তোমার কামকাজের ক্ষতি হবে না তো?'

'না। আমার লোক আছে, সে সামলাবে। আমি ফাঁকে ফাঁকে দু-একবার গিয়ে দেখে আসব।'

কিন্তু ওরা বাড়ি থেকে বেরুবার আগেই মুসলিম মহল্লার বহু মানুষ এসে হাজির। অল্প বয়সের ছেলেমেয়ে থেকে বৃদ্ধরা পর্যন্ত কেউ বোধ হয় বাকি নেই। সবার চোখেমুখে অপার কৌতূহল। কীভাবে যেন রটে গেছে পাকিস্তান থেকে নবাব হোসেনের ছেলে এসেছে।

বয়স্কদের ঘরে এনে বসায় লতিফ। অল্পবয়সীরা দরজার বাইরে ভিড় করে দাঁড়ায়। বাচ্চাকাচ্চারা জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে।

একজন খুব রোগা চেহারার বৃদ্ধ, আশি পঁচাশির মতো বয়স বলল, 'আমার নাম জানমহম্মদ। তোমার আব্বা ছিল আমার দোস্ত। শুনেছি নবাব আর তোমার আম্মি দু'জনেই মারা গেছে। বহুৎ আপসোস কি বাত।' একটু থেমে ফের বলে, 'বেটা, কত ছেলেবেলায় তোমাকে দেখেছি। চেহারা বিলকুল বদলে গেছে।'

জান মহম্মদকে একেবারেই চিনতে পারেনি আলতাফ। কিন্তু তা তো আর মুখের ওপর বলা যায় না। সে হেসে বলল, 'চাচা, আমার উমর যাট হয়ে গেল। চেহারা কি আর বচপনের মতো থাকবে?

'ঠিক --' আস্তে মাথা নাড়ে জান মহম্মদ।

আরেকটি বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে, 'পাকিস্তানে কেমন আছ তোমরা?'

আলতাফ বলে, 'চলে যাচ্ছে --'

এরপর বয়স্করা সবাই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায়। পাকিস্তানের হালচাল কেমন? আজিমাবাদ থেকে যারা চলে গিয়েছিল তারা কীভাবে দিন কাটাচ্ছে কে কী করছে, ইত্যাদি।

কাল রাত্তিরে পাকিস্তান সম্পর্কে ফতিমাকে যা বলেছিল, এখনও তা-ই বলল আলতাফ। জানাল, এখান থেকে যারা চলে গিয়েছিল তারা বেশির ভাগই রয়েছে করাচিতে। তারা ব্যবসা ট্যাবসা বা নৌকরি করে। কয়েকটা ফ্যামিলি গেছে লাহোরে। তাদের সঙ্গে আলতাফের যোগাযোগ নেই। তারা কেমন আছে, সে বলতে পারবে না।

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই হইচই করতে করতে চলে এল ধনপত। ভিড় ঠেলে ঘরে ঢুকে মুসলিম মহল্লার লোকজনদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী, আলতাফের খবর পেয়ে গেছেন?'

বয়স্করা সমস্বরে বলে, 'হাঁ। পাকিস্তানের হালহকিকতের কথা শুনছিলাম।'

ধনপত বুঝতে পারছে, যেভাবে ভিড়টা ছেঁকে ধরেছে, খুব সহজে আলতাফ ছাড়া পাবে না। অথচ সে ঠিক করে এসেছিল ওকে নিয়ে শহরে ঘুরতে বেরুবে সময় পেলে নিজেদের বাড়িতেও একবার নিয়ে যাবে। তার গ্যারেজটাও দেখাবে।

কেউ যাতে ক্ষুব্ধ না হয়, তাই খুব বিনীতভাবে ধনপত বলল, 'চাচাজিরা, গুস্‌সা করবেন না। আলতাফ তো কয়েকদিন এখানে আছে। ও আপনাদের সবার বাড়ি যাবে। এখন ওকে কৃপা করে ছেড়ে দিন।'

ধনপত বলার পরও বৃদ্ধরা সবাই আলতাফকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নেয়, তাদের বাড়ি যেতে তো হবেই, গরিবখানায় একবেলা দাওয়াতও খেতে হবে। নবাব হোসেনের ছেলেকে খাওয়াতে না পারলে তাদের আক্ষেপের সীমা থাকবে না।

আলতাফ মনে মনে হিসেব করে দেখল, এত জনের নিমন্ত্রণ রাখতে গেলে তাকে কম করে আজিমাবাদে কুড়ি বাইশ দিন থাকতে হয়। তা তো আর সম্ভব নয়। পরে কোনও অছিলায় এড়িয়ে গেলেই চলবে। আপাতত মুক্তি পাওয়ার জন্য বলল, সে সবার বাড়ি গিয়ে খাবে।

লোকজন চলে যাবার পর আলতাফ চোখ কুঁচকে মজাদার একটা ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করল, 'কী মতলব তোর? সবাইকে ভাগিয়ে দিলি যে?'

ধনপত বলে, 'তোকে বাঁচিয়ে দিলাম। নইলে কতক্ষণ আটকে রাখত কে জানে।' একটু থেমে বলল, 'ঘরে বসে থেকে কী করবি? চল, পুরানা শহরটা তোকে ঘুরিয়ে দেখাই।'

'লতিফকে সেই কথাই বলছিলাম। তুই যে সকালে আসবি খেয়াল ছিল না। বেরুব বেরুব ভাবছি, ওরা এসে গেল। আমি কিন্তু আগে আমাদের বাড়িটা দেখতে যাব।'

'ঠিক আছে। তাই চল --'

ফতিমাকে বলে তিনজন বেরিয়ে পড়ে।

আলতাফের ছেলেবেলায় মুসলিম টোলার বেশির ভাগ রাস্তাই ছিল কাঁচা, দু'একটায় কিছু খোয়া চোখে পড়ত। এখন সব রাস্তাই পিচ দিয়ে বাঁধানো। দু'ধারের বাড়িগুলো তেমনই ঘিঞ্জি, গায়ে গায়ে লাগানো।

যারা খানিক আগে আলতাফের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তাদের অনেকেই নিজেদের বাড়ি ফিরে যায়নি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। ওদের দেখে ফেউয়ের মতো সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

প্রতিটি বাড়ির জানালায় নানা বয়সের মেয়েদের কৌতূহলী মুখ দেখা যাচ্ছে। যে পুরুষেরা সামনের দাওয়া বা চবুতরে বসে শীতের রোদ পোহাচ্ছিল তারা ডেকে ডেকে দু'একটা কথা

বলছে। ধনপত এবং লতিফের সঙ্গী যে পাকিস্তান থেকে আসা নবাব হোসেনের ছেলে সেটা তারা আন্দাজ করে নিয়েছে।

ফতিমাদের বাড়ি থেকে আলতাফদের পুরনো বাড়িটা পনেরো মিনিটের রাস্তা। জিলিপির মতো পেঁচানো অলিগলি দিয়ে ওরা সেখানে পৌঁছে গেল।

বাড়িটা ঠিকঠাক আগের মতো নেই। আলতাফরা যখন পাকিস্তানে যায় ওটা ছিল দোতলা, তার ওপর আরও একটা ফ্লোর তোলা হয়েছে। খুব অল্পদিন হল গোটা বাড়ি রং করানো হয়েছে। দরজা-জানালা থেকে টাটকা পেইন্টের গন্ধ আসছিল।

সামনের দিকে চবুতরটা তেমনই রয়েছে। সেখানে বালাপোষ গায়ে জড়িয়ে একটি বৃদ্ধ চারপায়ার ওপর আধ শোওয়া হয়ে আছে। পাঁচ ছ'টা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে হুল্লোড় করছে। বাড়িটায় যে প্রচুর লোকজন, বাইরে থেকে টের পাওয়া যায়।

ধনপত লতিফ এবং আলতাফকে বৃদ্ধের কাছে নিয়ে আসে। ডাকে, আকবর চাচা —'

হাতের ভর দিয়ে দ্রুত উঠে বসে বৃদ্ধ। আশির ওপর বয়স। কিন্তু এখনও সে অথর্ব হয়ে পড়েনি। চোখের নজরও মোটামুটি ভালই আছে। তিনজনকে দেখতে দেখতে বলে, 'ও ধন্নো, লতি[illegible] সঙ্গে আরেক জন নয়া আদমি দেখছি।'

'হাঁ। ও আলতাফ -- নবাব হোসেন সাহেবের বেটা।' ধনপত জানায়।

'কৌন নবাব হোসেন?'

'তোমাদের এই বাড়িটা যাব ছিল---'

'মতলব, আজাদির পর বিবি বাচ্চা নিয়ে যে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল?'

'হাঁ।'

আকবব চকিত হয়ে ওঠে। সোজাসুজি আলতাফের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি পাকিস্তান থেকে আসছ?'

আলতাফ বলে 'জি, হাঁ--'

আকবর সন্দিগ্ধ সুরে জিজ্ঞেস করে, 'আচানক ইন্ডিয়ায় চলে এলে?'

বুড়োর সংশয়ের কারণ মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে আলতাফ। সে শুনেছে পাকিস্তানে যাবার আগে আকবব আলি নামে একজনেব কাছ থেকে নগদ কিছু টাকা নিয়ে তাদের থাকতে দিয়ে গিয়েছিল তাব আববা। এতকাল বাদে হঠাৎ কেন নবাব হোসেনের ছেলে এখানে এসেছে তা নিয়ে সে যথেষ্ট ধন্দে পড়ে গেছে।

আলতাফ কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগে আকবব আলি ফের প্রশ্ন করে, 'তোমরা কি ইন্ডিয়ায় ফিবে আসবে?'

অর্থাৎ বুড়ো জানতে চাইছে, ইন্ডিয়ায় এসে তারা এই বাড়িটা চেয়ে বসবে কিনা।

আলতাফ মনে মনে হাসে। বলে, 'না চাচা, এখানে ফিবে আসা আর সম্ভব নয়।' তারপর কী উদ্দেশ্যে ভাবতে এসেছে, জানিয়ে দেয়।

আকবর আলির দুশ্চিন্তা কাটে। হঠাৎ তার খেয়াল হয়, নবাব হোসেনের ছেলেকে মেহমানদারিটা ঠিকমতো কবা হয়নি। ব্যস্তভাবে বলে, 'আবে খাড়া কিঁউ, বৈঠো বৈঠো - -'

আলতাফরা গা ঘেঁযাঘেঁযি কবে চৌপায়াতেই বসে পড়ে। সেই বাচ্চাগুলোর হইচই

থেমে গিয়েছিল। তারা দূরে দাঁড়িয়ে অচেনা আলতাফকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে।

আকবর আলি বাচ্চাগুলোকে বলে, 'তোদের আম্মী খালাদের ডেকে নিয়ে আয়। বলবি আমি আসতে বলছি। এক্ষুনি যেন চলে আসে।

বাচ্চাগুলো দৌড়ে যায়। আকবরের তিন ছেলে এবং তাদের বিবিরা বাড়ির ভেতর থেকে এসে চৌপায়ার কাছে দাঁড়ায়। বাচ্চাগুলো তাদের সঙ্গে ফিরে এসেছে।

আকবর আলি সবার সঙ্গে আলতাফের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, 'এই বাড়িটা একসময় ওদের ছিল। একান্ন সাল বাদে পাকিস্তান থেকে বাপ-দাদার হাভেলি দেখতে এসেছে।' একটু থেমে বলে, 'আগে চায় মিঠাই খাওয়াও। তারপর আমি নিজে ওকে বাড়িটা দেখাব।'

কিছুক্ষণ আগে নাস্তা করে এসেছে বলেও পার পাওয়া গেল না। আকবর আলির ছেলের বৌরা বালুসাই, লাড্ডু এবং গরম খুসবুদার চা নিয়ে এল। সে সব খেতেও হল।

চা-মিঠাই খাওয়ার পর আকবর আলতাফকে সঙ্গে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়িটা দেখায়। কোন ঘরে সে আর তার ভাই নাজিম থাকত, কোন ঘরটা ছিল ছোট বোন আসমার, আর কোনটা তাদের আব্বা-আম্মির, সব স্পষ্ট মনে আছে। দেখতে দেখতে প্রবল আবেগ ফুটন্ত দুধের মতো কলিজার ভেতর থেকে উথলে উথলে উঠে আসতে থাকে।

লতিফ আর ধনপত ওদের সঙ্গে যায়নি, চবুতরে চৌপায়াতেই বসে ছিল। খানিক বাদে আলতাফ ফিরে এসে যখন বিদায় নিতে যাবে, হঠাৎ আকবর আলির কিছু মনে পড়ে যায়। তাকে চবুতরের এক কোণে আলাদা করে ডেকে নিয়ে নিচু গলায় বলে, 'বেটা, তুমি পাকিস্তান থেকে এসেছ, এক হিসেবে ভালই হয়েছে। আমার একটা জরুরি কথা ছিল --'

আলতাফ বেশ অবাকই হয়। জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

আকবর আলি জানায়, পাকিস্তানে যাবার আগে হাজার দশেক টাকা নিয়ে এ বাড়ির দখল তাকে দিয়ে গিয়েছিল নবাব হোসেন। কিন্তু সম্পত্তি কোর্টে রেজিস্ট্রি করা হয়নি। তাড়াহুড়ো করে বিবি বাচ্চা নিয়ে সে চলে যায়। পরে আকবর আলি অবশ্য জায়গামতো ঘুষটুষ দিয়ে নানা কৌশলে বাড়িটা নিজের নামে করিয়ে নেয়। তবু তার মনে একটা খিঁচ থেকে গেছে। যদি নবাব হোসেনের কাছে দলিল থেকে থাকে এবং তার ছেলেরা কোনওদিন এসে বাড়ি ফেরত চায়, বড় রকমের একটা সমস্যা হয়ে যাবে।

আলতাফ বলে, 'আব্বা এসব কথা কখনও আমাকে বলেনি। এ বাড়ির দলিলও আমাদের কাছে নেই। ফিকর মাত কীজিয়ে চাচা। আমি কখনও ইন্ডিয়ায় এসে বাড়ি ফেরত চাইব না।' একটু থেমে বলে, 'তা ছাড়া আমরা বিদেশি। আমাদের কথা ইন্ডিয়ার আদালত শুনবেই বা কেন?'

আকবর আলি বলে, 'তোমার কথা বিশ্বাস করছি। লেকেন তোমার ভাইবোনরা --

তাকে থামিয়ে দিয়ে আলতাফ বলে, 'ওরাও চাইবে না।'

'তবু তোমার কাছে একটা আর্জি আছে।'

'কী আর্জি?'

আকবর আলি জানায়, একটা স্ট্যাম্পড কাগজে আলতাফ যদি তার ভাইবোন এবং নিজের তরফে লিখে দিয়ে যায়, এ বাড়ির দখল নিতে কোনও দিনই তারা আসবে না, তা হলে মৃত্যুর আগে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারে।

আলতাফ বলে, 'আপনি যখন বলছেন, তাই হবে।' সে শুনেছে বহু হিন্দু নাকি চায় না, যারা ইন্ডিয়া থেকে চলে গেছে তারা ফিরে আসুক। এখন দেখা যাচ্ছে, কিছু মুসলমানের কাছে তাদের ফেরাটা কাম্য নয়।

নিজেদের পুরনো বাড়ি থেকে বড় রাস্তায় এসে একটা টাঙ্গা নিল আলতাফরা। ধনপত আলতাফকে দেখিয়ে টাঙ্গাওলাকে বলল, 'আমার এই দোস্ত বহুৎ সাল বাদ আজিমাবাদে এসেছে। ওকে টাউন ঘুরিয়ে দেখাও —'

টাঙ্গাওলা বলে, 'জি —'

কাল স্টেশন থেকে আসার সময় যতটা মনে হয়েছিল, আজিমাবাদ তার চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। নতুন নতুন কত যে মহল্লা হয়েছে তার হিসেব নেই। দুটো বড় পার্ক, মেয়েদের কলেজ, প্রকাণ্ড হাসপাতাল, বেশ ক'টা নার্সিং হোম, এমন কী খেলাধুলোর জন্য ছোট একটা স্টেডিয়ামও চোখে পড়ল। একান্ন বছর আগে এসব ছিল না।

ঘুরে ঘুরে শহর দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেল।

ধনপত আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, এখন ঘোরাঘুরি থাক। তোদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। বিকেলে এসে আমার গ্যারাজে নিয়ে যাব।'

লতিফ আর আলতাফকে মুসলিম মহল্লার সামনের বড় রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে চলে যায় ধনপত। তিন ঘন্টা বাদে ফের এসে দু'জনকে শহরের মাঝখানে চক বাজারে তার গ্যারাজে নিয়ে গেল।

আলতাফের ছেলেবেলায় চক বাজাব ছিল খুবই ছোট। এধারে ওধারে সামান্য কটা দোকান। লম্বা চালার তলায় সবজিওলা মাছওলা মাংসওলারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসত। চারদিকে টিনের বাড়ি, কচিৎ দু'চারটে পুরনো একতলা কি দোতালা।

জায়গাটা এখন আর চেনাই যায় না। পুরনো বাড়ি ঘর ভেঙে নতুন নতুন বিল্ডিং উঠেছে। একটা চোখধাঁধান বড় সুপার মার্কেটও চোখে পড়ল। এছাড়া লাইন দিয়ে অজস্র দোকান, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, প্রাইভেট টেলিফোন বুথ, জেরক্স করার দোকান –কত কী যে হয়েছে তার হিসেব নেই। একধারে বিরাট চত্বরে কার পার্কিংয়ের জায়গা। সেখানে শ'খানেক স্কুটার জিপ আর প্রাইভেট কাব দাঁড়িয়ে আছে।

চক বাজারেব একধারে ধনপতের গ্যারাজ। একধারে উঁচু শেডের তলায় মোটর, অটো আর স্কুটার মেরামতির কারখানা। আরেক ধরে টেবল চেয়ার টেলিফোন দিয়ে সাজানো অফিস। সেখানে নিয়ে গিয়ে আলতাফ আর লতিফকে বসাল ধনপত। শেডের তলায় যারা মোটর টোটর সারাচ্ছিল তাদের একজনকে ডেকে চা আর নিমকিন আনতে বলল। তারপর নিজেই হই হই করে আশপাশের দোকানদারদের ডেকে এনে আলতাফের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। শুধু তাই না, যারা গাড়ি সারাতে আসছে তাদের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেয়।

পাকিস্তান সম্পর্কে জানার জন্য অনেকেই ভীষণ উৎসুক। ফতিমা বা মুসলিম মহল্লার জান মহম্মদের মতো এদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায় আলতাফ। তবে দু' চারজনের বক্তব্য বেসুরো ঠেকে।

'কী মিয়া, ইন্ডিয়ায় ফিরে আসার ধান্দা করছ নাকি? কিংবা 'হিন্দুস্থানে শও ক্রোড় আদমি।

আমাদের ঘাড়ে আর চাপাতে চেষ্টা করো না।'

এ সব শুনে মুখ চুন হয়ে যায় আলতাফের। তবে ধনপত খেপে ওঠে, 'কী বলছেন আপনারা! কারও ঘাড়ে চাপার জন্যে ও আসে নি। ওর বাড়ী বহীন ইন্ডিয়ায় আছে, ভাঞ্জা-ভাঞ্জীরা আছে, অন্য রিস্তেদারেরা আছে। তাদের দেখতে এসেছে। দো-চার রোজ পরে চলে যাবে।'

লোকগুলো বলে, 'চলে গেলেই ভাল —'

রাত আটটা নাগাদ গ্যারাজ বন্ধ করে আলতাফদের উঁচা মহল্লায় পৌঁছে দিতে দিতে ধনপত বলে, 'ওদের কথায় কিছু মনে করিস না। যত চুহা, হারামজাদের পাল —'

আলতাফ আস্তে মাথা নাড়ে — সে কিছু মনে করে নি। বলে, 'এরকম লোক পাকিস্তানেও আছে। ইন্ডিয়ার কেউ সেখানে গিয়ে থাক, সেটা ওরা চাইবে না।'

চক বাজার থেকে উঁচা মহল্লায় টাঙ্গায় মিনিট কুড়ির রাস্তা। পাশাপাশি বসে যেতে যেতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় ধনপতের। সে বলে, 'তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম —'

আলতাফ জিজ্ঞেস করে,'কী রে?' ধনপত বলে, আমার বাপুজিকে তোর কথা জানিয়েছি। তোকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছে। কবে যাবি?'

আলতাফ চমকে ওঠে। একান্ন বছর আগে লাজপত সিংদের তাদের বাড়িতে আগুন লাগাবার দৃশ্যটা নতুন করে যেন দেখতে পায়। অদ্ভুত এক আতঙ্ক চারদিক থেকে যেন তাকে ঘিরে ধরতে থাকে। কী জন্য লোকটা ডেকেছে কে জানে। না, ওই লোকটার সঙ্গে কিছুতেই দেখা করবে না। কিন্তু সরাসরি ধনপতকে তা বলা যায় না। আলতাফ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানায়, 'ক' রোজ তো আজিমাবাদে আছি। করাচিতে ফেরার আগে চাচাজির সঙ্গে দেখা করে যাব।'

'সেদিন আমাদের ওঁখানে খাবি কিন্তু —'

'ঠিক আছে।'

ধনপত রোজই একবার করে ফতিমাদের বাড়ি আসে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করে। তাকে এড়াবার জন্য উঁচা মহল্লার সেই বৃদ্ধদের দাওয়াত নেয় আলতাফ। প্রথমে সে ভেবেছিল, কারও বাড়ি নেমন্তন্ন খাবে না।

ধনপত ভীষণ ক্ষুব্ধ। রেগে উঠে বলে, 'কী হয়েছে তোর? বাপুজি রোজ আমাকে দিয়ে বলে পাঠাচ্ছে, আমি নিজে বলছি। আমাদের বাড়ি যেতে তোর এত আপত্তি কেন?'

কাঁচুমাচু মুখে আলতাফ বলে, 'গুস্সা করিস না ধন্নো। মহল্লার বুঢ়া লোকগুলো এত করে বলছে যে না বলতে পারছি না।'

'আমিও তো তোকে এত করে বলছি।'

উত্তর দেয় না আলতাফ। শুধু পুরনো বন্ধুর একটা হাত নিজের মুঠির ভেতর তুলে নেয়।

দেখতে দেখতে করাচি ফেরার সময় হয়ে এল। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। মাঝখানে আর মাত্র দুটো দিন। তারপর তাকে পাকিস্তানের প্লেন ধরতে হবে।

আলতাফ ঠিক করেছে, আজ বিকেল তিনটের লোকাল ট্রেনে আজিমাবাদ থেকে এলাহাবাদ

গিয়ে দিল্লির মেল ট্রেন ধরবে। পৌঁছবে কাল সন্ধেয়। রাতটা কোনও হোটেলে কাটিয়ে পরশু কিছু কেনাকাটা করবে। পরশুর রাতটাও তাকে দিল্লিতে থাকতে হবে। তার পরের দিন করাচির ফ্লাইট।

ফেরার তারিখটা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল আলতাফ। বাড়ির আবহাওয়া আজ সকাল থেকেই ভীষণ থমথমে। মাঝে মাঝেই ক্ষীণ শব্দ করে কেঁদে উঠছে ফতিমা। তার দুটো হাত ধরে আলতাফ বলে, 'কেঁদো না আপা, আমি আবার আসব।' বলতে বলতে তার গলা বুজে আসে। টের পায়, বুকের ভেতরটা অদ্ভুত কষ্টে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।

লতিফ পুরুষমানুষ। মায়ের মতো সে কাঁদছে না ঠিকই, তবে তার সারা মুখ গভীর বিষাদে ছেয়ে আছে।

ধনপত কাল বলেছিল, আজ দেড়টা নাগাদ আসবে। তারপর সে আর লতিফ তাকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে এলাহাবাদের ট্রেনে তুলে দেবে।

ধনপতের কাছে অস্বস্তির শেষ নেই আলতাফের। প্রথম দিকে তাদের বাড়ি যাবার জন্য জোর করত ধনপত পরে আর কিছু বলত না। ও যে ভীষণ ক্ষুব্ধ সেটা বোঝা যেত। কিন্তু কেন আলতাফ যায় নি তা তো আর ওকে বলা যায় না।

বেলা একটু বাড়লে ফতিমা আলমারি থেকে গয়নার বাক্স খুলে পুরনো হার, চুনি, কানের দুল এবং ক'টা আংটি বার করে বলে, 'এগুলো নিয়ে যা। সবাইকে দিস।'

আলতাফ চমকে ওঠে, 'না না, এসব দিও না আমায় —'

'আমার কি ইচ্ছা হয় না, নিজের ভাইবোন, তাদের ছেলেমেয়েদের কিছু দিই?'

আলতাফ জানায়, সে বিদেশি; এখান থেকে সোনাদানা বা মূল্যবান কিছু নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এয়ারপোর্টে আটকে দেবে।

বিমর্ষ মুখে ফতিমা বলল, 'আমার জিনিস। নিজের লোকেদের তা দিতে পারব না?' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে।

অনেক কষ্টে বড় বোনকে শান্ত করে আলতাফ। বোঝায়, এটা হল কানুন। তার খেলাপ করা যাবে না। সোনার গয়না নিয়ে গেলে তাকে বিপদে পড়তে হবে।

দেড়টা বাজার আগেই ধনপত চলে এল। এর মধ্যে স্যুটকেস হোল্ডঅল গুছিয়ে নিয়েছে আলতাফ। খাওয়াও হয়ে গেছে।

ধনপত বলল, 'সব রেডি?'

আলতাফ মাথা নাড়ে, 'হাঁ।'

'আমার সঙ্গে একবার নিচে চল--'

'কেন রে?'

'দরকার আছে।'

আলতাফকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির সামনে গলিটায় চলে এল ধনপত। সেখানে একটা অটোয় বসে আছে একজন বৃদ্ধ। বয়স পঁচাশি ছিয়াশি। দেখেই বোঝা যায় ভীষণ অসুস্থ।

ধনপত আলতাফকে দেখিয়ে বৃদ্ধকে বলে, 'বাপুজি, এই হল আলতাফ- '

লাজপত সিং যে নিজে চলে আসবে, ভাবা যায়নি। হৃৎপিন্ডের উত্থান পতন থমকে যায় আলতাফের ।

লাজপত অটো রিকশা থেকে নেমে এসে দু'হাতের ভেতর আলতাফের একটা হাত তুলে নিয়ে বলে, 'ধন্নোকে দিয়ে বার বার খবর দিলেও কেন তুমি আমাদের বাড়ি যাও নি, তা আমি জানি। বেটা, আজাদির আগে পরে সময়টা ছিল বহুৎ খারাপ। কারও মাথার ঠিক ছিল না। তোমাদের ওপর আমি জুলুম করেছি। তখন ভাবতাম মুসলমানরা চলে গেলে ইন্ডিয়ার ভাল হবে। পরে শির ঠাণ্ডা হলে ভেবে দেখেছি, অন্যায় হয়ে গেছে। এই কথাটা বলার জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম। তুমি গেলে না, তাই আমাকেই আসতে হল।'

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে আলতাফ। এই কি সেই লাজপত সিং, একদিন যে তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়েছিল?

লাজপত থামে নি, 'তোমরা চলে যাবার পর ধন্নোকে বলেছি, মুসলিম মহল্লায় যারা রইল, বিশেষ করে তোমার বহীন আর ভাগনে ভাগনিদের যেন দেখভাল করে।'

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে আলতাফ। গলায় স্বর ফোটে না।

লাজপত বলে যায়, 'বেটা আমার জন্যে তোমাদের বহুৎ তখলিফ হয়েছে। একান্ন সাল পর এখন আর কিছু করার নেই। আমাকে ক্ষমা করে দিও।' জোরে শ্বাস টেনে বলে, 'এর পর ইন্ডিয়ায় যখন আসবে, আমাদের বাড়ি নিশ্চয়ই এস।

ঝাপসা গলায় আলতাফ বলে, 'জরুর আসব চাচা—'

একটানা কথা বলার কারণে ভীষণ হাঁফাচ্ছিল লাজপত। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। বলল, 'বেটা, অনেক উমর হয়েছে। শরীর কমজোর। পন্দ্র সাল বুখারে ভুগছি। এখন খুব কষ্ট হচ্ছে। বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ব। চলি --'

লাজপত সিংয়ের অটো গলির বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হবার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আলতাফ। তাব মনে হল, ফতিমারা তো আছেই, এই মানুষটির জন্যও তাকে আবার ইন্ডিয়ায় আসতে হবে।

[প্রকাশকাল: বর্ষ ৬০/সংখ্যা ২: ১৪০৭]